ISSN :: 2454-1508
DOI Prefix: 10.69655

IIFS Impact Factor: 4.5
IJIN Impact Factor: 8.5

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর ২০২৫

আত্মদীপ

সহ-সম্পাদক:
আজিজুল সেখ

সম্পাদক:
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সম্পাদক:

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:

আজিজুল সেখ

UTTAR SURI

Inheriting the spirit, inspiring the future

প্রকাশক:

উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, অসম

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5(IJIN)
Volume-II, Issue-I, September, 2025

Published by:
Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/
Article Submission Link: https://www.uttarsuri.com/uttarsuri
Email: editor@atmadeep.in

Editor-in-Chief
Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate Editor
Azizul Sekh

Type Setting:
Amrika Das Purkayastha
Soumili Dhar

Printed at:
Scholar Publications
Sribhumi, Assam, India, 788710

Cover Page:
Kajal Ganguli

Price: Rs. 600.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.

The publishers believe that the contents of this Journal do not violate any existing copyright/intellectual property of others in any manner whatsoever. However, in the event the author has been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.

Editorial Board

Advisor

Dr. Tapadhir Bhattacharjee
Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam
President, Uttarsuri, Karimganj, Assam
Mo: +919435566494

Dr. Nirmal Kumar Sarkar
Former Associate Professor, Karimganj College, Karimganj, Assam
Vice-President, Uttarsuri, Karimganj, Assam
Mo: +919435375599

Editor-in-Chief

Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Asst. Professor, Karimganj College
Karimganj, Assam, 788710
Mo: +919435750458, +917002548380
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

Associate Editor

Azizul Sekh
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura
Mo: +919126261414
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Editorial Board Member:

Dr. Debasish Bhattacharjee
Professor & Head, Dept. of Bengali
Assam University, Silchar
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in

Dr. Rupasree Debnath
Assistant Professor, Department of Bengali
Gauhati University, Assam, India
Email: rupasree@gauhati.ac.in

Dr. Malay Deb
Assistant Professor, Dept. of Bengali
Tripura University, Tripura, India
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in

Dr. Madhumita Sengupta
Asst. Professor, Dept. of Bengali
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in

Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)
Associate Professor, Dept. of Bengali,
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in

Romana Papri
Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies
University of Dhaka, Bangladesh
Email: romanapapri@du.ac.bd

Dr. Rajarshi Chakrabarty
Assistant Professor, Dept. of History
University of Burdwan, West Bengal, India
Email: rchakrabarty@hist.buruniv.ac.in

Dr. Mumit Al Rashid
Associate Professor and chairman
Department of Persian Language and Literature
University of Dhaka, Bangladesh
Email: mumitarashid@du.ac.bd

Dr. Barnali Bhowmick Ghosh
Associate Professor and HOD
Department of Bengali
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **সোমেন চন্দের নির্বাচিত গল্পে সাম্যবাদী ভাবধারার কথাবিশ্বে মানবজীবনের রেখাচিত্র**
ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী, ১-৭

২। **বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে অন্ত্যজশ্রেণির সংগ্রাম**
ড. যতন সাহা, ৮-১৬

৩। **সাধারণ জীবন থেকে সাহিত্য-সৃজন: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রেক্ষিত**
সরলা মাণ্ডি, ১৭-২৩

৪। **বিমল লামার 'নুন চা' উপন্যাস: লোকজ উপাদানের অন্বেষণ**
ড. বিকাশ নার্জিনারী, ২৪-২৯

৫। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোট গল্পে নিম্নবর্গীয় চেতনা: এক বিশ্লেষণী পাঠ**
রাজর্ষি মোহান্ত, ৩০-৩৭

৬। **রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারী: এক বিশ্লেষণী পাঠ**
অপরাজিতা ভট্টাচার্য, ৩৮-৪৬

৭। **বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়': ভূগোলের চোখে**
সৌম্য ঘোষ, ৪৭-৫৩

৮। **শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোর অন্তর্বর্তী সমাজচেতনা**
রাহুল দে, ৫৪-৬৪

৯। **মুহূর্তে বদলে যায় নারীর জীবন: মহাশ্বেতা দেবীর 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাস**
অনসূয়া কুণ্ডু, ৬৫-৭১

১০। **সময়ের শিকল, নারীর আর্তনাদ: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প**
সুপ্রিতা নাথ, ৭২-৭৮

১১। **শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় নারী চরিত্রের অবলোকন**
সুস্মিতা সাহা, ৭৯-৮৪

১২। **'সেই পাখি' উপন্যাসের কাহিনি ও শিল্পরূপ: লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ পর্যালোচনা**
অশোককুমার রায়, ৮৫-৯২

১৩। **পঞ্চাশের মন্বন্তর কালে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন**
সুজন সাহা, ৯৩-৯৭

নাট্যভাবনা

১৪। **চন্দন সেনের নির্বাচিত নাটকে প্রতিবাদী নারী চরিত্র**
জয়ন্তী রাজোয়াড়, ৯৮-১০২

কবিতা

১৫। **নারী চেতনার আলোকে মহাকালের নারী: প্রসঙ্গ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা**
ড. রেজাউল ইসলাম, ১০৩-১১০

১৬। **'কৃত্তিবাসে'র আলোয় শঙ্খ ঘোষ: দেশ-কাল-সমাজ ও মানুষের সংবেদনশীল বয়ান**
শিরিন আক্তার, ১১১-১১৮

১৭। **বাংলা কাব্যগীতির ধারায় অতুলপ্রসাদ সেনের গজল**
মো: আফতাব উদ্দিন, ১১৯-১২৭

১৮। **স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী**
সুমিত পাল, রঞ্জনা ব্যানার্জি ও সমীররঞ্জন অধিকারী, ১২৮-১৩৭

১৯। **মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় প্রকৃতির স্বরূপ ও রূপবৈচিত্র্য**
হুমায়ুন কবির, ১৩৮-১৪৩

দর্শন ভাবনা

২০। **উপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতি ভাবনা: একটি সমীক্ষা**
ড. স্বপন মাল, ১৪৪-১৫৪

২১। **স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন এবং পাশ্চাত্যে এর প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ**
ড. আনন্দ ঘোষ, ১৫৫-১৬০

২২। **জীবন জিজ্ঞাসা: ভারতীয় দর্শনের আলোকে একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ**
ড. মৈত্রী গোস্বামী, ১৬১-১৬৬

২৩। **দুঃখ ও দুঃখ মুক্তির উপায়: ধম্মপদের আলোকে একটি সমীক্ষা**
টোটন হাজরা, ১৬৭-১৭২

লোকসাহিত্য

২৪। **শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ছড়া ও আঞ্চলিক শব্দ**
অলোক চন্দ, ১৭৩-১৮৩

২৫। **বিখ্যাত কিছু ধাঁধা: একটি বিশ্বব্যাপী অন্বেষণের প্রয়াস**
অসিত মন্ডল, ১৮৪-১৮৯

২৬। **'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭): রূপকথা ও শাশ্বত, আখ্যান কৌশলের আধুনিক বুনন**
সমরজিৎ শর্মা, ১৯০-১৯৫

বিবিধ

২৭। **প্রসঙ্গ কলকাতা ৭১: চলচ্চিত্র ভাষার নবনিরীক্ষা**
ড. মোস্তাক আলি, ১৯৬-২০৩

২৮। **বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আধুনিকতার রূপায়ন**
মো: কয়েছ আহমেদ ও ড. কৃষ্ণা ভদ্র, ২০৪-২১৭

২৯। **সাদা-কালোর বাইরে: নন-বাইনারি পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান**
বসুন্ধরা গাঙ্গুলি, ২১৮-২২৪

৩০। **বাড়ি থেকে পালিয়ে: স্রষ্টার দ্বন্দ্ব, সৃষ্টির দ্বন্দ্ব**
অগ্নিভ সান্যাল, ২২৫-২৩০

৩১। **ভেষজ চিকিৎসায় পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি গ্রাম কর্ণগড়ের একটি সমীক্ষা**
অনন্যা মুখার্জ্জী, ২৩১-২৩৭

৩২। **ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জনমত গঠনে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ভূমিকা**
শুভেন্দু বোস, ২৩৮-২৪৮

Guidelines, Review Process & Publication Ethics, Page No: 249
Publication Charge, Page No: 251

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যা থেকে আত্মদীপ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। এই পথের সহযাত্রী হিসেবে আমরা আপনাদের পেয়েছি, যার জন্য আমরা ঋদ্ধ হয়েছি। বহু বিষয় গত এক বৎসরে সংযোজিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকে একটি নতুনা মাত্রা এনে দিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আত্মদীপের এই পর্বের নির্বাচিত লেখাগুলোকে কথাসাহিত্য, নাট্যভাবনা, কবিতা, দর্শন, লোকসাহিত্য, বিবিধ ইত্যাদি নানারকম ভাগে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। যারা বাংলা ভাষায় লিখছেন, গবেষণা করছেন তাদের ভাবনাগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়াই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।

আত্মদীপ পত্রিকা শুধু সাহিত্যকেন্দ্রিক নয়, বাংলা ভাষায়, যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠানো যেতে পারে। পত্রিকাটি অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হওয়ায় গবেষক এবং লেখকদের অনেকটা সাহায্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিটি প্রবন্ধ DOI সহকারে প্রকাশিত হয়, যা প্রবন্ধটির স্থায়ী ওয়েব ঠিকানা হয়ে থাকবে।

আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি বাংলা ভাষায় এটি একটি অন্যতম জার্নাল যা সম্পূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যে কোনো প্রবন্ধ জমা দেওয়ার পর সেটিতে AI কিংবা Plagiarism আছে কীনা তা পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং তারপর রিভিউ এর জন্য পাঠানো হয়। রিভিউতে তা গ্রহণযোগ্য কিংবা রিভিউ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রবন্ধ উপস্থাপিত হলেই তা প্রকাশ করা হয়।

ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে যারা লেখা দিয়েছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী, যারা আমাদের আহ্বানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি। আত্মদীপের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (সম্পাদক)
আজিজুল সেখ (সহ-সম্পাদক)

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 01-07
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.172

সোমেন চন্দের নির্বাচিত গল্পে সাম্যবাদী ভাবধারার কথাবিশ্বে মানবজীবনের রেখাচিত্র

ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গলসী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The First World War, the middle time of First and Second World War, were captured in Somen Chanda's writings. Somen was a famous writer of the 40's decade. The depth of the content in his writings has been multidisciplinary. He created the character, dialogue, plot, topic in accordance with his time. He died in unknown killer's knife. He was the leader of the Trade Union. He received membership of the Communist Party. He was the writer like Sukanta Bhattacharya. The ideals of communism are reflected in his writings. The three stories 'Pratyabartan', 'Banaspati' and 'Sanket' written by him. In these three stories Somen wants to spread the ideals of communism into the public; that has been reflectected. In the story 'Pratyabartan', Prashanta's life associated with the struggle for Homeland can see the ruins of the past. In the story 'Banspati', the dewing myth surrounded a tree. The events of different times have been transformed there. In the story 'Sanket', the owners arrange for more profit in less money without solving the problem of these three stories have been captured by the flow of equality. Ordinary people are tried about the bitter experience. Somen dreamed of establishing equality in the midist of that difference. Those verses are the ones who have taken place in the narrative discussion.

Keywords: Equality, Governance, Exploitation, Protest

সোমেন চন্দ বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট একটি নাম। ৪০ এর দশকে বাংলায় যে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়েছিল; তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক বিপক্ষের হাতে অসময়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনি। কলকাতা এবং গ্রামসমাজ সন্নিহিত মফস্বলের দাঙ্গা, দারিদর‍্য, অর্থনৈতিক সমস্যা, আপামর জনসাধারণের সমস্যাবলী উল্লিখিত হয়েছে তার লেখায়। সমাজ ব্যতীত সাহিত্য সতত অসম্পূর্ণ। সেই সামাজিক বাস্তব সতত উঠে এসেছে সোমেনের লেখায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যে সামাজিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল; সেই অচলাবস্থাই সোমেন চন্দের মতো লেখককুলকে নির্মাণ করতে সহায়তা করেছিল। বাস্তবধর্মী প্রগতিশীল মানসিকতায় সমৃদ্ধ ছিল লেখকের মনন-মানসিকতা। যৌবনের অফুরান দীপ্তি তার সাহিত্যের মধ্যে নতুন প্রাণ পেয়েছে। সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য সমাজের বাস্তবধর্মী প্রতিফলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার আগে পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ আঘাত পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। বামপন্থার আদর্শ সমগ্র বিশ্বে সেসময় যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল; সেই আদর্শই সোমেনের কাছে হয়ে উঠেছিল আশ্রয়স্থল। প্রাকলগ্নে সময়, সমাজ যেভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছিল; তার বয়ান এভাবেই ফুটে উঠেছে সে সময়ের সাহিত্যে। শ্রমিকের শ্রমের যথোচিত মূল্য না পাওয়া; সমাজব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবান্বিত সময় সাধারণ মানুষের সত্তাকে করে তুলেছিল বিপর্যস্ত।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য -

> "এবং যে পথে সে অগ্রসর হচ্ছিল, সেটা তার স্বনির্বাচিত-সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ।"[১]

বিশ্বযুদ্ধের আবহ গম্ভীর করে তোলে মানুষের দিনানুদৈনিক জীবন। তার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত হয়। তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ তাঁর লেখায় সমকালীন এসব বিষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। শোষিত, নিপীড়িত জনগণের মানসিকতা ধরা পড়েছে এ সময়ের সাহিত্যে। নির্বাচিত কয়েকটি প্রসঙ্গ অনুযায়ী কিছু গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের আখ্যান তুলে ধরেছেন লেখক।

'প্রত্যাবর্তন' গল্পের শুরুতেই বলে দেওয়া হয় যে, ঘটনাটি সুদীর্ঘ ২৫ বছর পরের। সাধুভাষায় লেখা গল্পের মধ্যে লেখক এক মায়াবী সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বিকেলের পড়ন্ত রোদে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামে এসে দাঁড়ায় প্রশান্ত। বুনোফুল, ঘাস ইত্যাদির জঙ্গলে আর নদীকূলের মাঝিকে দেখে সে ২৫ বছর পূর্ববর্তী গ্রামের কথা স্মরণ করে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরে এই সময়ের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে। পাটের ক্ষেতে পাটচাষিদের দেখে প্রশান্তর মনে তার বাড়ির চিত্রই সবার আগে উদিত হয়।

স্মরণ করা যায় কবির বিখ্যাত উক্তি -

> "ভাঙাচোরা বুড়ি গলা
> বিশুদ্ধ অতলস্পর্শ,
> ঘরে ফিরতে বলে ডাকে।"[২]

তার মনে হয়- সম্পূর্ণ ভারতের মানচিত্রে তার প্রকৃত বাসস্থানটি কোথায়? দীর্ঘ ২৫ বছরের অজ্ঞাতবাসের ফলে বাড়ির স্মৃতি তার কাছে ম্লান হয়ে পড়েছে। তবু আজন্মের বন্ধন এই জন্মভূমি। বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অন্য মানুষের কৌতূহলের শিকার না হয়ে তার মনে হতে থাকে যে, মানুষের মানসিকতা কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে? সন্ধ্যার অন্ধকারে কালু মিঞার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। কালু মিঞা তার বাল্যবন্ধু। সরল বাক্যালাপে তাদের আলাপচারিতা জমে ওঠে।

লেখক গ্রামের মানুষের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে-

> "এ গাঁয়ের নবীন বা প্রাচীন আর কেউ এই পথে আসিয়া পড়িলে তাহাকে দেখিয়েও দেখিবে না, অথবা চাহিলেও একটা বিশেষ করুণার দৃষ্টিতে তাকাইবে ইহা সে চায় না। বিশেষত তাহারা যখন দেখিবে এক ঝাঁক কঙ্কালসার মানুষের মধ্যে একটি মেদ-বহুল মাংসল পুরুষ।"[৩]

গ্রামের এমন অবস্থার কারণ তথা ফলাফল গল্পের মধ্যে স্পষ্ট। অভাব, অন্নহীনতা, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মৃত্যু মানুষকে পীড়িত করেছে অহরহ। প্রশান্ত কালু মিঞার সঙ্গে তার ঘরে আসে। কেরোসিন তেলের কুপিতে কালুর ঘরদুয়ার-এর অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয় প্রশান্ত। কালুর বিশ্বাস, সবই ভাগ্যের খেলা। সে তার ছোটো ছেলে আলিকে ডেকে আনে। জন্মান্ধ ছেলেটির অবস্থা দেখে মায়া হয় প্রশান্ত - র। কালুর বড়ো দুই ছেলে আলাদা গ্রামে উচ্চবিত্তবিশিষ্ট বাড়িতে কর্মরত। সংসারের জোয়াল টানার কাজটি অবিরতভাবে করে যেতে হয় কালুকে। ভাগ্য বা নিয়তির ওপর নির্ভরশীল কালুর প্রথাগত ভাবনাকে ভাঙতে পারে না প্রশান্ত। মুড়ি, চিঁড়ে, গুড় দু'টি পাকা আম দিয়ে বন্ধুকে আহারাদি সেরে নিতে দেয় কালু মিঞা। কুয়ো থেকে জল তুলে এনে পান করার বিষয়টি নিয়ে কালু সচেতন হলেও জাতপাতের বৈষম্যে বিশ্বাসী নয় প্রশান্ত।

তার উক্তি লক্ষণীয়-

> "না না, ওসব না, তুমিই এনে দাও, আমার জাত মারা যাবে না, আমাদের কোন জাত নেই।"[৪]

প্রশান্ত পরিবর্তিত হয়নি। যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত মনই তার সঙ্গী। কালু তার ভাগ্যের বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। কালুর কথার মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মাটিতে খড়ের বিছানায় নতুন একটি কাঁথাতে শুয়ে শুয়ে সেইসব দিনের স্মৃতিকণিকায় ডুব দেয় প্রশান্ত। ফেলে যাওয়া বাড়িতে মা-বাবা না থাকলেও পিসি, পিসির ছেলেমেয়ে, ঠাকুমা-বাকি পরিজনেরা কোথায়- তা জানতে চায় প্রশান্ত। পিসিমারা ঠাকুমাকে একা রেখে চলে যান বহুদিন আগে। বুড়ি রান্না করে অনেকদিন খেয়েছে বহু কষ্টে। তারপর একদিন রান্না করা কোনো খাদ্যদ্রব্য নামাতে গিয়ে পা পুড়িয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে বুড়ির। নিজের ঠাকুমার মৃত্যুর এমন করুণ বিবরণ শুনে হতাশ হয় প্রশান্ত। জীবনের ছোঁয়া আর মৃত্যুর পরশ এত নিকটাত্মীয় যে, সেখানে তৃতীয়

কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির স্থান নেই। আর এই মৃত্যু বড়োই ভয়াবহ। কালু এ সময় দক্ষিণের আকাশে প্রচণ্ড ঝড়ের আগমন দেখতে পায়। ঝড়ের আরব্ধবার্তায় তাই আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। কালুর ঘরে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে প্রশান্ত। সকালে প্রশান্ত-র ঘুম ভাঙলে কালু অতিথি আপ্যায়নের জন্য নদীতে মাছ ধরতে যায়। প্রশান্ত তার ফেলে আসা জন্মভূমির ভিটেমাটিতে সন্ধান করে ফেরে তার পূর্বেতিহাসের স্মৃতি। পরিত্যক্ত ভিটেতে সেই সন্ধান উজ্জ্বল হয়ে থাকে স্মৃতিপটে।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' থেকে কিছু উক্তি উল্লেখ করা যায়-

> "ওই তাহাদের বাড়ী-ঘর, ওই বাঁশবন, ওই সল্‌তে খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা-ও সব সে কত ভালবাসে!"[৫]

অপুর মতো প্রশান্তও তার অতীতকে ফিরে পেতে চায় ব্যাকুল আগ্রহে। যুক্তিবাদী মননশীলতা মানুষকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে।

পরবর্তী গল্প 'বনস্পতি'-তে লেখক অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের কথকতা আবহমান করে তুলেছেন। একটি বটগাছকে কেন্দ্র করে একটি অঞ্চলের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। হাট ছাড়া পীরপুর গ্রামে কোনো বসতি নেই। দৈত্যাকার একটি সুবিশাল বটবৃক্ষ গ্রামের সম্মুখে প্রহরীর মতোই দাঁড়িয়ে আছে। পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু গ্রাম থেকে পীরপুরের হাট দেখা যায়। বটগাছের পাতায় নদী, বিলের জলীয় বাষ্পে দোলা লাগে। সেই গাছের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায় কোনো এক মুসলমান বুড়ি। কিংবদন্তীমিশ্রিত, নদীসমৃদ্ধ এক অঞ্চলের ইতিকথাকে লেখক যেন একটি ছবির দ্বারা পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে পীরপুর গ্রামের বৃদ্ধ জমিদার নবকিশোর চৌধুরীর জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন লেখক। বৃদ্ধ জমিদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী অরুন্ধতীর সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন হয়ে পড়েছে তাঁর একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রকিশোর। এই অভাবনীয় অপরাধ ক্ষমার্হ নয়। বাগানের কোনো একটি নির্জন কক্ষ জমিদারের ব্যভিচারী ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। সেখানে অরুন্ধতীকে বন্দিনী করে রাখা হয়। এরপর থেকে তাদের দু'জনেরই কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর কয়েকদিন পর নদীর ধারে বট আর অশ্বত্থের চারা রোপণ করে বিধিসম্মত উপায়ে উপাসনা শুরু হয়। সেই উপাসনার সঙ্গে সেখানে ছাগবলি দেওয়া হয়। বটগাছের জন্মের ইতিকথা এরকম। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত পরাধীন হল। পীরপুরের একটি ছেলে অর্জুন সিরাজের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিল। গ্রামের মধ্যে একটি দুর্ধর্ষ বাঘের আতঙ্কে সবাই যখন আতঙ্কিত; সে সময় অর্জুন সেই বাঘটিকে ঘায়েল করে। তার প্রেমের কথকতা ধরা পড়ে গল্পের মধ্যে। তার বীরত্ব তথা সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে চম্পক তার প্রেমে পড়ে। অর্জুন যখন নৌকায় করে দূরদেশে যাত্রা করে; তখন চম্পক সেই গাছের কাছে প্রার্থনা জানায়। প্রকৃত অর্থে অর্জুন স্বদেশের রক্ষাকর্তা, দেশপ্রেমিক। তার সময়কাল পৃথক। সে কিন্তু আর ফিরে আসে না।

এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-

> "পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার লড়াই করিয়া সে প্রাণ দিয়েছে।"[৬]

গল্পের মধ্যে এরপর এসেছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ। বাংলায় দুর্ভিক্ষ এত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে, বহু মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের অমানবিক মানসিকতা সাধারণ জনমানসকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দেবাংশী সেই বটগাছের তলায় নতমস্তক হয়ে সেই সময় এই বিপর্যস্ত মানুষদের অনেকেই প্রার্থনা জানিয়েছিল।

১০০ বছরের কাছাকাছি সময়ের পর পীরপুর গ্রাম যখন সমগ্র বাংলার সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে; সে সময় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হল। পীরপুরের বটগাছে একজন সিপাহি আশ্রয় নিয়েছিল। কয়েক বছর পর বসন্তের প্রকোপে গ্রামে মড়ক দেখা দিল। সেসময়ও মানুষ বটগাছের কাছে প্রার্থনা করেছিল। বহু ছাগবলি সেসময় বৃক্ষদেবতার উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছিল। মানুষের সাধারণ লোকবিশ্বাসের মধ্যে বেঁচে থাকে বৃক্ষের মাহাত্ম্য। শঙ্কর ভুঁইমালী হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার স্ত্রী বটগাছের কাছে এসে মাথা ঠুকে কাঁদতে থাকে। গল্পের মধ্যে এক বৃহৎ সময়ের ইতিহাসকে নানান ঘটনার সম্ভারে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। শেষে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে। গ্রামের জামাই নৌকা করে শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। তাঁর হাতের পত্রিকা থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। সেই গল্প পড়ছে কিশোর সতু।

পীরপুর গ্রামের মনোহর চক্রবর্তী প্রচার করেন-

> "তাহাদেরই পীরপুর গায়ের রাজেন মিত্তিরের ছেলে সতীন মিত্র শহরের কোন এক সাহেবকে মারিতে গিয়া নাকি ধরা পড়িয়াছেশম্বয়ের।"[৭]

তৎকালীন সময়ের মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহসিকতা নিয়ে টিকেছিল। পীরপুরের বিশাল বটগাছ সেই ঘটনার সাক্ষী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কিছু যুবক পীরপুর গ্রামে এসেছিল। তারা প্রচার করেছিল স্বদেশি মন্ত্র। স্বদেশি গান পীরপুরের মানুষদের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে তুলেছিল। ন্যুব্জ, বৃদ্ধ বটগাছ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সময় ভগ্নপ্রায়। তার মৃত্যুর সময় সমাগত। বটগাছের গুঁড়িতে একজন লুকিয়ে থাকতে পারবে এমন স্থান হয়ে উঠেছে।

লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "সেদিন হাটবার, সেদিনের অবস্থা দেখিলে এতকালের ইতিহাসকে ভুলেও মনে করা যায় না, দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, একটা ভীষণ কোলাহল চাঁদোয়ার মতো সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে গুম-গুম করিতে থাকে।"[৮]

হাটবারের দিনই ঘটনাটি ঘটে। কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর বটগাছের তলায় হাট বসেছে। হাটের মধ্যে ছেলে, বুড়ো সকলেই নিজের মতো করে সওদা করছে। একটার সময় সতীন মিত্র; যার উল্লেখ গল্পের মধ্যে পূর্বেও আছে- বক্তৃতা শুরু করেন। পীরপুর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের কৃষকরা কিছুদিন আগে কারামুক্ত সতীনের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। সতীন মানবাধিকার নিয়ে, মানুষের খাদ্যের অধিকার নিয়ে কথা বলছিল। মূল্যবৃদ্ধির জগতে ফসলের দাম বাড়েনি কেন-তার যথাযথ ব্যাখ্যা চেয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল। সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিল। তাদের মনে প্রশ্নের জোয়ার আসার আগেই সতীনের কণ্ঠ রোধ করা হল। লাঠিয়াল বাহিনি এসে সতীনকে নির্বিচারে পিটিয়ে হত্যা করলো। বটগাছের মাটি ছাগরক্তের সঙ্গে মানুষের রক্তে রক্তিম হয়ে গেল। যারা বটগাছের তলায় পড়ে থাকল; তাদের পরিচর্যার জন্য কেউ সেখানে থাকলো না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য-

> "বাংলা তথা ভারতের দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল দুর্ভিক্ষ।"[৯]

এর দিন কয়েকের মধ্যেই এক ভীষণ ঝড়ে মৃতপ্রায় বটগাছ ভেঙে পড়ে। স্থানীয় জমিদার তার কাঠ বেচে অর্থ লাভ করেন। একটি বটবৃক্ষের সুদীর্ঘ ২০০ বছরের ইতিবৃত্ত লেখক বর্ণনা করেন। মানুষের সরব অভিব্যক্তির সঙ্গে বটগাছের অভিব্যক্তি যেন নীরবে ঘোষিত হয়েছে এ গল্পে। লেখক বাস্তব আর লোকবিশ্বাসকে সমান্তরাল পদ্ধতিতে বিচার করেছেন এ গল্পে। নতুন যুগে, নতুন সময়ে এ মাটিতে নতুন কোনো সমাজ, জনমানস গড়ে উঠবে। কিন্তু তার পশ্চাতে থেকে যাবে এই সময়ের ইতিহাস।

আলোচনার অন্তর্ভুক্ত পরবর্তী গল্পটি হল 'সংকেত'। এ গল্পের শুরুতেই নদীর বুকে লঞ্চ আসার ছবি আছে। পাখিদের কলরবের মধ্যে বনগ্রামের মজে যাওয়া নদীর বুকে লঞ্চ এসে দাঁড়ায়। ছেলেকে নিয়ে নদীর কূলে ছিল অন্ধ দশরথ। তামাক খাবার জন্য যখন বাবা-ছেলে দু'জনেই প্রস্তুত হচ্ছে; সে সময় লঞ্চটি এসে কূলে দাঁড়ায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কল্যাণে দশরথ শব্দ শুনতে পায় আর রাম তা দেখতে পায় কিছু পরেই। দশরথ বহুদিন আগে তার প্রথম স্টিমার দর্শনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়িছে ছেলের কাছে। রাম সেই বর্ণনা সমস্ত গ্রামের কাছে ব্যক্ত করেছে। বর্তমানে লঞ্চ থেকে অবতরণ করেছেন একজন বাবু। গ্রামের ইয়াসিন তাকে সেলাম করে। সেই ব্যক্তি কোনো এক কাপড় কলের ম্যানেজার। মিলের কর্মচারী সংগ্রহের জন্য এখানে তিনি এসেছেন। ইয়াসিনের সঙ্গে বলরামের বার্তালাপাইয়া ইয়াসিন তার ছোটোবেলায় ঘটা এরকম এক ঘটনার বিবরণ দেয়।

আকবর আলি এ সময় আসে এবং জানায়-

> "লড়াইয়ের খবর রাখনি, ইয়াসিন মিয়া? হেইর লাইগা ফাঁকি দিয়া লোক লিবার আইছে, জান?"[১০]

আকবর আলির মতে, যুদ্ধে যাওয়ার জন্য লোক সংগ্রহ করতে এসেছেন এই বাবু। গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হচ্ছিল এই প্রসঙ্গে। এসময় সেখানে উপস্থিত হয় বাচ্চা মৌলবী।

তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন-

> "সে পাশের গ্রামেই থাকে এবং মাঝে মাঝে কোন পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়া বেলা দুইটা-আড়াইটা অবধি এ অঞ্চলের সকলকে যুদ্ধের খবর শুনাইয়া যায়।"[১১]

বাবুটির দীর্ঘ পরিচিতি সম্পর্কে বলার পর মৌলবী জানায় যে, কাপড় তৈরির জন্যই কর্মী সংগ্রহ করতে তিনি এসেছেন। রহমানকে সে জানায় যে, তার ঘরে তাঁত আছে বলে তাকেই আগে নেওয়া হবে। ইয়াসিন এবার উপস্থিত জনতার কাছে জানতে চায় যে, তার কথা জনতা বিশ্বাস করেছে কি না? বলরাম আগে তার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও এখন ইয়াসিনের সঙ্গে পরামর্শ করে। ম্যানেজার গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন গাছের ছায়ায় বসে। তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য তাদের তিনি রাজি করান। কাপড়ের যে কলে তারা চাকরি করতে যাচ্ছে সেখানে হাসপাতাল, খেলার মাঠ, সিনেমা অর্থাৎ আধুনিক জীবনযাপনের সব রসদই মজুত আছে।

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ্য-

> "যৌবনের সহজ উন্মাদনায় প্রচলিত বন্ধন-সীমা ভেঙে ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উত্তেজনাই তখন তরুণ লেখকের মধ্যে প্রবল।"[১২]

নববিবাহিত রহমান তার স্ত্রী এবং বৃদ্ধ পিতাকে ছেড়ে মনোকষ্ট নিয়েই দূরে যায়। বাড়ি থেকে নদীর দিকে যাবার পথে গোলাম আলীর বাড়ির বকুল ফুলের গন্ধ মোহিত করে রহমান আর তার বাবাকে।

উল্লেখ করা যায় কবির বিখ্যাত উক্তি-

> "'যেতে আমি দিব না তোমায়'।
> তবুও সময় হল শেষ, তবু হায় যেতে দিতে হল।"[১৩]

বাবা-ছেলের অকৃত্রিম স্নেহের সম্পর্ক প্রতিফলিত হয় গল্পে। প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের আবাল্যপরিচিত ভূমি ছেড়ে নতুন অজানার সন্ধানে যাওয়া বড়ো কষ্টের। ঘুমের মধ্যে রহমান বাড়ির স্বপ্নই দেখে। অবশেষে অনেকটা সময় প্রতীক্ষার পর লঞ্চ নির্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী হয়। লঞ্চ একেবারে পাড়ে আসার আগে কিছু সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকারে সবাই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। দেখা যায় একদল মানুষকে। ম্যানেজারের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ওঠে। লঞ্চ পাড়ে আসার আগে সেই মানুষের দল ঘিরে ফেলে লঞ্চটিকে। নদীর জলও যেন তাদের পদচারণার সঙ্গে উত্তাল হয়ে ওঠে।

ভিড়ের একদম সম্মুখবর্তী একটি অল্পবয়সী লোক; যে এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। যে দৃঢ় কণ্ঠে জানায় যে, এখানে যেসব কথা বলে শ্রমিকদের চাকরি দিতে আনা হয়েছে; তা প্রকৃত সত্য নয়। এর মধ্যে আছে বঞ্চনা ও অবদমনের সুগভীর ইতিহাস।

তার বক্তব্যের অংশবিশেষ উল্লেখ্য-

> "আমরা স্ট্রাইক করেছি, মিলের কাজ বন্ধ। আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি।"[১৪]

অন্যায়ের এই স্রোতোধারা একবার শুরু হলে তাকে শেষ করার জন্য উদগ্র কুঠারাঘাত প্রয়োজন। অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাদের জায়গায় চাকরিতে নিযুক্ত হতে চলেছে কিছু সরল সাধারণ মানুষ। পুঁজিবাদের তীব্র কুফল মানবসমাজকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। সেই পাক খোলার জন্যই এই ভুক্তভোগী শ্রমিকদের চিৎকার ও প্রতিবাদ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য-

> "মার্কসের পার্টি-চিন্তার মূল কথা হলো- শ্রমিকশ্রেণির আত্মনির্ভরতা, সৃজনধর্মী শ্রেণিচেতন এবং পুরোপুরি গণতান্ত্রিক সংগঠন।"[১৫]

পাড়ে নামার পর রহমানের সঙ্গে আলাপ হয় এক অপরিচিত কিশোরের। উপায়ন্তরবিহীন এই অসহায় শ্রমিকদের পরিবর্তে তাদের কাজ দিয়ে ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে একই ধরনের অন্যায় কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করতে পারে। গ্রামের বাদশা মিঞা ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে রহমান কর্তব্যকর্ম ঠিক করতে পারে না। দুপুরে বউয়ের বেঁধে দেওয়া মুড়ি, চিঁড়ে, গুড় দিয়ে খাওয়া সেরে নেয় সে। বিকেলের দিকে মৌলবীর ডাকে অনেকে এসে মিলের প্রধান দরজায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শুয়ে পড়ে।

প্রধান দরজার একদম সামনে যাবার পর রহমান অবাক হয়ে দেখে যে, মৌলবী প্রধান দরজার সামনে শুয়ে থাকা মানুষদের গা মাড়িয়ে ভেতরে ঢোকে। যে কিশোর রহমানের সঙ্গে আলাপ করেছিল ইতিপূর্বে; সে ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে চিৎকার করছিল এই চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে রহমান সেই সকালের বক্তৃতা

উপস্থাপন করার লোকটিকে একটি ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিতে দেখে। প্রাক সন্ধ্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে তমসা ঘনিয়ে আসার আগে গুলির শব্দ শুনতে পায় রহমান। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। প্রসঙ্গক্রমে তার কিছু অংশ উল্লেখ করা যায়-

> "...কেহ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ পড়িতে পড়িতে হাঁটিতেছে; আবার হঠাৎ বসিয়া পড়িল। শীতের দিনের গৈরিক ধূলি রক্তবর্ণ হইয়া গেল।"[১৬]

রহমান প্রাণপণে দৌড়ে সেই রক্তবর্ণ ধূলিপূর্ণ স্থান থেকে দূরে চলে এসে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে এই ভয়ানক ঘটনার পারম্পর্য।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় কবির বিখ্যাত উক্তি-

> "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
> তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"[১৭]

রহমান এ যুগের অনিশ্চিত মানসিকতার মূর্তিমান প্রতীক। সে চেষ্টা করলেও এই হৃদয়হীন পুঁজিবাদের বিরোধিতায় সফল হতে পারবে না।। আবার চোখের সামনে মানুষকে গৃহহীন, নিরন্ন অবস্থায় সে দেখতে চায় না। সমস্যার সমারোহে দ্বান্দ্বিক বিষয় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে রহমানের মতো মানুষদের চারপাশে। শ্রমিকের শ্রমের মূল্য স্বল্প। বিবেক, আবেগ বিসর্জন দিয়ে মানুষ মানবতা ত্যাগ করতে পারে আপন স্বার্থে। সাম্যবাদিতার চিন্তা করেছিলেন সোমেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য-

> "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯) এবং বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭) বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলেছিল। অপজাত, অবজ্ঞাত মানুষদের স্থান দেওয়ার পিছনে কাজ করেছিল মনোজগতের এই অভিঘাত।"[১৮]

আলোচিত তিনটি গল্পের মধ্যে প্রতীকায়িত হয়েছে নানাবিধ উপায়ে। 'প্রত্যাবর্তন' সাম্যবাদের সূর্য আনতে চাওয়া এক বিপ্লবীর কাহিনি। সে নিজে গল্পের শেষ অবধি তার সমাপ্ত হয়ে যাওয়া পরিবারের ধ্বংসস্তূপে জীবনের স্পন্দন খুঁজে বেড়ায়। 'বনস্পতি' গল্পে দেবাংশী বটবৃক্ষের নানাবিধ ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার সঙ্গেই তৈরি হয় সতীন মিত্রের হত্যাকাহিনি। বলি আর হত্যার রঙে রাঙা হয়ে ওঠে পীরপুরের মাটি। সাম্যবাদের আখ্যানপটে রচিত হয় এক বিপ্লবীর সৌধ। 'সংকেত' গল্পে সাম্যবাদের বিপক্ষে বৈষম্য এনেই বিভেদমূলক নীতি দ্বারা মানুষকে গৃহহীন, কর্মহীন, নিরন্ন করে তুলতে চেয়েছে পুঁজিবাদী সমাজ। সেই পুঁজিবাদ মানুষের হৃদয়ে বিবেকের প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। লেখক সোমেন চন্দ সাম্যবাদের আদর্শে জীবনের পথ ও পন্থা পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজ প্রহেলিকা মাত্র। সেই চেতনাকে সম্মুখে রেখেই রচিত হয়েছে সাম্যবাদের ধারা আনার প্রচেষ্টা। তরুণ লেখক তার আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেই সাম্যবাদিতার দিন আনতে চেয়েছিলেন। গল্পগুলিতে তার মহৎ ইচ্ছার সদর্থক প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ। পরিচয় পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ, (সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ)-এর অন্তর্গত। মজুমদার, দিলীপ, সম্পাদনা। নবজাতক প্রকাশন। কলকাতা। সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ৩০৮।

২. মিত্র, অরুণ। জনমদুখিনীর ঘর। https://www.facebook.com/share/P/1FswyKCDup/ (বিবস্বান- একটি সাহিত্য গোষ্ঠী)-র Facebook Page - এ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪-তে প্রকাশিত), প্রবেশের তারিখ: ২৪ আগস্ট, ২০২৫।

৩. চন্দ, সোমেন। প্রত্যাবর্তন। সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ৭২।

৪. তদেব, পৃ. ৭৩।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। কামিনী প্রকাশালয়, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ১৪৩।

৬. চন্দ, সোমেন। বনস্পতি। সোমেন চন্দ ও তার রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ. ১০৭।

৭. তদেব, পৃ. ১১৩।

৮. তদেব, পৃ. ১১৫।
৯. শ, রামেশ্বর। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ। পুস্তক বিপণি, ২০০৬, কোলকাতা, পৃ. ৬১।
১০. চন্দ, সোমেন। সংকেত। সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ১৭৮।
১১. তদেব, পৃ. ১৭৯।
১২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ১৯৫।
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। যেতে নাহি দিব, (সোনার তরী) । বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৩, কলিকাতা, পৃ. ৪১।
১৪. চন্দ, সোমেন। সংকেত। সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ১৮৬।
১৫. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু। কথাসাহিত্য: কথাসাহিত্যিক। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৯৪।
১৬. চন্দ, সোমেন। সংকেত। সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ১৯১।
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ৭০ নং কবিতা, (নৈবেদ্য)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৩৯৩, কলিকাতা, পৃ. ২৯৯।
১৮. চক্রবর্তী, অলক। বিশ শতক: কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা। উচ্চতর বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, বর্ধমান, পৃ. ১০০-১০১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চন্দ, সোমেন। (সোমেন চন্দ তাঁর রচনাসংগ্রহ) । মজুমদার, দিলীপ, সম্পাদনা। নবজাতক প্রকাশন। কলকাতা। সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। কামিনী প্রকাশালয়, ২০১১, কলকাতা।
৩. শ, রামেশ্বর। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ। পুস্তক বিপণি, ২০০৬, কলকাতা।
৪. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬, কলকাতা।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। যেতে নাহি দিব, (সোনার তরী) । বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৩, কলকাতা।
৬. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু। কথাসাহিত্য: কথাসাহিত্যিক।বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, কলকাতা।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ৭০ নং কবিতা, (নৈবেদ্য)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৩৯৩, কলকাতা।
৮. চক্রবর্তী, অলক। বিশ শতক: কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা। উচ্চতর বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, বর্ধমান।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 08- 16
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.173

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে অন্ত্যজশ্রেণির সংগ্রাম

ড. যতন সাহা, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লঙ্কা মহাবিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 05.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the period of India's freedom movement, many writers emerged, among whom Assamese fiction writer Birendra Kumar Bhattacharya holds a special place of honor. He was simultaneously a poet, storyteller, playwright, essayist, and novelist. His novels gained immense popularity among readers. His life was full of diverse activities. Apart from literary pursuits, he also worked as a journalist and editor. For his livelihood, he traveled to different regions of Assam, and through his writings, he vividly portrayed the struggles and problems of common people. These struggles and problems found deep reflection in his novels.

In discussing the novel 'Iaruingam' in brief, on the one hand, the economic, social, and political oppression of the marginalized classes will be highlighted on the other hand, the characters of the novel, rising above all inferiority complexes, emerge as dignified human beings through the joy of self-respect. An attempt will be made to bring forth these aspects in the main discussion.

Keywords: Marginalized classes, Economic oppression, social oppression, Political, Humanism

সাহিত্যে শ্রেণিসংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। সমাজে ধনী-গরিব, শোষিত-শাসিত জনগোষ্ঠীর দুঃখ, দারিদ্র্য ও প্রতিরোধ সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সমাজে ক্ষমতাশালী ও বঞ্চিত শ্রেণির দ্বন্দ্ব সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন পর্যন্ত, এই সংগ্রামের চিত্র সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, যেমন, কবিতা, উপন্যাস, নাটক এবং গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। অসমীয়া সাহিত্যেও শ্রেণিসংগ্রাম একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিশেষ করে বিশ শতকের সাহিত্যে কৃষক, শ্রমিক ও নিপীড়িত শ্রেণির বাস্তব জীবনচিত্রের পাশাপাশি তাদের অধিকার ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের প্রতিফলন দেখা যায়। লক্ষীনাথ বেজবরুয়া থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র গোস্বামী, শীলভদ্র, ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া, ভূপেন হাজরিকা, আব্দুল মালিক এবং বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে অন্ত্যজশ্রেণির (Marginalised) মানুষ। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসেও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের-ই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে সকল লেখকদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অসমীয়া কথা সাহিত্যিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য অন্যতম। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাগা সমাজের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিষ্পেষণ। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম'

উপন্যাস অবলম্বনে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষগুলোর সমস্যার বিবরণ এবং তাদের উত্তরণের বিষয়ে আলোকপাত করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি: পদ্ধতি বিদ্যা হিসাবে বিশ্লেষণাত্মক এবং বর্ণনাত্মক এই দুটি পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করেছি। নীচে উপন্যাসের কাহিনি পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে উল্লিখিত বিষয়টির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস করব।

'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে টাংখুল নাগাদের স্বদেশানুরাগী যুবকদের প্রতিনিধি স্বরূপ রিশাং, ফানিটফাং এবং খাটিং নামে তিনটি পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মূল ঘটনাটি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। নাগা সমাজের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিষ্পেষণের চিত্র তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি নাগাদের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যেরও মানবতাবাদের ধ্বনি শোনা যায় এখানে।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসটি অসমীয়া সাহিত্যের একটি অন্যতম উপন্যাস। ইয়ারুইঙ্গম একটি নাগা শব্দ যার অর্থ হল 'প্রজা সাধারণের শাসন'। ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমার মণিপুরের সমান্তবর্তী নাগা অধ্যুষিত গ্রাম উখ্রুলে শিক্ষকতা করতে যান এবং সেই সময় তিনি নাগা সমাজকে খুব কাছের থেকে দেখেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনি গড়ে তোলেন। উপন্যাসের পটভূমি মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড সীমান্তের একটি নাগা অধ্যুষিত গ্রাম। কাহিনির সময়সীমা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করার পরবর্তী কিছু সময় এর কাহিনি।

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানি সৈন্য মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড পাহাড় ত্যাগ করার পর। এই জাপানি সৈন্যের সঙ্গে সুভাষ বসুর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এর একজন নাগা সৈন্য ছিল ভিডেশ্যেলী। নাগাদের মধ্যে দুটি প্রধান গোষ্ঠী রয়েছে এক টাংখুল, অপরটি আঙ্গামী। ভিডেশ্যেলী ছিল আঙ্গামী নাগা। মিত্রশক্তি জাপানের সঙ্গে মিলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারত স্বাধীন করাই ছিল তার একমাত্র স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নই তাকে সুভাষ বসুর অনুগামী করে এবং সে ব্রহ্মদেশে (বর্তমান ম্যানমার) গিয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে' যোগদান করে। একদিন জাপানি সৈন্য ভারত থেকে ফিরে যায় কিন্তু সংগ্রামী ভিডেশ্যেলী নাগা পাহাড়েই থেকে যায়। এবং সে স্বপ্ন দেখে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

"সমগ্র দেশখন স্বাধীন করি এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঢ়ার স্বপ্নত সি বোলে বাউল।"[১]

শুধু তাই নয়, নাগাদের মধ্যে সে এক স্বাধীন নাগা রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে নাগা গ্রামবাসীদের-

"সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য এখনর স্বপ্নই মানুহবোরর মনত দ সাঁচ বহুবাইছিল।"[২]

কিন্তু উপন্যাসের অপর এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র গান্ধীবাদে বিশ্বাসী রিশাঙের কাছে এটা হাস্যকর এবং অলীক স্বপ্ন মনে হয়-

> "এটা মানুহর অদমনীয় আশারে এখন রাজ্য গঢ়ি নুঠে; রাজ্য গঢ়িছে ব্রিটেন, জাপানে আরু আন আন সভ্য দেশবোরে যি বোরর হাতত বিরাট সৈন্যবাহিনী আরু বোমারু বিমান আছে। রাজ্য পাতিছে ইংরাজে, - যার রাজ্যত সূর্য ডুব নাযায়।রাজ্য পাতিছে আমেরিকাই, যার ধনেরে পৃথিবী কিনিব পারে। তেনে রাজ্য পাতিব এটি অহৌ বলিয়া আঙ্গামীয়ে! তদুপরি রাজ্যখনেই বা কেলেই? সিহঁতক লাগে স্কুল, হাস্পাতাল, রাস্তা। রাজ্য সিহঁতর হারমালহে হ'ব। ধন-সোন, অস্ত্র এইবোর ক'র পরা পাব? তাতকৈ বরং এতিয়া যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থকাই ভাল।"[৩]

রিশাঙের পাশাপাশি উপন্যাসে দেখা যায় খাটিং ও ফানিটফাঙ স্কুল কলেজ ছেড়ে ইংরাজ সরকারের অধীনস্থ 'ভি' ফোর্সে যোগদান করে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করে। তার বিনিময়ে চীফ কমিশনার তাদের আশ্বাস দেন যে নাগাভূমিতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও যাতায়াতের জন্য সুব্যবস্থা করে দেবেন। এই আশা নিয়েই তিন বন্ধু বিভিন্ন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে শেষে নিজের জন্মভূমি ট্রাংখ্রুলে এসে পৌঁছায়। এখানেই রিশাঙ ও ভিডেশ্যেলির সংগ্রামের পথ ভিন্ন। সে ভিডেশ্যেলির আদর্শ সম্পর্কে বলে-

> "ভিডেশ্যেলীয়ে যি বাটে যাবলৈ বিচাৰিছে, সিহঁতে তাৰ ওলোটা বাটে যাব খুজিছে। কিন্তু ভিডেশ্যেলীৰ এদিন মোহ-মুক্তি হবলৈ বাধ্য। এদিন সি বুজিব বন্ধুভাবে যিমানে সম্পদ আদায় কৰিব পাৰি, শত্রুভাবে নোবাৰি। বরং পৃথিবীৰ শক্তিশালী দেশ এখনৰ শত্রু হৈ নিজেকে ধ্বংস কৰিবলৈ বেছি পৰ নেলাগে।"[৪]

এখানেই সে ক্ষান্ত থাকেনি। উপন্যাসের অপর এক উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র চারেংলা নেতাজী সম্পর্কে জানতে চাইলে, তখন অহিংসায় বিশ্বাসী রিশাঙ বলে-

> "নেতাজী! বৰ ডাঙৰ এজন নেতা।...এক দুর্জয় বাসনা আৰু অসীম মনোবলেৰে তেঁও মুক্তিৰ বাণী বহন কৰি, সীমান্তত প্রবেশ কৰিছিলহি। কিন্তু তেঁওৰ এই দেশ গঢ়াৰ স্বপ্ন এই পথেদি পূর্ণ নহয়। এদিন নেতাজী আৰু ভিডেশ্যেলী দুয়ো তেওঁলোকৰ ভুল বুজিব।"[৫]

একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সৈন্যদের নাগা পাহাড় দখল অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি নাগা জনসাধারণের দুর্দশার প্রধান কারণ হয়ে উঠেছিল, তার বিবরণ উপন্যাসের বহু জায়গায় পাওয়া যায়। আবার মহামারী বসন্তে দিন দিন মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে এক মৃত্যু উপত্যকার পরিণত হয় নাগা পাহাড়।

বলা বাহুল্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নাগারা শোষিত বঞ্চিত হয়ে এসেছে। তাই একদিন সবকিছু ছেড়ে দেশ ও জাতির জন্য ভিডেশ্যেলী নেতাজীর শরণাপন্ন হয়ে জাপানি সৈন্য দলে ভর্তি হয়েছিল। সিঙ্গাপুরে প্যারেডের সময় নেতাজিকে সে বলতে শুনেছে-

> "যি মৰিব জানে, সিহে স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজিব জানে।"[৬]

নেতাজীর সেই বাণীই সে নাগা পাহাড়ের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু রিশাঙের মতো নাগা জনসাধারণ গান্ধীকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছে। সেখানে নেতাজিপন্থী ভিডেশ্যেলীর বক্তব্য হল-

> "যুদ্ধ জানো বন্ধুক-উৰাজাহাজ কৰে? যুদ্ধ কৰে মানুহে। যদি ৰাইজে আমাক মানে, তেন্তে আৰু কি লাগে! ৰাইজেই ৰজা।"[৭]

উপন্যাসে দেখি, সারাভারত ব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে। নাগা পাহাড়েও এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। কিন্তু ভিডেশ্যেলীর লক্ষ্য নাগা পাহাড়কে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাগাল্যান্ডকে এক সার্বভৌম রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। নাগা রাজ্য গঠন করার জন্য সে আত্মগোপন করে এবং একটি গুপ্ত বাহিনী গঠন করার কাজে নিজেকে সমর্পিত করে। তাই সে নাগা জনসাধারণকে তার দলে ভর্তি করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে-

> "নগা গাঁৱে গাঁৱে কৈ ফুৰিছে বোলে ব্রিটিছক খেদি নগা স্বাধীন হব লাগে।"[৮]

ভিডেশ্যেলীর এই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকার গ্রেফতারি আদেশ জারী করে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র খাইখুইয়ের মুখে শোনা যায় ভিডেশ্যেলীর গ্রেফতারী পরোয়ানার কথা-

> "কালি চীফ কমিশ্যনাৰৰ পৰা এটা বায়াৰলেছ পাঁইছো।... 'অ' ভিডেশ্যেলী হৈছে দাগী বিদ্রোহী। তাৰ ওপৰত গ্রেপ্তাৰেৰ আদেশ হৈছে।"[৯]

অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাগাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কমপেনসেশন্ আদায় করার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন তা নাগা যুবকেরা অনুধাবন করতে পারে। তাছাড়া লবন, কার্পাস, আদা ইত্যাদি কাঁচা মালের উচিত মূল্য তাদের প্রাপ্য আদায়ের জন্যে একজন নেতা তাদের প্রয়োজন আর এই নেতা তারা রিশাঙের মধ্যে দেখতে পায়। কিন্তু রিশাং জানে এইসবের জন্যে শিক্ষার বড় প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনেই সে মিশনারী ডক্টর ব্রুকের প্রচেষ্টায় কলকাতায় পড়তে যায়।

উপন্যাসে দেখা যায় রিশাং, খাটিং এবং ফানিটফাঙ তিন বন্ধু তিনটি আদর্শে চলে। রিশাঙ চলে যায় কলকাতায় পড়াশোনার জন্যে। খাটিং মিলিটারিতে ভর্তি হয়। এবং ফানিটফাঙ ভিডেশ্যেলীর প্ররোচনায় পড়ে নিজেকে তার অনুচর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। ভিডেশ্যেলীর মতো সেও এক স্বাধীন নাগা রাজ্যের স্বপ্ন দেখে।

নাগা যুবকেরা যেন বিপথে পরিচালিত হয়ে ভিডেশ্যেলীর দলে যোগ না দেয় সেজন্য উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র জীবন মাস্টার ও রিশাঙ ঘরে ঘরে গিয়ে শান্তির বাণী শোনায়। অপরদিকে সর্বস্ব হারিয়ে নাগারা যে ক্ষতিপূরণ সরকার থেকে পাওয়ার কথা ছিল সেটা না পেয়ে এন ভি, জেমস প্রমুখ নাগা যুবকেরা ভিডেশ্যেলীর গোপন শিবিরে গিয়ে কাজ করতে শুরু করে। ঔপন্যাসিক তার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে-

> "মহাসমরর আঘাতত সিঁহতর গাঁও ভূই আরু জীবন বিধ্বস্ত হৈ যোবার পিছরে পরা ক্ষতিপূরণ আরু অন্যান্য সহায় বিচারি মানুহবোরে চরকারর ওচরলৈ কেইবাবারো গৈছে, কিন্তু একো হোবা নাই। ক্ষোভত আরু ক্রোধত বহুত মানুহে ভিডেশ্যেলীর পক্ষ হৈ এতিয়া নগা পর্বতর গভীর অরণ্যত বন্দুক-বারুদ গোটাই সমরায়োজন করিছে।"[১০]

আবার তারই আত্ম অনুশোচনা করে বলে-

> "সিহঁতক বহুত কিবাকিবি লাগে, সঁচা কথা; কিন্তু এইদরে রণ করিবর বাবে সিহঁতক আরু মন নাই। রণ মানেই অকালমরণ, অকালমরণ কোন জীয়া মানুহে বিচারে?"[১১]

অর্থাৎ তারা যুদ্ধ চায়না। চায় শান্তি এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো। তাই পরবর্তীতে তাদেরকেই আবার বলতে শোনা যায়-

> "সেইভাবেই এই ভয়র আঁউসীত শান্তির জোনর এধালি কিরণ পাবর বাবে সিহঁতর প্রাণে কান্দি উঠিছে। ভুলেই হ'ক বা শুদ্ধই হওক, রিশাঙক সেই শান্তির দূত বুলি গ্রহণ করিবর বাবে সিহঁতর মন আজি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।"[১২]

সাধারণ নাগাদের প্রতি রিশাঙের আস্থা স্বরূপ মন্তব্য-

> "সাধারণ মানুহে এনে স্বাধীনতা কেতিয়াও বিচরা নাছিল আরু আজিও নিবিচারে - সিহঁতে বিচারে জীয়াই থকার স্বাধীনতা, শান্তির অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টি।"[১৩]

অপরদিকে ভিডেশ্যেলীর অনুচরের হাতে জীবন মাস্টারের মৃত্যু হলে নাগা পাহাড়ে তার আদর্শের জীবন্ত স্মৃতি মুছে যায়। রিশাং তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলে-

> "জীবন এই বিষয়ত অবিনাশ, গান্ধী এওঁলোকর সৈতে একে।"[১৪]

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় রিশাং ও খুটিংলার বিবাহ হয়। বিয়ের পর একদিন রিশাং তার স্ত্রী খুটিংলাকে বলে তাদের ছেলে সন্তান হলে নাম রাখবে 'ইয়ারুইঙ্গম'। যার অর্থ হল 'প্রজা সাধারণের শাসন'। অর্থাৎ রিশাঙ বিশ্বাস করে যে একদিন এই নাগা পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসবে এবং সরকারের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের আকাঙ্খিত স্বপ্ন একদিন পূর্ণতা পাবে-

> "মিশ্যনেরীবোরে সদায় সিহঁতক কয়, যীশুর কল্পিত স্বর্গরাজ্য বোলে এদিন এই পর্বতমালার বুকুতে উদয় হব।"[১৫]

অর্থাৎ রিশাঙের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা সম্ভব হবে এবং 'ইয়ারুইঙ্গম' একদিন নাগা পাহাড়ে আবির্ভূত হবে। রিশাং এবং ভিডেশ্যেলী এই দুই রাজনৈতিক নেতার পরস্পর বিরোধী আদর্শের মত বিরোধ এবং তার পরিণতিই হল 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসের কাহিনি।

"অন্ত্যজ" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত *অন্ত্য* (শেষ, নিম্নতম) থেকে। সামাজিক কাঠামোর দিক দিয়ে এটি হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ বা অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে, যাদের স্পর্শঅযোগ্য বা অচ্ছুত হিসেবে চিহ্নিত করা হত। 'অন্ত্যজশ্রেণি' মানে সেই জনগোষ্ঠী যাদের সামাজিক সম্মান, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ 'অন্ত্যজশ্রেণি'-কে 'পিছড়ে-বর্গ' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই বর্গের চৈতন্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন-

> "নিম্নবর্গের চৈতন্যের অপর যে লক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ধর্মভাব। ধর্মভাব বলতে আমি শুধু ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি চেতনার সেই ঐতরিক বা 'এলিয়েনেটেড' অবস্থার কথা যার প্রভাবে জড়জগৎ বা জীবজগতের কোনও সত্তাকে, বাস্তবের বা ভাবনার অন্তর্গত কোনও বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারে না, এবং এক

বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়, যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়।'' [১৬]

আসলে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা ধর্মভীরু।

এখন আমাদের প্রশ্ন হতে পারে নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ শ্রেণি কি একই? এই প্রসঙ্গে নিম্নবর্গের গবেষক রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন-

> "হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যারা সর্বনিম্নে অবস্থিত তারাই তমঃগুণান্বিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এদের একেবারে নীচে শূদ্র। এরাই তমঃগুণের আধার, পেশাগত দিক থেকে হীনকর্মে ব্রতী, জাতিগত দিক থেকে অচ্ছুৎ, অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে দরিদ্র, শিক্ষাগত দিক থেকে নিরক্ষর, সংস্কৃতির দিক থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই সকল পরিচয়ে পরিচিত মানুষ কালে কালে বিভিন্ন ধরনের ভূ-শক্তির পীড়নে পর্যুদস্ত। এই দলিত, অচ্ছুৎ, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত।"[১৭]

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসের কাহিনি মূলত অন্ত্যজ বা প্রান্তিকবর্গের সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। একদিকে ঔপনিবেশিক শোষণ অন্যদিকে দেশীয় সামন্তবাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রান্তিক মানুষেরা সেদিন সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এই প্রান্তিক বর্গের প্রতিনিধি হয়ে উপন্যাসে রিশাং, খাটিং, ফানিটফাং এবং ভিডেশ্যেলী তারাও নিজেদের ন্যায্য দাবির জন্য সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

উপন্যাসের শুরুতেই লক্ষ করা যায় প্রান্তিক মানুষদের ওপর শোষণের ছবি-

> "গাঁৱর সকলোরে ধান একেলগে এটা ভঁরালত থৈ তার পরা ধান বাটি দিবর বাবে গাঁওবুঢ়ার গাত ভার দিলে। যোবাবার খেতি সম্পূর্ণকৈ চপাব নোবারিলে সিহঁতে। সমানে আধা সৈন্যবোরে পথারর পরা কাটি লৈ গল। এতিয়া যিটো ভঁরাল আছে সেইটোতে সৈন্যবোরর চখু পরিছিল। কিন্তু তার আগতে জানিবা জাপানীবোর গলগৈ। এতিয়া বগা সাহাববোর আহিছে, সিহঁতে বা কি করে তাক ভাবি মানুহবোরর মনত নকৈ আতঙ্কর উদয় হৈছিল।"[১৮]

তাদের এই অমানবীয় অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র খাটিং বলে-

> "বোপাই! স্বাধীনতা কি আমি জানো। নগা নাঙঠ হৈ থাকোঁতে ইয়াতকৈ বহুত সুখেরে আছিল। খোৱা-বোবার দুখ নাই। গাঁবর বস্তুরে চলি যায়। টকা-পইচা, এইবোরর জঞ্জাল নাই।"[১৯]

ফলস্বরূপে নাগা সমাজের সাধারণ শ্রেণির মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা থেকে দূরে থাকতে চায়। তাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ বা ধারণা হল তাদের ওপর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ অত্যাচার। তাই উপন্যাসে সহিংস পন্থায় বিশ্বাসী ভিডেশ্যেলী চেয়েছে স্বাধীন 'নাগারাজ্য'। যেখানে নাগা মানুষদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা থাকবে। সে স্বপ্ন দেখে -

> "সমগ্র দেশখন স্বাধীন করি এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঢ়ার।''[২০]

কিন্তু রিশাঙের কাছে ভিডেশ্যেলীর এই স্বপ্ন দেখা মানে 'পাগলামি' ছাড়া কিছু নয়। তাই সে আশাবাদী সম্ভাব্য স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখবে এবং যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকলের সম অধিকার থাকবে। উপন্যাসের শেষে রিশাং ও তার প্রেয়সী খুটিংলার কথোপকথনে তা ফুটে ওঠে-

> "আমার লরা হলে তার নাম কি রাখিম জানো?
> কি? লাজত খুটিংলাই কলে ।
> 'ইয়ারুইঙ্গম'
> মানে? মুখখন তুলি বিস্ময়ত খুটিংলাই প্রশ্ন করিলে ।
> 'রাইজর শাসন'।'' [২১]

অর্থাৎ তাদের সন্তানের মধ্যে দিয়ে এক গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে সে। ভারত স্বাধীন হলো। কিন্তু নাগা পাহাড়ের সেই প্রান্তিকবর্গের ওপর অত্যাচার কমেনি। অত্যাচারে বর্ণনা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন-

"কমতো অত্যাচার আরু উৎপীড়ন হোয়া নাই এই পর্বতীয়া নগাখিনির ওপরত। মহাযুদ্ধই সিহতক ঘরতে বনবাস দিলে, ভঁরাল উদং করিলে, ঘর-দুয়ার সম্পত্তি বোমা-বর্য়ণত উজার করিলে। তার পিছত আহিল মারি-মরক। সৈন্যবাহিনী আরু সরকারে প্রতিশ্রুতি দিছিল ক্ষতিপূরণের।"[২২]

কিন্তু তারা ক্ষতিপূরণ কিছুই পায়নি, এমনকী স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু তাদের প্রাপ্যটুকুর জন্য তারা লড়াই করে যাচ্ছে। কিন্তু নতুন সরকারের থেকে কোন আশা তারা দেখতে পায় না। ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

"ইউনিয়ন জেকর ঠাইত যিদিনা উখ্রুলর সদর অফিসত তিনিরঙিয়া পতাকা উরিল; সেইদিনাও সিহঁতে কেবল একান্ত মনে কামনা করিছিল নতুন সরকারর অনুদান-ক্ষতিপূরণ। কিন্তু আজিও তার কোন দিয়া হওয়া নাই।"[২৩]

তাই ভিডেশ্যেলীর ভারতীয় জাতীয় চেতনায় আস্থা নেই। ফলে সে সংগ্রাম করছে এক স্বাধীন নাগা রাজ্যের জন্য। অপরদিকে ভিডেশ্যেলীর এই সংগ্রামের বিপরীতে রিসাঙকে বলতে শোনা যায়-

"ভিড্যেশেলিয়ে ভুল করিছে। নতুন সরকার হইছে, স্বাধীন সরকার-তার কামলৈ সিঁহতে বাট ছোঁয়া উচিত। কিন্তু রিশ্বাঙর অনুমান ভিড্যেশেলির এই নতুন সরকারকো স্বাধীন সরকার বুলি গ্রহণ নকরে। তার অন্তরত জিলিকি উঠিছে রোমাঞ্চকর নগা স্বাধীনতার এক কল্পনা-রাজ্য। সৎ খ্রিস্টান ভাবে, পৃথিবীর বুকুত এদিন জন্ম ল'ব এক অনুপম স্বর্গরাজ্যই। এই কল্পনা তারও আছে কিন্তু চল্লিশ কোটি জনতার পরা বিচ্ছিন্ন হৈ এমুঠি নগাই কি স্বাধীনতা পাব, কেনেকৈ স্বাধীনতার সহায়ত এই দুর্গম পর্বতমালাক মানুষ স্বপ্ন রাজ্যের পরিণত করিব, তাক সি ক'ব নোয়ারে। আরু যি পথ গ্রহণ করি ভিড্যেশেলিয়ে সেই লক্ষলৈ যাব খুজিছে, সেই পথ মানুহর চরম নিষ্ঠুরতার পথ।"[২৪]

মতাদর্শের বিরোধ থাকলেও একজন সহিংস ভাবে আন্দোলন করছে প্রান্তিক বর্গের মানুষদের সুযোগ-সুবিধার জন্য। অপরদিকে রিশাং অহিংস ভাবে সংগ্রাম করছে স্বাধীন ভারতের প্রান্তিক আদিবাসী বর্গের প্রাপ্য আদায়ের জন্যে। স্বাধীনতা পরবর্তী সামন্তবাদীদের অত্যাচার ও শোষণের ছবি তুলে ধরেন বীরেন্দ্র কুমার তাঁর 'রঙামেঘ' (১৯৭৬) উপন্যাসটিতে। ৭০-এর দশকের অসমের কৈবর্ত সমাজের প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেন। এখানে একটি কৈবর্ত সমাজের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রিয়রাম কৈবর্ত সমাজেরই একজন ব্যাক্তি, পেশায় একজন জেলে। কিন্তু সে তার মহাজন-এর অধীনে মাছ ধরে। তাদের সম্প্রদায়ের নেতা এম.এল.এ চৌধুরী এবং তাঁর দল কংগ্রেস আশ্বাস দেয় তাদের উন্নয়নের কিন্তু এতদিনেও তাদের কোন উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ করে ওই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবক আনন্দ। সে কথায় কথায় 'মাও-সে-তুঙ'-এর কথা বলে-

"We must not depend on secretaries or back-benchers. We must do things ourselves, accepting only other people's help. The secretary system should not be allowed to become an epidemic. Wherever a secretary is unnecessary, there should not be one. To depend entirely on secretaries for everything is a symptom of the decline of the revolutionary sprit."[২৫]

আনন্দের মতো আমরা 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে রিশাং চরিত্রটির মধ্যেও দেখি, সে চায় শিক্ষা আর শিক্ষা। কারণ সে জানে একমাত্র শিক্ষাই পাল্টে ফেলতে পারে মানুষকে। মানুষের বিশ্বাস, প্রথা এবং সমাজকে। তাই সে বলে-

"পৃথিবীত যুদ্ধ ইনকিলাব এইবোর দুদিন থাকে, কিন্তু শিক্ষা আরু জ্ঞান চিরদিনীয়া।"[২৬]

অন্যদিকে দেখা যায়, প্রান্তিক বর্গের মানুষেরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকা গ্রহণ করছে। আমরা রিশাঙের কলকাতার হোস্টেলের বন্ধু তথা মণিপুরের বাসিন্দা পিটম্বি চরিত্রটিকে দেখতে পাই, কীভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলকাতা শহরে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখে নির্ভীক কণ্ঠে বলে-

"ফায়ার এন্ডফায়ার এন্ড গিভ আস ফ্রিডম।"[২৭]

তার এই নেতৃত্বে সাড়া দিয়ে উত্তেজিত জনতার কণ্ঠে শোনা যায়-

"কুইট ইন্ডিয়া, কুইট ইন্ডিয়া।"[২৮]

উপন্যাসে দেখা যায় রিশাং, খাটিং, শারেংলা, ভিড়্যেশেলী এবং ফানিটফাং সহ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলিও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে বিভিন্নভাবে। রিশাঙকে দেখা গেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে। অন্যদিকে ভিডেশ্যেলীর মতো ফানিটফাঙও এক স্বাধীন নাগা রাজ্যের স্বপ্ন দেখে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র শারেংলাকে সে বলে-

> "স্বাধীনতা নহলে জীবনর একো মূল্য নাই।...স্বাধীনতা পালেহে ইংরাজ আরু আমেরিকাবোরর দরে হব। মানুহর দরে আমি জীয়াই থাকিম।"[২৯]

নাগা পাহাড়েও যে সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত ছিল। সে সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' গ্রন্থে লিখেছেন-

> "পাহাড়ের কোনো নিভৃত গহ্বরে বসিয়া নাকি লাখ দুই নাগা সৈন্য তলোয়ার সানাইতাছে; হাতিয়ার সবই মজুত।"[৩০]

'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমাজের একেবারে প্রান্তিক বর্গের মানুষগুলোকে মুখ্য চরিত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একইভাবে বহুদিনের লাঞ্ছনা আর শোষণের শিকল ভেঙে সমাজের মূল স্রোতের (Main Stream) সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রগুলো একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করেছে।

উপসংহার: বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে দেখা গেছে, কীভাবে চরিত্রগুলি নাগা পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে। সারেংলা গুয়াহাটিতে 'ওয়েভিং' স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

> "চারেংলাই নগা পাহাড়খন এরি আহিব লগা হল। তার একমাত্র কারণ হল জীবিকা।"[৩১]

অপরদিকে রিশাং কলকাতায় পড়তে গিয়েছে। কলকাতায় শ্যামলীর মায়ের সঙ্গে আলাপ চারিতায় উঠে আসে বিশ্বের কাছে নাগা সমাজের ধারণা। ঔপন্যাসিক লিখছেন-

> "শ্যামলীর মাকে তাক সিহঁতর জীবনর বিষয়ে অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন করিছিল। তাইর ধারণা আছিল নাগাবোর বর দুর্দান্ত যোদ্ধা, অনবরত যুদ্ধই করি থাকে আরু সিহঁত হাবিত বাঘ-ঘোঙর লগত একেলগে থাকে।"[৩২]

এর উত্তরে রিশাং বলে -

> "সিহঁতর গাঁবতে মানুহে ঘর-বারী পাতি থাকে, সদায় যুদ্ধ নকরে। সিহঁত যে সভ্য মানুহতকৈ বহুত গুনে ভাল -তাকো ক'বলৈ নাপাহরিলে।"[৩৩]

অর্থাৎ সমাজ তাদের অন্ত্যজ করে রাখলেও, সমাজের সভ্য মানুষদের থেকে তারা যে কোনো অংশে কম নয়, রিশাং চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমারের সমাজের অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি সমবেদনার দিকটি উঠে আসে। প্রান্তিক মানুষ একদিকে যেমন সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণের প্রকরণগুলিকে বুঝতে পেরেছে, তেমনি আত্মমর্যদার আনন্দে সমস্ত হীনমন্যতা কাটিয়ে স্বরাট মানুষ হয়ে উঠেছে। এখানেই বীরেন্দ্র কুমারের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য রচনাবলী ১। প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, কথা গুয়াহাটি-০১, পৃ. ৭১।
২. তদেব, পৃ. ৭১।
৩. তদেব, পৃ. ৭১।
৪. তদেব, পৃ. ৭১।
৫. তদেব, পৃ. ৭১।
৬. তদেব, পৃ. ৯৮।
৭. তদেব, পৃ. ৯৯।
৮. তদেব, পৃ. ১০৪।

৯. তদেব, পৃ. ১০৪।
১০. তদেব, পৃ. ১৭১।
১১. তদেব, পৃ. ১৭১।
১২. তদেব, পৃ. ১৭১।
১৩. তদেব, পৃ. ১৭১।
১৪. তদেব, পৃ. ১৭৩।
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৫।
১৬. ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ সম্পাদনা। নিম্নবর্গের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ৪৩।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৪৮।
১৮. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
১৯. তদেব, পৃ-৭৫।
২০. তদেব, পৃ-৭১।
২১. তদেব, পৃ-১৭৫।
২২. তদেব, পৃ-১২৩।
২৩. তদেব, পৃ-১৩৫।
২৪. তদেব, পৃ-১৩৫।
২৫. ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্র কুমার। রঙামেঘ। দ্বিতীয়সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০১৬, চন্দ্রপ্রকাশ, গুয়াহাটি-১, পৃ. ৮৭।
২৬. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।
২৭. তদেব, পৃ-১২৩।
২৮. তদেব, পৃ-১২৩।
২৯. তদেব, পৃ-১৯৯।
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ। নির্বাসিতের আত্মকথা। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ-২০২০, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৪, পৃ. ১৯।
৩১. আচার্য্য, নির্মাল্য এবং ঘোষ, শঙ্খ সম্পাদনা। সতীনাথ রচনাবলী (খণ্ড-২)। মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৬৫।
৩২. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
৩৩. তদেব, পৃ. ১২৭।

গ্রন্থপঞ্জি:

অসমীয়া

১. কলিতা, সমীন। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী ড বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য।তৃতীয়প্রকাশ, এপ্রিল ২০২৪, নেসনেল প্রিন্টার্স, গুয়াহাটি।
২. খাওন্দ, মলয়া। ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য আরু তেওর উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, সাহিত্য প্রকাশ, গুয়াহাটি।
৩. ঠাকুর, ড. নগেন। এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস। পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১৮, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটি।
৪. ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রকুমার। ডেরশ বছরর অসমীয়া সংস্কৃতিত এভুমুকি। ষষ্ঠ সংস্করণ-২০১২, অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটি।
৫. ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রকুমার। রঙামেঘ। দ্বিতীয়সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০১৬, চন্দ্রপ্রকাশ, গুয়াহাটি।
৬. শর্মা, গোবিন্দপ্রসাদ। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য উপন্যাসিক। পুনর্মুদ্রণ ২০১০ বনলতা, গুয়াহাটি।

৭. শর্মা, ড. হেমন্তকুমার। বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য রসাহিত্য-কৃতি। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৩, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৮, অভিযাত্রী মুদ্রণ আরু প্রকাশন, গুয়াহাটি।
৮. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য রচনাবলী ১। প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ ২০০৩ , কথা, গুয়াহাটি।

বাংলা

১. ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ সম্পাদনা। নিম্নবর্গের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, কলকাতা।
২. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার। প্রান্তিকমানব। পুনর্মুদ্রণ-ফেব্রুয়ারি, দীপ প্রকাশন, ২০২৩, কলকাতা।
৩. আচার্য্য, নির্মাল্য এবং ঘোষ, শঙ্খ সম্পাদনা। সতীনাথ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, কলকাতা।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ। নির্বাসিতের আত্মকথা। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ-২০২০, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫, কলকাতা।
৬. বন্দোপাধ্যায়, সুরভি। গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি। তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা।
৭. ভট্টাচার্য, দেবাশিস। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা। অক্ষর পাবলিকেশন্স, ২০১০, কলকাতা।

ইংরেজি

১. Bandyopadhyay, Sekhar. From Plassey to Partition and After. Second Edition, Orient BlackSwan, Hyderabad-29.
২. Guha, Amalendu. Planter Raj To Swaraj. Third edition, 2014, Chaman offset, Delhi-110002.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 17-23
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.174

সাধারণ জীবন থেকে সাহিত্য-সৃজন: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রেক্ষিত

সরলা মাণ্ডি, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 16.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Nabaneeta Dev Sen was one of the foremost creators in Bengali short fiction who gave artistic expression to the varied experiences of ordinary people. In her selected short stories, the everyday joys and sorrows, struggles, laughter, happiness, and pain common lives find vivid portrayal. She sought to capture these aspects with a subtle and sensitive perspective eye. Her distinctive feature is presenting ordinary life in a simple manner without exaggeration. In her short stories, relationship between men and women, social realities, education, politics and even psychological conflicts in the diverse contexts of both urban and rural life are vividly portrayed. Through a blend of satire, wit and a human perspective, she has beautifully transformed the ordinary events of everyday life into art. The readers of her short stories do not merely enjoy the narratives; rather they perceive the hidden truths and deeper significance of ordinary life. Nabaneeta Dev Sen has demonstrated that ordinary life is the primary source of literature, and that a writer's sensitive vision can transform that life into art. A distinct dimension of women's experiences finds unique expression in her stories. She portrays women's struggles, social constraints, and their yearning for freedom in a very natural way. As a result, a feminist perspective is also reflected in her narratives.

Keywords: Ordinary life, Everyday Reality, Urban and Rural life, Women's Freedom, Women's Experiences, Contemporary Social Picture, Politics and Education, Family and Relationship, Satire and Humor

নবনীতা দেবসেন বাংলা সাহিত্যের প্রতিথযশা সাহিত্যিক। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপনাসিক ও ছোটগল্পকার, কিন্তু কবিতার হাত ধরেই তাঁর সাহিত্য জীবনের পথচলা শুরু। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়' (১৯৫৯) । এই কাব্যগ্রন্থ দিয়েই তাঁর শিল্পীজীবন সাধনার জয়যাত্রা শুরু। তিনি মূলত কবি হলেও গল্পকার হিসেবে তিনি এক স্বতন্ত্র ধারায় বিরাজমান, তাঁর গল্পের বিষবস্তুর বৈচিত্র ও গাম্ভীর্য তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পচর্চা নিয়ে তিনি বলেছেন-

> "প্রথমে আমি শুধু কবিতাই লিখতুম, আর যাঁরা অনায়াসে গল্পলেখেন, অবাক বিস্ময়ে ভাবতুম তাঁরা নিশ্চয় ম্যাজিক জানেন। কেমন করে সাজিয়ে তোলেন গল্পের পরম্পরা? একসময় টের পেলাম গল্প নিজেই নিজেকে তৈরী করে, আমার কাজ কেবল থেমে যাওয়া।"[১]

শিল্পী বা সাহিত্যিক মাত্রই তাঁর লেখনীর মধ্যে উঠে আসে সমকালীন সময়, সমাজ ও ব্যক্তিসত্তা। এর থেকে নবনীতা দেবসেনের গল্পগুলি ব্যতিক্রম নয়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির বেশিরভাগই সমাজ দ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। প্রথম গল্প যখন লিখতে শুরু করেন তখন তিনি ছাত্রী ছিলেন। তিনি বলেছেন-

> "যদিও আমার প্রথম গল্প বেরিয়েছিল ১৯৫৬ বা ৫৭ – তে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায়। আমি তখন ছাত্রী। সে গল্প হারিয়ে গেছে, এবং পরবর্তী গল্পগুলিও।"[২]

সমাজের নানান অসঙ্গতিকে তিনি কৌতুকের সঙ্গে গল্পে পরিবেশন করেছেন। তিনি গল্পগুলিতে বাস্তব জগত ও জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি, প্রাঞ্জল দৃষ্টি গুনসম্পন্ন পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পের আঙ্গিকে ও ভাষার মধ্যে রয়েছে সহজ সরল ও পরিচ্ছন্নতা, কোথাও কোন জটিলতা নেই। নবনীতা দেবসেন লড়াই করে গেছেন সারাজীবন, তিনি যেমন একদিকে ছিলেন লেখক তেমনেই অন্যদিকে তিনি ছিলেন সাংসারিক এবং তার সাথে বাইরের নানান কাজ তিনি একসঙ্গে সামলে নিতেন। তাঁর জীবনের যে লড়াই কখনো নিজের সঙ্গে, পরিস্থিতির সঙ্গে, কখনো বা জীবনের সঙ্গে অবিরাম ঘটে থাকত। তিনি সমাজের নানা অচলয়াতনিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তিনি বিশেষ করে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রে স্বাধিকারের, আত্মবোধের পরিপূর্ণ মানবিকতার প্রশ্ন খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন সাহিত্যের মধ্যে।

নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যচর্চার বৃহত্তর অংশে ফুটে উঠেছে নারী জীবনের কথা। তিনি তুলনামূলক বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন বলে দেশ বিদেশের নানান বিষয় তাঁর আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে মিথ ও পুরাণকেও আশ্রয় দিয়েছিলেন। নারীর চার দেওয়ালের মণিকোঠার বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে আজ তারা অসীমের পথে পা বাড়িয়েছে। তাদের এই স্বাধীনতা অর্জন অনেক প্রতীক্ষার কষ্টের ফল এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের আত্মত্যাগের কথাও বর্ণনা করেছেন। মানবজীবনের নানান দিক আলোচিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে। তিনি পদ্মশ্রী (২০০০), সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার (১৯৯৯), কমলকুমার জাতীয় পুরস্কার (২০০৪) প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে ছোটগল্প তার এক অমর সৃষ্টি। প্রসঙ্গত আমরা নবনীতা দেবসেনের ছোটগল্পের মধ্যে খুঁজে পায় সাধারণ মানুষের জীবনের নানান অভিজ্ঞতাকে। এখানে আমি আমার আলোচনার বিষয় হিসেবে বেশকয়েকটি ছোটগল্প নির্বাচন করেছি, যেমন- 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ', 'খেসারৎ', 'পরীক্ষা', 'জীবে দয়া', 'অপারেশন ম্যাটারহর্ন', 'চোর-ধরা', 'সেদিন দুজনে'।

নবনীতা দেবসেনের এক অন্যতম ছোটগল্প হল 'গদাধর উইমেন্স কলেজ'। এই গল্পে তিনি এক বাস্তব সময়ের পরিপ্রেক্ষিতকে ও মনুষ্য সমাজের জটিলতাকে তিনি খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পটি 'গল্পগুজব' গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গল্পের কথিকা শ্রীমতী ও গীতু। গল্পের কথিকা তার দীর্ঘ দশ বছরের বিবাহিত জীবনের একঘেয়েমি জীবনযাপন করে কলেজ জীবনের পুরনো বন্ধু গীতুকে বলছে। তারা একসময় কলেজে একসঙ্গে পড়ত। গীতু এখন গদাধরপুর উইমেন্স কলেজের শিক্ষিকা। তারা দীর্ঘ দশ বছরের পর কলেজ জীবনের পূর্ব ঘটনাকে স্মৃতিচারণ করছে। তখন গল্পের কথিকা বলছে-

> "আচ্ছা, তোর মনে আছে গীতু, সেই পাঠচক্রের সেশনটা? অশোকতরুর সেই মুখ নামিয়ে গান: 'ও আমার গোলাপবালা'।"[৩]

গদাধরপুর একটি ছোট গ্রাম, শহর বললেও অনেকটাই বলা হবে। এই গদাধরপুরেই তার বান্ধবী গীতু থাকে। গদাধরপুর একটি গ্রাম্য পরিবেশর জায়গা। গল্পের কথিকার এই গদাধরপুর অপছন্দের। তাই সে গীতুকে বলছে-

> "সত্যি গীতু, তোরা যে কী করে থাকিস গদাধরপুরে! ওখানে তো আর পাঠচক্র-টক্র হয় না। বক্তা পাবি কোথা, গাইয়েই বা কই? সভ্য সমাজের বাইরে একটা কলেজ বসিয়েছে কী করতে কে জানে। ওখানে লাইফ বলে তো কিছুই নেই।"[৪]

গদাধরপুর সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত বলে মনে করেন গল্পের কথিকা। তাই গল্প কথিকা গীতুকে বারবার বলেছে এই রকম অনাড়ম্বরপূর্ণ অজপাড়াগাঁতে তার কোনমতেই থাকা সম্ভব নয়। তাই সে গীতুকে অনেকটা ব্যাঙ্গের সঙ্গে বলেছে-

> "যেমন জায়গা তেমনি কলেজ! কী করতে যে আছিস ওই অজ পাড়াগাঁয়। কী করেই বা আছিস ওই অজ গাঁয়ে, চিরকাল শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় বাস করে? বোরিং লাগে না? বিয়েটিয়ের নাম

তো করিস না। লাগিয়ে দিই একটা সম্বন্ধ? আমার এক ভাশুর ফিরেছেন বিদেশ থেকে, একটু বয়স্থা এডুকেটেড মেয়ে চান, নিজেও বহুকাল অ্যাকাডেমিক লাইনেই ছিলেন। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। না মশাই অত মুচকি হাসির কিছুই নেই। বত্রিশ তো পার হলো, এরপর আর কবে বিয়েটা করবি শুনি? চিরকাল কেবল গেঁয়ো গাধাগুলোকে পিটিয়ে গোরু বানালেই চলবে? গদাধরপুরে মানুষ থাকে! ওটা কি একটা লাইফ হলো গীতু?"[৫]

এরপর দেখা যায় গল্প কথিকাকে তাঁর নিজের জীবন সত্তার দিকে ফিরে আসতে দেখা যায়। গল্প কথিকা আক্ষেপ করে বলে যে তার কত স্বপ্ন ছিল, কত প্ল্যান করে রেখেছিল, তারপর তার বিয়ে হয়ে যায় বড়লোকের বাড়িতে। গল্প কথিকার স্বামী অনেক বড় অফিসে চাকরি করে, সারাক্ষণ ধরে কাজ করে করে যন্ত্রবৎ মানুষে পরিণত হয়েছে। তার স্ত্রীর প্রতি সময় দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। তার স্বামী বলে-

"বউয়ের আঁচল ধরা হলে কেউ জীবনে উন্নতি করে না বুঝলে।"[৬]

তারপর গল্প কথিকা হতাশ করে বলেছেন-

"আমার জন্য তো আয়া আছে ড্রাইভার আছে খানসামা আছে – মালী বাবুর্চি ঠাকুরচাকরের ঘোর বৃন্দাবন একেবারে! আবার একটি কর্তাও চাই? সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?"[৭]

জীবনের কাছে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জীবনের সবকিছুর গুরুত্ব আলাদা আলাদা ভাবে মানব জীবনে ধরা দেয়। গল্প কথিকার গাড়ি, বাড়ি, টাকা, পয়সা সবকিছু থেকেও সে স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত থেকেছে। তার স্বামী সন্তান সংসার নিয়ে সে যেন নিজের সত্তার অস্তিত্বটাই আর খুঁজে পায় না। তাই সে আক্ষেপের সুরে বলে-

"ঘর সংসার ছেলেপুলে নিয়ে ন্যাতা জোবড়া।"[৮]

এরপর গল্প কথিকাকে রেওয়াজ করতে দেখা যায়, এমনকি একটা স্পেশাল ক্লাসে যোগদান করতেও। গল্পের শেষে দেখা যায় গল্প কথিকা গীতুকে বলছে-

"ফিলসফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে?"[৯]

এর থেকে বোঝা যায় যে কলেজের মাধ্যমে নারীর স্বাধীনতা বা ক্ষমতায়ন আসলে কতটা সম্ভব হয়েছে? সেটা লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুধু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নয় নারীর প্রকৃত অধিকার, আত্মসম্মান ও সুযোগের প্রয়োজন।

'খেসারৎ' নবনীতা দেবসেনের আর এক অন্যতম গল্প। এটিও 'গল্পগুজব' গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল সুফল মাঝি। গল্পটি শুরু হয়েছে- "হাই! মা! মা রে! মা গ!"[১০] এক শোকসন্তপ্ত কথার মধ্য দিয়ে। সুফল মাঝি তার পরিবারের সবাইকে একসাথে হারিয়েছে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গল্পটিতে লেখিকা মূলত অসমবয়সী সম্পর্কের এক বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে একজন কমবয়সী মেয়েকে কেন্দ্র করে একজন চল্লিশোর্ধ পুরুষের জীবনে মানসিক জটিলতা তৈরি হয়। সুফলের পরিবার বলতে তার স্ত্রী, মা, সুফলের ঠাকুরদা। সুফলের স্ত্রী লক্ষ্মী দেখতে কালো। তার মা ইচ্ছে ছিল গঙ্গা স্নান করবে, কলকাতা দেখবে। তার মায়ের প্রস্তাবে লক্ষ্মীও বলে যে সেও কলকাতা যাবে। তাই সুফল ঠিক করে যে তাদেরকে এক ময়দানের মিটিনের সময় কলকাতা নিয়ে যাবে। এই সময় গেলে তারা নিখরচায় যেতে পারবে, সেখানে তাদের খাওয়ার অভাব হবে না অথচ তাদের কলকাতা দেখার আশাটাও পূর্ণ হবে। লেখক এখানে সাধারণ মানুষের মনের কথা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। তা সুফলের একটা কথার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

"মিটিন আছেক। কইলকাথার ময়দানকে বড়িয়া মিটিন্। পার্টি দাদাবাবুরা গাড়িভাড়া দিয়্যেঁ লিয়ে যাবেক, ভাত, দিবেক, লিখরচায় কইলকাথা দেইখ্যেঁ আসবি সব্বাই-গঙ্গাচ্ছান কইর্যেঁ আসবি সব্বাই।"[১১]

কলকাতা যাওয়া বা দেখার দাবি মূলত উঠে এসেছিল সুফলের মায়ের কাছ থেকে। সুফলের মা গঙ্গা স্নান করে পূজো দিতে চেয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্মীও তার স্বামী সুফলের কাছে বায়না করছে সেও কলকাতা ঘুরতে যাবে, কলকাতায় গিয়ে কালীঘাট, ভিক্টোরিয়া ও চিড়িয়াখানা দেখবে। লক্ষ্মী ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত মেয়ে। তার স্বামী, পরিবার ও সংসারকে ঘিরে লক্ষ্মীর যেন প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। সংসারের সমস্ত দায়বদ্ধতা লক্ষ্মীর মতো মানুষেরা জানে। সুফলের বাড়ীতে লক্ষ্মী আসার পর সংসার যেন অন্য রূপ নিয়েছে। সংসারের নানান অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মী তার প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস, আচরণ ও ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে, সংসারের সমস্ত অভাব

অনটনকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে তারা এমনসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে সুখী হয় যা অন্য মানুষদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছকর ঘটনা। কিন্তু যখন ভাগ্যের পরিহাসে তারা খুসির আলো দেখে তখন যেন মনে হয় বিধাতাও তাদের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুফল ও লক্ষ্মীর সংসারেও যেন তাই নেমে এসেছে। তারা গঙ্গা স্নান করে পূজো দেওয়ার জন্য কালীঘাটে যাবে তখনেই তাদের জীবনে এক ঘোর অন্ধকার নেমে এল। আসল দোষ কি তাদের ভাগ্যের নাকি তাদের এই খামখেয়ালি পনার। যার ফলে সুফলের মা, বড় ঠাকুরদা ও তার স্ত্রী লক্ষ্মী তো মরলই তারদের সাথে লক্ষ্মীর গর্ভে থাকা সন্তানও মারা গেল, যার ফলে লক্ষ্মী এই ভব সংসারে তার সন্তানকেই দেখে যেতে পারল না।

'জীবে দয়া' গল্পটি নবনীতা দেবসেনের 'গল্পগুজব' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এই গল্পের কেন্দ্রীর চরিত্র গল্পকথিকা খুখু, তার দুই মেয়ে ও তার মা। গল্পটিতে দেখা যায় 'জীবে দয়া' বিষয়টি পশুপাখিকে কেন্দ্র করেই হোক বা মানুষকে কেন্দ্র করেই হোক এটি একটি দয়ারেই প্রতিরূপ। গল্প কথিকা তার মায়ের বাড়িতে থাকে। তিনি বলেছেন তার পিতা বট বৃক্ষের মতো ছিলেন, এখন তার পিতা নেই। গল্প কথিকার দুই মেয়ে পশু-পাখিদের পোষে এবং অসুস্থ পশু-পাখিদেরকে বাড়িতে নিয়ে এসে সেবাযত্ন ও চিকিৎসা করে থাকে, আর এতেই তারা আত্মতৃপ্তি বোধ করে। গল্পকথিকাও তাদের দুই মেয়ের এই কাজে অনেকটা সাহায্যো করে থাকে। এটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তার এই উক্তিতে-

> "এ-বাড়িতে প্রচন্ডরকম জীবে দয়ার ট্রাডিশন- আমার মেয়েরা অষ্টাবক্র মুনির মতো জীবে দয়ার ট্রেনিং সমেত ভূমিষ্ট হয়েছে।"[১২]

কিন্তু গল্প কথিকার মা তাদের এই জীবে দয়া কাজে অনেকটা বিরোধিতা করতেন। তা গল্প কথিকার মায়ের একটি বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "বোঝো এখন আমার কষ্টটা! মা যেমন, মেয়েরা তেমনিই হয়েছে।"[১৩]

গল্প কথিকা যদিও তাদের দুই মেয়ের সহমত ছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে আক্ষেপ প্রকাশ করতেন। তিনি বলেন-

> "ওদের বুকে জীবে দয়া যত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের অশান্তিও চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যাচ্ছে।-অথচ, মুশকিল এই যে, সংসারটাকে আমার কিছুতেই খুব সীরিয়াস বলে মনে হয় না।"[১৪]

গল্প কথিকা তার মার সংসারকে বলেছেন 'আসল সংসার' আর তার নিজের সংসারকে বলেছেন 'খেলাঘর'। তার মায়ের সংসারকে আসল সংসার বলার কারণ হল, তার মায়ের সংসারের মাথা ছিলেন তাঁর বাবা, এখন তার বাবা নেই। তার বাবা থাকার সময় সেও অনেক পশুপাখি পোষ মানাত, যেমনটা তার মেয়েরা করে থাকে। তার খেলার সংসারে তার মাথা নেই বলতে তার মেয়েদের বাবা নেই। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন-

> "যেন রান্নাবাড়ি খেলছি – ঘরকন্নাটাকে কিছুতেই আমার বাস্তব বলে আর বিশ্বাস হতে চায় না। এ সংসার যেন ভবসংসার-এর কান্ডারী সত্যি করে তিনিই, যিনি এই অখন্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মান্ডটিকে চালাচ্ছেন। আমার সংসারে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা আছে দ্বার।"[১৫]

গল্পকথিকা মাঝে মধ্যে সংশয় অনুভব করেন যে তার দুই মেয়ে পশুপাখিদের যেমন সেবা যত্ন করে তেমন ভাবে যদি তার মায়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ না দেয় তা নিয়ে তার সংশয় হতো। তার এই সংশয় অনেকটা মনোগত। তার এই সংশয় উদয় হয় যখন তার দুই মেয়ে যখন বড় হবে তখন তাদের মধ্যে এই একই মমত্ববোধ থাকবে? তারা কি তাদের মা কে দেখবে? তার এই দুশ্চিন্তা আসলে তার চারপাশের পরিবেশ মানুষকে দুশ্চিন্তার সম্মুখীন করতে বাধ্য করায়। তার এই সংশয়ের কথা তার উক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে-

> "আমি যখন বুড়ো হবো, তোমাদের এই মনগুলো কোথায় চলে যাবে কে জানে।"[১৬]

তখন গল্পকথিকার মেয়ে সারল্যের সাথেই বলেছেন-

> "দিম্মা তো বুড়ো হয়েছেন। তোমার মনটা কি কোথাও চলে গেছে? "[১৭]

গল্পকথিকা তার মাকে যত্ন করেই রেখেছেন। সর্বোপরি বলা যায় মানুষেই পারে শিক্ষাদান করতে, তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে। অবশ্য আমরা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার এর ব্যতিক্রমও দেখে থাকি।

'পরীক্ষা' গল্পটি নবনীতা দেবসেন আর একটি অন্যতম গল্প। এই গল্পটিতে লেখিকা দেখিয়েছেন মা ও মেয়ের অভূত পুর্ব বন্ধন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মা মেয়ে। মেয়েটি দশম শ্রেণীতে পড়ে, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। এবিষয়ে তার মা অত্যন্ত উদবিগ্ন কিন্তু মেয়েটির পড়াশুনার মনোযোগ তেমন একটা নেই। মেয়েটি সবসময় কুকুর, বিড়াল নিয়েই সবসময় ব্যস্ত থাকে। কেবল পড়াশুনা নিয়ে সে উদবিগ্ন থাকে। তার এই উদবিগ্নতা একটি বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন ইতিহাসের শিক্ষক তাকে বলছে সিলেবাসটা দেখার জন্য তখন মেয়েটি বলে-

> "দাঁড়ান ফোন করে জেনে নিচ্ছি! আমার বন্ধুরা জানে।"[১৮]

আর একটি বাক্যের মধ্যে তার উদাসীনতা ধরা পড়েছে যখন টিউশনের শিক্ষক খাতা ও কলম দিতে বলছে, তখন মেয়েটি বলছে-

> "বোন স্কুলে নিয়ে গেছে কলম। এই যে খাতা।"[১৯]

তার পড়ার যে একটুও ইচ্ছে নেই তার এই কথাগুলোর মধ্যে ধরা পড়ে। মেয়ের এই উদাসীনতা মায়ের দুশ্চিন্তা ক্রমশ বৃদ্ধি করে। মাধ্যমিক পরীক্ষা যেন মেয়ের নয়, তার মায়ের। প্রত্যেক বাবা-মা'র মধ্যেই সন্তানের সাফল্যেই আলোড়িত হয়ে ওঠে পিতামাতার সাফল্য। পরীক্ষা গল্পেও আমরা তাই লক্ষ্য করে থাকি, মা তার মেয়ের পরীক্ষার ফল যাতে ভালো হয় তার চেষ্টায় করে গেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক রেখেছেন তার মা। কিন্তু মেয়ের এই উদাসীনতা দেখে অনেকেই পড়াতে চায় না। তা সত্ত্বেও মেয়ের মা টিউটর জোগাড় করেছেন। তার এক বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "পড়ানো চলছে। এপ্রিলে পরীক্ষা। আমার এক প্রিয় ছাত্রীকে টিউটর রাখলুম ফেব্রুয়ারি মাসে। ফিজিক্স-কেমেস্ট্রি পড়িয়ে দিতে।একটা ছোট ভাই ফিজিওলজির ভালো ছাত্র ছিল। তাকে বললুম বায়োলজিটা দেখিয়ে দিতে।"[২০]

তার মা নানাভাবে চেষ্টা করে গেছে মেয়ে যাতে পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে।

মা তার নিজের পড়াশুনার কথা স্মৃতিচারণ করলেন। এখন সে মেয়ের সাথে যেভাবে জড়িয়ে আছে সে(মা) যখন পড়াশুনা করেছে তখন এটা ছিল না। তখন নিজের নিজের মধ্যে পড়ার দ্বায়িত্ববোধ জন্মাতো। মেয়ের পড়াশুনা বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ দেখা যায়। তা তার মায়ের একটি কথার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "মেয়ে খউব সিভিলাইজড, নিয়মিত তিনখানা কাগজ পড়ে। ইন্দ্রিরা, মোরারজী, চরণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানী।"[২১]

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যেও দেখা যায় পড়া বাদ দিয়ে নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠা। যেটা আমরা দেখে থাকি 'পরীক্ষা' গল্পের মেয়েটির মধ্যে। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে আগে প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল এখনকার থেকে। এখন প্রত্যেক মা-বাবাই তাদের সন্তানদের শ্রেষ্টরুপ প্রতিপন্ন করতে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। এই গল্পের মা'ও এর ব্যতিক্রমী নয়। পরীক্ষা গল্পে মা ও মেয়ে আজীবন রূপ পরীক্ষা সমবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লেখিকা বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের সমাজে পরীক্ষা কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের সম্পর্ক ও জীবনের নানা দিক এখানে পরীক্ষার সম্মুখীন করে। প্রকৃত শিক্ষা বা জীবনের আসল অর্থ শুধু পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হওয়া নয়, বরং মানবিকতা স্বাধীন চিন্তা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিকাশ।

'চোর ধরা' গল্পটি নবনীতা দেবসেনের 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পগ্রন্থথেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইতু। ইতু হচ্ছে গল্পকথিকার বোন। 'চোর ধরা' গল্পটি শুরু হয়েছে ইতুর পরিচয় দিয়ে। সে খুব সুন্দর রেডিওতে গান করতে পারে। তাই গল্প কথিকা বলেছেন-

> "রেডিওতে তার গলা শুনতে পেলেই আপনার হাতের গ্রাস হাতেই থেকে যায়, একপায়ে জুতো পরে আপনি ভুলে অন্য পায়ে চটি গলিয়ে ফ্যালেন। আমার বোন ইতু এমনই গুনের মেয়ে।"[২২]

গল্পকথিকা বলেছেন যে আমার বোনাই অর্থাৎ ইতুর স্বামীও ওনেক গুনের আধার। ইতুর স্বামীর নিজের একটা আইন কোম্পানী আছে সেটাতে সে ডিরেক্টর, সে অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। ইতুর স্বামীর মনটা উদার, বেশ দিলখোলা দরাজহস্ত মানুষ। ইতু তার স্বামীকে খুব ভালোবাসে, তা গল্পকথিকার বক্তব্যতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "ইতুই তাঁর জীবন সর্বস্ব, নয়নমণি। উঠতে ইতু, বসতে ইতু, খেতে ইতু, শুতে ইতু। মানুটিই ইতুসর্বস্ব।"[২৩]

গল্পকথিকা তার বোনের সংসার চালানোর কাজ দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যান। তাই তিনি বলেছেন-

> "এই জাঁদরেল ব্যারিস্টারকে কোমরে গুঁজে রেখে ইতু অনায়াসে সংসার করে, ছেলেপুলে সামলায়, ছাত্রছাত্রী সামলায় এবং নিজের গানকে দিনকে দিন উন্নত করে। কিন্তু একা স্বামীটিকে নিয়ে তার যত জামেলা; পনেরোজন বেসুরো ছাত্র, তিনজন অবাধ কাজের লোক কোয়াটার ডজন অপোগণ্ড সন্তান নিয়েও তার আর্ধেক গোলমাল নেই। ইতু দশভুজার মতো ছুটে ছুটে সবদিকে সামলায়।"[২৪]

ইতুর স্বামীকে দেখে সবাই ভয় করে। ইতুর স্বামীও ইতুর জয়গান করে থাকে। সে(ইতু) তার দুহাত দিয়েই দশভুজার মতো নিজের ছেলেমেয়েকে, স্বামীকে, চাকবাকরকে নিয়ে সংসার সামলায়। আর একইভাবে দেখা যায় তার গানের ক্লাসটিও সুন্দরভাবে চালিয়ে নিয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় মূলত ইচ্ছাশক্তি থাকলেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, নানা প্রতিকুলতাকে জয় করে সংসারটিকে সুন্দর পরিবেশে তৈরী করা যায় তারই প্রতিরূপ হল ইতু।

তেমনেই নবনীতা দেবসেনের আর এক অন্যতম গল্প হল 'অপারেশন ম্যাটারহর্ন'। গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই দুজন ভারতীয় নাগরিক নারীর অসম্ভব দুঃসাহসিকতার কথা। তাদের মধ্যে একজনের নাম রেনুকা, সে তামিলনাড়ুর মেয়ে, অন্যজন বাঙালি নবনীতা। তারা দুজনেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসাথে পড়াশুনা করত, সেখান থেকেই তাদের দুজনের বন্ধুত্ব। তাদের প্রবল ইচ্ছা ছিল ম্যাটারহর্ন শৃঙ্গ জয় করার, তাই তারা ইস্টার ছুটিতে তাদের এই বাসনাকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। যেসময় তারা পাড়ি দিয়েছিল তখন ভারতবর্ষের কোন নারী পর্বত শৃঙ্গ জয় করতে পারেনি। ম্যাটারহর্ন শৃঙ্গটি যেমন উঁচু তেমনেই খাড়া। আল্পসের এই দুর্গমগিরি জয়ের জন্য তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, তাদের না ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য না ছিল পর্যাপ্ত অর্থ ও অন্য ব্যক্তিদের থেকে সুপরামর্শ নেওয়া। এই বরফযুক্ত ম্যাটারহর্ন পর্বতে উঠতে যে তাদের কাঁটাযুক্ত জুতোর দরকার সেই জুতোই তাদের ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল অসীম সাহসিকতা ও অফুরন্ত আশা যা তারা ম্যাটারহর্ন পর্বত জয় করবে। যদিও শেষপর্যন্ত তারা ম্যাটারহর্ন পর্বত জয় করতে পারেনি ঠিকেই কিন্তু তাদের মনে যে অসীম সাহসিকতা ছিল তা সাধুবাদ না জানিয়ে থাকা যায় না।

'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত এক অন্যতম গল্প হল 'সেদিন দুজনে'। গল্পটিতে আলোচিত হয়েছে মার্কিনমূলকে অবস্থিত এক ভারতীয় দম্পত্তির জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে। গল্পকথিকা বলেন কর্ত্তা দেখতে ছিল সাদা ধবধবে, লম্বাচওড়া আর গিন্নি ছিল তার উল্টো, তার কর্তার তুলনায় ছোটখাটো কালো বর্নের। কর্ত্তা ছিল অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক আর গিন্নি তেমনেই ছটফটে দুরন্ত। লেখিকার ভাষায় 'সভ্যতাবিবর্জিত বন্যপ্রাণী'। কিন্তু চেষ্টা করে যেত সংসারটিকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতে, কিন্তু তার কোন বাস্তব বুদ্ধি নেই। কোন কথাটি কার সামনে কখন বলতে হবে, আর কোথায় বলা যাবে না তার স্বামী ইশারা সত্ত্বেও বলে ফেলেন। কর্ত্তা মাঝেমধ্যে বিরক্তবোধ করে তার গিন্নির প্রতি। কিন্তু তার এই সরলতাই তাঁর মধ্যে নিজস্বরুপ সত্তা সৃষ্টি করে, যার ফলে কর্ত্তার সত্তাকে আলোকিত করে তোলে।

লেখিকা 'সেদিন দুজনে' বোঝাতে চেয়েছেন ভালোবাসা মানে শুধু একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরের মনের গভীরে বহন করা। মানুষের ভালোবাসা চিরজীবি – যদিও জীবন যাপন সামাজিক নিয়ম বা পরিস্থিতিতে মানুষকে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। সম্পর্কের মধ্যে যে নীরবতা বা অমীমাংসিত প্রশ্ন থাকে তা না বলা কথা গুলোই ভালোবাসাকে আরও বাস্তব ও বেদনাময় করে তোলে। এখানে লেখিকা ভালোবাসার নীরব, বেদনাময় ও অথচ চিরন্তন রুপকে তুলে ধরেছেন– যেখানে বিচ্ছেদও একধরনের মিলন, আর অপুর্ণতাও ভালোবাসার আরেক রূপ।

কথাসাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন বাংলা ছোটগলের এমন এক লেখক, তিমি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সাহিত্য সৃষ্টির আসল উপাদান লুকিয়ে আছে আমাদের চারপাশের নিত্যদিনের সাধারণ জীবনযাপনে। তাঁর গল্পে

কোন জটিল বা অস্বাভাবিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত নয়, বরং তিনি তাঁর ছোটগল্প গুলোতে সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন, মানসিক দ্বন্দ্ব থেকেই তার গল্পের জন্ম। ফলে তার গল্পে জীবন যেমন আছে তেমনেই তাঁর গল্পে জীবনের শিল্পরূপও আছে। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে নিত্যদিনের নানা উপাদান যেমন- বাজার, অফিস, সংসার, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক আচার বারবার উঠে এসেছে এবং নারী অভিজ্ঞতার বিশেষমাত্রা তাঁর গল্পের এক অনন্য বৈশিষ্ট ও নারীর টানাপোড়েন, সামাজিক বাধা, স্বাধীনতার আকাঙ্খা ইত্যাদি তিনি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পের মূল উপকরণ হিসেবে। এই সাধারণ জীবনের বাস্তবতাকে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক অথচ সঙ্গবেদনশীল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। বাস্তবতা থেকে শিল্প উত্তরণের দিকটিই তাঁর সৃষ্টির আসল শক্তি। তিনি সরাসরি জীবনকে অনুলিপি করেননি বরং তাকে রূপ দিয়েছেন নানা শিল্পসুষমায়। যেমন তিনি 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ' গল্পে গ্রামীণ পশ্চাদপদ, রাজনীতি এবং নারীশিক্ষার চিত্রকে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। গল্পে মধ্যবিত্ত সংসারের টানাপোড়েন এবং সম্পর্কের হিসেব নিকেশ সাহিত্যে রুপ পেয়েছে। ভালোবাসা কারে কয় গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পে তিনি প্রেম ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। এটি মূলত নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা হলেও লেখিকার সৃজনশীল রুপায়নে হয়ে উঠেছে শিল্পসমৃদ্ধ। লেখিকা নবনীতা দেবসেন সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতাকে কেবল নথিবদ্ধ করেননি, বরং সেগুলোকে শিল্পরুপে রুপান্তর করেছেন। তাঁর ছোটগল্প প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের জীবনেই সাহিত্যের প্রধান উৎস, আর লেখকের সংবেদনশীল সৃষ্টি সেই জীবনকেই চিরস্থায়ী শিল্পে পরিণত করতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র:

১. দেবসেন, নবনীতা। *গল্পসমগ্র* - ১। নিবেদন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১।
২. তদেব, পৃ. ১।
৩. দেবসেন, *নবনীতা, গল্পসমগ্র* - ১। নিবেদন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০২৩, পৃ. ৮৭।
৪. তদেব, পৃ. ৮৭।
৫. তদেব, পৃ. ৮৭।
৬. তদেব, পৃ. ৮৮।
৭. তদেব, পৃ. ৮৮।
৮. তদেব, পৃ. ৮৮।
৯. তদেব, পৃ. ৯১।
১০. তদেব, পৃ. ১২৮।
১১. তদেব, পৃ. ১৩০।
১২. তদেব, পৃ. ১৬৬।
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৬।
১৪. তদেব, পৃ. ১৭০।
১৫. তদেব, পৃ. ১৭২।
১৬. তদেব, পৃ. ১৭৬।
১৭. তদেব, পৃ. ১৭৬।
১৮. তদেব, পৃ. ১৫৭।
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৭।
২০. তদেব, পৃ. ১৫৯।
২১. তদেব, পৃ. ১৫৯।
২২. তদেব, পৃ. ২৭৫।
২৩. তদেব, পৃ. ২৭৫।
২৪. তদেব, পৃ. ২৭৫।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 24- 29
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.175

বিমল লামার ‘নুন চা’ উপন্যাস: লোকজ উপাদানের অন্বেষণ

ড. বিকাশ নার্জিনারী, *স্বাধীন গবেষক, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In his novel ‘Nun Cha Chaier Deshre Nunkatha’, Bimal Lama has given literary form to the life and folk culture of the Nepali-speaking people of the Darjeeling hills of North Bengal. In this novel, along with the description of rivers, villages, mountains and nature, the folk beliefs, folk weapons, folk customs, folk musical instruments, folk deities, folk addictions, etc. of the Nepali community are clearly reflected. Here, the use of flour gutli, vermilion, lamps, five grains, etc. on banana leaves to drive away evil spirits; the custom of blowing jhankari; considering khukuri as a weapon of heroes; the cremation of Tamangs and the burial of Rais in the event of death—all are signs of regional beliefs. Folk musical instruments such as dhangro, jhamta, kangling, etc. are used in spiritual and tantric rituals. Bamboo utensils such as flower vases reflect the multifaceted role of bamboo in rural life. The formless form of folk deities, such as the goddess's position at the root of a rubber tree, is a sign of worship of local nature. In addition, festivals and folk customs such as ‘Chulai', Gai Tyuhar, Vaitika, etc. reveal the socio-cultural life of the Nepali community. The mixture of Hinduism and Buddhism is also evident in the novel—such as the presence of the practice of animal sacrifice among Buddhists.

Keywords: Nuun Cha, Bimal Lama, Folk Elements, Nepali Community, Folk Beliefs, Jhankari, Folk Weapons, Tamang and Rai Janajati, Folk Musical Instruments, Bamboo and Folk Crafts, Gai Tyuhar, Vaitika

সাম্প্রতিককালের একজন ঔপন্যাসিক হল বিমল লামা। দার্জিলিং-এর চা-বাগান নিয়ে তার লেখা অন্যতম উপন্যাস হল ‘নুন চা চায়ের দেশের নুনকথা’ (২০১২)। এই উপন্যাস নেপালি ভাষায় ‘নুনকো চিয়া’ নামে অনুবাদ হয়। তার জন্ম ১৯৬৮ সালের ৪ঠা জুলাই, দার্জিলিং পাহাড়ের চা-বাগান ঘেরা একটি গ্রামে। তার লেখা ‘লোচন দাস শব্দকর’ উপন্যাস দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়ে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তার অন্যান্য উপন্যাসগুলো হল ‘রুশিকা’ (২০১৬), ‘হুদুর দুর্গা’, ‘ব্রজ্রযোগিনী’ (১৪২৯), ‘ডুংরির পলাশ বনে’ (২০২৫) প্রভৃতি। আবার সাম্প্রতিককালে প্রকাশ পেয়েছে ‘সালোকসংশ্লেষ’ নামে একটি উপন্যাস শারদীয় ১৪৩২ বর্তমান পত্রিকায়।

বিমল লামার উপন্যাসে লোকজ উপাদান কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা আলোচনায় প্রবেশ করার আগে লোকজ উপাদান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ইংরেজি ‘Folklore’ –এর সর্বজন গ্রাহ্য বাংলা প্রতিশব্দ ধরা হয় ‘লোকসংস্কৃতি’। তবে ‘Folk’ এর প্রতিশব্দ ‘লোক’ শব্দটি গৃহীত হলেও ‘lore’ এর প্রতিশব্দ রূপে দেখা দিয়েছে—কলা, কৃষ্টি, যান, চর্যা, বার্তা, ঐতিহ্য প্রভৃতি। আর লোকজ উপাদান বলতে আমরা এই লোকসংস্কৃতিকেই বুঝব।

অর্থাৎ লোকজ উপাদান হল লোকসংস্কৃতির উপাদান। এই লোকজ উপাদানকে বুঝতে লোকসংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা— ক. বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি এবং খ. অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি।

ক. বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Material Folklore): লোকজ জীবনে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত বস্তুসমূহকেই এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই উপাদানগুলির মধ্যে যে বিষয় বিরাজমান তা হল— লোকযান, লোকঅস্ত্র, লোকযন্ত্র, লোকশিল্প, লোকপরিচ্ছদ, লোকপ্রযুক্তি, লোকখাদ্য, লোকঔষুধ, লোকাভরণ, লোকপানীয়, লোকতৈজস ইত্যাদি।

খ. অবস্তুকেন্দ্রিক বা অবস্তুযুক্ত লোকসংস্কৃতি (Formalised Folklore): এই লোকজ উপাদানটি মূলত লোকায়ত সমাজজীবনে মনের ভাব বিনিময়, আনন্দ বেদনা, বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আদিযুগ থেকে আজ সভ্যতার উষালগ্ন পর্যন্ত মানুষ মনের মধ্যে নানান বিশ্বাস সংস্কার সত্য মিথার বেড়াজালে বন্দি। যেমন— আমরা সকাল থেকে ঘুমানো পর্যন্ত নানা বিধিনিষেধের মধ্যে থাকি। লোকসংস্কৃতির এই লোকজ উপাদানটি টোটেম ট্যাবু নামে পরিচিত। এই পর্যায়ের উপাদানগুলি হল— লোকাচার, লোকপ্রথা, লোকসংগীত, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য, লোকগালিগালাজ ইত্যাদি।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নেপালি ভাষী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিস্তা, ছোটা রঙ্গিত, বালাবাস প্রভৃতি নদীর প্রসঙ্গ রয়েছে। বিজন বাড়ি এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা মেলে এই উপন্যাসে। এইসকল স্থানের নেপালি সম্প্রদায়ের ভাষা, লোকবিশ্বাস, লোকনেশা, লোকঅস্ত্র, লোকপ্রথা, তামাং ও রাই সম্প্রদায়ের নিজস্ব রীতি-পদ্ধতি, লোকবাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি লক্ষ করা যায় এবং তার সঙ্গে পাহাড়ের সেইসকল স্থানের প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যেরও দেখা মেলে।

এই উপন্যাসে লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে। উপন্যাসে রয়েছে—

> “উরগেন দেখল, কলাপাতার ওপর আটার তৈরি কয়েকটা গুটলি পুতুল। মানুষ আর জন্তুর আদলে তৈরি। কয়েকটা মন্দির চূড়ার মত। তাতে সাদা সাদা কি লেগে আছে। লাল সিঁদুরও মাখানো আছে কয়েকটাতে। পোড়া ধূপকাঠি কয়েকটা। আছে মাটির নিভে যাওয়া প্রদীপ, পোড়া সলতে, কলাপাতার ওপর শুকনো রক্তের দাগ। একমুঠো পঞ্চ শস্য। তেমাথা মোড়ে রাতে কেউ রেখে গেছে। যে রেখেছে, তার ইচ্ছে, কেউ ডিঙোক। তাহলে তার বালাই ঘাড় বদলায়। ঝাঁকরিকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়ে দুষ্ট আত্মা তাড়ানোর আয়োজন। কিন্তু জেনে শুনে কেউ কখনও ডিঙোবে না এ জিনিস। পাহাড় জঙ্গলে একে অছেদ্দা করার সাহস কারও নেই। একবার ডিঙোলে তেরাত্তির পেরোবে না, তখন যত বড়োই ঝাঁকরি ডাকো সে বালাইয়ের হাত থেকে মুক্তি নেই। আর এ কোনও হাওয়ামুখী গল্প নয়। ধনবানধুরায় অনেক আছে এর ভুক্তভোগী। বুদ্ধিরাম সেই কোন ছোটোবেলায় একবার লাথি মেরেছিল ওই আটার পুতুলে। তার সেই পা এখন পঙ্গু। লাঠি নিয়ে ঘষটে চলতে হয়। কত ঝাঁকরিই তো দেখাল ওর মা। এমনকি ভাদুরে পূর্ণিমায় মাকালবাবার থানে পর্যন্ত নিয়ে গেছিল তিনবার। সেখানে পাহাড় দেশের বড়ো বড়ো ঝাঁকরিরা পর্যন্ত ওর ঝাড়ফুঁক করেছে। কোনও লাভ হয়নি। আর এইসব ঝাঁকরিরা সোজা লোক না। তাদের এক পা ভূতের ঘরে তো এক পা মানুষের ঘরে। মাঝে দাঁড়িয়ে সব সামলায়। বলা যায় ভূতের দালাল।”[১]

এই লোকবিশ্বাসের অনুরূপ ঔপন্যাসিক তিলোত্তমা মজুমদারের ‘মানুষশাবকের কথা’ উপন্যাসে দেখা যায়। তার উপন্যাসে বিহারি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস কারো গৃহে অসুখ হলে পুরানো কুলো, ঝাঁটা, জবাফুল, সিঁদুর প্রভৃতি রাস্তার চৌমাথায় রাত্রিবেলা চুপি চুপি ফেলে দেওয়া হত। যে এসব উপকরণগুলি মাড়িয়ে যাবে তার বাড়িতে অসুখ চলে যাবে। তবে তার আগে বাচ্চারা সেইসব উপকরণের মধ্যে পেচ্ছাপ করে দিলে কারও কিছু হবে না। তবে বিমল লামা ‘নুন চা’ উপন্যাসে নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিয়েছেন গৃহের মধ্যে দুষ্ট আত্মা থাকলে তাকে তাড়ানোর জন্য নানা ধরনের উপকরণ দিয়ে পূজা করে রাস্তার তেমাথায় ফেলে দেওয়া হত। তবে এই নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপকরণগুলি ভিন্ন। ঔপন্যাসিক বিমল লামার উপন্যাসে রয়েছে সেই উপকরণগুলি। উপকরণগুলি

হল কলাপাতা, আটার তৈরি ছোটো ছোটো গুটলি, যা মানুষ ও জন্তুর আদলে তৈরি করা হয়, সিঁদুর, পোড়া ধূপকাঠি, মাটির নিভে যাওয়া প্রদীপ, পোড়া সলতে, পঞ্চশস্য প্রভৃতি।

বিমল লামার এই উপন্যাসে নেপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে আরেকটি লোকপ্রথা বা লোকবিশ্বাস দেখা যায়। উপন্যাসে রয়েছে—

> "এই অঞ্চলে লোকে তীর-ধনুক পর্যন্ত ব্যবহার করে না। ওটাকে অশুভ অস্ত্র মনে করে। অপদেবতাদের ব্যবহারের জন্য। হয়তো সেগুলো ব্যবহার করলে অপদেবতার কোপে পড়ার ভয় আছে। আবার তীরধনুকের ব্যবহারে এক ধরনের কাপুরুষতাও দেখে থাকতে পারে এদের পূর্বপুরুষ। তাই বীরের অস্ত্র খুকুরির ওপরই ভরসা রেখেছে আজীবন।"[২]

উপন্যাসের মধ্যে নেপালিদের আরেকটি লোকপ্রথা দেখা যায়। উপন্যাসে দেখা যায় ভাল্লুকের আক্রমণে চ্যাংবা তামাং এবং রাজেশ রাই এর মৃত্যু হয়েছিল। নেপালিদের মধ্যে চ্যাংবা তামাং ছিল তামাং সম্প্রদায়ের লোক এবং রাজেশ রাই ছিল রাই সম্প্রদায়ের লোক। তাদের নিজ নিজ লোকপ্রথা রয়েছে। কোনো সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ মারা যাওয়ার পর কবর দিয়ে থাকে আবার কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ মারা গেলে দাহ করে থাকে। উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় তামাং জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে এবং রাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায়—

> "চ্যাংবাকে দাহ করা হবে কারণ সে তামাং। কিন্তু রাজেশ রাই, তাকে কবরস্থ করা হবে।"[৩]

উপন্যাসে নেপালি সম্প্রদায়ের লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে রয়েছে—

> "লাভা, ঝ্যামটা, চ্যাংরো, কাংলিং, ঘ্যারলি এইসব বাদ্যযন্ত্র দিনভর বাজতে থাকবে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে।"[৪]

তামাং জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুর পর থেকে শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত শ্রাদ্ধ বাড়িতে তেরোদিন ধরে আত্মার শান্তি কামনার জন্য বাজানো হয়ে থাকে লামাদের দ্বারা এই বাদ্যযন্ত্রগুলি। তবে রাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়নি উপন্যাসে। উপন্যাসে রাজেশ রাই এর শ্রাদ্ধের সময়কার বর্ণনা রয়েছে এইভাবে—

> "রাইদের শ্রাদ্ধে অত জটিলতা নেই। রাজেশের শ্রাদ্ধ ওর বাড়ির লোক তিন দিনের মাথায় সেরে ফেলেছে। আত্মীয়-বন্ধুরা সমবেত হয়েছে মৃত আত্মার স্মরণে আয়োজিত ভোজে অংশ নিয়েছি। সন্ধ্যায় বিজুয়া পুরোহিত ডেকে বিশেষ শুদ্ধিকরণ পূজা সম্পন্ন করেছে।"[৫]

তামাং সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো তারা বিভিন্ন পূজাপার্বণে ব্যবহার করে থাকেন। উপন্যাসে এই বাদ্যযন্ত্রগুলো আত্মার শান্তি বা আত্মা তাড়ানোর জন্য তান্ত্রিকদের দ্বারা এই বাদ্যযন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায়—

> "দেওইয়ালের এক কোণে নানা বাদ্যযন্ত্র। একটা কালো কাঠের তৈরি ঢ্যাংরো। তার দু'পিঠের চক্চকে চামড়া দেখেই বোঝা যায়। এটা নিয়মিত বাজানো হয়। একটা দণ্ডের ওপর সেটা আটকানো। বাজানোর জন্য ছোট্ট একটা বাঁকা কাঠের গজা। ঢ্যাংরোর দণ্ডে লাল নীল সবুজ, তিন রঙের একগুচ্ছ সরু ফিতে বাঁধা। মোষের শিং দিয়ে তৈরি একজোড়া শিঙা এক পাশে। মানুষের নলির হাড় দিয়ে তৈরি কাংলিং। পেতলের ঝ্যামটা। ডিমের মাপের একেকটা ঘুঙুর দিয়ে তৈরি লম্বা একটা মালা। ছোটো নূপুর জড়ানো একজোড়া পায় বাঁধার পাটি।"[৬]

লোকজ বাদ্যযন্ত্র একটি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীবনযাপন ও বিশ্বাসের প্রতীক। এগুলি কেবলমাত্র বিনোদনের উপকরণ নয়, বরং ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, সামাজিক সমাবেশ ও লোকনাট্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে রয়েছে। এই উপন্যাসে বর্ণিত নেপালিদের বাদ্যযন্ত্র 'ঢ্যাংরো' হল কালো কাঠের তৈরি ও দুই পিঠে চামড়া টানানো ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এর সঙ্গে বাঁকা কাঠের 'গজা' ব্যবহার হয়, যা তাল দেওয়ার জন্য শক্ত ও গভীর ধ্বনি উৎপন্ন হয়। দণ্ডে বাঁধা লাল-নীল-সবুজ ফিতে প্রতীকি রঙের এই বহুমাত্রিকতা উৎসব, আচার বা দেবতার পূজায় শুভতার পরিচায়ক। আবার 'শিঙা' হল মোষের শিং থেকে তৈরি এই বায়ুবাদ্য প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ জীবনে সংবাদ প্রচার, মিছিল, পূজা, শিকার কিংবা সামাজিক সমাবেশে ডাক দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়ে

এসেছে। এর ধ্বনি শক্তি ও ক্ষমতার প্রতীক। তারপর 'কাংলিং' মানুষের উরুর হাড় দিয়ে তৈরি এক ধরনের তিব্বতি-ভুটানি বায়ুবাদ্য, যা মূলত বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর উপস্থিতি নির্দেশ করে সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় মিলন ও সংস্কৃতির সমন্বয়। আবার 'ঝ্যামটা' (পেতলের) ঝনঝন ধ্বনি উৎপন্ন করা এই ঝংকারবাদ্য মন্ত্রপাঠ, নৃত্য বা যাত্রায় ছন্দতাল বজায় রাখতে দেখা যায়। এটি সমবেত বাদ্যযন্ত্রের অংশ হিসেবে সম্মিলিত একাত্মতা প্রকাশ করে। তারপর 'ঘুঙুরমালা' ডিমের মতো ছোটো ঘুঙুর দিয়ে তৈরি মালা মূলত নৃত্যের সময় বিশেষ শব্দের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেহের নড়াচড়ার সঙ্গে সুরেলা ঝংকার সৃষ্টি করে, যা লোকনৃত্যে ভঙ্গিমাকে ছন্দময় করে তোলে। আবার 'নূপুর ও পাটি' ছোটো নূপুর বাঁধা পাটি পায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তালের অনুষঙ্গ হয়। এগুলি নৃত্যের ছন্দকে শরীরবদ্ধ রূপ দেয় এবং আধ্যাত্মিক-ভক্তিমূলক গানের সঙ্গে নৃত্যকে সংযুক্ত করে রাখে। এই বাদ্যযন্ত্রসমূহ শুধু শব্দসৃষ্টি করে না, বরং একটি লোকসমাজের ধর্মীয়-সামাজিক পরিচয়, সাংস্কৃতিক আচার, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও সামষ্টিক আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। কাঠ, চামড়া, শিং, হাড়, ধাতু—এমন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি হওয়া এই বাদ্যযন্ত্রগুলো লোকজ জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। সুতরাং এরা একাধারে লোকজ শিল্প, ধর্মীয় উপকরণ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।

লোকজ উপাদান বাঁশ নানান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিত্য ব্যবহৃত হয়। বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'লোকজ শিল্প' গ্রন্থে মঞ্জরী চৌধুরী তাঁর 'ত্রিপুরার লোকশিল্পে বাঁশ' প্রবন্ধে লোকজীবনের বাঁশের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> "অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানবসমাজে বাঁশ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য বস্তু হিসাবে জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়ে গেছে। শুধুমাত্র বাঁশ ব্যবহার করেই বাসযোগ্য উন্নতমানের গৃহনির্মাণ এখন সম্ভব হয়েছে। সেক্ষেত্রে খুঁটি, পাইর, তির, বেড়া, চালের কাঠামো, ছাউনি, বাঁধবার বেত এই সবই বাঁশ দিয়ে তৈরি। বাঁশকে লম্বালম্বি ছেঁচার পর চিরে দা দিয়ে খুঁটে করা হয় তরজা। এই তরজা দিয়ে ঘরের বেড়া ও ছাউনির কাজ হয়। তরজার বেড়ার মধ্যেও নিজের শিল্পীসত্তার ছাপ রেখে দেন কোনো কোনো কারিগর। নিপুণ বাঁশশিল্পীর হাতে তৈরি তরজার বেড়া পাটির মতো মুড়ে নেওয়া যায়।"[৭]

এছাড়াও বাঁশের তৈরি গৃহস্থালি সরঞ্জাম রয়েছে যা দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে লোকজীবনে, যেমন— মাছ ধরার সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র, ঘরে ব্যবহৃত চালুনি, টুকরি, ঝুড়ি, ডালা, ফুলদানী, মাচা, বেড়া, সাঁকো প্রভৃতি। এই উপন্যাসের মধ্যে বাঁশের তৈরি ফুলদানি প্রসঙ্গ রয়েছে—

> "খুকুরিটা হাতে নিয়ে পড়ে থাকা বাঁশটার দিকে এগিয়ে গেল উরগেন। তার থেকে একগাঁট বাঁশ কেটে নিল। একদিকের গাঁট কেটে ফেলতেই একমুখ খোলা চোং হল একটা। চোংটা হাতে নিয়ে উরগেন ফিরে এল জুনির কাছে। তারপর খুব মন দিয়ে চেঁচে পরিষ্কার করতে লাগল বাঁশের চোংটা। কিছুক্ষণের পরিশ্রমের পর একটা মসৃণ বাঁশের ফুলদানি তৈরি হল। সেটা জুনির হাতে দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে রাখবে ফুলগুলো'। জুনি ফুলদানিটা নিয়ে ওরাসগুলো একটা একটা করে সাজাতে লাগল তার মধ্যে। উজ্জ্বল লাল গুরাসের একটা ঝলমলে তোড়া তৈরি হল সবুজ ফুলদানির ওপর। জুনি দু'হাতে ফুলদানিটা তুলে ধরে বলল, 'কী সুন্দর লাগছে, না?'[৮]

বাঁশ দিয়ে তৈরি লোকজ উপাদানের ব্যবহার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদারের রাভা জনজাতির নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলোতে রয়েছে।

গ্রামীন লোকজীবনে লোকদেবতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সব লোকদেবতা বেশিরভাগ নিরাকার দেখা যায়। যার কোনো আকার নেই, আবার আদ্য আকার হয়ে থাকে। যেমন বড়ো পাথর বা গাছ। প্রকৃতির উপাসকদের মধ্যে এই লোকদেবতা অধিক পরিমানে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের নানা জনজাতির মধ্যে এইসব লোকদেবতার দেখা মেলে। এইসব লোকদেবতাদের নিয়ে নানা লোককথা প্রচলিত হয়েছে। বিমল লামার 'নুন চা' উপন্যাসে তেমনি নেপালিদের মধ্যে লোকদেবতার বর্ণনা দেখা যায়। উপন্যাসে রয়েছে—

> "আজ দেবী পুজো, ধনমানধুরার সবচেয়ে জাগ্রত দেবী। কিন্তু এই দেবীর মুখ কেউ দেখেনি, কারণ এর কোনও মূর্তি নেই। আবার পুরোপুরি নিরাকারও নন ইনি। মাঝামাঝি সমাধানের মতো

একটা শিলাখণ্ডের চেহারা নিয়ে অধিষ্ঠান করছেন। এঁর কোনও মন্দিরও নেই। ওই প্রাচীন রবার গাছের মূলেই এঁর পবিত্র স্থান।"[৯]

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসগুলোতে এই ধরণের লোকদেবতার উল্লেখ করেছেন। এমন অনেক লোকদেবতা দেখা যায় যেখানে হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মের মধ্যে পালন করা হয়। তেমনি অনেক প্রকৃত উপাসক জনজাতির মধ্যে খৃস্টান, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম গ্রহন করলেও হিন্দু রীতি বা প্রকৃতির উপাসনা করতে দেখা যায়। বিমল লামা তার 'নুন চা' উপন্যাসে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্রণ দেখিয়েছেন। যেমন বৌদ্ধ ধর্মে পশুবলি দেওয়ার প্রথা না থাকলেও উপন্যাসে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তামাং জনজাতিরা লোকদেবতার জন্য পশু বলি দিচ্ছে। উপন্যাসে রয়েছে তার চিত্র—

> "কী কারণে যেন বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনটাই দেবী পুজোর দিন। ছোটোবড়ো পশুপাখি বলি দেওয়ার সময় কারও খেয়াল থাকে না, আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। যদিও গ্রামের অর্ধেকের বেশি লোক নিজেদের বৌদ্ধই মনে করে। নিয়মিত গুফায় যায়। বৌদ্ধমতে বিয়ে শ্রাদ্ধ করে। কিন্তু ওই দিন ধনমানধুরার শিশুরা জানে আজ দেবীপুজো।"[১০]

লোকনেশা 'চুলাই' এর প্রসঙ্গ রয়েছে উপন্যাসে। উত্তরবঙ্গের নানা জনগোষ্ঠী এই চুলাই তৈরি করে থাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। যা বিভিন্ন নামে পরিচিতি। যেমন— নেপালিরা বলে থাকে রকশি, বোড়ো-মেচরা জৌউ, রাভারা বলে থাকে চকত, আদিবাসীরা দারু প্রভৃতি। অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসগুলোতে এই দেশী মদের ব্যবহারে প্রসঙ্গ এনেছেন। নুন-চা উপন্যাসে নেপালি জনগোষ্ঠীর চোলাই বানানোর পদ্ধতি দেখা যায়—

> "ততক্ষণে ওদিকে চোলাই করার টিনের ওপর রাখা হাঁড়ির জল গরম হয়ে পড়েছে। এই জল ওপর থেকে বদলে দেওয়া দরকার। না হলে হাঁড়ির তলায় বাষ্প জমবে না, মানে ঠিকমতো চোলাই হবে না। এই জলধারা থেকে প্রতিমাকেই টেনে আনতে হয়। শুধু গরম করো আর ফেল, অবশ্য এই গরম জলে হাত-মুখ ধুতে বা চান করতে বেশ আরাম।"[১১]

এই উপন্যাসে নেপালিদের গাই তিউহার, ভাইটিকা দেওয়ার প্রথা দেখা যায়। গাই তিউহার দেওয়ার লোকপ্রথা অনুসারে গাইয়ের কপালে টিকা ও গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া। এই লোকপ্রথা রাজবংশী, বোড়ো-মেচ, আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত উত্তরবঙ্গের নানান গ্রামে। দেবেশ রায় 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই লোকপ্রথার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। বিমল লামা তার 'নুন চা' উপন্যাসে নেপালিদের মধ্যে এই লোকপ্রথা দেখিয়েছেন—

> "দিন গুনে গুনে অবশেষে পৌঁছে গেল অউসি, ঘোর অমাবস্যা— গাই তিউহার। সকাল সকাল গাইয়ের কপালে টিকা দিয়ে গো-মাতাকে প্রণাম। তারপর চারদিকে গাঁদার মালা-দরজা-জানলা-খাম্বা রেলিং, পারলে চালের কিনারা পর্যন্ত। রান্না-খাওয়া-হইহল্লা, হাহা-হিহি-শুভেচ্ছা। তারপর দিন ফুরিয়ে অউসিতে আকাশ ঢেকে গেলে পাহাড় জুড়ে লক্ষ লক্ষ মাটির প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোয় পথ চিনে চিনে মেয়ে দলের গ্রাম পরিক্রমা। ঘরে ঘরে গিয়ে মিহি কণ্ঠে গেয়ে ওঠে
> 'সুশীলা-সরু-শিলা-মুনা-সূর্যজ্যোতি,
> ভৈলেনি আয়ো আঙ্গন মা/বড়ালি
> কুড়ালি রাঅ ন/অউসি কো দিন, গাই তিউহার
> হো, ভৈলো!'
> গাই তিউহারের পরদিন গোরুর কপালে টিকা দেওয়ার দিন। তারপর ভাইটিকা। সেদিন পাহাড়ের সব ভাই বোনের কাছে ছুটে আসবে টিকা নিতে। সে যতই কাজ থাক।"[১২]

'নুন চা' উপন্যাস কেবল দার্জিলিংয়ের নেপালি সম্প্রদায়ের জীবনের কাহিনি নয়, বরং উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জনপদের লোকজ সংস্কৃতির একটি জীবন্ত দলিল। এখানে লোকবিশ্বাস, লোকপ্রথা, লোকঅস্ত্র, লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকদেবতা, লোকনেশা, বাঁশের ব্যবহার, উৎসব প্রভৃতি মিলিয়ে পাহাড়ি জনজাতির লোকজীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেছে। ঔপন্যাসিক বিমল লামা এই উপন্যাসে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে নেপালি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক

জীবনচিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলত, এই উপন্যাস একদিকে নৃতাত্ত্বিক নথি, অন্যদিকে লোকজ উপাদান নির্ভর আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. লামা, বিমল। নুন চা চায়ের দেশের নুনকথা। সপ্তর্ষি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২, চতুর্থ সংস্করণ- আগস্ট ২০২০, কলকাতা-০৯, পৃ. ৯।
২. তদেব, পৃ. ৩৮।
৩. তদেব, পৃ. ৪৩।
৪. তদেব, পৃ. ৪৮।
৫. তদেব, পৃ. ৪৮।
৬. তদেব, পৃ. ৫১।
৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার সম্পাদনা। লোকজ শিল্প। পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ২০১১, কলকাতা-১১, পৃ. ১৪৫।
৮. তদেব, পৃ. ৯১।
৯. তদেব, পৃ. ৯৩।
১০. তদেব, পৃ. ৯৪।
১১. তদেব, পৃ. ২৪২।
১২. তদেব, পৃ. ৪৬৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোক সংস্কৃতির সুলুক সন্ধান। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫, কলকাতা-৭৩।
২. বন্দ্যোপাধায়, সুভাষচন্দ্র। বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান। করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৭, প্রথম সংস্করণ (করুণা) জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা-০৪।
৩. পাল, স্বপ্না। বাংলা উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (বঙ্কিম থেকে কল্লোলযুগ)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উপস্থাপিত ২০০২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. ইসলাম, শেখ মকবুল। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১১, কলকাতা ০৯।
৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, সম্পাদিত। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, কলকাতা ৭৩।
৬. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭, কলকাতা ০৯।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 30-37
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.176

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোট গল্পে নিম্নবর্গীয় চেতনা: এক বিশ্লেষণী পাঠ

রাজর্ষি মোহান্ত, *সহকারী অধ্যাপক, কালিগঞ্জ পাইওনিয়ার কলেজ, শ্রীভূমি, অসম, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 23.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Narayan Gangopadhyay is an unforgettable name in post-Tagore Bengali literature. This distinctive storyteller of the twentieth century shone like a radiant star in the realm of Bengali literature. Among the writers whose pens vividly portrayed the decaying Bengali society of the mid-twentieth century, Narayan Gangopadhyay holds a prominent place alongside Narendra Nath Mitra, Nabendu Ghosh, Mahasweta Devi, and others. During and after the Second World War, Narayan Gangopadhyay enriched Bengali literature with his realistic perspective. His short stories, in particular, reflect the contemporary real-world context, the unrest of the time, and the ideals of life. Narayan Gangopadhya'y works include 14 collections of short stories. He was not merely a popular fiction writer; he was also a great artist who represented an entire era. His true literary development took place against the backdrop of war and famine. His individual voice continuously echoed the hopes and aspirations, sorrows and agonies of an entire era. The disrupted Bengali life during the famine and World War II, the decline of human values, black marketeering, Partition, communal riots, the refugee crisis — all these tragic real-life images were vividly depicted in his stories.

Narayan Gangopadhyay was a believer in Marxist philosophy. His short stories repeatedly highlight the struggles of the voiceless section of Indian society. Just as he sought to awaken the exploited, deprived, and marginalized working class of society. He also highlighted the various crises faced by these people in his short stories. Particularly, he portrayed the lives of the lower classes with a realistic and insightful perspective. His short stories silently bear witness to the exploitation of the lower-class people by the wealthy elites, moneylenders, and custodians of the law.

Keywords: Narayan gangapadhyay, subaltern, famine, starving, foodless

রবীন্দ্র উত্তর বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম হলো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ শতকের এই স্বতন্ত্র কথা শিল্পী বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার অবক্ষয়িত সমাজ চিত্র যেসব লেখকদের কলমে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাঁর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিমায়। বিশেষত তাঁর ছোট গল্পগুলি সমকালীন বাস্তব প্রেক্ষাপট, অশান্ত সময় ও জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি। মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বিপর্যস্ত বাঙালি জনজীবন, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, কালোবাজারি, স্বার্থের সংঘাত, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতির

নানা বাস্তব করুন দৃশ্য তাঁর গল্পে মুর্ত হয়ে উঠছে। বিশেষত নিম্নবর্গীয় সমাজ ও তাদের জীবন বীক্ষণ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি তুলে ধরেছেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বালিয়া ডিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বরিশালের বাসুদেব পাড়ায়। বাল্য কাল থেকেই তিনি মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন। দেশপ্রেম, রাজনৈতিক চেতনা ও প্রতিবাদী ধারা তাঁর মনে বাল্য কালেই অঙ্কুরিত হয়। তাঁর শিক্ষাকাল কাটে দিনাজপুর, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতায়। তিনি ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে M.A. পাশ করেন এবং ১৯৬০ সালে ডক্টরেট্ ডিগ্রি নেন। এরপর তিনি জলপাইগুড়ি কলেজ, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শৈশবেই তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তাঁর পিতা পুলিশের দারোগা হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তদানীন্তন বাংলা দেশের যত রকম দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। শুধু গ্রাহক বললে ভূল হবে, একজন একনিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন। তাঁর পরিবারের ছোটোদের জন্য আসত খোকাখুকু, সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী প্রভৃতি পত্রিকা গুলি। সেখান থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। আর অতি অল্প বয়স থেকেই গল্প, উপন্যাস, কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'মাস পয়লা' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় ছোটোদের বিভাগে কবিতা লিখে পুরস্কার ও পেয়েছিলেন। কাব্য চর্চার মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্য জগতে পদার্পণ। দেশ, শুকতারা, পাঠশালা, সন্দেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি একাধিক পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উননিবেশ' (অখণ্ড) ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলন হলো 'বীতংস'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের প্রায় ১৪ টি সংকলন পাওয়া যায়। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্প সংকলন হল-

'বীতংস' (১৯৪৫), 'কালাবাদর' (১৯৪৫), 'দুঃশাসন' (১৯৫২), 'ভোগবতী' (১৯৪৫) ।

তিনি জীবনে প্রায় শতাধিক গল্প লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্প হল–

'ইতিহাস','টোপ','সৈনিক','জান্তব','কালোজল','রেকর্ড','হাড়','পুষ্করা','নক্রচরিত্র', 'দুঃশাসন', 'সভাপতি' প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও তাঁর সাহিত্যের একটি বিরাট জায়গায় জুড়ে আছে কিশোরদের জন্য লেখা গল্প ও উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিশোর গল্পের নাম হল– 'মৎস-পুরাণ', 'ভুতুড়ে', 'খট্টাঙ্গ ও পলান্ন', 'রোমাঞ্চকর বন্দুক', 'থলে রহস্য' ইত্যাদি। কয়েকটি কিশোর উপন্যাস হল– 'অন্ধকারের আগন্তুক'(১৩৫২), 'চারমূর্তি'(১৯৫৭), 'চারমূর্তির অভিযান'(১৯৬০) । অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিশোর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি "রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার" লাভ করেন। এছাড়া তাঁর অসামান্য সাহিত্য কীর্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক, এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আয়োজিত 'আনন্দ পুরস্কার' ও পান। ২২শে কার্তিক, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে, ইং ৬ই নভেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় শিল্পী বলা যায়। মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিতেই তাঁর যথার্থ বিকাশ। যার ব্যক্তি কণ্ঠে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়েছে সমগ্র যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনার মর্মগাথা। তিনি মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। লেখক সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রণা তথা মন্বন্তর কবলিত বাংলার নিরন্ন, বিবস্ত্র মানুষের গগনভেদী হাহাকারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন খুব কাছে থেকে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে সমাজ মানসের ভাববেদনা বানীবিগ্রহ লাভ করেছে। অনেক সমালোচকেরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিখ্যাত লেখক মাক্সিম গোর্কির সাথে তুলনা করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন–

> "নারায়ণ শুধু প্রতিভাবানই নন, সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয়ও বটেন।...ছোটগল্পে বঙ্গভারতী আজ যড়ৈশ্বর্যময়ী, এই বিরাট ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মহত্তর সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন।"[১]

বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটা অংশ জুড়ে আছে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা, তাঁদের জীবন সংগ্রামের কথা। মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের সময়ে অবক্ষয়িত মূল্যবোধ ও পরিবর্তিত জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে সমসাময়িক কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে সাবালটার্নদের প্রসঙ্গ। মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ,

সুকান্ত,বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে মহাশ্বেতা দেবী প্রত্যেকেই প্রান্তিকায় দলিতদের নিয়ে কলম ধরেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও সমাজের সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বেদনাহত চিত্র ধরা পড়েছে এভাবে—

> "শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
> প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা ।"[২]

আর এই শতাব্দী লাঞ্ছিত, শোষিত আর্তের হাহাকারই যেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রাণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পেও বার বার উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় জীবন বীক্ষনের সংগ্রাম। সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষকে তিনি যেমন জাগাতে চেয়েছেন, তেমনি তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে এই শোষিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নানা সংকটের কথা। সমাজে যারা দিনের পর দিন অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত, তারা চিরদিনই শোষিত হয়েই থেকে যায়। যাদের আর্তনাদ পৌঁছায় না সমাজের উচ্চ শ্রেনী তথা সভ্য বলে খ্যাত মানুষদের কাছে, সমাজ যাদের বাতিলের খাতায় রাখে, সেই সাবালটার্নদের তিনি ঠাই দিয়েছেন হৃদয়ে, মননে। তাঁর 'হাড়', 'বীতংস', 'নক্রচরিত্র', 'দুঃশাসন', 'পুস্করা', 'টোপ' প্রভৃতি নানা গল্পে সমাজে নিম্নবর্গীদের অবস্থান সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এমনই একটি গল্প হল 'বীতংস'। এই গল্পে আসামের চা বাগানে আরকাটির মাধ্যমে শ্রমিক পাচারের করুন ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এই আরকাটিরা বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশের প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে। গল্পে 'সুন্দর লাল' ভণ্ড সাধু সেজে সাঁওতাল পাড়ায় প্রবেশ করে। সে অনায়াসেই নিরীহ সাঁওতালদের বিশ্বাস অর্জন করে। সে নিজেকে সিদ্ধ পুরুষ বলে জহির করে। ঝাড়ফুঁক, ভূত তাড়ানো, পিশাচ চালানে সে সিদ্ধহস্ত। উদার প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সাঁওতালদের কাছে এসে হয়ে উঠে বাবা ঠাকুর। সুন্দর লাল সংসার ত্যাগী বৈরাগী সাজলেও তার মনে থাকে তীব্র ভোগ লালসা। নৃত্যরত সাঁওতাল কন্যা বুধুনির সর্বাঙ্গে বিচরণ করে তার লোলুপ দৃষ্টি। ঝুড়ু সাঁওতালের মেয়ে বুধনিকে সে স্বপ্ন দেখায় শহরের রঙ্গিন জীবনের।

> "চলে যা, চলে যা তুই! দেবতার নাম করে বলছি, তুই চলে যা। শাড়ী, চুড়ি, তেল—যা চাস সব পাবি।"[৩]

কিন্তু শাড়ি চুড়ি, আর তেলের বিনিময়ে বুধনীকে যে কতটা মুল্য দিতে হবে তা সহজ সরল আদিবাসীরা বুঝতে পারেনা। গ্রামের মানুষ তাকে ভগবানের মত শ্রদ্ধা করে। ধর্মকে অস্ত্র করে সুন্দর লাল তাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সম্মতি আদায় করে। তারপর একদিন, বিনি সাঁওতালির মানসিক পূজার দিন, তার উপর শিং-বোঙার ভর করার ভান করে এবং গ্রামে মোড়ক লাগার ভবিষ্যৎবাণী করে।

> "ঝড়ু সাঁওতাল, শুনছিস? আমি শিং-বোঙা, তোদের ডাকছি—শুনছিস?... —আমার কথা শোন্। তোদের গাঁয়ে মড়ক লাগবে—হয়জার মড়ক! —একটি প্রাণীও বাঁচবে না মরে সব শেষ হয়ে যাবে। 'করম' দেবতার রাগ পড়েছে, তোদের কাউকে রাখবে না, কাউকেই নয়।"[৪]

করম দেবতার ভয় দেখিয়ে সাঁওতালদের ঘরবাড়ি ছাড়ার জন্য বলে। সাঁওতাল পাড়ার নিরীহ মানুষেরা তাকে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসের সযোগ নিয়ে গ্রামের মানুষদের সে নির্মমভাবে ঠকিয়ে নিয়ে যায় আসামের চা বাগানে। সুন্দরলাল তাদের লোভ দেখায়-

> "সেখানে ঘর পাবি, জমি পাবি, এরচেয়ে অনেক সুখে থাকবি।"[৫]

অসহায় সাঁওতালরা একপ্রকার বাধ্য হয়েই তার সঙ্গ নেয়। ঘর বাড়ি ছেড়ে ছুটে চলে অনিশ্চিত জীবনের পানে। ঘর ছাড়ার দুঃখ থাকলেও নুতুন জীবনের স্বপ্নে, দুবেলা দুমুঠো ভাতের আশায় তারা সুন্দর লালের দেখানো পথে হেঁটে চলে-

> "—একটা অস্ফুট গানের গুঞ্জন। সাঁওতাল পুরুষেরা ঘর ছাড়ার দুঃখ ভোলবার জন্যেই কেউ হয়তো বাঁশিতে সুর দিয়েছে। মেয়েদের মুখে কোনো ক্ষোভের ইঙ্গিত নেই। পথ চলবার আনন্দে তারা লীলায়িত, মাদলের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কালো চুলে শাদা ফুলের মঞ্জরিগুলি দুলে উঠছে। বুধনীর চোখে স্বপ্ন। শহর, চুড়ি, তেল আর শাড়ী।"[৬]

অন্যদিকে আরকাটি সুন্দর লাল মনে মনে হিসাব করে—

> "বধুনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশ জন কুলিতে তার কমিশন পাওয়া হয় কত!"[৭]

বীতংস শব্দের অর্থ হল পাখী বা হরিণ ধরার ফাঁদ। সুন্দরলালও গল্পের শুরু থেকে যে ফাঁদ পাতে, গল্পের শেষে দেখতে পাই সবাই তার ফাঁদে পা দেয়। এভাবেই সুন্দরলালের মতো আরকাটিরা দক্ষ শিকারীর মতো ফাঁদ পেতে নিরীহ মানুষদের শ্রমিক হিসাবে চালান করে। আর 'শহর চুড়ি, তেল আর শাড়ির' স্বপ্ন দেখে বুধনীর মত হাজার হাজার মেয়ে কালের স্রোতে হারিয়ে যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরো একটি করুণ গল্প হল 'দুঃশাসন'। গল্পটি মনন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। আলোচ্য গল্পে ও সমাজের দুটো শ্রেণীর মানুষকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেনীর প্রতীক হিসাবে আছে দেবী দাস, থানার বড়বাবু শচীকান্ত প্রভৃতি চরিত্ররা। অন্য দিকে সর্বহারা, অর্ধনগ্ন বুভুক্ষুর দল। গল্পের শুরুতেই দেখতে পাই, একজন লোক দেবী দাসের পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে একটুকরো কাপড়ের জন্য অনুরোধ করছে।

> "অন্তত এক জোড়া কাপড় নইলে আর—"[৮]

দেবী দাসের বিরাট কাপড়ের আড়ত আছে। গোদাম ভর্তি কাপড় থাকা সত্ত্বেও অসহায় লোকটাকে সে এক জোড়া কাপড়ও দিতে চায় না। যুদ্ধের বাজারে আকাল পড়েছে। কয়েকদিন পর কাপড় বেশি দামে বিক্রি করা যাবে, ভালো মুনাফা হবে। তাই সব দোকানে তালা দিয়েছে। অন্যদিকে থানার বড়বাবু নিশিকান্তের আয়োজিত যাত্রাপালা 'দুঃশাসনের রক্তপান'-এর জন্য ৫০ টাকা চাঁদা দিতে পারে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব সুন্দর ভাবে শোষক শ্রেণী আর শোষিতদের জীবন চিত্র মূর্ত করে তুলেছেন। একদিকে যাত্রা পালায় আলোর বাহার, অন্যদিকে রাতের আঁধারে পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থে সামান্য আলো জ্বালাতে না পারা অসহায় জননীর হৃদয় বিদারক ক্রন্দন। মুছি পাড়ায় রাতের অন্ধকারে শিয়াল একটি শিশুকে নিয়ে গেছে এবং ঘরের পাশে বসেই খেয়েছি। কিন্তু সামান্য আলোর অভাবে শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

> "পরদিন সকালে বাড়ী থেকে ত্রিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে, অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না।"[৯]

এই মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ হয়তো এত প্রাঞ্জল ভাষায় দিতে পারতেন না। কেরোসিনের অভাবে পুরো গ্রাম যেখানে অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখানে 'ডে laight' জ্বালিয়ে ভিমসেনের "রক্তাক্ত হাতে দ্রুপদ-নন্দিনীর বেণী"[১০] বেঁধে দেওয়ার দৃশ্য দেখছে আধুনিক বাংলার দুঃশাসনেরা।

গল্পের শেষ ভাগ আরো মর্মান্তিক। যাত্রা পালা শেষ করে দেবীদাস মুচি পাড়ার লক্ষণ মুচির খবরে তাঁর বাড়িতে যায়। সেখানে ঘটে এক বিচিত্র ঘটনা- একটি নগ্ন মেয়ে ঘাটের দিক থেকে জল নিয়ে আসছিল। মানুষের সাড়া পেয়ে নিমিষে উধাও হয়ে যায়।

> "মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই — কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[১১]

যুদ্ধের বাজারে নিজের লজ্জা নিবারণের ন্যূনতম এক টুকরো কাপড় কেনার সামর্থ্য নেই। এ দৃশ্য কেবল মাত্র মুচি পাড়ার নয়; ৫০-এর মমন্তরের সময় বাংলার প্রত্যেক পাড়ার, প্রত্যেক ঘরের দৃশ্য। অসহায়, শোষিত, বঞ্চিত মানুষগুলির অবস্থা বোঝার জন্য শুধুমাত্র 'কোনো খানি একফালি কাপড় নেই' কথাটিই যথেষ্ট। আর সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতীক কাপড়ের আড়তদার দেবী দাসের মতো ব্যবসায়ীরা শুধু মাত্র বাংলার নয়, একটি যুগের 'দুঃশাসন'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'হাড়' গল্পটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। মন্বন্তরের সময়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পটিতে। গল্পে আমরা দেখতে পাই, নায়ক চাকরী প্রার্থী বেকার যুবক, বুকে এক রাশ আশা নিয়ে রায় বাহাদুরের বিশাল প্রাসাদের ফটকে উপস্তিত হয়। পিতার দেওয়া একটি চিটি নিয়ে সে পিতৃবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রায় বাহাদুর এইচ এল চ্যাটার্জি বিরাট প্রাসাদের ভেতরে থাকেন। এর ফটকের ভিতরে বিশাল দর্শন দুটো কুকুর দেখে তার ভিতরে ঢুকার সাহস হয় না। সে সামনে পায়চারি করতে থাকে। তারপর একটা সময় রায় বাহাদুরের ষড়শী কন্যা সুষির সহায়তায় রায়বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে। পিতার দেওয়া চিঠিটি গল্পকথক রায় বাহাদুরকে দেন। চিঠি পড়ে রায় বাহাদুর ছেলেটির পরিচয় জানতে পারেন; ফরিদপুরের ঈশান স্কুলে পড়া তার সহপাঠী প্রমথের ছেলে। রায়বাহাদুর তার বন্ধু প্রমথের প্রচুর প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধের বাজারে একটি মধ্যবিত্ত যুবকের সামান্য কেরানীর চাকরীর কতটা দরকার তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন না। তিনি প্রায় ধমকের সুরে

যুবকটিকে প্রত্যাখ্যান করে তার জীবনের এডভেঞ্চারের গল্প শোনাতে শুরু করেন। তারপর তিনি যুবকটিকে তার ভ্রমণের ইতিহাস বলতে থাকেন। বলতে থাকেন তার ফিলিপাইন, ম্যানিলা,তাহিতি, দ্বীপে গিয়ে আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা। তার সংগ্রহ করা বিচিত্র সব হাড়ের টুকরো গুলো দেখাতে থাকেন। ৫০০০ টাকা দিয়ে তিনি একটা 'রেডোশিয়ান' এর হাড় কিনে আনেন কাটুবাটু থেকে। তাহিতি দ্বীপে কুমারী মেয়েকে বলি দিয়ে তৈরি করা হাড় ও রয়েছে। ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে ভেসে আসে নিরন্ন বুভুক্ষুদের চিৎকার,-

> "...চাট্টি ভাত দাও মা...একটুখানি ফ্যান"[১২]

যা তার বিরক্তির উদ্রেক করে। মনোহর পুকুর পার্কের পাশে অসহায় নিরন্ন মানুষগুলি সামান্য ভাতের ফ্যানের জন্য হাহাকার করতে থাকে। রাসবিহারী এভিনিউ এর কোলাহল চাপিয়ে কানে আসে ক্ষুধার্তের হাহাকার। কিন্তু তা চাপা পড়ে যায় রায়বাহাদুরের মতো মানুষের আপাত জীবন সত্যের আড়ালে। সেই সময় গল্প কথক যুবকটির মনে হয়-

> "তাহিতি দ্বীপে মানুষ পুড়ছে না, পুড়ছে কলকাতায়!"[১৩]

নারায়ণ গঙ্গপাধ্যায় সমাজের তিনটি শ্রেনীর চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পটিতে। সমাজে উচ্চ শ্রেনীর প্রতিনিধি রায়বাহাদুর। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতীক চাকরী প্রার্থী বেকার যুবক। আর নিম্ন শ্রেণির প্রতীক মনোহর পুকুর পার্কের ফুটপাতে আশ্রয় গ্রহণ করা মন্বন্তর কবলিত অসহায় বুভুক্ষু মানুষ গুলো। নারায়ণ গঙ্গপাধ্যায় একই সমাজিক পরিবেশে তিনিটি শ্রেনীর মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজের উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি রায় বাহাদুরের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় বিলাসিতায় পরিপূর্ণ, বাস্তব জীবন চিত্র তার চোখে পড়ে না। হাতে যার বিলাস বহুল হীরার আংটি, যার 'হবি' বিভিন্ন ধরনের 'হাড়' সংগ্রহ করা; তার কাছে অসহায় বুভুক্ষুদের চিৎকার বিরক্তিকর মনে হয়। তিনি বলেন-

> "...পার্কের ওই ডেসটিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না।...খেতে না পেলে চীৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই ।"[১৪]

ঘরে বিলাসীতা করে কুকুর পোষতে পারেন, কিন্তু ডাস্টবিনে পড়ে থাকা পচা দুর্গন্ধময় খাবারের জন্য সংঘর্ষ করা মানুষের কথা তিনি ভাবেন না। রায়বাহাদুর হয়তো পারতেন মানবিক জাদুকাটির স্পর্শে কলকাতার বুকে জ্বলতে থাকা বুভুক্ষার লেলিহান শিখা থামাতে। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পে সে আশার আলো জ্বালিয়ে তুলেননি।

এক বুক হতাশা নিয়ে গল্পকথক যুবকটি যখন রায় বাহাদুরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন দেখতে পায় নোংরা ডাস্টবিনের মধ্যে খাবার খুঁজছে ক্ষুধার্ত মানুষগুলি। আর পার্কের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটি কঙ্কালসার ছেলে হাড় চুষে চলেছে।

> "... একটা ছোট ছেলে দু'হাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হাঁ, হাড়ই তো।"[১৫]

মন্বন্তরের একটি রুক্ষবাস্তব চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাই। আলোচ্য গল্পে একদিকে বিলাসবহুল রায় বাহাদুরের সৌখিন হাঁড় আর অন্যদিকে ক্ষুধার্তের শেষ সম্বল ডাস্টবিনের হাড়। সুতরাং 'হাড়' নামটিও এখানে যেন ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে এবং নামকরণটিও এখানে স্বার্থক হয়ে উঠেছে। শুধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নয়, সমকালীন অনেক লেখকদের কলমে কি চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকেও আমরা কুঞ্জকে দেখি কুকুরের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে লেখা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নক্রচরিত্র' গল্পে সমাজের তিমিরাচ্ছন্ন নির্মম সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'নক্রচরিত্র' গল্পের নায়ক গোলাপাড়া হাটের নিশিকান্ত কর্মকার একাধারে আড়তদার, ব্যবসায়ী এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। সে একদিকে গলায় তুলসী মালাধারী বৈষ্ণব আবার অন্যদিকে ডাকাতের ও মদতদাদা। ডাকাতেরা রাতের অন্ধকারে ছিনতাই করা মাল তার কাছে বিক্রি করে যায়। নিশীকান্ত ডাকাতদের ঠকিয়ে অল্প মূল্যে দামী দামী মাল আত্মসাৎ করে। ডাকাতের উপর বাটপারি করা সোনা দিয়েই ভরাট করেছে তার লৌহ সিন্দুক। আবার যুদ্ধের বাজারে অধিক মুনাফা লাভের জন্য আড়তে শত শত মন চাল ও লুকিয়ে রাখে; যার ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের আকাল পড়ে। বিগত যৌবন এবং বিকারগ্রস্ত হলেও সে প্রচন্ড লোভী এবং ধূর্ত। ইব্রাহিম দারোগার মতো প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কৌশলে সে বশ করে রাখে। তার কুকর্মের ফলে মতিপালের মতো মানুষদের না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করতে হয়। কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

মতিপালের পরিবার যেখানে ধ্বংস হয়ে যায়, সেখানে নিশী হরি সভায় কৃষ্ণ নাম শ্রবণে মত্ত। সত্যিকার অর্থেই সে নক্রবৎ।

গল্পটিতে লেখক নিশিকান্তকে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। গল্পে নিশিকান্ত ছাড়াও আইন ও শান্তির রক্ষক ইব্রাহিম দারোগাও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আশ্রিত বিশাখা, মদন ডাকাত, যোগী, মতিপাল, মতিপালের বউ, প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা প্রত্যেকেই শোষিত, বঞ্চিত। মদন, যোগী বাধ্য হয়ে ডাকাতির পথ বেছে নিয়েছে। দুবেলা দুমুঠো ভাতের তাগিদে 'কষ্টবালা'র মতো অসহায় নারীর হয়তো, 'বিশাখা' সেজে নিশিকান্তের বৃন্দাবন লীলার সঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

অতিলোভী মহাজন নিশিকান্ত বিগত যৌবন হলেও তার যৌন স্পৃহা বর্তমান। সে বিশাখাকে তার সেবা দাসী হিসাবে রেখেছে। ইব্রাহিম দারোগাকে হাতে রাখার জন্য বারংবার বিশাখাকে ব্যবহার করেছে। তবে বিশাখা নিজের ভাগ্যের সাথে আপোষ করে গুল্মের ন্যায় নিশিকে আঁকড়ে বেঁচে থাকাই শ্রেয় মনে করেছে। একদিকে নারী লোলুপতা, ধর্মের ভন্ডামী, অর্থের লোভ, সবকিছু মিলিয়ে নিশিকান্ত হয়ে উঠছে সত্যিকারের নক্র। যুদ্ধের বাজারে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় আড়তে ৮০০ মন চাল মজুত করে রেখেছে। বারো টাকা দরে কিনেছে, দাম বাড়লে ৪০ টাকা করে বিক্রি করতে পারবে।

> "বারো টাকা দরে কেনা, বর্ষার বাজারে অন্তত চল্লিশে ছাড়া চলবেই। দু চারজন লোক তো এর মধ্যেই আনাগোনা সুরু করেছে, মিলিটারীর কন্ট্রাক্ট নাকি পেয়েছে তারা; টাকার জন্যে আটকাবে না...।"[১৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাজারে বাংলার মহাজনরা কিভাবে আড়তে খাদ্যশস্য মজুত করে দেশে খাদ্যাভাবের সৃষ্টি করেছিল, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ এই গল্পটি। আড়তে প্রচুর চাল থাকা সত্ত্বেও বাজারে চালের আকাল পড়েছে। আসলে সমাজে না খেতে পাওয়া মানুষগুলো কি নিদারুণ যন্ত্রণাই না ভোগ করছে, তা নিশিকান্তের মতো চরিত্রদের চোখেই পড়ে না। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখতে পাই, সকল মহাজনেরা মিলে বিশাল আড়ম্বর করে হরিসভায় অষ্টপ্রহর কীর্তনের আয়োজন করেছে। বৈষ্ণব ভোজনের জন্য বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। আর সেই সময় আসর জমে আসতে না আসতেই ইউনিয়ন বোর্ডের চকিদার, মতি পাল ও তার স্ত্রীর মৃত্যু খবর নিয়ে এসেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিশিকান্তকে মড়া দেখার জন্য যেতে হয়। চৌকিদার নিশিকান্তকে জানায়, ক্ষুধার জ্বালায় অভুক্ত মতিপাল মাটি কামড়ে মারা গেছে। চালের আকাশ ছোঁয়া বাজারে সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে গ্রাসাচ্ছাদন যে কতটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ভাতের ফেনের জন্য যেখানে মানুষ শহরের নালার পাশে বসে থাকতো, সে জায়গায় ভিক্ষা দেওয়ারতো প্রশ্নই ওঠে না। এই অপ্রিয় সত্যটাই চৌকিদারের কণ্ঠে শোনতে পাই–

> "...না খেয়ে মরেছে। আগে ভিক্ষে করত, তিরিশ টাকা চালের বাজারে কে ভিক্ষে দেবে এখন? বৌটাও আর পেটের জ্বালা সইতে পারেনি, তাই গলায় দড়ি দিয়েই ঝামেলা মিটিয়েছে।"[১৭]

ক্ষুধার অসহ্যকর জ্বালায় কাতর গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের যে নিদারুণ বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই বিভীষিকাময়। দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন মতি পাল বারান্দায় পড়ে আছে। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অসহায় মতিপাল মাটি কামড়ে খেয়েছিল। বারান্দায় পড়ে থাকা মৃতদেহের মুখে কাদামাখা বমি লেগে আছে।

> "পেটের জ্বালায় দাওয়া থেকে বুঝি খানিকটা মাটি কামড়ে খেয়েছিল, একরাশ কর্দমাক্ত বমি গালের দুপাশে জমে রয়েছে। পুরো বত্রিশটা দাঁতই তার বেরিয়ে আছে...।পেটটা লেপ্টে রয়েছে পিঠের সঙ্গে; কালো কালো নগ্ন পা দুটোকে দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ-যেন ভূতের পা ।"[১৮]

আর তার চেয়েও মর্মান্তিক মতিপালের বউয়ের মৃত্যু দৃশ্য। সদর দরজা দিয়ে লন্ডনের আলো পড়তেই চমকে উঠে। লজ্জা নিবারণের শেষ আবরণটুকু গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলেছে—

> "শেষ সম্বল লজ্জাবাস দিয়েই গলায় ফাঁস পরিয়েছে— লণ্ঠনের আলোয় সেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অস্বাভাবিক নারীদেহটা একটা দানবীয় বিভীষিকা যেন।"[১৯]

আর এরজন্য দায়ী নিশিকান্তের মতো মুখোশধারী ভণ্ড চরিত্ররা। আড়তে চাল, কাপড়, ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলেও মনে মনে শুধু মুনাফার হিসাব করতে থাকে। মৃত্যু উপত্যকার বিভীষিকায় তাদের মনের বিকার নিবৃত্ত হয় না। ক্ষুধার্ত জন মানুষের হাহাকার তাদের বিশাল দালানের প্রাচীর ভেদ করতে পারেনি।

নিশির মত মানুষেরা নিজের ক্ষমতার জোরে সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অন্ন, তাদের জীবন, নিজের লোভের ভান্ডারে জমিয়ে রেখেছে। আশাহারা, ভাষাহারা, অসহায় জাতির কলঙ্ক সরূপ নিশিকান্তের মতো মহাজনেরা। গল্পে নিশিকান্ত নারকীয় মৃত্যু যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেছে খুব কাছে থেকে। তবুও তার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় না। আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের চরিত্ররা নিজের সামাজিক অবস্থানে অনড়। তাঁর নিম্নবর্গীয়রাও কোথাও বিশেষ একটা প্রতিবাদ করেনি। তাঁর আপাত নিরীহ চরিত্ররা ক্ষুধার জ্বালায় নির্বিকারে হাড় চুষেছে ডাস্টবিন থেকে তুলে, অথবা ভাগ্যের সাথে আপোস করে 'সুন্দরলাল' এর সাথে পাড়ী দিয়েছে অজানা অন্ধকার জগতে। এছাড়াও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পেও আমরা দেখি কিভাবে একটি শিশুকে বাঘের টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন রাজবাহাদুর। 'পুষ্করা' গল্পেও শিবা ভোগ খেয়ে ডোম পাড়ার পাগলি রাস্তায় পড়ে আছে। মূলত সমাজের সেই বিচ্ছিন্ন নগ্নরূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে নিম্নবর্গীয় চেতনার যে প্রবাহ দেখা যায়, তা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ দিক নির্দেশ করে। তাঁর রচনায় শহর ও গ্রামবাংলার প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাত্রা, সংগ্রাম, আনন্দ-বেদনা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উঠে এসেছে। তিনি সাধারণ মানুষের কথাই বলেছিলেন—যাঁদের অস্তিত্ব উচ্চবর্গের চোখে তুচ্ছ, অথচ যাঁরা সমাজের মূল চালিকাশক্তি। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নির্মম বাস্তবতা মূর্ত হয়ে উঠছে তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে। তাঁর চরিত্রেরা প্রায়ই অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার, কিন্তু তারা শুধুই করুণ নয়—তারা প্রতিবাদী, তারা নিজের মতো করে টিকে থাকার চেষ্টা করে। মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী লেখক নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের গভীরতর সংকট, অভাব, অসম্মান ও তাদের লড়াই করার অসামান্য মনোবলকে অত্যন্ত সংবেদনশীল দৃষ্টিতে দেখেছেন। মন্বন্তর এবং যুগের অবক্ষয় নিয়ে পরবর্তী সময়ে লেখকরা গল্প লিখলেও, তাঁর গল্প উত্তর কালের লেখকদের সর্বদাই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সেজন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজও পাঠক সমাজে অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদনা)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬, পৃ. ৫।
২. দে, সুধাংশু শেখর। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৫।
৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদনা)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬, পৃ. ২৩।
৪.তদেব, পৃ.২৮।
৫.তদেব, পৃ. ২৮।
৬.তদেব, পৃ. ২৯।
৭.তদেব, পৃ. ২৯।
৮. তদেব, পৃ. ৫১।
৯. তদেব, পৃ. ৫৪।
১০.তদেব, পৃ. ৫৭।
১১.তদেব, পৃ. ৫৮।
১২.তদেব, পৃ. ৩৬।
১৩. তদেব, পৃ. ৩৬।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৭।

১৬. তদেব, পৃ. ৪৬।
১৭. তদেব, পৃ. ৪৮।
১৮. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৯. তদেব, পৃ. ৪৯।

আকর গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদনা)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. অভিজিৎ (সম্পাদনা)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: ছোটগল্পের রূপকার। কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২রা এপ্রিল ২০১৫।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। সমগ্র কিশোর-সাহিত্য প্রথম খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮০।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 38- 46
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.177

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারী: এক বিশ্লেষণী পাঠ

অপরাজিতা ভট্টাচার্য, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 23.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Rabindranath Tagore's short stories, the figure of the protesting woman emerges as a powerful and contemporary theme. His female characters are not confined to traditional roles; rather, they challenge societal norms and assert their independence, dignity, and identity. Tagore presents these women as individuals with strong inner strength, consciousness, and the ability to think and act for themselves. The protest of women in Tagore's stories is not always external or loud. It often takes the form of silent resistance, inner confidence, and thoughtful defiance. These women reject the oppressive customs and expectations of a patriarchal society and seek to live life on their own terms. Their rebellion is deeply personal, reflecting a desire for self-respect and the right to make their own choices. Tagore's stories highlight two main aspects of women's protest: first, the struggle to protect their basic rights and self-respect, and second, the rejection of unjust social norms. Through this, he portrays a new vision of womanhood that is independent, intelligent, and emotionally strong. Several of his stories showcase these themes. In StrirPatra, Mrinal leaves her husband's house, refusing to accept the hypocrisy and oppression of upper-caste society. In Denapaona, the evils of the dowry system are exposed, where women suffer due to material demands. Haimanti criticizes the traditional marriage system and highlights the emotional suffering of a sensitive and educated woman. Shasti shows a woman who silently accepts injustice rather than support a false social order. Stories like 'Dui Bon', 'Mahamaya', 'Laboratory' depict women who assert their own choices, values, and self-worth. Tagore does not limit his female characters to domestic roles. He presents them as full human beings with dreams, thoughts, and inner power. His belief that "women's liberation will come one day; she will open her own path" reflects his progressive vision. These protesting women are not just characters—they represent a new beginning, a challenge to patriarchal society, and a step toward gender equality. Tagore's portrayal of the protesting woman is both a literary and social statement. It marks the rise of a new consciousness where women are not only resisting oppression but also redefining their place in society with confidence and dignity.

Keywords: Women protest, Liberation, Domestic roles, Gender Equality

প্রতিবাদ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেখানে লুকিয়ে থাকে অধিকার আদায় তথা নিজের সম্মানের জন্য তীব্র লড়াই। সমাজে যখন তীব্র অবিচার, শোষন, অন্যায় দীর্ঘদিন ধরে চলে তখন তা কলুষমুক্ত করার জন্য চলে এই প্রতিবাদ। প্রতিবাদ হলো অন্যায়, অবিচার বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ, প্রতিরোধ বা পরিবর্তনের প্রয়াস। এটি সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত বা সাংস্কৃতিক যে কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রতিবাদ শুধু উচ্চস্বরে বিরোধিতা করা নয়, এটি হতে পারে নীরব প্রতিরোধ, লেখনী, শিল্পকর্ম, সংগঠিত আন্দোলন বা ব্যক্তিগত অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে। মানুষের চেতনা ও বিবেকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ধারণাও বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায়, রাজতন্ত্র, উপনিবেশবাদ, লিঙ্গবৈষম্য, শ্রেণি-বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই সমাজে পরিবর্তন এনেছে। কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে, কখনো সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে, কখনো আবার সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম বা গণআন্দোলনগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রতিবাদের নানাবিধ রূপ দেখতে পাই। প্রতিবাদ শুধু বিদ্রোহ নয়, এটি পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করে। সমাজের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতার সৃষ্টি করে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মনোবল বাড়ায়। পুরুষ প্রধান সমাজে আজও নারীরা অবহেলিত। কিন্তু অবহেলিত, নির্যাতিত হতে হতে যখন তাদের সহনশীলতা কমে যায় তখনই তারা হয়ে উঠে প্রতিবাদীমুখর। নারীরা কারোর দাসী নন, তারা সমাজের বোঝা নন, তারা অবহেলার পাত্রী নন, তাদেরও আছে মন, তাদেরও নিজেদের পরিবারের জন্য মন কাঁদে, তাদেরও ইচ্ছে হয় কথা বলার, কিন্তু তাদের মুখ ফুটে কথা বলার কোনো জো থাকে না। তাদের কথা শোনার মতো কেউ থাকে না। সিমোন দ্য বোভোয়া তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন-

“কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে গড়ে তোলে।”[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারীদের উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক। উনিশ শতকের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা যখন অবদমিত, তখন রবীন্দ্রনাথের গল্পে তাদের দৃঢ় অবস্থান এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তাঁর লেখায় নারীরা শুধু পুরুষের অনুগামী নয়, বরং সমাজের নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীর প্রতিবাদ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক পর্যায়ে বিভক্ত। নারী জাতির প্রগতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি ছোটগল্পে সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নারী প্রতিবাদের গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘দেনাপাওনা’, ‘হৈমন্তী’, ‘শাস্তি’, ‘মহামায়া’ ‘ত্যাগ’ ইত্যাদি।

‘দেনাপাওনা’ গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। প্রথম ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে পণপ্রথার বিরুদ্ধে একটি অসাময়িক লড়াইয়ের রূপ ফুটে উঠেছে। সমাজে পণপ্রথার বিরুদ্ধে যে লড়াই এবং বিষময় বেদনার রূপ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে বিয়ে প্রথার সাথে জড়িত সামাজিক অসংগতি, যৌতুকপ্রথার নিষ্ঠুরতা এবং নারীর দুরবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের সমাজে আজও অনেক জায়গায় যৌতুকের শিকার হতে হয় বহু নারীকে। ঠিক তেমনি শিকার হতে হয় রবীন্দ্রনাথের নিরুপমাকে। পাঁচ ছেলের পর এক মেয়ে হওয়ায় খুব খুশি রামসুন্দর এবং তার স্ত্রী। আদরে সোহাগে বড়ো করতে লাগলা নিরুপমাকে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা মায়ের তার বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য। অনেক চেষ্টার ফলে রামসুন্দর তার মেয়ের বিয়ে দেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অনেক যৌতুকের বিনিময়ে। গল্পে নিরুপমার শ্বশুর রায়বাহাদুরকে একজন লোভী, শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিরুপমার বাবা মেয়ের বিয়ের জন্য তার শেষ সম্বল ভিটে মাটি পর্যন্ত বন্ধক দিয়েছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও সামান্য টাকার লোভে নিরুপমার শ্বশুর এবং শাশুড়ি তাকে অকথ্য কথা শোনাতে শুরু করল। বিয়ে হয়ে আসার পর যখন নিরুপমার শশুড়বাড়ির আত্মীয়রা যখন বলে-

“আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।”[২]

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার শাশুড়ি বলে উঠে-

“শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।”[৩]

অপমানে, নীপিড়নে লাঞ্ছিত হয়ে একদিন নিরুপমা তার বাবাকে কাতর কণ্ঠে বলে উঠে-

> "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"[৪]

নিরুপমার মতো মেয়েকে সমাজের অর্থপিপাসু মানুষ কোনোভাবেই বাঁচতে দেয়না। তাই নিরুপমাও নিজের আত্মবলিদানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। সেও আর চুপ থাকতে পারেনি, পিতার অপমানের প্রতিবাদ করেছে। এরকম প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই বিরল। প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নিরুপমা তার নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের মধ্যে নিরুপমার তীব্র প্রতিবাদের কথা তুলে ধরেছেন।

> "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না।"[৫]

সমাজে অনেক নিরুপমারা আছেন যারা পণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে নিজের প্রাণবিসর্জন দিয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়ায়। নিজের নাম এবং নিজের পরিবারের নাম উজ্জ্বল করে। কিন্তু সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে একদিন নীরবে তাদের চলে যেতে হয় বহুদূরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পটি সামাজিক অন্যায়, আইনের অন্ধত্ব এবং নারীর অসহায় অবস্থানকে গভীরভাবে তুলে ধরে। গল্পটি একদিকে যেমন বাস্তবতার নির্মম চিত্র তুলে ধরে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের মনস্তত্ত্ব ও সমাজের মূল্যবোধের অসারতাকেও প্রকাশ করে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুই ভাই— দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই। তারা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং গ্রামীণ জীবনের চাপে প্রতিনিয়ত ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। গল্পের সূচনাতেই এই দুই ভাই কাজ শেষে বাড়ি ফিরে দেখে, তাদের জন্য খাবার তৈরি হয়নি। এতে দুখিরাম অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে রাগের বশে তার স্ত্রী রাধাকে দা'র আঘাতে হত্যা করে। এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের পর দুই ভাই ভয় পেয়ে যায় এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে ছিদাম এক চতুর পরিকল্পনা করে। সে সিদ্ধান্ত নেয়, যদি তার স্ত্রী চন্দরা মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেয় যে সে-ই রাধাকে হত্যা করেছে, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে। ছিদাম বলে—

> "স্ত্রী তো আবার পাওয়া যাবে, কিন্তু ভাই পাওয়া যাবে না।"[৬]

এই উক্তিটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক চিহ্নিত করে, যেখানে নারীর মূল্য একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়। চন্দরা প্রথমে হতবাক হলেও পরে স্বামীর কথায় রাজি হয়, কারণ সে ভাবে, সামান্য সাজা হলেও হয়তো তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরিস্থিতি তার ধারণার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আদালতে যখন বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন, তখন সে আর কোনো আশা খুঁজে পায় না। সেই মুহূর্তে তার ভেতর থেকে সত্য উচ্চারিত হয়—

> "ভাই, আমায় তুমি বাঁচাও। আমি যা বলেছি, তা সত্য নয়।"[৭]

কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিল না। আইনের নিষ্ঠুর নিয়ম এবং সমাজের নির্মমতা চন্দরার জন্য মৃত্যুকে অবধারিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন, কীভাবে সমাজের চোখে নারী শুধু একজন অধীনস্থ ব্যক্তি, যার জীবনের মূল্য তার স্বামীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ছিদামের কাছে ভাইয়ের জীবন রক্ষার চেয়ে চন্দরার জীবন কোনো গুরুত্বই রাখে না। গল্পটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নির্মম বাস্তবতা তুলে ধরে। চন্দরা শুধুমাত্র একজন নারী হওয়ার কারণে সহজেই বলির পাঁঠা হয়ে যায়, অথচ প্রকৃত দোষী দুখিরাম শাস্তি পায় না। এখানেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের গভীরতা— তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে সমাজে সত্য চাপা পড়ে এবং ক্ষমতাহীনরাই সবসময় শাস্তি পায়।

'শাস্তি' গল্পটি কেবল একটি হত্যাকাণ্ড বা ভুল বিচার নিয়ে লেখা নয়, এটি এক ভয়ঙ্কর সামাজিক বাস্তবতার গল্প। এখানে নারীর প্রতি সমাজের অবিচার এবং আইনের অন্ধত্ব একসঙ্গে মিলে চন্দরার করুণ পরিণতি নির্ধারণ করে। চন্দরার শেষ আর্তনাদ—

"আমি যা বলেছি, তা সত্য নয়"- শুধু গল্পের শেষ লাইন নয়, এটি সমাজের প্রতি এক চিরস্থায়ী অভিযোগ।

নারী নিপীড়নের আরও একটি গল্প 'হৈমন্তী' (১৯১৪)। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় সবুজপত্র পত্রিকায়। সৎ, আদর্শবাদ ব্যক্তি গৌরীশঙ্করের একমাত্র মেয়ে হৈমন্তী। খোলামেলা নির্ভেজাল পরিবেশে জন্ম হয় তার। তার বিয়ের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত। বাবা মায়ের আদুরে হওয়ায় তার বাবা ঠিক করলেন সঠিক পাত্রের হাতেই তাকে দিবেন। কিন্তু সমাজের

অমোঘ পরিহাস তাকে সমাজে আর টিকে থাকতে দেয় নি। পুরুষশাসিত সমাজে তার বয়স একটু বাড়তি হওয়াতে তাদের প্রায় একঘরে দেওয়ার মতো অবস্থা।

> "...মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমের বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেজন্যই তাড়া।"[৮]

নারী অবমাননার বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদী গল্প এটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তীর বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও পণের টাকার লোভে পাত্রের বাবা পাত্রের সাথে তার বিয়ে দেন। হৈমন্তীর সতেরো বছর বয়সটাই তার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গৌরীশঙ্করবাবুর লাখ টাকার গুজবের পরিবর্তে অপুর মা বাবা যখন জানতে পারল যে হৈমন্তীর বাবা ধারদেনায় লিপ্ত হয়ে, আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত হয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ঠিক তখন থেকে হৈমন্তীরও তার শ্বশুরবাড়িতে শুরু হয় অপমান, লাঞ্ছনা। আত্মীয়রা যখন তার বয়স জিজ্ঞাসা করল তখন সে নির্দ্ধিধায় সত্যি কথাই বলেছে। এই নিয়েই অশান্তি শুরু হয় তার শ্বশুর বাড়িতে। অপুর মা সকল আত্মীয়ের সামনে বলে উঠলেন-

> "তোমার বাবা যে বলিলেন তোমার বয়স এগারো।"[৯]

হৈম কোনো অবস্থাতেই তার বাবার অপমান সহ্য করতে পারল না। হৈম প্রতিবাদে কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে বলল-

> "বাবা বলিয়াছেন? কখনো না। ... আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"[১০]

হৈমর পিতা ছিল খুব শিক্ষিত, তাই পিতার সেই গুণ হৈম নিজেও আয়ও করেছে অনায়াসেই। এই সুশিক্ষার জন্যই হৈমর মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই তাকে সামজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলে। কিন্তু পিতার মতো এমন বলিষ্ট, দৃঢ়, ন্যায়পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও সমাজের পরিহাসে তাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। তার পিতা তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে দেখতে আসতে গেলে সে অভিমান করে তার পিতাকে বলে-

> "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এই বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"[১১]

উক্তিটির মধ্যে হৈমর বাবার প্রতি ঘভীর আর্তনাদ, তার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির প্রতি জোর প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গল্পে একদিকে যেমন যৌতুকের বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে হৈমন্তীর তীব্র প্রতিবাদী সত্ত্বা প্রকাশ করেছেন, ঠিক অন্যদিকে হৈমন্তীর উপর তার শ্বশুরবাড়ির মানুষের অত্যাচারের প্রতি অপুর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হৈমন্তী আসলে একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ। 'হৈমন্তী' শুধুমাত্র এক ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি সমগ্র বাঙালি সমাজের এক দুঃখজনক বাস্তবতাকে তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং সমাজের কূপমণ্ডূকতা ভেঙে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিও নারীর অবমাননা ও অপমানের জন্য হওয়া তীব্র প্রতিবাদের একটি করুণ কাহিনি। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে যে রয়েছে সে হলো মৃণাল। তাকে ঘিরেই গল্পটি প্রাণস্পন্দন লাভ করেছে। পুরুষশাসিত সমাজ কোনোভাবেই একজন বন্ধ্যা নারীকে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না। তারপরও সে বিন্দুকে পেয়ে তাঁর সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু যখন বিন্দু আত্মহননের পথ বেছে নিল তখন কোনোভাবেই মৃণাল আর চুপ করে থাকতে পারল না, সেখানেই সে প্রতিবাদ জানালো।

> "মৃণাল আগাগোরা বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। এই বিদ্রোহ স্বামীর পরিবারের নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি রুগ্ন মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধেও। বিন্দুর প্রতি সকলের অমানবিক ব্যবহার দেকে মৃণাল মধ্যযুগীয় মূল্যবোধহীন সমাজের চেহারাটা উপলব্ধি করেছে। এইজন্য সবরকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ। মৃণাল বিন্দুকে দেখে উপলব্ধি করেছে সংসারে নাড়িদের অবস্থান কোথায়! এইজন্যই পত্নীত্ব থেকে নারীত্বের মহিমায় তার মুক্তিসন্ধান।"[১২]

গল্পের মুখ্য চরিতে মৃণাল, যে তার স্বামীকে উদ্দ্যেশ্য করে চিঠি লেখেন। এই চিঠির মাধ্যমেই তিনি তার অন্তরের দুঃখ, বেদনা এবং অবদমিত কষ্ট প্রকাশ করেন। চিঠিটি তার জীবনের এক দীর্ঘ যন্ত্রণার স্বীকারোক্তি, যেখানে তিনি বুঝতে পারেন, এতদিন তিনি সংসারে থেকেও কেবল এক বন্দী নারী ছিলেন। মৃণালের প্রতিবাদিনী সত্ত্বা তখনই জেগে

উঠে যখন তার বিন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বিন্দু আসলে তার শ্বশুড়বাড়ির দিকের পরিচিত। গল্পের আগাগোড়াই দেখা যায় নারীর প্রতি সমাজের প্রতিমূর্তি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীর প্রতি অবমাননা এবং এসবের বিপরীতে ফুটে উঠেছে নারীর প্রতিবাদীস্বরূপ। বিন্দুর বিয়ে যখন তারা একটি পাগল ছেলের সঙ্গে দেয় তখন সে সেই পাগল ছেলের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বিন্দুর কাছে মনে হয়েছিল এটাই তার একমাত্র পথ। কারণ সমাজের একঘেয়েমি বাঁধা ধরা নিয়মকে সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি, তাই সে প্রতিবাদ করেছে। তার এই প্রতিবাদ তাকে অনন্তলোকের সন্ধান দিয়েছে, সে-ও মোক্ষ প্রাপ্তি লাভ করেছে। সে বিষয়ে মৃণাল প্রতিবাদ করে জানায়-

> "মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান – সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।"[১৩]

বিন্দুর মৃত্যু যেন মৃণালের চোখ খুলে দেয়। এতদিন তিনি সংসারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকলেও এবার তিনি বুঝতে পারেন, সংসার আসলে তার জন্য নয়। স্বামী-সংসার-সমাজ এই তিনটি বাঁধনকে অস্বীকার করেই তিনি শ্রীক্ষেত্রে চলে যান। গল্পের শেষে পত্র মারফৎ মৃণাল শিশিরকে জানায় সে আর ফিরে আসবে না। শ্রীক্ষেত্রে এসে সে নিজেকে মুক্ত মনে করছে। তার চিঠির শেষ লাইনটি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

> "তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। ... এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।"[১৪]

এই বাক্য একজন নারীর স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা, যেখানে তিনি আর পুরুষশাসিত সমাজের নিয়ম মেনে চলতে রাজি নন। এই গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী-মনস্তত্ত্বের এক অনন্য বিশ্লেষণ। মৃণালের চরিত্রটি কেবল একজন বিদ্রোহী নারী নয়, বরং প্রতিটি নারীর অবদমিত সত্ত্বার প্রতিচ্ছবি। সমাজ যেভাবে নারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই এই গল্পের মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এখানে নারীর স্বনির্ভরতা এবং স্বাধীন সত্ত্বাকে তুলে ধরেছেন, যা তাঁর সময়ের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। গল্পটি প্রমাণ করে, নারী শুধু সংসারের অলঙ্কার নয়, সে একজন স্বতন্ত্র সত্ত্বাও বটে।

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা হিসাবে প্রজ্জ্বলিত আরও একটি গল্প 'ত্যাগ'। গল্পটির প্রকাশসাল **১২৯৯** বঙ্গাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'ত্যাগ' শুধুমাত্র প্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনি নয়, এটি সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক নীরব অথচ গভীর প্রতিবাদ। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার সংকীর্ণ পরিসর, সামাজিক অনুশাসনের নির্মমতা এবং নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে যে নিঃশব্দ বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে, তা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। হেমন্ত ও কুসুমের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কিভাবে সমাজের কঠোর অনুশাসন ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করে, কিভাবে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা সামাজিক শৃঙ্খলার ভারে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়, এবং কিভাবে নীরব ত্যাগ ও আত্মসম্মানের মধ্যে এক ধরনের প্রতিবাদ নিহিত থাকে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেমন্ত ছোটবেলা থেকেই তার বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে কখনো মিথ্যা বলবে না। এই সত্যনিষ্ঠার চর্চা একসময় তার জীবনে এক গভীর সংকট তৈরি করে। যখন তার মা জানতে চান, সে কুসুমকে ভালোবাসে কিনা, তখন সে সত্য উচ্চারণ করতে পারে না। তার মানসিক টানাপোড়েন স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের লেখায়—

> "হেমন্ত বলিতে পারিল না, কুসুম এতিম, কিন্তু আমি তাহাকে ভালোবাসি।"[১৫]

এখানেই দেখা যায়, সমাজের বিধিবিধান কিভাবে একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সত্য প্রকাশ থেকে বিরত রাখে। যে সত্যকে রক্ষার জন্য হেমন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, সেই সত্যই একসময় তার প্রতিবাদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটি এক দ্বৈত সংগ্রাম—একদিকে আত্মিক সত্য, অন্যদিকে সামাজিক সত্য। এই গল্পে হেমন্তের প্রতিবাদ দুটি স্তরে ঘটে। প্রথমত, সে সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে তার অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারলো না। দ্বিতীয়ত, তার মৌনতা এবং মানসিক দ্বন্দ্বই একপ্রকার প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। সে কথা না বলে, নিজের অনুভূতিকে দমন করে, কিন্তু তার যন্ত্রণার মধ্যে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিক্রিয়া লুকিয়ে থাকে।

গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে কুসুমের চরিত্রে। সে সমাজের কাছে অবহেলিত, কিন্তু তার আত্মসম্মান দৃঢ়। সে কারও করুণার পাত্র হতে চায় না, এমনকি হেমন্তের ভালোবাসাও সে ভিক্ষার মতো গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। যখন সে বুঝতে পারে, হেমন্তের মা তাকে মেনে নেবেন না এবং হেমন্ত নিজেও নিজের অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, তখন সে নিজেই সরে যায়।
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"যারে তুমি ত্যাগ কর, সে তোমাকে ত্যাগ করে না।"[১৬]

এই লাইনটি কুসুমের প্রতিবাদের সারাংশকে তুলে ধরে। সে বিদ্রোহ করেনি, উচ্চবাক্য বলেনি, কিন্তু তার চলে যাওয়াই এক শক্তিশালী প্রতিবাদ। সে জানে, ভালোবাসা যদি সামাজিক স্বীকৃতি না পায়, তবে সেটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে কাউকে দোষারোপ না করেই সরে যায়, কিন্তু তার এই নীরব চলে যাওয়াই সমাজের অনুশাসনের প্রতি এক তীব্র প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

'ত্যাগ' গল্পে নারীর অবস্থানের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের সময়ের সামাজিক কাঠামোর এক নির্মম বাস্তবতা। কুসুম শুধুমাত্র একজন এতিম বলেই নয়, একজন নারী বলেও সে সামাজিকভাবে দুর্বল। তার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই, তার মতামত বা ইচ্ছাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীর অবস্থানের বিরুদ্ধে এক সুক্ষ্ম প্রতিবাদ গেঁথেছেন। কুসুমকে সমাজ মেনে নেবে না, কারণ সে উচ্চবংশজাত নয়, তার সামাজিক পরিচয় নেই। কিন্তু কুসুম তার আত্মমর্যাদার সঙ্গে কোনো আপস করেনি। সে জানে, সমাজের কাছে সে উপেক্ষিত, কিন্তু সে কারও দয়া বা করুণা প্রত্যাশা করেনি। বরং সে নিজের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়েছে আত্মসম্মানের জন্য।

গল্পের শেষে দেখা যায়, হেমন্ত এক গভীর মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। সে কুসুমকে হারানোর কষ্ট সহ্য করতে পারে না, কিন্তু তার সামনে কোনো উপায়ও খোলা থাকে না। সমাজের কঠোর বিধান ও পারিবারিক শৃঙ্খল তাকে যে বন্ধনে আটকে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে সে সরাসরি বিদ্রোহ করতে পারেনি, কিন্তু তার অন্তরের যন্ত্রণা তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কখনো কখনো প্রতিবাদ সরাসরি হয় না, কিন্তু তার অভিঘাত গভীর হয়। হেমন্ত ও কুসুমের ত্যাগ কেবল ভালোবাসার বিসর্জন নয়, সমাজের রূঢ়তার বিরুদ্ধে এক নীরব অথচ তীব্র প্রতিক্রিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ত্যাগ' গল্পে প্রতিবাদের বহুমাত্রিক রূপ দেখা যায়— সত্যের প্রতি নিষ্ঠার বিরুদ্ধে সামাজিক শৃঙ্খলার দমন, ভালোবাসার স্বীকৃতির প্রশ্নে পারিবারিক বিধিনিষেধের কঠোরতা, নারীর আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, এবং সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধ। হেমন্ত ও কুসুম— দুজনেই নিজের মতো করে প্রতিবাদ করেছে, কেউ কথা বলে, কেউ চুপ থেকে। কিন্তু তাদের এই আত্মত্যাগ কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং তা বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক অনুচ্চারিত বিদ্রোহ। এই গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, এখানে কোনো সরাসরি বিদ্রোহ নেই, তবুও প্রতিটি চরিত্রের সিদ্ধান্তই এক ধরনের প্রতিবাদ বহন করে। সমাজের নিয়ম, পারিবারিক শৃঙ্খলা, নারীর অবস্থান— এসবের বিরুদ্ধে এই নীরব সংগ্রামই ত্যাগ গল্পের মূল আবেদন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী প্রতিবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আরেকটি ছোটগল্প 'মহামায়া'। গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহামায়া' গল্পটি এক সংগ্রামী নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাহিনি, যেখানে সমাজের কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এক নারীর নীরব কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। মহামায়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঠাকুর দেখিয়েছেন কীভাবে এক নারী নিজের জীবনকে আত্মসম্মানের সঙ্গে গড়ে তুলতে পারেন, এমনকি যদি সমাজ তার বিরুদ্ধে থাকে।

গল্পের মূল চরিত্র মহামায়া এক ব্রাহ্মণ কন্যা, যার জীবনকে পারিবারিক এবং সামাজিক নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, বিধবা মহিলাদের জন্য কঠোর নিয়ম আরোপ করা হতো, যা নারীর জীবনকে নিষ্প্রাণ ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের এক প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থাপন করত। মহামায়ার স্বামী অল্প বয়সেই মারা যাওয়ায় তাকে বিধবার জীবন বেছে নিতে বাধ্য করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তার বর্ণনার সঙ্গে তার ব্যাক্তিত্বকে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

> "যেন শরতকালের রৌদ্রের মতো কাচাসোনার প্রতিমা- সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ মহামায়ার চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী প্রতিবাদ।

মহামায়ার প্রতিবাদ শুরু হয় তার আত্মমর্যাদাবোধ থেকে। সে কেবল বিধবা হওয়ার কারণে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া কঠোর নিয়ম মেনে নিতে চায় না। তার মনোবল এবং আত্মসম্মানের প্রকাশ দেখা যায় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায়। যখন সমাজ তাকে পরাধীন করে রাখতে চায়, তখন সে নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে। এ প্রসঙ্গে গল্পের একটি উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ:

> "মহামায়া যখন বিধবা হইল, তখন তাহার সমস্ত জীবন যেন শ্মশানবাসের জন্য প্রস্তুত হইল।"[১৮]

এই শ্মশানবাসের বিপরীতে মহামায়া জীবনের অন্য এক বাস্তবতাকে গ্রহণ করে, যেখানে সে নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়ে দেয়।

মহামায়ার প্রতিবাদ সরাসরি কোনো সশব্দ বিদ্রোহ নয়, বরং এক নিশ্চুপ অথচ সুস্পষ্ট অবস্থান। সে সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি রুখে দাঁড়ায় না, কিন্তু নিজের জীবনকে যেভাবে পুনর্গঠন করে, সেটাই তার বৃহত্তর প্রতিবাদের রূপ। তার জীবনে পরবর্তীতে নতুন প্রেমের সম্ভাবনা আসে, কিন্তু সমাজ সেই ভালোবাসাকে অনুমোদন দেয় না। প্রেমের এই নতুন অধ্যায়ে মহামায়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দৃঢ়তা আরও স্পষ্ট হয়। যখন প্রেমিক তাকে নিতে আসে, তখন সে সহজে আত্মসমর্পণ করে না; বরং পরিস্থিতির গভীরতা অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত নেয়। মহামায়ার প্রতিবাদের আরেকটি দিক হলো তার আত্মমর্যাদাবোধ। সে জানে, তার অস্তিত্বের মূল্য শুধু সামাজিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। গল্পে বলা হয়েছে,

> "সে কেবল বিধবা নয়, সে একজন মানুষ, যে নিজের ইচ্ছামতো বাঁচতে চায়।"[১৯]

এই বাক্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে মহামায়া একজন নারীর প্রতীক, যে নিজের জীবনকে স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে চায় এবং যে কেবল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি ছায়া হয়ে থাকতে রাজি নয়।

গল্পের শেষ দৃশ্য মহামায়ার প্রতিবাদের এক অমোঘ প্রতীক। সে যখন নদীর স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন তা নিছক আত্মসমর্পণ নয়; বরং সমাজের রূঢ়তার বিরুদ্ধে তার চূড়ান্ত প্রতিবাদ। এই দৃশ্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কখনও কখনও নীরব আত্মত্যাগও এক প্রকারের প্রতিবাদ হতে পারে। তার এই ত্যাগ কেবল ব্যক্তি মহামায়ার নয়, বরং পুরো নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহ। মহামায়ার এই প্রতিবাদ শুধুমাত্র নারী সমাজের পক্ষে নয়, এটি সামগ্রিকভাবে এক অনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ সমাজের নিষ্ঠুরতার কথা ব্যক্ত করেছেন মহামায়ার জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে।

> "সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না, সমাজ তাহাকে মন্দ বলিবে, কিন্তু মহামায়া তাহার আত্মার গরিমা বুঝিতে পারিয়াছে।"[২০]

এই কথাগুলো মহামায়ার প্রতিবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ, যেখানে সে সমাজের মানদণ্ডকে তুচ্ছ করে নিজের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ 'মহামায়া' গল্পে শুধুমাত্র এক নারীর ব্যক্তিগত দুঃখগাঁথা বলেননি, বরং এটি এক বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার দিকেও ইঙ্গিত করে। মহামায়ার চরিত্রের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে সমাজ যদি নারীর প্রতি অবিচার করে, তবে নারী নিজেই নিজের অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। তার প্রতিবাদ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সার্বজনীন।

সুতরাং, 'মহামায়া' গল্পে প্রতিবাদ এক বহুমাত্রিক রূপে প্রকাশ পেয়েছে— নারীর আত্মমর্যাদা, ভালোবাসার স্বাধীনতা এবং সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে এক অন্তর্নিহিত বিদ্রোহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গল্প শুধু মহামায়ার একক সংগ্রামের কাহিনি নয়, এটি সামগ্রিকভাবে নারীর সামাজিক অবস্থান ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দলিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীদের আত্মসম্মান তথা মূল্যবোধ নিয়ে ছিলেন ওয়াকিবহাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারীদের উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি নারীদের কেবল করুণার পাত্র হিসেবে দেখাননি, বরং তাদের ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সাহিত্যে গুরুত্ব দিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়-

> "স্ত্রী জাতিরও যদি সেই স্বপরিচয় না থাকত তাহলে কেবলমাত্র পুরুষতান্ত্রিকতার অত্যাচার সহনে করুণার পাত্র হিসেবে তাদের কোনো অস্তিত্ব এতদিন টিকে থাকত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে, উপন্যাসে বিশেষ্করে ছোটগল্পে নারীর এই স্বকীয়তাকে, সৃষ্টিতে প্রতিরোধে বিরোধে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বারে বারে তুলে ধরেছেন।"[২১]

তাঁর ছোটগল্পের নারীরা সমাজের বেঁধে দেওয়া সীমানার বাইরে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের সন্ধান করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে এবং কখনো প্রকাশ্য, কখনো নীরব প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়। এই প্রতিবাদ কখনো ব্যক্তিগত, কখনো সামাজিক, আবার কখনো নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্রোহী, কেউ ধৈর্যশীল, কেউ যুক্তিবাদী, আবার কেউ বেদনাহত কিন্তু সচেতন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল নিজের স্বাধীন সত্তাকে উপলব্ধি করে এবং সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে সংসার ত্যাগ করে। 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমা শ্বশুরবাড়ির অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও সমাজের কঠিন বাস্তবতার কারণে তার প্রতিবাদ আত্মহননের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নন্দিনী পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান দৃঢ় করে তোলে, যেখানে সে নিজেকে শুধু একজন পুরুষের স্ত্রী বা সঙ্গিনী হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না, বরং তার নিজস্ব যোগ্যতা দ্বারা নিজের জীবনকে গড়ে তোলে। এই গল্পগুলোর নারী চরিত্রদের প্রতিবাদ কেবল সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে নয়, এটি আত্মপ্রতিষ্ঠারও লড়াই। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন, নারীর প্রতিবাদ মানেই সর্বদা বিদ্রোহ নয়, বরং এটি হতে পারে আত্মসচেতনতার প্রকাশ, যা ধাপে ধাপে সমাজ পরিবর্তনের পথে নিয়ে যেতে পারে। তাঁর সাহিত্যে নারীর প্রতিবাদ কখনো প্রেমের মোড়কে, কখনো বুদ্ধির পরীক্ষায়, কখনো বা চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থান ও চিন্তাভাবনার বদল ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের এই প্রতিবাদী নারীরা আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁদের সংগ্রাম, আত্মসম্মানবোধ এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দৃঢ়ভাবে নিজের অবস্থান ধরে রাখার প্রচেষ্টা আজকের সমাজেও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। তাঁর সাহিত্যে নারীর প্রতিবাদ শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির সন্ধান নয়, এটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত বহন করে। তাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের এই নারীরা শুধু সাহিত্যের চরিত্র নয়, বরং তারা সময়ের চেয়েও অগ্রসর এক চেতনার প্রতিনিধি, যারা আজও আমাদের ভাবতে শেখায়, প্রশ্ন তুলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজের অবস্থান খুঁজে নিতে অনুপ্রাণিত করে।

তথ্যসূত্র:

১. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৩।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১১।
৩. তদেব, পৃ. ১২।
৪. পাল, অরূপ ও দাস, নিত্যানন্দ। বাংলা ছোটগল্পে বৈচিত্রের সন্ধান পাঠকের দৃষ্টিতে। পত্রলেখা, এপ্রিল ২০২২, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২৭।
৫. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৪৫।
৬. মজুমদার, সমরেশ। রবীন্দ্রনাথের গল্প বিশ্লেষণী পাঠ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৯০।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১৩৫।
৮. তদেব, পৃ. ৪৮২।
৯. তদেব, পৃ. ৪৮৩।
১০. তদেব, পৃ. ৪৮৪।
১১. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৪২।

১২. ঘোষ, তপোব্রত। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ। দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৩৯৭, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৭।
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ৫০০।
১৪. তদেব, পৃ. ৫০১।
১৫. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৬৩।
১৬. তদেব পৃ. ৬৪।
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১১০।
১৮. তদেব, পৃ. ১১১।
১৯. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৮২।
২০. তদেব, পৃ. ৮৪।
২১. মিত্র, জয়া। নারীর মর্যাদার জন্য তাঁর আজীবন লেখার লড়াই। দেশ, ১৫মে ১৯৯৯, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৬৪।

আকর গ্রন্থ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬।

সহায়কগ্রন্থ:

১. ঘোষ, তপোব্রত। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ। দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৩৯৭, কলকাতা ৭০০০৭৩।
২. দত্ত, ড. সঞ্চারী (মিত্র)। রবীন্দ্র-গল্পে আধুনিক নারী, সোনার তরী। নভেম্বর ২০০৬, কলকাতা-৯।
৩. পাল, অরূপ ও দাস, নিত্যানন্দ। বাংলা ছোটগল্পে বৈচিত্রের সন্ধান পাঠকের দৃষ্টিতে। পত্রলেখা, এপ্রিল ২০২২, কলকাতা ৭০০০০৯।
৪. ভট্টাচার্য, সুতপা। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারী এবং মুশায়ের। জুলাই ২০১১, কলকাতা ৭০০০৭৩।
৫. মজুমদার, সমরেশ। রবীন্দ্রনাথের গল্প বিশ্লেষণী পাঠ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা ৭০০০০৯।
৬. মিত্র, জয়া। নারীর মর্যাদার জন্য তাঁর আজীবন লেখার লড়াই। দেশ, ১৫মে ১৯৯৯, কলকাতা ৭০০০০৯।
৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৮২, কলকাতা ৭০০০৭৩।
৮. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 47- 53
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.178

বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়': ভূগোলের চোখে

সৌম্য ঘোষ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.08.2025; Accepted: 26.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

'Chander Pahar' of Bibhutibhushan Bandopadhyay is not only an 'adventure-literature'. The topic of Geography has gained great importance here in two ways: Directly and Indirectly. The map of Africa, tribes,mysteries are all part of direct geography. In the context of indirect geography, there is a sense of existentialism. ''Chander Pahar'' transcends of Direct geography and Indirect geography and explores an abstract geography. This view of geography does not match the view of colonialism. Bibhutibhushan has tried to reach at this through an existential opposition. Here, 'Abstract geography' deals with 'possibility', myth, deviations from reality. Bibhutibhushan has therefore paid off loans of colonialism through this 'Abstract Geography' in 'chander Pahar'. There has also been a change in the thinking of Geography. Geography has been reconstructed through the conflict of essence. Hero of this novel has followed, rejected and then constructed geography.

Keywords: Direct and indirect geography; Dasein; Abstract geography; pay off loans of colonialism; 'possibility' and 'impossibility' in Geography

এক

'ভূগোল' পৃথিবীর বর্ণনামাত্র নয়, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে অন্ধকার মহাবিশ্বে জানার সীমানা বিস্তৃত করে চলেছে 'ভূগোল'। একটি স্থানের সঙ্গে অন্য একটি স্থানের সম্পর্কের ব্যাপ্তি ভূগোলের স্থূলতম উদাহরণ। মানব মনের অবস্থা প্রতিমুহূর্তে যখন পরিবেশ কর্তৃক পরিবর্তিত হচ্ছে, তখনও ভূগোল এসে দাঁড়ায়। কোনো পরিবেশের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে অভিযোজিত হওয়া এবং বেড়ে ওঠার মধ্যে ভূগোল এবং মানব-চিন্তনের ইতিহাস গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। মনে পড়ে, "হীরামানিক জ্বলে"-র মধ্যে রজনীকান্ত বসুর উক্তি,

> "... আপনাদের পূর্বপুরুষে এটা পেলেন কি করে? এ হলো সমুদ্রপাড়ের জিনিস। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের আমগাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার — কিন্তু এ সীলমোহরের পেছনে রয়েছে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দান্ত সাহস...ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেইসব দিনের ইতিহাস এ সীলমোহরের সঙ্গে জড়ানো।"[১]

অর্থাৎ, ভূগোলের সঙ্গে মানব চিন্তনের সেই কোন্ সুদূর আদর্শ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরবপূর্ণ মর্যাদাকে হারিয়ে ফেলেছে।ফলত, রৈখিক সীমারেখা না বদলালেও ভূগোলের উত্থান-পতন মানবেতিহাসের সঙ্গে কীভাবে বদলে যেতে পারে "হীরামানিক জ্বলে"-তে তার যেন একটা ছবি ধরা পড়েছে ।

ভূগোলের প্রসঙ্গ আনতে গেলে দুটি বিষয়কে প্রাথমিকভাবে দেখে নেওয়া যায়: লগ্নীকৃত ভূগোল এবং ভূগোলের লগ্নীকরণ। বাংলা সাহিত্যে যেদিন রাধা বৃন্দাবন ছেড়ে যমুনা পার হয়ে মথুরার হাটে যায়, সেদিন থেকে ভৌগোলিক সীমানার বৃদ্ধি পেতে থাকে সাহিত্যে। কেবল একটি জায়গার সঙ্গে আরেকটি জায়গার সম্বন্ধের ভূগোলই নয়, সেই

সময়ের এক নারীর জীবিকার পথও উন্মোচিত হয়েছে। নতুন পথের সন্ধানও ভূগোলের প্রসঙ্গ। চৈতন্যের ভারত-ভ্রমণ কিংবা মহারাষ্টাপুরাণের পথপরিক্রমণ সবই 'লগ্নীকৃত ভূগোল'- এর অংশ, অর্থাৎ,অন্য কোনো বিষয়ভাবনা উপস্থাপনের সাপেক্ষে ভূগোলের স্বাভাবিক অবতারণা ঘটেছে সাহিত্যে। আধুনিককালেই প্রথম সাহিত্যের মধ্যে 'ভূগোলের লগ্নীকরণ' ঘটেছে সচেতনভাবে ভূগোলের প্রয়োজনে। ভ্রমণ বা অভিযান সাহিত্যের নায়কের অধিকরণ হিসেবে ভূগোলের প্রয়োজন দেখা গেল বিশেষভাবে। কেবল স্থানের পরিচয়ে আর ভূগোল নয়, সেই সঙ্গে উপলব্ধির পরাকাষ্ঠাও।

প্রসঙ্গত, এর মধ্যেই বের হয়ে গেছে "চাঁদের পাহাড়" উপন্যাস। 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৯৩৫-৩৬ সালে। বই আকারে ১৯৩৭ সালে। বাংলা সাহিত্যে অভিযানমূলক উপন্যাসের সার্থক পথচলা শুরু হয়। সুদূর আফ্রিকার বৃহত্তম এক অংশের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছে নায়ক- শঙ্করের অভিযান। লক্ষ্যবস্তু আর উপলক্ষ্যের দিকে তাকালে, শঙ্করের দ্বৈত সত্তার দ্বৈরথ চোখে পড়ে:

> "কোন অনির্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে সে চলেছে কোথায়! আলভারেজ্ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরার খনিতে তার দরকার নেই। বাংলা দেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী... আফ্রিকার কোনো হীরকখনি তাদের চেয়ে মূল্যবান নয়।
>
> কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাংলা বলে কোনো দেশ নেই।"[২]

-এর প্রধান সহায়িকা বাঙালি-মনের বিস্ময়বোধ,কোমলতা। পৃথিবীর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি যে আফ্রিকা, শঙ্করের সেই একান্ত ভারতীয় তথা বাঙালি-ধাঁচের মানসিকতার সঙ্গে জুড়ে গেছে। ঘরকুনো-বাঙালি-শঙ্করকে বিভূতিভূষণ তাই নিয়ে গিয়ে তুললেন ভৌগোলিক আফ্রিকার কিসুমু থেকে কোবালা, থেকে রোডেসিয়া-বুলাওয়ে-সলসবেরিতে। কিন্তু,নিছক আর অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। হীরকখনির প্রয়োজনটা বিভূতিভূষণের কাছে গৌণ, ঐ কল্পিত চাঁদের পাহাড়'টাই মুখ্য। আর, সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভূগোলের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞান। শঙ্কর কিন্তু কালপুরুষ, সপ্তর্ষি দেখে চিনতে পারে, অঙ্ক কষাতেও মজবুত। সেখানকার ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তো নয়ই। 'ব্যুশক্রাফ্ট' না জেনেও শেষপর্যন্ত বেঁচে ফিরতে পেরেছে শঙ্কর। তার এই অভিযানের পরোক্ষ সহযাত্রী উপন্যাসের কিশোর-পাঠকেরা। সঙ্গে সঙ্গে তারাও টাঙ্গানিয়াকা পার হয়েছে স্টিমারে। বুশম্যান কিংবা মাটাবেল জাতির মধ্যে দিন কাটিয়েছে। প্রত্যক্ষ-বুননের মধ্যে ভূগোলের অফুরন্ত বীজের অঙ্কুর ঘটিয়ে পাঠক তবে নিস্তার পায় শেষপর্যন্ত।

দুই

প্রত্যক্ষ-বুনন ছাড়া পরোক্ষ-বুননেও ভূগোলের প্রসঙ্গ রয়েছে। ব্যক্তির "আমি"-কে প্রতিনিয়ত আরও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হয়। এর মধ্যে দিয়ে অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় । অর্থাৎ, দর্শনের পরিভাষায় "Being in the world।"[৩] হাইডেগারের "ডাজাইন"(Dasein) [৪] ধারণা নির্দিষ্ট স্থানে 'বিশ্ব-মধ্যে-সত্তার' বিশেষ অবস্থিতিকে চিহ্নিত করে। আফ্রিকার ভয়ঙ্কর পরিবেশে মাত্র নয়, এক দুর্ধর্ষ অভিযান, রোমাঞ্চকর খোঁজ এবং ভয়াকুল বিস্ময়ের পথে শঙ্করের অবস্থান গুরুত্ব পেয়েছে। আলভারেজ্-এর উদ্দেশ্য ছিল হীরকের, শঙ্করেরও তাইই। তবে শঙ্করের হীরকের উদ্দেশ্যকে বেষ্টন করে রয়েছে আরেকটি উদ্দেশ্য:

> "ঐ জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল — আকাশে অনেকদূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেছে... সেসব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে সে এসে পড়েছে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কি এর পরিণতি কে জানে?"[৫] (অনুচ্ছেদ 'ছয়')

অর্থাৎ না-জানা এই উদ্দেশ্য কোনো অরূপরতনের। কিংবা বলা হয়েছে, "জনমানবহীন বিশাল রিখটারসভেল্ড্ পর্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত — পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য কৃচিৎ ঘটে"[৬] (অনুচ্ছেদ 'সাত') । আর সেই আত্মস্থ রূপের পূর্ণ সম্ভোগে কাটাতে যায় শঙ্কর। সে তাই ক্ষণিকের জন্য ভাবে "হীরা চায় না।"[৭]

হীরকের সন্ধান ভৌগোলিকভাবে সত্য বটে, কিন্তু তা তার সর্বব্যপ্ত-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়নি। শঙ্করের 'সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুক মনটি' তাই অন্য 'স্বপ্নজাল' বুনতে পারে। আর, তার ফলে নায়ক শঙ্কর গভীর-পাঠে হয়ে উঠতে থাকে একাধারে দ্বৈত ভূমিকার নায়ক। তার দুই সত্তা পরস্পর বৈপরীত্য যুদ্ধে নামতে পারে। একটা সত্তা নির্ভীক আলভারেজের সঙ্গে এবং সঙ্গ-ছাড়া সাহসিকতার পরিচয় দেয়। সিদ্ধান্ত নেয়। আবার, ইউরোপীয়-সভ্যতা তথা ভদ্রতার চোখ দিয়ে "বর্বর" সভ্যতাকে দাগিয়ে দেয়:

> "... এদেশের মাসাই, জুল, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতই ওর (রিখটারসভেল্ড্ পর্বতমালার) আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না"[৮] (অনুচ্ছেদ 'ছয়') ।

অন্য সত্তা, বাংলার সেই ভাবুক ছেলে, সৌন্দর্য-পিপাসু নায়ক। ঘুমের ঘোরে বুনো হাতির স্বপ্ন দেখে ভাবতে বসে "ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়!"[৯] আবার, মজ্জাগত সংস্কারে বন্য কোয়োট্ কিংবা নেকড়ে-শকুনি দেখে ভাবে "কি সব অমঙ্গলের দৃশ্য!"[১০]

এই দুই সত্তার অনুভাব হিসেবে আফ্রিকার পরিবেশ পরিস্থিতিই দায়ভার বহন করে। কেবল অধিকরণমাত্র হয়নি এই ভূ-প্রকৃতি, প্রণোদনার জন্মও দিয়েছে। আফ্রিকার ভূগোল ও ইতিহাস চিরকালীন রহস্যময় অজ্ঞানতায় ভরা। বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে শঙ্কর যে কালপুরুষ-সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখেছে,তার তাৎপর্য আর আফ্রিকার ভূখণ্ডে তাদের দেখতে পাওয়ার তাৎপর্য আলাদা। বাংলার ভূখণ্ডে বসে শঙ্করের নক্ষত্রমণ্ডলীয়-জ্ঞান ভূগোল-বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু আফ্রিকার ভূখণ্ডে সপ্তর্ষিমণ্ডল শঙ্করের গ্রামের স্মরণবেদনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

অর্থাৎ, বলবার কথা এই, শঙ্কর একাধারে একক ব্যক্তির অস্তিত্ব নিয়ে গোটা উপন্যাসের নায়ক, অভিযানের অভিযাত্রী। আবার, কখনো সত্তাগত দিক থেকে সেই দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ। একের মধ্যে বহু-কে ধারণ করে কিশোর-পাঠ্য ভূমিকা ছেড়ে বড়ো-বয়সের পাঠচর্চাতেও অংশ নেয়। আর এই বিচিত্র পাঠের অবয়ব গড়ে তুলেছে ভূগোল।

তিন

ওয়েস্টমার্কের বড়ো ভূগোলের বই পড়তে পড়তে শঙ্কর 'চাঁদের পাহাড়' আরোহণের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়। ভূ-প্রকৃতি, অজানা রহস্যের দুনিয়া 'পথের পাঁচালী'-র অপুর মতো শঙ্করকেও টানে। তারা দুজনেই সীমাহীন পথচলায় ব্রতী হয়। পথের দেবতা অপুকে যে মন্ত্র শুনিয়েছিল, শঙ্করকেও একই মননে বিভূতিভূষণ গড়ে তোলেন। অপু যদি স্বয়ং বিভূতিভূষণের আত্মজৈবনিক চরিত্র হয়, শঙ্করও তবে তাঁর মানস পুত্র। তাই মানস-ভ্রমণে আফ্রিকার এত নিখুঁত প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই প্রকৃতির টানে আবার শঙ্কর ফিরবে বলে জানায়। সুতরাং, রূপকথার সেই 'আমার কথাটি ফুরাল' বলে ইতি টানা নেই। 'কোম্পানি গঠন করার চেষ্টা করবে' এবং "...ফিরবে রত্নখনির পুনর্বার অনুসন্ধানে..."[১১] শঙ্কর আবার ফিরবেই।

অন্য ভূ-বিজ্ঞানীদের মতো না হলেও শঙ্কর 'একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ- আবিষ্কারক'। শঙ্করের এই ভূগোলের সঙ্গে আজকের মানচিত্র মিলবে না, আর মেলানোর প্রয়োজন নেইও। মানস ভ্রমণের এই মানচিত্রে শঙ্কর আসলে নতুন ভূগোলের জন্ম দিয়েছিল। এই নতুন ভূগোল গড়ে উঠেছিল সিংহের সঙ্গে সম্মুখ অভিজ্ঞতায়- অনাহারে-বহু বীরের সংস্পর্শে। ভূগোলের এই বিচ্যুতিকে নবনির্মাণ হিসেবেও ভেবে দেখা যায়। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'-তে যে রূপকথার রাজ্য অবচেতনের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল তা দিয়েই কি উপন্যাসটি শুরু হয়নি! সেই আঁব খাওয়া থেকে সম্ভব নয় পর্যন্ত রূপকথাটি।আর সম্ভবের কথাটি বলবেন বলেই কথক বন্য প্রদেশে কুসুমঘাটীতে গিয়ে উপনীত হন।[১২] সবটাই কি 'সম্ভব'-এর নিক্তিতে মাপ হয়ে নিখাদ তকমা এঁটে পৌঁছেছে? এই 'সম্ভব'-এর বৈশিষ্ট্যই বা কী? ভূগোলের মানচিত্রে তাকে থাকতেই হবে নয়তো মনের ভেতরে। শঙ্করের পৌঁছে যাওয়ার পথটা ভূগোলে এলোমেলো হলেও রয়েছে। আর পাঠকের মনের ভেতরে রয়েছে অভিজ্ঞতা আর অটুট টানাপোড়েন। তাই যে উপনিবেশ 'সম্ভব'-এর প্রশ্ন তুলে ভারতীয় ঐতিহ্যের 'কথা সম্ভব নয়'-কে অস্বীকার করেছিল, সেই উপনিবেশকেই যেন শঙ্কর শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিয়িছে:

> "ছাদের আলসের দিব্যি চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো।" [১৩]

চীন দেশের এই ছড়াটা প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আসে একটা বিরোধিতার সূত্র ধরে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যকর্মে এই বিরোধিতা নতুন নয় কিন্তু 'চাঁদের পাহাড়' যাত্রাটা নতুন। তাই দ্বিতীয়বার এই নামটি না থেকেও উপন্যাসটির নামকরণে স্থান পেয়েছে এটি। যার প্রতি অদম্য পিপাসা নিয়ে এই যাত্রা। তবে বাস্তব ভূগোলের চিত্রে তা উদ্দেশ্য-বিন্দু হয়নি। তাহলে কী এই নামকরণের তাৎপর্য? ভূগোলকে অস্বীকার না করে একটা স্থানের ধ্যানস্তিমিত সৌন্দর্যকে সর্বত্রে অনুভব করে যেন 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিওগ্রাফি' গড়ে উঠেছে। তাই তো কঙ্গো নদীতে স্টীমারে বসে যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে পায়, তা একইভাবে জন্মভূমিকে মনে করায়। কিন্তু আকাশটা তার কাছে এক হতে পারলো কই: "সে-সব পরিচিত আকাশ ছেড়ে...।"[১৪] কেন আকাশটাকে এই ভাবুক ছেলেটি মিলিয়ে দিতে পারেনি? কেন আফ্রিকার আকাশ আর বাংলার আকাশের মধ্যে এত দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান? তবে কি এই স্ববিরোধিতা নিয়েই 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিওগ্রাফি' গড়ে উঠবে, যার মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্বের অবকাশযাপন! মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আফ্রিকা"। এই দুর্নিবার বিরোধিতা নিয়েই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-রচনা। নিভৃত রহস্যের দুর্গম অরণ্যের মায়াময়ী আফ্রিকার মধ্যে হঠাৎ এলো "নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে।"[১] ভূগোলটা[৫] আফ্রিকার বদলে গেল। নিভৃতচারী জাতিগুলি ভাষা ও নিজস্ব অন্ধকারকে নিয়ে আলোকিত দুনিয়ার শাসনাধীন থাকতে লাগলো। শঙ্করও তো কোম্পানি গঠন করে হানা দেবে আবার আফ্রিকায়, তার সেই 'বর্বর, নরমাংসলোলুপ' পর্বতে। এই অপরাধের স্খালনই কি তার আরেক সত্তা প্রতিমুহূর্তে করে চলেছে? তাই কি এত আকর্ষণ আর মুগ্ধতাকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করে শঙ্কর জানাতেই পারলো না, কোনখানে সেই গুহা, যেখানে অজস্র টেট্রাহেড্রন ক্রিস্টাল পাওয়া যায়? অর্থাৎ বিভূতিভূষণ আর প্রকাশ করাতে পারলেন না সেই সন্ধান। শঙ্করের উপনিবেশ দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে রত্নগর্ভা আফ্রিকার সেই রহস্যকে রহস্যের মধ্যেই রেখে দিলেন। শঙ্কর আবার ফিরবে।অপুর মতো তার যাত্রাও শেষ হয়নি।

চার

একটি দেশের উপর আরেকটি দেশের আধিপত্য অধিকৃত-দেশের ভূগোলেও প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য ভারতের ভূগোলকেও বদলে দিয়েছিল। ভূগোল অর্থে দেশের মানচিত্রটা কেবল নয়, তার অবস্থা,প্রকৃতি এবং সংস্কৃতিও। দূরবর্তী দেশের সংস্কৃতি এবং দর্শন এই আধিপত্যের জোরেই ভারতের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছিল। 'হীরামানিক জ্বলে'-তে সেই চম্পাভূমির রহস্যই উন্মোচিত হয়েছে, 'হীরামানিক' তো আর জ্বলেনি। তেমনই মাটাবেল্ জাতির সঙ্গে আলাপের মুহূর্তটা। ব্রিটিশদের সঙ্গে ওরা লড়েছিল। ওদের সন্দেহ, ওদের দেশে হীরের সন্ধানে আলভারেজ্ আর শঙ্কর এসেছে। পরিবর্তে পুড়িয়ে দেবার নিজস্ব নিয়মকানুন ওদের আছে। অন্যদিকে, আগন্তুকদের রিভলভার তৈরি। মাছে শান্ত না হলে মৃত্যু নাকি খুন! শান্ত হওয়ার জন্য পরিণামে সিগারেট নাকি বকশিশ? এমনকি পূর্ব অভিযানের বর্ণনাতেও ছিল, কাফির কয়েকজন সঙ্গে গেলে পাবে তামাক নাকি প্রলোভন! তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কারা কাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে? একদিকে সর্বনেশে নিজেদের নিয়ম 'সভ্য গভর্নমেন্টের আইন এখানে খাটবে না' অন্যদিকে দুর্দান্ত কৌশল এবং সন্ধান। অধিগ্রহণের ইতিহাস তো নতুন নয়। পৃথিবীর সব দেশের পুরাতন ইতিহাস ঘাঁটলে অধিগ্রহণের ইতিহাসই তো সামনে আসে। নিজস্ব নিয়মকানুন নিয়ে মাটাবেল জাতির নিজস্ব বন্য-জীবন, অতিথির সঙ্গে একসাথে খাওয়া। কাফিরদের সতর্কবার্তা এবং খেলবার সেই সাদা পাথর, অনুদান নয় বরং প্রতিদান। জিম কার্টার আর আলভারেজের সভ্য দুনিয়ার বাইরে একটা বন্য-জাতির নিজস্ব প্রতিদান। মেয়েটির প্রাণ রক্ষা পায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়, তাই এই প্রতিদান। এই বিচিত্র জীবনচর্যার পরিচয় কি সভ্য-ভূগোলের পাতায় পাতায় থাকতে পেরেছে, তাও আবার আফ্রিকার ভূগোল রচনায়? তবে কি বিভূতিভূষণ যাত্রাপথের প্রত্যক্ষ-ভূগোলকে ছেড়ে রেখে নতুন এই ভূগোল গড়ে তুলেছেন যা ইতিহাস আর সংস্কৃতির সঙ্গে হাত ধরে চলবে। এই ইতিহাসই তো তাঁর লেখার ইচ্ছা ছিল। সংক্ষেপে হলেও, 'চাঁদের পাহাড়'-এ সেই 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিওগ্রাফি'-র খোঁজ মেলে।

'চাঁদ'-এর ব্যবহার কাফির জাতির কাছে সময়নির্দেশক: "ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখছো, ধোঁয়া ধোঁয়া — এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে।"[১৬] তাহলে কি ভাবতে পারা যায়, ঐ দূরের ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা পাহাড়টার স্থানবাচক নয়, সময়বাচক অধিকরণ 'চাঁদ'! তাহলে, সময়ের সঙ্গে 'চাঁদ' একটি সরলরৈখিক ভাবনায় সংযুক্ত হয়েছে। সেখানে আলোকিত দুনিয়ার হিসেবের খতিয়ানে চাঁদ আর সময়ের গতিপথ বঙ্কিম বা বৃত্তাকার। হিসেবের সূক্ষ্ম পারদর্শিতা এই অনালোকিত জীবনের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, তিন আউন্স সোনা পেয়ে শঙ্কর

খুশি হলেও "শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আলভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না"[১৭] কারণ 'মজুরি পোষাবে না'। সূক্ষ্ম হিসেবের পারদর্শিতা। এই দুটি বিষয়কে সামনে রাখলে একদিকে উপনিবেশের দৃষ্টি দিয়ে আকর্ষণ করা যায় বৈপরীত্যের জায়গাটি। কিন্তু ভূগোলের দৃষ্টি যদি ব্যবসায়িক হিসেবের দিকে পড়ে বা সময়ের সঙ্গে মজুরির তুলনা করা যায়, তবে ভূগোলের সিদ্ধান্ত কি এটাই হবে না, যে, এই সূক্ষ্মতার জন্যই অন্যদেশের মানুষ বারবার আফ্রিকার বুকে হানা দেবে ভয়ানক পরিণতি জেনেও, আর মাটাবেল কাফিররা কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না বুনিপের মিথকে আঁকড়ে ধরে। বন্য জাতির দৈহিক ক্ষমতা এর পরিপূরকই হবে বরং, তবুও নিজস্ব বাসভূমির মিথকে রক্ষা এবং অধিকৃত ভূমির রহস্যে বন্দুক চালিয়ে আর চাঁদের হিসেবকে দিন-মাইলে বদলে নতুন জয়যাত্রার পতাকা পুঁতে দেওয়াই কি শাসকের চিরন্তন ইতিহাসের সত্য হয়নি! ফলে, অস্পষ্ট ভূগোলের মানচিত্র আরও স্পষ্ট হয়েছে আগন্তুকদের দ্বারাই। তাই তো লেখা হলো "এখন দেখা যাচ্ছে যে আলভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আলভারেজ বলে, ম্যাপ কি হবে, আমার মনে গভীরভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি...।"[১৮] ভূগোল যে নির্মিতই হয় তা নয়, সে বদলে যায় অলক্ষ্যে। অস্পষ্ট, কেউ যায় না এমন জায়গার ভূগোল প্রকাশিত হতে থাকে। বিভূতিভূষণ কি শঙ্করের স্মৃতিতে সেই ভূগোলকে জিইয়ে রাখবেন ! বোধহয় নয়। উপনিবেশবাদের যে ঋণ বিভূতিভূষণ শোধ করার জন্য শঙ্করকে দিয়ে হীরকখনির নির্দিষ্ট পথ চিনিয়ে দেননি,তেমনি অকেজো করে দিয়েছেন শঙ্করের ভূগোলের বিদ্যা। সপ্তর্ষিমণ্ডল কেবলই জন্মভূমির স্মরণবেদনা। সে কিন্তু আলভারেজের থেকে ম্যাপটাকেও বুঝে নিতে চেষ্টা করেনি। সব যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বুনে দিয়েই এই অভিযান বিভূতিভূষণ রচনা করলেন।

পাঁচ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখার একটি অংশ —

> "There is the true African Man: his physical and mental character black-skin suffused with strength and vigour, simplicity, good humour, and cheerfulness, and closeness to Nature, with a spirit of reverence for the God that is behind Nature is something which makes him quite distinctive in the World of Man, and eminently likable, and even lovable, to those who come to know him from close quarters." [১৯]

অর্থাৎ, প্রকৃতি ও মানুষের যূথবদ্ধ সংস্কৃতির বাতাবরণ। তাদের নিবিড় সংস্পর্শে এলে তাদের জীবনচর্যা বুঝতে পারা যায়। অনির্দিষ্টভাবে যতটুকু পরিচয় এই জনজাতির সঙ্গে আলভারেজ ও শঙ্করের হয়েছে,তাতে কিছু পরিচয় তারা পেয়েছে এবং কিছুটা পূর্ব-অভিজ্ঞতা। যেহেতু,জীবনচর্যার প্রসঙ্গ কেবলমাত্র সমাজবিদ্যার বিষয়মাত্র নয়, ভূগোল এবং সমাজবিদ্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, সেহেতু ভূগোলের চর্চায় প্রসঙ্গগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়, হতে পারে পরোক্ষধর্মী। বুশম্যানদের মতো কৌশল জানার প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ: "ভাল বুশম্যান না হলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে।"[২০] কারণ "মধ্য আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।"[২১] এমন এক ভূগোলের প্রসঙ্গ যেখানে জীবনযাপনের সমূহ-বিদ্যা বা রক্ষাকবচের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। শুরুতেই দেখা যায়, এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বন্দুক নিয়ে টহলদারি, শঙ্করের পাওয়া বন্দুক, বন্দুকের ম্যাগাজিনে ভরা কার্ট্রিজ, হাতে কম্পাস বেঁধে ঘোরা, 'ডেথ্ সার্কেল্'-এ সম্পর্কে সচেতনতা,সদা সশস্ত্র থাকা ইত্যাদি নানা বিদ্যা সবই পরিবেশ পরিস্থিতির দ্বারা সৃষ্ট। আর ভূগোলের প্রতি বিভূতিভূষণের আগ্রহ এবং ভালোলাগা চোখে পড়ার মতো হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকতার সময় থেকেই। সুতরাং, ভূগোলের চর্চা পুথিগত হলেও তা বিভূতিভূষণের হৃদয়বাহী বিষয়। ফলত, ভূগোলের নির্মাণ এবং ভৌগোলিক বর্ণনায় 'নিয়মে-বেনিয়মে'[২২] গড়ে ওঠার বিচ্যুতি সাহিত্যের মহলে ঝড় তোলে না। তবে, উপনিবেশের চোখ দিয়ে শঙ্কর মানচিত্র দেখলেও বিভূতিভূষণ যে তা দেখেননি 'বিচিত্র জগৎ'-এর মধ্যেই প্রকাশিত। যেমন, "Always something new from Africa"[২৩] রোমানদের করা উক্তিটি খনিজ সম্পদ থেকে মূল্যবান রত্ন-পাথর, ক্রীতদাস থেকে আধিপত্যের অবসর — সবকিছুকেই প্রমাণ করেছে। তাই ধর্ম-বিস্তারের জন্য প্রলোভন আর বিপদে কুলির প্রয়োজন পূরণে তামাকের প্রলোভনের মধ্যে পার্থক্যটা যে সামান্যই তা বোঝা যায়। আফ্রিকার বুকে ভারতের ধর্ম বিস্তারের কোনো অভিযান ঘটেনি। আর, সম্পদের খোঁজে অভিযান নব্যযুগের সাহিত্যের বিষয়। বাস্তবিকই ভারত কখনো রত্নের উদ্ধারে তরী ভাসায়নি। দেওয়া-নেওয়ার বজরা সাজানো থেকে কালীদহে জাহাজডুবি ভারতের সম্পত্তি। খোঁজের

ইতিহাস সাহিত্যের অন্দরেই। ভারতের বুকে তাই খুঁজতে খুঁজতে জনজাতি এসে পৌঁছেছিল এককালে। ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছে কিন্তু অভিযান করেনি।তাই অভিযানের প্রলেপে আড়ালে ভারতের সেই ঐতিহ্যকে স্থাপন করে নতুন এক ভূগোল গড়ে তুলেছেন বিভূতিভূষণ। শঙ্কর চাইলেও হের্ হাউপ্টম্যান কিংবা আত্তিলিও গাত্তি বা আলভারেজ হতে পারেনি। হলে কীভাবে সেই 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিওগ্রাফি' গড়ে উঠবে? সেই তো উপনিবেশের তৈরি ভূগোলের ম্যাপ, মাইল ফলকের সংগ্রাম। তাই সেই ভূগোল বিদ্যার অপসারণ বিভূতিভূষণ কৌশলে ঘটান। আর সমগ্র অভিজ্ঞতার আলোকে 'মাউন্টেন অফ দ্যা মুন'-এ না গিয়েও গোটা পরিক্রমণ 'চাঁদের পাহাড়' হয়ে উঠেছে। এই পাহাড় মনোলোকের ভূগোলে সত্য যা বাস্তবের ভূগোল থেকে বিচ্যুত। এই নতুন ভূগোলে মনের দ্বন্দ্ব আর লেখকের অভিপ্রায় মিশে রয়েছে।তাই ওয়েস্টমার্কের সেই 'মাউন্টেন অফ দ্যা মুন' উদ্দেশ্য হলেও, শেষ পর্যন্ত যে নতুন পথ, অভিজ্ঞতা এবং ভূগোল আবিষ্কৃত হলো তাইই বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), চতুর্থ খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ চৈত্র,১৪২৭, পৃ. ৫৪৪।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪৩২।
৩. ঘোষ, সঞ্জীব। অস্তিবাদ: দর্শনে ও সাহিত্যে (সম্পা:)। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭, নলেজ হোম, ঢাকা, পৃ. ৭৮
৪. তদেব, পৃ. ৭৮।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪২৩।
৬. তদেব, পৃ. ৪৩২।
৭. তদেব, পৃ. ৪৩২।
৮. তদেব, পৃ. ৪২৭।
৯. তদেব, পৃ. ৪০০।
১০. তদেব, পৃ. ৪৫৫।
১১. তদেব, পৃ. ৪৬০।
১২. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। কঙ্কাবতী। সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ২০২১, পৃ. ১১।
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪৬০।
১৪. তদেব, পৃ. ৪২৪।
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পত্রপুট (ষোল সংখ্যক কবিতা)। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৫, পৃ. ৬৩।
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪১।
১৭. তদেব, পৃ. ৪৩৬।
১৮. তদেব, পৃ. ৪৩৪।
১৯. Chatterjee, Suniti kumar. Africanism. Bengal Publishers Private Ltd., Calcutta, 1960, page – 02.
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪২৬।
২১. তদেব, পৃ. ৪২৬।

২২. আনন্দবাজার ডট্ কম্, https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/column-on-chander-pahar/cid/1336849

২৩. Chatterjee, Suniti kumar. Africanism. Bengal Publishers Private Ltd., Calcutta, 1960, page – 03.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। কঙ্কাবতী। সপ্তম সংস্করণ ২০২১, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ (নতুন মুদ্রণ) ১৪৩১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) চতুর্থ খণ্ড। ষষ্ঠ মুদ্রণ চৈত্র, ১৪২৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পত্রপুট (ষোল সংখ্যক কবিতা)। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, কলকাতা।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস। প্রথম প্রকাশ (তৃতীয় মুদ্রণ) ২০২৩, কারিগর, কলকাতা।

৬. ঘোষ, সঞ্জীব সম্পাদিত। অস্তিবাদ: দর্শনে ও সাহিত্যে। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭, নলেজ হোম, ঢাকা।

৭. Chatterjee, Suniti kumar. Africanism. Bengal Publishers Private Ltd., Calcutta, 1960.

বৈদ্যুতিন সূত্র:

1. https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/column-on-chander-pahar/cid/1336849, 18-08-2025, 21:05 IST

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 54- 64
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.179

শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোর অন্তর্বর্তী সমাজচেতনা

রাহুল দে, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 02.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstarct

Criminal tendencies among individuals are not uncommon, they are identified as 'criminals' by breaking the fence of well-established principles, rules, reforms or state-specific laws. The police system and intelligence forces have been developed to suppress the crimes that are constantly committed in society. And when a detective proves the crime based on his keen intelligence, logic or assumption and identifies the criminal, then that layered flow of events arouses curiosity with the drama of suddenness. Readers or listeners who are thirsty for stories become interested in listening to such stories. A new genre of social stories is created---detective stories. Social truth is revealed there in a different way. Sharadindu Banerjee was familiar with detective stories from home and abroad. It cannot be said that he did not imitate, there was no assimilation; however, Sharadindu Byomkesh Bakshi is a Bengali character who is deeply involved in Bengali life and culture. His keen observational skills have revealed the mystery of the murder and the psychology of many characters and the contemporary social background. Not only are the characters he creates truth-seekers, but Sharadindu himself seems to have fulfilled the social responsibility of truth-seeking here, in a sense he is also a 'truth-seeker'. In the discussed article, we will shed light on how Sharadindu's detective stories reveal the socio-economic-political history of the then Bengali society. Among his various literary works, he has completely relied on detective stories to portray the social character of the then post-independence and pre-independence period.

Keywords: Society, political and moral situation, decline of morality, degradation of social values, social status of the criminal

১৯৩০-এর কাছাকাছি। গত শতকের শেষ থেকে বাঙালি জাগরণের যে ঢেউ উঠেছিল, তার রেশ সমানে চলছে। পাঁচকড়ি বাবুর দেবেন্দ্রবিজয় বসু সাহেবী প্যান্টালুনের বিকল্প মালকোঁচা-মারা ধুতি পরে আসরে নেমে পড়েছিল। পাঁচকড়ি দের উদ্দেশ্য সাধু ছিল। কিন্তু বিদেশি গোয়েন্দা-কাহিনি যে তিনি অনুকরণ করতেন এবং তা একটুও চাপা থাকত না। তবুও একথা বলা যায়, বাঙালি গোয়েন্দার খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছিল-প্রিয়নাথ দারোগার দপ্তরে বা শৌখিন বুদ্ধিজীবীর অ্যাডভেঞ্চারে, এই ভাব-যেখান থেকে হোক বাঙালির নিজস্ব খাঁটি , যদিও বাংলার মিল্টন, বাংলার স্কট, বাংলার ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এই নিয়ে উত্তেজনা তখন স্তিমিত, সাহিত্যে নোবেল করতলে, তবুও বাঙালির সামনে অনর্জিত অজস্র রাজ্য। বাঙালি তখন একটি শার্লক হোমস প্রয়োজন অনুভব করল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটু আগে বা সমকালে অন্যেরাও এই জরুরি সন্ধানে লেগে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্য হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথা প্রথমেই মনে পড়বে। তিনি বলে কয়ে বিমল কুমার জয়ন্তদের বাঙালির গৌরব বলে চালাতে চেয়েছিলেন। তবে একে বিলিতি

ক্রাইম স্টোরি থেকে ধার করা গল্প তাতে সযত্নে নেহাৎ কিশোর-পাঠ্যের সীমায় তাদের আটকে রাখার চেষ্টা; তাই বেশি এগোতে পারলেন না। আর নীহার গুপ্তের কিরীটি রায়ের কথা যত কম বলা যায় ভাল। বিলিতি গল্পের নকলনবিশী, দাঁতে পাইপ চিবিয়ে গোয়েন্দাপ্রবরের সাহেবিয়ানা, সস্তা মোটা জাতের বহিরঙ্গ কাজ-কারবার সাহিত্য-বোদ্ধা রহস্য-রসিক পাঠকের কাছে এই গোয়েন্দাকে প্রিয় করে তুলতে পারেনি। এমন সময় শরদিন্দু বাবুর ব্যোমকেশের আবির্ভাব। **১৯৩২** থেকে **১৯৩৭** পর্যন্ত **৫** বছরে **১০**টি গল্প ছাপা হল। তার মধ্যে 'সীমন্ত হীরা', 'মাকড়সার রস', 'চোরাবালি', 'রক্তমুখী নীলা' একেবারে পয়লা সারির লেখা। আর এই **১০** টি গল্পের মধ্যে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালি পাঠকের দীর্ঘকালের স্বপ্ন সার্থক করল। শুধু পুরোদস্তুর বাঙালি বলেই নয়, শার্লক হোমস প্রেরণার উৎসে এবং ফাদার ব্রাউন পাশে থাকলেও, গল্পগুলির মৌলিকতার জন্য, এমন কি অপরাধীর মন এবং পাপের বৈশিষ্ট্যে দেশকালের বাস্তবতা এমন মুদ্রিত যে এদের চেনাজানা লোক বলেই মনে হয়। বাঙালি এতকালে, একটা নিজস্ব অপরাধের জগত, এক দল খাঁটি বাঙালি অপরাধী, তথা এক বাঙালি গোয়েন্দা পেয়ে যেন বর্তে গেল। না, গোয়েন্দা নয়, শব্দটা শুনলেই কেমন পুলিশ স্পাই মনে হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশে শব্দটা ঘৃণার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই একটি সম্মানজনক নূতন নামকরণও হল 'সত্যান্বেষী'।

গবেষণাপদ্ধতি:

গবেষণাপত্রটি তৈরি করতে গিয়ে আমরা মূলত বিশ্লেষণাত্মক গবেষণাপদ্ধাতি ও বর্ণনামূলক গবেষণাপদ্ধতির ব্যবহার করেছি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে মূলত আকর গ্রন্থদুটির অর্থাৎ শরদিন্দু অমনিবাস **১**ম খণ্ড ব্যোমকেশ (১৪২১) এবং শরদিন্দু অমনিবাস ২য় খণ্ড ব্যোমকেশ (১৪১৯) (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা) এই দুটি উপর নির্ভর করে আমাদের আলোচনাটি প্রস্তুত করেছি।

বিশ্লেষণ:

শরদিন্দু তাঁর রহস্য-কাহিনিগুলিকে এতটা গুরুত্ব দিতেন যে তাঁর সব শ্রেণির সৃষ্টির মধ্য থেকে এদেরই বেছে নিলেন যুগটিকে প্রকাশ করার জন্য। ৩৭-৩৮ বছর ধরে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের যে অগ্রগতি, তার যে জটিল ক্রমবিকাশ, সে কথা বলার দায়িত্ব দিলেন কতগুলি গোয়েন্দা গল্পকে। তিনি তো ইতিহাসাশ্রয়ী অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন, শিল্পগুণে সেগুলিও কিছু কম নয়। অর্থাৎ ঐ সব কাহিনি লিখতে গিয়েও তাঁর শিল্পীমন পুরোই জেগেছে। তাতে নানাভাবে সমকাল প্রতিফলিত। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস যেভাবে স্তরে স্তরে উন্মোচিত হল **১৯৩২** সাল থেকে **১৯৭০** সাল পর্যন্ত, তা মুদ্রিত হয়ে আছে রহস্য গল্পগুলিতে। সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার প্রত্যক্ষ বাহন হয়ে রইল তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলি। এই ব্যাপারটি না করলে রহস্য-কাহিনি হিসেবে ওদের উপভোগে যে হানি হত তা মনে হয় না। কিন্তু ঐ জিনিসটি থাকার ফলে গোয়েন্দা গল্পে এসেছে বাস্তবতার ভিত্তি, ঘটেছে দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। গল্পগুলি অনেক বেশি বাঙালি হয়ে উঠেছে। শুধুই স্থান-কালের চিহ্নহীন কাল্পনিক তথা অলীক গল্পোসল্পের মজা পেতে কিন্তু গল্পগুলি জাতীয় ইতিবৃত্তের অঙ্গ হয়ে পড়ায় সে মজা বেড়েই শুধু গেল না, জীবনের-সমাজের গাঢ়তার রঙে স্বাদ হয়ে উঠল বর্ণাঢ্য।

শরদিন্দুর গোয়েন্দা গল্পের ভূগোলটাও কৌতূহলোদ্দীপক। বেশির ভাগ গল্প কলকাতার। তবে বাইরেরও বেশ কয়েকটি আছে। (১) চোরাবালি-উত্তরবঙ্গের এক জমিদারি। (২) ব্যোমকেশ ও বরদা-মুঙ্গের। (৩) চিত্রচোর-গিরিডি। নাম না করলেও অভ্রখনির কথা আছে। গিরিডি-মধুপুর রেল লাইনটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। (৪) দুর্গরহস্য-গিরিডি থেকে অল্প দূরে পাহাড় ও বন ঘেরা স্থান। মনে হয় পরেশনাথ পাহাড় দেখে কল্পিত। (৫) চিড়িয়াখানা-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম, কলকাতা থেকে ঘন্টাখানেক রেলের পথ। (৬) বহ্নিপতঙ্গ-পাটনা। (৭) অমৃতের মৃত্যু-ধান-প্রধান গঞ্জ ও কাছের গ্রাম। বর্ধমান, হুগলীর কোনও রেলস্টেশন হতে পারে। (৮) শৈলরহস্য-পুনার কাছে মহাবলেশ্বরে, কিছুটা কলকাতায়। (৯) অচিন পাখি-পুরনো মফঃস্বল শহর, কলকাতা থেকে তিন ঘন্টার পথ। (১০) কহেন কবি কালিদাস-রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চল, কয়লা খনি ও সন্নিহিত শহর। (১১) অদৃশ্য ত্রিকোণ-মফঃস্বলের এক বড় শহর।

অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ গল্প কলকাতার বাইরে। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ কলকাতায়। কলকাতার গল্পের মধ্যে সীমন্ত হীরা, আদিম রিপু একটুখানি বাইরে গেছে। প্রথমটিতে একবার উত্তরবঙ্গে এক জমিদারবাড়িতে, দ্বিতীয়টিতে ব্যোমকেশের শালার বাড়ি পাটনায় কয়েকদিনের জন্য। মোটামুটি কলকাতার বাইরের বাংলার প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানে

গল্পের যাতায়াত আছে। জায়গা বাছাই করার কোন চেষ্টা নেই। সত্যজিৎ ফেলুদা-কাহিনিতে বাঙালির পর্যটনকে রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে যুক্ত করে একটা বিশেষ স্বাদ এনেছেন, নানা মামুলি স্থানে ঘটনা ঘটিয়েছেন যেমন, তেমনি বাঙালির প্রিয় ভ্রমণ-কেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। পুরী, দার্জিলিং, বারানসী, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই, চেন্নাই, কৈলাস, হাজারিবাগ, কাশ্মীর, কেদার, এক আধবার লন্ডন, হংকংও ঘুরে আসা হয়েছে। এরকম কিছু ছিল না শরদিন্দুর মনে। তিনি ভ্রমণের, বিশেষ করে শারদ পর্যটন-রসের জন্য বাড়তি কিছু করেননি। চোরাবালিতে ছিল উত্তর-পূর্ব বঙ্গেব আরণ্য প্রকৃতির পটভূমি। সেটা অখণ্ড বাংলার কথা। পরে দেশভাগের পরে লেখক পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় বন্ধ হয়ে গেছেন। আর সন্নিহিত বিহারে-গিরিডি -মুঙ্গের-পাটনায়। গিরিডিতে ব্যোমকেশ গিয়েছিল স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য, মুঙ্গেরে অবকাশ-যাপনের জন্য, আর পাটনায় শ্বশুর বাড়িতে অর্থাৎ শালার বাড়িতে বেড়াতে। ব্যোমকেশ রহস্য-ভেদের কাজে গেছে পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে আমন্ত্রিত হয়ে। নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে গল্প শুনতে শুনতে রহস্যভেদ করেছে। ব্যোমকেশ স্বাধীন সরকারের গোপন কাজে দেশের নানা স্থানে গিয়েছে-তার খবর আছে, তবে একটি ছাড়া সে সব রহস্য-ভেদ কাহিনি-আকারে পরিবেশিত নয়। এইরূপ এক কাজে মহারাষ্ট্রে যায় ব্যোমকেশ এবং মহাবালেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে একটা রহস্য সমাধান করে-শৈলরহস্য। উত্তর বঙ্গে চোরাবালিতে বেড়াতে গিয়ে আর একবার পর্যটন-মিশ্র রহস্য গল্প জমিয়ে তোলা হয়েছে। শরদিন্দু এই সব গল্পে-কলকাতার বাইরের আঞ্চলিকতাকে মাঝেমধ্যে চমৎকার উপভোগ্য করে তুলেছেন, কখনও আবার স্থানিকতাকে রহস্য-নির্মাণে ও ভেদে, রহস্যরস ঘন করে তোলার কাজে তাৎপর্য দিয়েছেন। 'চোরাবালি', 'দুর্গরহস্য' 'শৈলরহস্য' এদিক থেকে সেরা। গল্পগুলোর রহস্য-রস সম্ভোগ করার সময়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। কোন আকর্ষণী প্রকৃতি-রূপ না থাকলেও মামুলি মফঃস্বল টাউন বা কয়লা-শহর চলচ্চিত্রের মত জলজ্যান্ত হয়ে গল্পের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে 'কহেন কবি কালিদাস'-এ।

কলকাতায় যত কাণ্ড ঘটেছে তার বেশির ভাগের কেন্দ্রে ব্যোমকেশের হ্যারিসন রোডের মেস, তার বিয়ের পরে যা হয়ে দাঁড়ায় ওদের ফ্লাট। কলকাতার ১৭টা অপরাধের ব্যোমকেশ সমাধান করেছে এখান থেকে। দুটি গল্পে অপরাধী আড্ডা গেড়েছে ব্যোমকেশের মেসে (উপসংহার, ছলনার ছন্দ), একটিতে অপরাধীর মনের আব্রু খোলা হয়েছে ব্যোমকেশের ঘরে (রক্তমুখী নীলা)। শেষ ৫টাতে (অসম্পূর্ণ বিশুপাল বধ ধরে) গোয়েন্দাগিরি হয়েছে ব্যোমকেশের নিজের দক্ষিণ কলকাতার কেয়াতলা রোডের বাড়ি থেকে।

কলকাতার ২২টি কাহিনিতে বাঙালির প্রিয় মহানগরীকে কাল-প্রবাহের চলচ্চিত্রে ধরে রেখেছেন শরদিন্দু। খুব বেশি করে আছে হ্যারিসন রোডকে কেন্দ্র করে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার অনেকখানি। মাকড়সার রস, অর্থমনর্থম, অগ্নিবাণ, রক্তমুখী নীলা, আদিম রিপু, রক্তের দাগ, মণিমণ্ডন, অদ্বিতীয়, দুষ্টচক্র, হেঁয়ালির ছন্দ, খুঁজি খুঁজি নারি-- এদের কাণ্ডকারখানা ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে প্রায় হাঁটা পথের মধ্যে ঘটেছে। উপসংহারের অনেকখানিও। গল্প চৌরঙ্গী পর্যন্ত গিয়েছে মগ্নমৈনাকে, পথের কাঁটায়। সত্যান্বেষী এবং উপসংহারের উপসংহার মধ্য কলকাতার মিশ্র এলাকায়। কলকাতা ধরা আছে তার সর্ববিধ বৈচিত্র্যে। তাঁর আঁকা উত্তর-দক্ষিণ কলকাতার মানচিত্র সমকালের পাঠকদের কাছে ছিল একান্ত পরিচিত, বাস্তব-ফলে সমকালে ঐ সব গল্প পড়তে পড়তে একেবারে ঘরের কাছে জানাশোনার মধ্যে ক্রাইমগুলি ঘটছে বলে বাস্তবতার আর একটা মাত্রা পাওয়া যেত। আর উত্তরকালের পাঠকদের কাছে তাঁর গল্প হল অতীত কলকাতাকে-ইতিহাসের কলকাতাকে জীবন্ত করে ফিরিয়ে আনা। বাঙালির কাছে ভিড়ের চৌরঙ্গী, গভীর রাতের রেডরোড (পথের কাঁটা), থিয়েটার, (বিশুপাল বধ), আধুনিক কায়দার বড় হোটেল (রুম নং ২), ছোট হোটেল (আদিম রিপু), বিখ্যাত গ্রান্ড হোটেল (সীমন্ত হীরা) আত্মীয়ের মত। ছোট কিন্তু বর্ধিষ্ণু কারখানা এবং তার মালিকের বাগান ও লনওয়ালা বসত বাটি (শজারুর কাঁটা), ধনী অবসরপ্রাপ্তের বহুতল প্রাসাদ (বেণীসংহার, অর্থমনর্থম) , ব্যবসায়ীর (রক্তের দাগ), ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদের সুরম্য ভবন (মগ্নমৈনাক)। নানা ধরনের ভাড়া বাড়ি, নির্মীয়মান বাড়ি। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স (রক্তের দাগ), ব্যায়াম সমিতির কুস্তির আখড়া (রক্তের দাগ)। সিনেমায় রাতের শো (অর্থমনর্থম, আদিম রিপু)। অনেক গল্পে গৃহবন্দী ব্যাধি-পঙ্গু বা জরাগ্রস্তের আশ্রয়-স্বরূপ একটিমাত্র কামরা (মাকড়সার রস, খুঁজি খুঁজি নারি, দুষ্টচক্র, অদ্বিতীয়), বনেদী পুরনো হতশ্রী আবাস (দুষ্টচক্র, আদিম রিপু), ভাড়াবাড়ির রহস্য (অদ্বিতীয়), মধ্যবিত্ত অধ্যাপকের রান্নাঘর (অগ্নিবাণ), যানবাহন হিসেবে, ট্রাম, টানা রিকস, ট্যাক্সির ব্যবহার, প্রাইভেট গাড়ি তো আছেই। আছে রবীন্দ্র-সরোবর আর কলেজ স্কোয়ারকে ক্রাইমের স্থানরূপে কাজে লাগানো, কলেজ

স্ট্রিট পাড়ার বইয়ের দোকানও আছে। সব মিলে কলকাতা কলকাতাই। এর সঙ্গে ক্রাইমকে এমন মিলিয়েছেন যে গোয়েন্দাগিরি এবং ক্রাইম বস্তুটা একেবারে দেশি, প্রায়ই হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে কলকাত্তাই।

লেখক ব্যোমকেশ কাহিনি গুলিতে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সারা দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ক্রমবিকাশের পটভূমিটি জীবন্ত করে রেখেছেন। শুধু কালানুক্রমিক বিবরণ নয়, লেখকের মনোভাব গল্পগুলির মধ্যে ভাষ্যের মত জড়িয়ে সংশ্লিষ্ট পাপ এবং প্রায়শ্চিত্তকে জাতীয় চরিত্র দিয়েছে। লেখকের মুম্বাই যাবার আগেকার গল্পকটিতে তিনের দশকের প্রথম দিকের মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘটনাবিরল জীবনের ঢিমেতাল। রাজনৈতিক কলকোলাহল তখন জাতিকে উদবেজিত করেনি এমন নয়, কিন্তু শরদিন্দু গল্পের ঘোরে সেদিকে ফিরে তাকাননি। কিন্তু ১৯৫০-এর পরে তাঁর গল্পে দাঙ্গা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, দেশভাগের যন্ত্রণা, তারপর ক্রমিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ধরা পড়েছে। তাছাড়া ক্রাইমের স্বভাব কখনো কখনো খুব বেশি করে সময়কে বিদ্ধ করেছে। সেটাও খুব তাৎপর্যবহ। (কারণ গোয়েন্দা কাহিনিকে এতখানি জীবনের সঙ্গে মেশানো বিশ্বের রহস্য গল্পের ইতিহাসেও দুর্লভ।)

‘চিড়িয়াখানা’ (জুলাই ১৯৫৩) উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। কাহিনি প্রারম্ভেই কাল-পটভূমির উল্লেখ করে বলা হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এক গ্রীষ্মকালের ঘটনা। ব্যোমকেশ বক্সীর কাছে উপস্থিত নিশানাথ সেন, একসময়ে বোম্বাই-এর বিচারবিভাগে সেশন জজ, ‘শারীরিক’ কারণে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে বর্তমানে কলকাতার অদূরে ২৪ পরগণার মোহনপুরে তৈরি করেছেন ‘গোলাপ কলোনী’ বলেছেন- ‘গোলাপ কলোনী আমার ফুলের বাগান। আমি ফুলের ব্যবসা করি। শাক সবজিও আছে, ডেয়ারি ফার্মও আছে।’ অর্থাৎ প্রাক্তন জজ নিশানাথ সেন এখন ফুল-সবজির ব্যবসাদার। শুধু তাই নয়, গোলাপ কলোনীতে যারা তাঁর অধীনে কাজ করে মালীদের বাদ দিলে তারা সকলেই ভদ্র শ্রেণির, ‘কিন্তু সকলেই বিচিত্র ধরনের লোক।’ এদের মধ্যে একদল আছে যারা কোনও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না, আরেক দলের অতীত জীবনে ‘দাগ’ আছে। প্রথম দলে যদি পড়ে পানুগোপাল, তাহলে দ্বিতীয় দলে রয়েছে ভুজঙ্গধরবাবু-

> “ডাক্তার ছিলেন, সার্জারিতে অসাধারণ হাত ছিল… কিন্তু তিনি এমন একটি দুর্নৈতিক কাজ করেছিলেন যে তাঁর ডাক্তারির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি এখন কলোনীর ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার…।”[১]

নিশানাথ সেনের ‘অস্বাভাবিক’ মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ আবিষ্কার করেন কলোনীর বাসিন্দাদের বিচিত্র সব জীবনবৃত্তান্ত। দময়ন্তী নিশানাথবাবুর স্ত্রী নন, সহবাসিনী; অধুনা বৈষ্ণব ব্রজদাস চুরির অপরাধে জেল-খাটা আসামী, একদা রসায়নের অধ্যাপক নেপাল গুপ্ত কটুভাষী কুটিল ও দাম্ভিক, তার পরীক্ষার ফল এখন বিপরীত হয়। আঙুল-কাটা রসিক আগে কারখানায় কাজ করত, এখন কলোনীর হিসাব দেখে। ভুজঙ্গধরের স্ত্রী নৃত্যকালী ওরফে সুনয়না ওরফে বনলক্ষ্মী একদা অভিনেত্রী ছিল, প্রণয়াসক্ত ধনী ব্যবসায়ীকে খুন করে উধাও হয় ইত্যাদি। এ কি শুধু গোয়েন্দা কাহিনি? একে সামাজিক উপন্যাস বলতে বাধা কোথায়? প্রেম-পরিণয়-অবৈধ সম্পর্ক-ব্ল্যাকমেল-ঈর্ষা-লোভ-হত্যা এসবই তো জীবনযাপনের অঙ্গ। আর এই বিচিত্র জীবনই উপন্যাসের আলম্বন। ‘চিড়িয়াখানা’-এই সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তাই তার গোয়েন্দা চরিত্রের কার্যকলাপে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর ‘মগজাস্ত্রে’র বিবিধ কলাকৌশল এর অন্যতম আকর্ষণ। এইজন্যই ‘চিড়িয়াখানা’র অন্য একটি শ্রেণীগত পরিচয় গোয়েন্দা কাহিনি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক উপন্যাস লেখেননি এমন নয়, ‘বিষের ধোঁয়া’, ‘ছায়াপথিক’ কিংবা ‘রিমঝিম’ এর উদাহরণ। ব্যক্তিহৃদয়ের টানাপোড়েন এবং সিনেমা-জগতের পরিবেশ এইসব উপন্যাসে যতটা প্রাধান্য লাভ করেছে, সামাজিক সমস্যাজনিত সংকট ততটা গভীরতর হয়ে ওঠেনি। তুলনায় সমসময়ের দর্পণ হিসেবে, সমাজবাস্তবতার অভিজ্ঞান হিসেবে ব্যোমকেশের কাহিনি সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। স্মর্তব্য, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল এইরকম-

> “… গোয়েন্দা কাহিনিকে আমি ইনটেলেকচ্যুয়াল লেভেলে রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনি নয়। প্রতিটি কাহিনিকে আপনি শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পড়তে পারেন। কাহিনি মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়- ব্যোমকেশ তারই সমাধান করে। কখনও কখনও সামাজিক সমস্যাও

এর মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'চোরাবালি' গল্পে আছে বিষবার পদস্খলন।... জীবনকে এড়িয়ে কোনদিন গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।"[২]

সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে ব্যোমকেশ দেখেছে বেশিরভাগ মানুষ অর্থ কিংবা কাম, ক্রোধ কিংবা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অপরাধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা চালিত হয় প্রথম ও তৃতীয় রিপুর দ্বারা। বিপত্নীকের নৈশাভিসার, অসুখী দাম্পত্য, অবৈধ প্রণয় কিংবা প্রচণ্ড অর্থলোভক্রমশ এদের স্বাভাবিক জীবনসীমার বাইরে এনে ফেলে এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করে। অনুকূল ডাক্তারের মতো অর্থপিশাচ কিংবা অনাদি হালদারের মতো আদিম রিপুতাড়িত চরিত্র মানবজীবনের নৈতিক শৃঙ্খলার অবক্ষয়ের বৈনাশিক দিকটিকেই তুলে ধরেছে ব্যোমকেশের কাহিনিতে। অনাদি হালদারের মতো 'অসভ্য বজ্জাত ছোটলোক'কে খুন করার জন্য প্রভাতকে ক্ষমাই করেছে ব্যোমকেশ। 'হেঁয়ালির ছন্দ' গল্পে যে ভূপেশবাবু পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল নটবর নস্করকে খুন করে, ব্যোমকেশ তাকেও ক্ষমা করেছিল, বলেছিল, দাঁড়কাক মারলে যদি ফাঁসি না হয় তবে 'শকুনি মারলেও ফাঁসি হওয়া উচিত নয়। অপরাধী যুগলের মৃত্যু আত্মহত্যা কিংবা পলায়ন (যেমন, বহ্নিপতঙ্গ, চিড়িয়াখানা, কহেন কবি কালিদাস ইত্যাদি) কখনো তাকে স্বস্তিই দিয়েছে, 'চোরাবালি'র জমিদারকে দিয়েই দেওয়ান কালীগতির মৃত্যুদণ্ড বিধান করেছেন ব্যোমকেশ। অপরাধীকে ধরার জন্য ব্যোমকেশ 'মগজাস্ত্র'ই ব্যবহার করেছে, অন্য কোনো মারণাস্ত্র নয়। কালো টাকা পুড়িয়ে দিয়েছে, চোরাই অস্ত্র উদ্ধার করেছে, দেশের প্রতিরক্ষা তহবিলে একলক্ষ টাকা আদায় করে নিয়েছে, গোপন চিঠি হাতবদলের জন্য লক্ষাধিক টাকার উৎকোচ নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছে। সব মিলিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশের ব্যক্তিত্বে এমন একটা মহত্ত্ব তথা সামাজিক মধ্যে ২২টি গল্পেরই পটভূমি শহর কলকাতা এবং দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকে বেশ কিছু গল্পের সময়কাল ১৯৫৩-১৯৭০।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শহর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সমকালীন নানারকম অস্থিরতা, সামাজিক নানা সমস্যা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে গভীরভাবে আহত করেছিল। সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গরল সঞ্চিত হয়েছিল, তার উৎসের সত্যসন্ধানে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। তীক্ষ্ণ এই সমাজদৃষ্টির জন্যই দেখা যায় 'রাষ্ট্রবিপ্লব' শব্দটা ব্যোমকেশের গল্পে একাধিকবার এসেছে। রাষ্ট্রবিপ্লব অর্থে শুধু প্রাণনাশী দাঙ্গাই নয়, এর অনুষঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে সামাজিক দুর্নীতি ও নৈরাজ্য। কখনও এমন মনে হয়েছে-

"স্বাধীনতা হয়তো আসিতেছে, কিন্তু তাহা ভোগ করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিব কি? সম্মুখ সমরে যদি বা প্রাণ বাঁচে, কাঁকর ও তেতুঁল বিচির গুঁড়া খাইয়া কতদিন বাঁচিব?"[৩]

(আদিম রিপু) চারপাশে যখন 'প্রকাশ্য হত্যার পাইকারি কারবার', সেই প্রেক্ষাপটেই এই কাহিনি সূত্রপাত-

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলাদেশে, বিশেষত কলিকাতা শহরে, মানুষের জীবনের মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তারপর জিন্না সাহেবের সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন আমরা মৃত্যু দেবতাকে একেবারে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। জাতি হিসাবে আমরা যে টিকিয়া আছি, সেকেবল মৃত্যুর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারি বলিয়াই। বাঘ ও সাপের সঙ্গে আমরা আবহমানকাল বাস করিতেছি, আমাদের মারে কে?"[৪]

জাতির এই অবস্থার পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শরদিন্দু সমকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন-

"কলিকাতার সাধারণ জীবনযাত্রায় কিন্তু কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। রাস্তায় ট্রাম-বাস তেমনি চলিতেছে, মানুষের কর্মতৎপরতার বিরাম নাই। দুই সম্প্রদায়ের সীমান্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হৈ হৈ দুমদাম শব্দ ওঠে, চকিতে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তায় দুই চারিটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। সুরাবর্দি সাহেবের পুলিশ আসিয়া হিন্দুদের শাসন করে, মৃতদেহের সংখ্যা দুই চারিটা বাড়িয়া যায়। কোথা হইতে মোটর ভ্যান আসিয়া মৃতদেহগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া অন্তর্ধান করে। তারপর আবার নগরীর জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিতে থাকে।"[৫]

এই উদাসীন শহরের পটেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দেখে নিতে চেয়েছিলেন ক্রমশ ভেঙে-পড়া সামাজিক মূল্যবোধগুলিকে। বিশৃঙ্খল এই পরিবেশেই তো পুত্রের পছন্দের পাত্রীকে বিবাহ কিংবা নগদ অর্থে কিনে নিতে চায়

অনাদি হালদার, পালক পিতাকে এজন্য হত্যা করে প্রভাত। আর সেই মেয়েটি, শিউলি, সিনেমার দালাল গদানন্দ তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং বিয়ে করে, এই নিয়ে তৃতীয়বার। গদানন্দর আগের দুই বউ-এর মৃত্যু রহস্যজনক। এই বিপর্যস্ত সময়েই কেষ্ট দাস অনাদি হালদারকে ব্ল্যাকমেল করে, ন্যাপা বিকল্প চাবি তৈরি করে সিন্দুক খোলে। এমনকি তৎকালীন মুসলিম লিগ সরকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ থানার জমাদারের মন্তব্য। অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর ন্যাপা থানায় খবর দিতে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলেছিল-

> "থানায় কেউ ছিল না। একটা জমাদার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার কথা শুনে রেগে উঠল, বললে-যাও যাও, একটা হিন্দু মরেছে তার আবার এত হৈ-চৈ কীসের। লাশ রাস্তায় ফেলে দাও গে।"[৬]

অনিশ্চিত বিপর্যস্ত এই সময়ের ভার তখন তুলে নেয় বাঁটুল, এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্বঘোষিত পরিত্রাতা-গুণ্ডার সর্দার।

> "বেঁটে নিটোল চেহারা, তৈলাক্ত ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে বাঁটুলের প্রতাপ বাড়িয়াছে, পাড়ার সজ্জনদের গুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিবার অজুহাতে সে সকলের নিকট সেলামী আদায় করে। সেলামী না দিলে হয়তো কোনদিন বাঁটুলের হাতেই প্রাণটা যাইবে এই ভয়ে সকলেই সেলামী দিত।"[৭]

বাঁটুল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকান সৈন্যদের কাছ থেকে জলের দরে কেনা আগ্নেয়াস্ত্র সাধারণ মানুষকে বিক্রি করত। বোঝা যায়, দাঙ্গার সেইসব ভয়ানক দিনে অনেকেই নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখত। এই বাঁটুল চরিত্ররা কিন্তু লেখকের কল্পনার সৃষ্টি নয়, সেই সময়ের গর্ভেই এই ধরনের গুণ্ডার জন্ম এবং ভদ্রলোকেরাও যে তাদের খাতির করত, অন্তত প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করত না তার প্রমাণ ব্যোমকেশের বাড়িতে বাঁটুলের যাতায়াত এবং অস্ত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব। স্বাভাবিক অবস্থায় বাঁটুলরা অবাঞ্ছিত, তাদের কার্যকলাপ অনৈতিক এবং শাস্তিযোগ্য; কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে জাতির সংকটকালে তারাই যে 'প্রয়োজনীয়' হয়ে ওঠে, সেই সত্যকে শরদিন্দু অস্বীকার করেননি এবং এই বিরোধাভাস সমাজের সর্বস্তরেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে ব্যোমকেশের যোগাযোগ যেমন 'আদিম রিপু' গল্পের স্থানিক চেহারাটাকে জাতীয় স্তরে বিস্তৃত করেছে, তেমনই চোরাকারবারে অর্জিত প্রায় লাখ দু'য়েক টাকা পুড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতার প্রভাতে মহত্ত্বের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বস্তুত, 'আদিম রিপু'র দেশকালপট শরদিন্দুর সমাজবাস্তবতাবোধের গভীরতাকে সম্যক ধারণ করে আছে। এমনকি রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রেললাইনের দু'ধারে বেড়ে ওঠা ঘাস কিছু জমা নিয়ে ও গোয়ালাদের সেই ঘাস বিক্রয় করে বিকাশ যে কিছু উপার্জন করছে, এই ছোট খবরটিও তিনি দিতে ভোলেননি।

'সত্যান্বেষী' গল্প লেখা হয়েছে মাঘ ১৩৩৯-এ। সেইসময়কার কলকাতা শহর ও কোকেন-কেন্দ্রিক ব্যবসা ও অপরাধের উল্লেখ আছে এই গল্পে। আছে কলকাতার এক বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক খুঁটিনাটি-

> "... এই শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার একদিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্যদিকে খোলার বস্তি এবং তৃতীয় দিকে তির্যক চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ।"[৮]

দিনের বেলায় শান্ত কর্মব্যস্ত নিরীহ এই অঞ্চলটির চেহারা রাতের দিকে পাল্টে যায়। নিস্তব্ধ প্রায় জনহীন এই পাড়াটাকে তখন অনেকে এড়িয়ে যাওয়ার বা দ্রুত পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

> "পুলিশের অনুমান, এই অঞ্চলে কোথাও একটি কোকেনের গুপ্ত আড়ত আছে, সেখান হইতে সর্বত্র কোকেন সরবরাহ হয়। একদল চতুর অপরাধী পুলিশের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন যাবৎ এই আইন-বিগর্হিত ব্যবসায় চালাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অপরাধীদের নেতা কে এবং ইহাদের গুপ্তভাণ্ডার কোথায়, তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"[৯]

অবশেষে এই রহস্যের সমাধান করে 'সত্যান্বেষী' ব্যোমকেশ বক্সী। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ছদ্মবেশে কোকেনের কারবারী অনুকুলবাবুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্বার্থরক্ষার্থে মানুষের নিষ্ঠুরতা যে কতদূর যেতে পারে তা ঐ ভাটিয়া আর অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়েই পথের কাঁটা সরাবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, দেখা যায় কন্টকবিদ্ধ হয়ে যারা মারা গেলেন তারা প্রায় সকলেই প্রৌঢ়, অপুত্রক

এবং অর্থবান।বোঝা যায়, সম্পত্তি হস্তগত করার লক্ষ্যেই পথের কাঁটা দূর করতে চেয়েছেন কেউ কেউ এবং সেইসূত্রেই পথের কাঁটা দূরীকরণের অভিপ্রায়ে আরও কেউ সামিল হয়েছে। মানুষের আত্যন্তিক লোভের এ-এক উদাহরণ। যুদ্ধের পর অস্ত্রের চোরাকারবার প্রায় দেশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল এবং স্বভাবতই সমাজজীবনের পক্ষে তা অনুকূল ছিল না। 'রক্তের দাগ' (আষাঢ় ১৩৬৩) কিংবা 'অমৃতের মৃত্যু' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬) গল্পে শরদিন্দু এই বিষয়টির স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'রক্তের দাগ' গল্পে নন্দ জানিয়েছে 'যুদ্ধের পর অনেক চোরাই পিস্তল কিনতে পাওয়া যেত' এবং মল্লবীর ভূতেশ্বরের কাছে একটা লোক চোরাই পিস্তল বিক্রি করতে এসেছিল। অমৃতের মৃত্যুর কারণ সে এইরকম এক অস্ত্রব্যবসায়ীকে দেখে ফেলেছিল। সান্তালগোলার কাছাকাছি বাঘমারি গ্রামে ছিল বিশ্বনাথ দাসের চোরাই অস্ত্রের ভান্ডার। এ কাহিনিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে-

> "গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী সৈন্য আসিয়া এদেশের নানা স্থানে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল; তারপর যুদ্ধের শেষে বিদেশীরা চলিয়া গেল, দেশে স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। স্বাধীনতার রক্ত-স্নান শেষ করিয়া দেশ যখন মাথা তুলিল তখন দেখিল হ্রদের উপরিভাগ শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশে হিংসুক নক্রকুল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিদেশী সৈন্যদলের ফেলিয়া-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই নক্রকুলের নখদন্ত। রেলের দুর্ঘটনা, আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণ, সশস্ত্র ডাকাতি-নূতন শাসনতন্ত্রকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল।"[১০]

এই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কালোবাজারীদের চিহ্নিত করে এক বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিল ব্যোমকেশ।

চোরাই অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল মারাত্মক প্রাণঘাতী কয়েকটি বিষের ব্যবহার। 'বহ্নিপতঙ্গ' (১৯৫৬) কাহিনি শুরুতেই রয়েছে পারিপার্শ্বিক অবক্ষয় ও ক্রমবিনষ্টির ছবি-'মহাযুদ্ধের চিতা নিভিলেও আকাশ বাতাস চিতাভস্মে আচ্ছন্ন, তদুপরি স্বাধীনতার প্রসব যন্ত্রণা।' বস্তুত, দেশের স্বাধীনতালাভের উল্লাসের গভীরে যে কতবড় ক্ষত ছিল, শরদিন্দুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা' ধরা পড়েছিল। পুলিশ অফিসার পুরন্দর পাণ্ডে সেই সামাজিক দুষ্টক্ষতেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন-

> "এই মহাযুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীতে ঠগ-জোচ্চোর-খুনী-বদমায়েসের সংখ্যা বেড়ে গেছে, ...বিদেশী সিপাহীরা এসে নানারকম বিজাতীয় বজ্জাতি শিখিয়ে গেছে। কতরকম নেশার জিনিস, কত রকম বিষ যে দেশে ঢুকেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।"[১১]

এমনই একটা সাংঘাতিক মারণ-বিষ 'কিউরারি' রক্তের সঙ্গে এক বিন্দু মিশলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। আরও একটি সত্যের প্রকাশ ঘটে এই বিশৃঙ্খল নীতিবর্জিত পরিবেশে কেননা-

> "যুদ্ধ আর রাষ্ট্রবিপ্লব সভ্য মানুষকে অসভ্য করে তোলে। তখন বিবেক বুদ্ধির মুখোশ পড়ে খসে, কাঁচা-খেকো জানোয়ারটি বেরিয়ে আসে। কী ঠুনকো আমাদের সভ্যতা।"[১২]

কিন্তু ব্যোমকেশের কাছে আরও ভয়ানক মনে হয়েছে সেইসব মুখ, যারা বাইরে শান্তশিষ্ট নিরীহ জীব আর ভিতরে তীক্ষ্ণ নখদন্ত বিশিষ্ট।

'বহ্নিপতঙ্গ' উপন্যাসেও দীপনারায়ণ সিং-শকুন্তলার কাহিনিকে কেন্দ্র করে বিহারের উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত সমাজের যে ছবি আছে, আপাত-ভদ্রতার আড়ালে তার নীচতা ও বিকৃতি লেখক যেন স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এলিট সমাজকে সন্তুষ্ট রেখে নিজের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাওয়া দীপনারায়ণ, প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন জগন্নাথ ডাক্তার, দেওয়ান গঙ্গাধর বংশী কিংবা লম্পট মিথ্যাবাদী নর্মদাশঙ্করের মতো চরিত্রের মধ্যে দিয়ে 'বহ্নিপতঙ্গ'—এ ফুটে উঠেছে সামাজিক অনৈতিক পরিবেশ। শকুন্তলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা, কিন্তু সে-ও বিবাহিত জীবনের শর্তকে লঙ্ঘন করেছে। বাল্যবন্ধুর সঙ্গে গোপন অভিসারে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরী শকুন্তলাকে পাবার লোভে দীপনারায়ণকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশীদার। অর্থাৎ রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা যে ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কও বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে, সত্যান্বেষীর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সেই প্রচ্ছন্ন সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন শরদিন্দু, ব্যোমকেশ-পাঠককে টেনে এনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন এই সমাজ-দর্পণের সামনে-গল্পের সত্য থেকে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সমাজের সত্যে।

মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, শরদিন্দুর এই গোয়েন্দা কাহিনিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের পারিবারিক-সামাজিক জীবনের একটা অনুপুঙ্খ ও বিশ্বস্ত চিত্র আছে এবং তার ঐতিহাসিক মূল্যও কিছু কম নয়। এইসূত্রেই

ব্যোমকেশের গল্পে একান্নবর্তী পরিবার, প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের মধ্যে সংঘাত ও সৌহার্দ্য, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে। সপুত্রক ব্যোমকেশ-সত্যবতী ও লেখক অজিতের পারিবারিক জীবনের মধুর ছবিটিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। পাশাপাশি শহরের অভিজাত ও অনভিজাত পরিবারের অন্দরমহলের গল্পে বিচিত্র জীবন-প্রবাহের কৌতূহলকর নানা দিক ধরা পড়েছে। যেমন, অর্থমনর্থম্ (১৩৪০) গল্প। অর্থবান করালীবাবু অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তার পরিবারের যে ছবি ব্যোমকেশের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তা এইরকম করালীবাবুর পোষ্য পাঁচজন-তিন ভাগ্নে এবং শ্যালিকার দুই ছেলে-মেয়ে। তিন ভাগ্নের মধ্যে মতিলাল এবং মাখনলাল দুজনেরই বাড়ির 'বাইরে' যাবার নেশা আছে, ফণিভূষণ বিকলাঙ্গ, শ্যালিকা-পুত্র সুকুমার ডাক্তারি পড়ে, সত্যবতী তার বোন। করালীবাবু প্রায় নিয়মিত উইল বদল করতেন এবং সেটা তার মেজাজের ওপর নির্ভর করত কখন কাকে সম্পত্তি দেবেন কিংবা বঞ্চিত করবেন। করালীবাবুর মৃত্যু-রহস্য উদ্ধার ব্যোমকেশের কাজ, তা আলোচনার পরিসরও বর্তমান প্রবন্ধ নয়; কিন্তু এটা স্পষ্ট যে এই কাহিনিতে বাড়ির আশ্রিতদের যে ছবি ধরা পড়েছে তা খুব সন্তোষজনক নয়। কিংবা ধরা যাক্ 'মগ্নমৈনাক' (১৯৬৩) গল্পটি। সন্তোষ সমাদ্দার খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ধনী ব্যবসায়ী, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু চরিত্রবান ছিলেন না। কার্তন-গায়িকা সুকুমারীর সঙ্গে গোপন ডেরায় সপ্তাহান্তিক দিনগুলি কাটাতেন। আর দেশভাগের সময়ে ঢাকায় মীনা নাম্নী এক সুন্দরী গুপ্তচরের সঙ্গে তার প্রণয় ছিল, ফলে রাজনৈতিক দৌলোতে নিযুক্ত সন্তোষ সমাদ্দার মোহমত্ত ভাবে দেশের গোপন তথ্য তাকে শুধু মৌখিকভাবে নয়, চিঠিতে লিখেও পাচার করতেন। ব্যোমকেশ বলছে-

> "অবস্থাটা ভেবে দেখ, রাজনৈতিক কূটযুদ্ধ চলছে, ওদের গুপ্ত অভিপ্রায় আমরা কিছুতে আমি জানি না, ওরা আমাদের গুপ্ত অভিপ্রায় সমস্ত জানে।ফল অনিবার্য।
>
> স্নতশবাবুর তখন এমন মহোমত্ত অবস্থা জে,তিনি মীনাকে কেবল মৌখিক গুপ্তকথা জানিয়ে নিরস্ত হননি, যখন কলকাতায় থাকতেন তখন চিঠি লিখে তাকে গুপ্ত সংবাদ জানাতেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কী আমি জানি না,সম্ভত অন্য কোন দেশনেতার প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা।কিন্তু তিনি জেনেশুনে মীনাকে খবর পাঠাতেন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।... তিনি জানতেন মীনা বিপঞ্জ দলের গুপ্তচর।"[১৩]

মীনার কন্যা হেনা এই চিঠিগুলি নিয়ে সন্তোষবাবুকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে এবং পরে সন্তোষ সমাদ্দার ছাদ থেকে ঠেলে হেনাকে হত্যা করে। সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি পর্যন্ত তার স্বামীকে বিশ্বাস করত না, বাইরের লোকের কাছেও স্বামীর চরিত্র নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছে। আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির চরিত্রেও যে কত নীতিহীনতা লুকিয়ে থাকতে পারে, এই গল্পে তার দৃষ্টান্ত আছে। শরদিন্দু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেশের দুর্গতির কারণ চিহ্নিত করেছেন 'দেশদ্রোহী' দেশপ্রেমিকের মুখোশ খুলে দিয়ে। হেনাকে নিয়ে উদয়চাঁদ-যুগলচাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য, চামেলিদেবীর বিরূপতা, চিংড়ির ঈর্ষা নেংটির কৌতূহল-সব মিলিয়ে একটা পারিবারিক ছবি আছে। 'অগ্নিবাণ' (বৈশাখ ১৩৪২) গল্পে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-র কাছ থেকে অব্যাহতি পেতে বিষ-বারুদে দেশলাই তৈরি করেছিলেন বৈজ্ঞানিক দেবকুমারবাবু, কিন্তু অসাবধানে দুর্ভাগ্যবশত মৃত্যু হয়েছে তার প্রথম পক্ষের মেয়ে রেখা ও ছেলে হাবুলের। দ্বিতীয় স্ত্রী-র মৃত্যুর পর জীবনবীমার টাকা দিয়ে দেবকুমারবাবু নিজের ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আবার নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু তা-ও ব্যর্থ হয়েছে। 'মণিমণ্ডন' (মাঘ ১৩৬৫) ও কহেন কবি কালিদাস' (বৈশাখ ১৩৬৮) গল্পে ধনবান ব্যবসায়ী পিতার সঙ্গে পুত্র-পুত্রবধূর সম্পর্ক মধুর। তবে শেষোক্ত গল্পে ধনী-পুত্রের অসৎ সংসর্গে পড়ে জুয়া খেলার কথা আছে।

পারিবারিক জীবনচিত্র পরিস্ফুটনের প্রসঙ্গে কখনও কখনও উচ্চারিত হয়েছে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিংবা নারীর শিক্ষার মতো বিষয়। 'রক্তের দাগ' গল্পে উচ্ছৃঙ্খল যুবক সত্যকামের বে-হিসেবি দিনযাপনের কারণ খুঁজতে গিয়ে ব্যোমকেশ পৌঁছে গেছে তার জন্মপরিচয়গত রহস্যে। জানা গেছে সত্যকাম উষাপতিবাবুর সন্তান নয়। সুচিত্রা এম্পোরিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা রমাকান্ত চৌধুরীর গর্ভবতী কন্যা সুচিত্রার সঙ্গে দোকানের অ্যাসিস্ট্যান্ট অনাথ দরিদ্র যুবক ঊষাপতির বিয়ে দিয়েছেন এবং ক্রমে তাকে দোকানের আট-আনা অংশীদার করেছেন। রমাকান্ত চৌধুরীর বক্তব্য ছিল এইরকম-

> "সুচিত্রা ছেলেমানুষ, মা-মরা মেয়ে; তার ওপর আজকাল দেশে যে হাওয়া বইতে শুরু করেছে তাতে মেয়েদের সামলে রাখাই দায়। সুচিত্রা খুবই ভাল মেয়ে, কেবল বর্তমান আবহাওয়ার দোষে

একটু ভুল করে ফেলেছে। আজকাল ঘরে ঘরে এই ব্যাপার হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়, কিন্তু বাইরের লোক কি জানতে পারে?”[১৪]

রাজকন্যা দাগী হলেও অর্ধেক রাজত্বের প্রলোভনে শেষপর্যন্ত ঊষাপতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নিয়েছিল, কিন্তু সত্যকামের বেপরোয়া জীবনযাপনকে মানতে পারেনি। স্ত্রী-র কানীন পুত্রকে শেষপর্যন্ত খুন করেছিল উষাপতি। ব্যোমকেশও সময়কে সাক্ষী রেখে বলেছিল-

“প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঁধন ভাঙার একটা ঢেউ এসেছিল, উচ্চবিত্ত সমাজের অবাধ মেলা-মেশা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুচিত্রা আলোর নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে একটু বেশি মাতামাতি করেছিলেন।... কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তাঁর হুঁশ হল।”[১৫]

সত্যকাম লম্পট বটে, কিন্তু ‘মেয়েরাও নেহাত নির্দোষ নয়’- এই সত্যটি ব্যোমকেশ উচ্চারণ করেছিল। ‘বহ্নিপতঙ্গ’-এ শকুন্তলার স্বাধীন-বিহারের কথাটি আগেই বলা হয়েছে। ‘অগ্নিবাণী’-তে রুদ্র ডাক্তারের ছেলে নন্তুর সঙ্গে রেখার প্রণয় এবং পণ বিষয়ে পারিবারিক মনোমালিন্য, ‘খুঁজি খুঁজি নারি’-তে রামেশ্বরবাবুর মেয়ে নলিনীর স্বেচ্ছাবিবাহ ও পারিবারিক অসন্তোষ এবং ‘শজারুর কাঁটা’ (মার্চ ১৯৬৭)-তেও অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। দীপা মেয়ে-স্কুল থেকে ‘সীনিয়র কেম্ব্রিজ’ পাশ করেছিল, একেবারে পর্দানশীন নয় তবে ‘বাইরে যেতে হলে বাপ কিংবা ভাই সঙ্গে থাকবে’- এমনই বাড়ির সিদ্ধান্ত। দীপার মন কিন্তু বিদ্রোহে ভরা।

“তার মনের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, নিজস্ব মতামত আছে; সে মুখ বুজে বাড়ির শাসন সহ্য করে বটে, কিন্তু তার মনে সুখ নেই। মেয়ে হয়ে বাংলাদেশে জন্মেছে বলে কি তার কোনো স্বাধীনতা নেই।”[১৬]

এ গল্প যখন লেখা হচ্ছে তখন স্বাধীনতার পর দুটি দশক পেরিয়ে গেছে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করছে। সে সময়েও কলকাতা শহরের কিছু রক্ষণশীল বনেদি পরিবারে মেয়েদের অবস্থান কিরকম ছিল, এ গল্পের পরিসরে তা ধরা পড়েছে। এহেন দীপা যখন ভিন্ন জাতের এক যুবকের প্রেমে পড়ে এবং তাকে বিবাহ করতে চেয়ে পিতামহের অনুমতি চায় তখন তিনি চিৎকার করে ওঠেন-

“এসব আজকাল হচ্ছে কি? নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করবে। তুমি কি ম্লেচ্ছ বংশের মেয়ে?”[১৭]

দীপা বাড়ি থেকে পালাতে গিয়েও পারেনি, নজরবন্দী হয়ে থেকেছে, তারপর অভিভাবকদের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। স্বামীর প্রতি কীভাবে তার প্রাথমিক বিরাগ পরে প্রবল অনুরাগে পরিণত হল তা’ এই আলোচনার অভিমুখ নয়। কিন্তু নানাবিধ অনুশাসনের মধ্যে থেকেও মেয়েরা যে সেদিন নিজেদের অনুভবকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিল, সেটাই বড়ো কথা। ‘চিত্রচোর’ গল্পে দেখি বিধবা রজনী আর ডাক্তার ঘটক বিবাহে সম্মত হয়েছে, কিন্তু পিতার জীবদ্দশায় তা গোপন রাখাই শ্রেয় মনে করেছে। ‘চোরাবালি’ গল্পে জমিদার-গৃহে আশ্রিতা বিধবা রাধা মৃত সন্তান প্রসব করে বিতাড়িত হয়েছে, জমিদার হিমাংশুবাবু তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছে। শুধু নারীর অসহায়তা নয়, কখনও যে তারা কী ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে, লেখক তার ইঙ্গিত দিতেও ভোলেননি। ‘অদ্বিতীয়’ (ফাল্গুন ১৩৬৮) গল্পটির সূচনায় এমনই এক সময়ের পটভূমি-

“কিছুকাল হইতে কলিকাতা শহরে এক নূতন উৎপাতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে... কখনও একটি, কখনও বা একাধিক ভদ্রশ্রেণির যুবতী তাক্ বুঝিয়া দুপুরবেলা বাহির হয়। পুরুষেরা তখন কাজে গিয়াছে, বাড়িতে মেয়েরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিতেছে।এই সময় যুবতীরা গিয়া দরজায় টোকা মারে... গৃহিণী ভাবেন ফেরিওয়ালী, তিনি দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি যুবতীরা ঘরে ঢুকিয়া পড়ে, ছুরি বা পিস্তল দেখাইয়া টাকাকড়ি গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে।”[১৮]

জেনানা ফাটকের এক বন্দিনী জেলখানার গার্ডকে খুন করে নিরুদ্দিষ্ট, স্বামী-স্ত্রী মিলে ধনবান ব্যবসায়ীকে খুন করে ফেরার হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বিরল নয়। এমনকি বর্ষীয়সী ডাক্তার শোভনা রায় সুকান্ত সোমকে ছুরিকাঘাতে খুন করে তার মেয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে (রুম নম্বর দুই, জুলাই ১৯৬৪)। অর্থাৎ সমাজে মেয়ে-অপরাধীর সংখ্যাও খুব কম ছিল না-এমন একটা আভাসও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ব্যোমকেশের কাহিনিগুলির মনোযোগী পাঠে রাষ্ট্রের পুলিশি-ব্যবস্থার একটা ছবিও ফুটে ওঠে। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর তথা ডিটেক্টিভ তথা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের সঙ্গে প্রায় সব গল্পেই স্থানীয় থানা, সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন-অধস্তন কর্মচারী কখনও বা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনা ঘটেছে। আর এইসূত্রেই উন্মোচিত হয়েছে পুলিশি ব্যবস্থার বেশ কিছু দৈন্য। - 'অচিন পাখি' এবং 'অদৃশ্য ত্রিকোণ' গল্পে মূল অপরাধী হচ্ছে স্থানীয় থানার দারোগা। 'বহ্নিপতঙ্গ' উপন্যাসে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরী স্বয়ং দীপনারায়ণ হত্যার সঙ্গে জড়িত, শেষে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিণতি। 'চিত্রচোর' গল্পে পাণ্ডেজী স্বয়ং বলেছেন-

> "পুলিশের থানা থেকে যত কথা বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘুষখোর পুলিশ তো আছেই। তাছাড়া পুলিশের পেটে কথা থাকে না।"[১৯]

বলাবাহুল্য, পুলিশিব্যবস্থার এই দুষ্ট ক্ষতটিকে যথার্থ চিহ্নিত করার মতো সাহস সেদিন লেখকের ছিল।

উপসংহার:

এইভাবে দেখা যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশকাহিনিগুলি সমকালের সমাজ-ইতিহাসের এক বিশ্বস্ত চিত্র হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বলা যায় তাঁর খ্যাতির সিংহভাগ জুড়ে আছে ঝিন্দের বন্দী, কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, তুঙ্গ ভদ্রার তীরে-র মতো ঐতিহাসিক রোমান্স। এই রোমান্সের টানেই তাঁর গল্পে এসেছে রহস্য-রোমাঞ্চের আবহ। 'ডিটেকটিভ গল্প' শীর্ষক রচনাটিতে শরদিন্দু একবার বলেছিলেন-

> "দুয়ের মধ্যে তফাৎ কোথায়? একটা অতীতের romance, অন্যটা বর্তমানের romance.... ডিটেকটিভ গল্প যদি অপাংক্তেয় হয় তবে historical romance-ও অপাংক্তেয়..."[২০]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনাপ্রবণ মন ঐতিহাসিক এবং গোয়েন্দা-এই দুই ধরনের কাহিনি মধ্যেই রোমান্সের সন্ধানে তৃপ্তি পেয়েছিল। রোমান্স রচনাই যেমন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, তেমনই সাহিত্য রচনাকালে ঐতিহাসিকের বাস্তবতাবোধ কাম্য মনে করেছিলেন। অধ্যাপক অলোক রায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন- "কেমন করে রোমান্টিক কল্পনার সঙ্গে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে মেলানো সম্ভব তারই নিদর্শন শরদিন্দু-সাহিত্য"। (অলোক রায়, 'সত্যান্বেষী শরদিন্দু', ছোটোগল্পে স্বদেশ স্বজন, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১০) কালসচেতন এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই শরদিন্দুর গোয়েন্দা কাহিনি কেবলমাত্র হত্যা এবং হত্যাকারীর খুঁটিনাটি বর্ণনা নয়। বরং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে চরিত্র নির্বাচন করে দেশকালের বাস্তব পটভূমিতে তাদের স্থাপন করে পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহে তাদের যুক্ত করে গোয়েন্দা গল্পকেও একটা সামাজিক অবয়ব, সামাজিক তাৎপর্য দেবার চেষ্টা করেছেন শরদিন্দু। সমকালের নানা ভাঙন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ব্যথিত চিত্তে, দেশের প্রতি দেশবাসীর প্রতি তাঁর অন্তরে একটা আলাদা জায়গা ছিল। সমাজের দুষ্টচক্রের কার্যকলাপ তাঁকে যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত করেছিল। শাসনের দণ্ড তাঁর হাতে ছিল না, কিন্তু অভিভাবকোচিত একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাগুলি তুলে ধরে মানবচরিত্রের অন্ধকার দিকটি দেখিয়ে দিয়ে তাকে আলোকিত করায় প্রয়াস তিনি আন্তরিকভাবেই করেছিলেন।অপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যাপারে ব্যোমকেশের মনোভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও সহৃদয়তা এখানে পাঠক স্মরণ করতে পারেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এমনও বলেছিলেন-

> "ব্যোমকেশের গল্পে যদি সাহিত্যরস না থাকিয়া শুধু thrill ও সস্তা sensation থাকে তবে সাহিত্য বিচারকগণ তাহাকে দ্বীপান্তরিত করুন আপত্তি নাই। কিন্তু যদি তাহা থাকে তবে শুধু ডিটেকটিভ বলিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার কাহারো নাই।"[২১]

এবং অন্যত্র বলেছিলেন-

> "আমি গল্প রচনা করে পাঠককে আনন্দ দিতে চাই, রসসৃষ্টি করাই আমার স্বধর্ম। কাউকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই, গল্প লেখার ব্যাপদেশে Socialism, Marxism প্রভৃতি মতবাদ প্রচার করাও আমার কাজ নয়। আমি জীবনকে যতটুকু বুঝেছি, জীবন থেকে যতটুকু রস আহরণ করেছি সেইটুকুই আমার পাঠকদের পরিবেশন করেছি।"[২২]

শরদিন্দুর 'বাস্তবের romance'-এর এই-ই বৈশিষ্ট্য যে তা' জীবন-বিবিক্ত নয়, বরং প্রাত্যহিকতায় প্রাণবান, দেশকাল সম্পৃক্ত। ব্যোমকেশ তাঁর intellect ও intuition দিয়ে সমাজের সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, ব্যোমকেশ ও তাঁর স্রষ্টা তাই দুজনেই 'সত্যান্বেষী'।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস ১ম খণ্ড ব্যোমকেশ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রয়োত্রিংশ মুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৪২১, পৃ. ৩৭০।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস ২য় খণ্ড ব্যোমকেশ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশমুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৪১৯, পৃ. ৬৪৭।
৩. তদেব, পৃ. ১২।
৪. তদেব, পৃ. ১৭।
৫. তদেব, পৃ. ১৭।
৬. তদেব, পৃ. ৩৬।
৭. তদেব, পৃ. ১৮।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস ১ম খণ্ড ব্যোমকেশ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রয়োত্রিংশ মুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৪২১, পৃ. ২০৮।
৯. তদেব, পৃ. ১৫।
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস ২য় খণ্ড ব্যোমকেশ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশমুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৪১৯ , পৃ. ২০৮।
১১. তদেব, পৃ. ১০৩।
১২. তদেব, পৃ. ১০৪।
১৩. তদেব, পৃ. ৪১৬।
১৪. তদেব, পৃ. ১৮৪।
১৫. তদেব, পৃ. ১৮৫।
১৬. তদেব, পৃ. ৪৯২।
১৭. তদেব, পৃ. ৪৯৩।
১৮. তদেব, পৃ. ৩৫৪।
১৯. তদেব, পৃ. ২৬৫।
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস দ্বাদশ খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশমুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৩৯৯ , পৃ. ২১৬।
২১. তদেব, পৃ. ২১৬।
২২. তদেব, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 65- 71
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.180

মুহূর্তে বদলে যায় নারীর জীবন: মহাশ্বেতা দেবীর ‘প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে’ উপন্যাস

অনসূয়া কুণ্ডু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.09.2025; Accepted: 12.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Almost all women writers have spoken out about crimes committed against women. But before 20th century they mostly talked about love, marriage, widowhood and domestic violence. After enduring domestic violence for a long time, women also preferred to remain silent and they become almost like domestic animals. In cases of sexual violence against them, the victims kept quiet for fear of losing their honor.
From the second half of the 20th century, the level of sexual assault on women increased many times due to the movement out of the house. Mahasweta Devi's work is a powerful exploration of social justice, women's rights, and the struggles of marginalized communities. She sheds light on the harsh realities of domestic violence, sexual assault and other forms of violence faced by women. The novel Every Fifty-Four Minutes is a shining example of how a woman's life changes in an instant, centered around a rape.

Keywords: widowhood, Domestic violence, Sexual violence, Victims, Social justice, Rape

বিশ শতকের আগে পর্যন্ত নারীদের কোনও নিজস্ব উচ্চারণ না থাকায় পৃথক ও সমান্তরাল সত্তা হিসেবে তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্বীকৃতি পায়নি। তাদের আপন স্বরন্যাস খুঁজে নেওয়ার জন্যে দুরূহতম সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। অপরদিকে পিতৃতান্ত্রিক যুক্তিশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত পুরুষ নারীর প্রতি নৃশংস অত্যাচার করার ছাড়পত্র লাভ করেছে। সিমন দ্য বোভোয়া-র মতে মানুষের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির জন্যে সত্তার দ্বিবিধ প্রকাশের অর্ন্তবর্তী ব্যবধান বিশ্লেষণ খুবই কার্যকরী। তিনি দেখিয়েছেন শরীর মূলত; নিয়ত উপস্থিত ও বিষয়গত অস্তিত্ব। কারণ একে—দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, শোনা যায়, স্বাদ ও ঘ্রাণ নেওয়া যায়। এক কথায়, দেহ হল পর্যবেক্ষিত বিপরীতক্রমে পর্যবেক্ষক সত্তা দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ নেয় ও স্বাদ নেয়। অর্থাৎ ঐ সত্তা নিজে পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়। নারীর শারীরিক অভিজ্ঞতা নানা অনুপুঙ্খের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব-চেতনার বিশিষ্ট একটি ধারণাকে প্রকাশ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া জুড়ে থাকে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের প্রেক্ষিত। অজস্র ঘাত প্রতিঘাতে পূর্ণ সমাজে বিষয় ও বিষয়ীর সন্ধান যেমন সহজে নিষ্পন্ন হয় না, তেমনই নারীর সঙ্গে সহযোগী বা অসহযোগী সম্পর্ক-বিন্যাসও বিচিত্র জটিলতার জন্ম দেয়। এই জটিলতার সর্বোচ্চ নেতিবাচক পরিণতি নারীর প্রতি ধর্ষণ। এই নৃশংস কর্মকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর আইনানুগভাবে ধর্ষণ প্রমাণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও নারীরা কখনোই সুবিচার পায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষকের সাজা হলেও, সমাজ নারীকে হীন চোখে দেখে। ধর্ষিতা নারীকে কখনোই আগের মতো সামাজিক ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে দেখা হয় না। নারীত্বের এই অবদমনের চিত্র সব দেশে সব কালে সমান।

বিশ শতকের সাতের দশকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে নবচেতনার জাগরণ ঘটেছিল। রাজতন্ত্রের অবসানে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয়েছিল এবং সময়ের দাবী মেনে জীবনচেতনার বিবর্তন হয়েছিল। এই সময়ের গণ-সচেতন মহিলা কথাশিল্পী রূপে মহাশ্বেতা দেবীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর লেখায় নারী চরিত্রেরা হয়ে উঠেছে সমাজ

নির্ধারিত বাস্তব সত্য। তৃষ্ণার্ত হরিণ শিশু যেমন জল খাওয়ার আগে মৃত্যু সম্পর্কে অসচেতন থাকে, তেমনই ভাবে নারীদের জীবনেও হঠাৎ করে বিপদ আসে। মুহূর্তে বদলে যায় তাদের জীবনের অভিমুখ। সুদূর অতীতে কবির ভাষায় রূপকার্থে নারীর দেহ-স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

“অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।”[১]

আর আধুনিক কালের একজন জনপ্রিয় নারী সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন বলেছেন—

“নারী কি জানে রূপ আসলে
রূপের নীচে তৈরি করে
অন্ধকার কূপ!”[২]

আসলে মনু কথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা কেবল ভোগের উপাদান মাত্র। মনু মনে করেন— জন্মে যৌবনে বার্ধক্যে নারীরা পুরুষের অধীন। মনুসংহিতায় নারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে বলা হয়েছে—

“পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্যাদুভে কুলে।।”[৩]

অর্থাৎ স্ত্রীলোক কখনও পিতা, স্বামী কিংবা পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; কারণ স্ত্রীলোক এদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে পিতৃকুল ও পতিকুল—উভয় কুলকেই কলঙ্কিত করে তোলে। সেই ভাবনার প্রতিফলন প্রতিনিয়ত এই সমাজে ঘটতে দেখা যায়। নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অন্যায়গুলির সুবিচারের জন্য নানা ধরনের আইনের ধারা খাতায় কলমে লেখা থাকলেও বাস্তবে তা কার্যকরী রূপ পায় না। একজন নারীর জীবন মুহূর্তেই পুরুষতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাকে পুনরায় আলোয় ফিরিয়ে আনার জন্য আইনের অনুশাসনের থেকেও জরুরি পার্শ্ববর্তী মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন। নারীর জীবন কলঙ্কিত হওয়ার নেপথ্যে ধাপে ধাপে যে বিষয়গুলি দায়ী, সেগুলি হল—

ক. প্রেমের ফাঁদে পড়ে একজন পুরুষের ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়া।
খ. কারও দ্বারা ভয় পেয়ে ক্রমাগত ব্ল্যাকমেলিং-এর শিকার হওয়া।
গ. ট্রাফিকিং হওয়া বা পাচার হয়ে যাওয়া।
ঘ. গার্হস্থ্য হিংসার কবলে পড়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া কিংবা চাকরি ছেড়ে দেওয়া।
ঙ. জোর করে, ফুসলিয়ে অথবা কোন মাদকদ্রব্য মিশিয়ে আবেশাচ্ছন্ন করে নারীকে শ্লীলতাতাহানি করা।
চ. আচমকা বা অতর্কিতে নারীকে তুলে নিয়ে গিয়ে বা ঘরে ঢুকে নারীকে ধর্ষণ করা।

প্রতিটি ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী সাজার বর্ণনা সাংবিধানিক বিচার ব্যবস্থায় থাকলেও নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হওয়া প্রত্যেকটি ঘটনাই অতর্কিতে ঘটে। একজন নারী যখন বুঝতে পারে, তখন তার আর কিছুই করার থাকে না। ভোগ লালসায় মত্ত পেশী-শক্তিতে উর্বর পুরুষেরা নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। যে-কোনও ধর্ষিতা নারীর শরীরে প্রবল আঘাতের চিহ্ন দগদগে ক্ষতের মতো ফুটে থাকলেও; ধর্ষণ প্রমাণ করার ক্ষমতা বিচার ব্যবস্থার হাতে থাকে না। নারীদের জন্য এই অচলাবস্থা কিছু আইনি প্রতিরক্ষা পেলেও শেষ রক্ষা হয় না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক আইন ও আইনের বিভিন্ন ধারার বদল করা হচ্ছে নারীদের আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে। অনৈতিক পাচার (রোধ) আইন ১৯৫৬, যৌতুক প্রতিরোধ আইন ১৯৬১, নারীদের নিয়ে অশ্লীল বিবৃতি (প্রতিরোধ) আইন ১৯৮৬, সতীদাহ প্রথা রোধ ১৯৮৭, গৃহহিংসা/পারিবারিক হিংসা থেকে নারী সুরক্ষা আইন ২005 ইত্যাদি। এই প্রকার কয়েকটি আইনের ধারা এখানে উল্লেখ করা হল—

৩০৪ বি ধারা. যৌতুক হত্যা:

যেখানে বিয়ের সাতবছরের ভেতরে আগুনে পুড়ে অথবা গুরুতর আহত হয়ে অথবা অন্যান্য কারণে স্ত্রীর মৃত্যু হলে এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার স্বামী অথবা স্বামীর অন্য কোনো আত্মীয়ের দ্বারা নির্যাতিত, অথবা যৌতুক দাবির কোনো সংযোগ পাওয়া গেলে সেই মৃত্যুকে ‘যৌতুক মৃত্যু’ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় এই মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে। যে কেউ যৌতুক হত্যা সংঘটিত করবে তার সাতবছরের অধিক সশ্রম কারাদণ্ড হবে অথবা সেই শাস্তি বেড়ে যাবজ্জীবন হতেও পারে। হত্যার প্রচেষ্টাতেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থরাশি জরিমানাও হতে পারে।

৩৫৪. ধারায় নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে হামলা বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ:

এই ধারা যৌন নিগ্রহের অপরাধের মধ্যে পড়তে পারে। এই অপরাধে অভিযুক্তের সশ্রম কারাদণ্ডের সময়কাল তিনবছর পর্যন্ত অথবা জরিমানা, কিংবা দু'টোই হতে পারে।

৩৫৪ বি. ধারায় নিগ্রহ অথবা দুষ্কার্য বলপ্রয়োগ করে নারীকে অসম্মান:

বলপ্রয়োগ করে নারীকে অসম্মান করার অভিপ্রায় কোনো পুরুষ যে নিগ্রহ করেছে অথবা অন্যায় বলপ্রয়োগ করেছে কোনো নারীর উপর অথবা অসম্মান করার অভিপ্রায়ে এমন অসৎ কার্য, নগ্ন, বিবস্ত্র হতে বাধ্য করেছে, তার জন্য ন্যূনতম তিন বছরের কারাদণ্ড, সেটি সাত বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

৩৫৪ সি. ধারায় ঈক্ষণকর্ম/ যৌন দৃশ্যকামী অভিপ্রায়:

নারী যখন একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তে থাকে যেখানে নারীটি সাধারণত আশা করে কেউ তাকে লক্ষ করছে না। তখন যদি কেউ লুকিয়ে লক্ষ করে, বা ছবি তোলে, বা ছবি তুলে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় অথবা সরাসরি কিংবা বৈদ্যুতিন (সামাজিক) মাধ্যমে দেয়, তাহলে অপরাধের কারাদণ্ড তিনবছর থেকে সাত বছর হতে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

৩৫৪ ডি. ধারায় গোপনে অনুসরণ করা:

যে-কোনও ব্যক্তি একজন মহিলাকে অনুসরণ করে বা এরকম মহিলার দ্বারা বিরক্তি প্রকাশের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করে বা কোনো মহিলার আন্তর্জাল, ইমেল বা অন্য কোনো মাধ্যমের বৈদ্যুতিন ব্যবহার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে, তবে শাস্তি ভোগ করতে হবে যা তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে বা জরিমানাসহ বা উভয়ই হতে পারে।

৩৬৬ এ ধারা. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে সংগ্রহ করা:

যদি কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম বয়স) নারীকে কোনও উপায়ে ভুলিয়ে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় অথবা আপত্তিকর এমন কিছু করতে বলা হয়। যার উদ্দেশ্য সেই নারীকে বল প্রয়োগ করে অথবা ফুসলিয়ে কারোর সঙ্গে অবৈধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত করা অথবা তার সম্ভাবনা রাখা হয়। তাহলে যে ব্যক্তি এর জন্য দায়ী তার দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সেইসঙ্গে জরিমানাও ধার্য করা হতে পারে।

৩৬৬ বি ধারা বিদেশ থেকে নারী আমদানি করা:

যদি বিদেশ থেকে (বা জম্মু ও কাশ্মীর থেকে) একুশ বছরের কম বয়সি কোনও নারীকে আমদানি করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে তাকে অবৈধ যৌনসংসর্গে লিপ্ত করানো হবে বা তার সম্ভাবনা থাকবে, তাহলে সেই ব্যক্তির দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সেইসঙ্গে জরিমানাও ধার্য করা হতে পারে।

৩৬৭ ধারায় গুরুতর আহত, দাসত্ব ইত্যাদির জন্য ব্যক্তিকে অপহরণ করা:

পরাধীন করা, অসহায় ঝুঁকিতে ফেলা, গুরুতর আহত করা, দাসত্বের শিকার করা, অপ্রকৃতস্থ লালসার শিকার করা হলে দশ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এবং জরিমানা রাশিও ধার্য হতে পারে।

৩৬৮ ধারায় অন্যায়ভাবে লুকিয়ে রাখা বা কারাগারে রাখা:

যে-কোনও ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছে এইরকম ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে গোপন করে বা আবদ্ধ করে রাখে তবে একই অভিসন্ধিতে তাকে একইভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।

৪৯৮ এ. ধারায় স্বামী অথবা স্বামীর নিকট আত্মীয়ের দ্বারা মহিলার নৃশংস হেনস্তা:

যে ব্যক্তি, স্বামী হয়ে অথবা একজন স্ত্রীলোকের স্বামীর আত্মীয় হয়ে, এই মহিলার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তার কারাদণ্ড বেড়ে তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানাও ধার্য করা হতে পারে।

৫০৯ ধারায় শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কার্য কোনো মহিলার শ্লীলতার অবমাননা করার উদ্দেশ্যে:

যে কেউ, যে-কোনও মহিলার শ্লীলতাহানি করতে চায়, যে-কোনও শব্দ উচ্চারণ করে, যে-কোনও শব্দ (সাউন্ড) বা অঙ্গভঙ্গি দেখানোর মাধ্যমে বা কোনও জিনিস দেখানোর মাধ্যমে শব্দটি শোনা যায় কিংবা এই জাতীয় অঙ্গভঙ্গি বা

জিনিস মহিলার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসে কিংবা এই জাতীয় ব্যবহার মহিলার ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করে, তবে সাধারণ কারাদণ্ড যা তিন বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং জরিমানাও ধার্য হতে পারে।

৫০৯ এ. ধারায় আত্মীয় দ্বারা যৌন হয়রানি:

যে ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কিত, দত্তক গ্রহণ বা বিয়ের মাধ্যমে কোনও মহিলার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তার বর না হয়েও সে মহিলার নৈকট্য পায় এবং সে মহিলার শ্লীলতার অবমাননার অভিপ্রায় নিয়ে এই জাতীয় মহিলাকে প্ররোচিত করে বা হুমকি দেয়। তার কারাদণ্ড বেড়ে তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানাও ধার্য করা হতে পারে।[৪]

আইনের মাধ্যমে নারীর উপর সংগঠিত হওয়া অত্যাচারের প্রতিকার ও প্রতিরোধার্থে 'ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড'-এর এইসব গুরুত্বপূর্ণ ধারা থাকলেও ধর্ষণের মাত্রা কমেনি। '৩৭৫' নং ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে তা প্রমাণ করতে গিয়ে একজন নারীকে অথবা তার বাড়ির মানুষকে ভয়ংকর দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, ধর্ষণের ক্ষেত্রে বলা হয় এটা রাজ্যের অসম্মানের বিষয়; তাই সুনির্দিষ্টভাবে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেস্ লিখলে সুবিচার পাওয়ার কাজটি অনেক সহজ। আসলে বাড়ির সদস্যরা এরকম একটি আতঙ্কিত মুহূর্তে বাকরুদ্ধ হয়ে যায় বলেই, প্রাথমিক ভাবে পুলিশের কাছে গিয়ে সবিস্তারে কিছু বলতে পারেন না। তাছাড়া যেখানে ঘটনাটি ঘটে সেখানকার তথ্য প্রমাণ লোপাট করে দেওয়ার বিষয়টিও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ধর্ষিতা নারী দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার পর নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রেই তার মৃত্যু ঘটে। একজন নারীর জীবনে এভাবেই পটভূমির পরিবর্তন হতে পারে। এই মর্মস্পর্শী ঘটনাকে নিজের লেখা 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন মহাশ্বেতা দেবী।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উপ-শহরের অধ্যাপক দম্পতির ছোট মেয়ে পুতলি ওরফে পল্লবী চৌধুরী। তার ওপরে আরও একজন দিদি ও দাদা আছে। তারাও প্রতিষ্ঠিত এবং উভয়ই বাইরে থাকে। মা-বাবার আদরের দুলালী পুতলি তার নিজের বাড়ি, শহর, এখানকার মানুষজন, বন্ধুবান্ধব, সকলকে ভীষণ ভালোবাসে। পুতলি অল্পতেই খুশি, সমাজসেবায় ব্রতী, তার বন্ধুরা সকলেই মানুষের সেবাধর্মে আত্মনিয়োজিত। অল্প বয়স হলেও পুতলির মধ্যে কোনও উচ্চাশা ছিল না। পাশের পাড়ার ছেলে সমুর সঙ্গে সুমধুর বন্ধুত্ব একদা বিবাহের পরিণতি পেতে পারে তা পুতলি জানত। এই শহরেই পুতলির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার মা-বাবার কলেজের বন্ধু সুজাতার। সুজাতাদির কর্মকাণ্ড আরও বড় এবং ব্যাপক। 'পরিবেশদূষণ প্রতিরোধ' নামে তার একটা সংগঠন আছে। নানা ধরনের বিজ্ঞান-চেতনামূলক, নাগরিক-চেতনামূলক কাজকর্ম তারা করে। সুজাতার সমাজসেবার সু-সংগঠিত আড্ডায় অনেক ছেলেমেয়েরা আসে। নিজে ভীষণ ভালো মানুষ সুজাতাদি, উপরন্তু তার একটা বিশাল বাগান বাড়ি আছে, অনেকটা পুরনো জমিদারের মতো। পুতলির পরিচয় পাওয়ার পর সুজাতাদি তাকে একেবারেই আপন করে নিলেন। অবিবাহিত মানবপ্রেমী সুজাতাদির সঙ্গে পুতলির সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়ে উঠল। সুজাতাদির বাড়িতে সব বন্ধুরা একসঙ্গে যেত এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত, কি ভাবে সামাজিক কু-সংস্কারগুলি দূর করে মানুষের কাজে নিযুক্ত থাকা যায়। বন্ধুরা খুব উদ্যোগী এবং খুশি খুশি থাকত যেন একটা সুন্দর পারিপার্শ্বিকতাকে তারা লালন করে চলছিল নিজেদের অন্তরে। চারিদিকে খুশির আবহাওয়া, পুতলির মা-বাবার জীবনেও অনিমেষ শান্তি, কারণ দুজনেই বড় চাকরি করে সুন্দর একটা বাগানবাড়ি করে নিয়েছে, বড় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। একমাত্র উনিশ বছরের শিক্ষাব্রতী মেয়ে পুতলি থাকে তাদের কাছে, তাদের বাড়ির নাম পূর্বাশা—

> "ভীষণ, ভীষণ দুর্বলতা নীহার আর অশ্রুকণার 'পূর্বাশা' বিষয়ে। ওটা যেন বাড়ি নয়, তার চেয়েও বড় কিছু। ওঁদের রুচি, ওঁদের বিশ্বাস, সব কিছুর মূর্ত প্রতীক।"[৫]

পাশেই সুজাতাদের বিশাল বাগানবাড়িতে এখন সুজাতা একাই থাকে ওর বৃদ্ধ মাকে নিয়ে। সুজাতাদির প্রায় ষাট বছর বয়স হলেও ভীষণ উদ্যোগী একটি নারী। অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভালো মিশতে পারে। এরই মধ্যে তার মা হঠাৎ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে সুজাতা অশ্রুকণার বাসায় এসে পুতলিকে একদিনের জন্য তার কাছে পাঠানোর কথা বলে। অশ্রুকণা রাজি হয়ে পুতলিকে যেতে বলে, নীহার ফিরে এলে তাকে বিষয়টা বলে, দুজনে বেশ সুখী ও আরামদায়ক সময় উপভোগ করে। উভয়ের মধ্যে দাম্পত্যের ফুরফুরে কথোপকথন হয়—

"—সুজাতা এমনিতে আসে না যায় না, কিন্তু তোমার অসুখে, আমার অপারেশনে যথেষ্ট করেছে।
—হ্যাঁ, একটা পাবলিক স্পিরিট আছে।
—ওদের ক্লাবের ছেলেমেয়েগুলোও ভাল।
—ভালই তো। আজ তাহলে আমি আর তুমি!"[৬]

আকাশে বৃষ্টি নামে, একটা সাধারণ রাত কেটে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পর থেমে যায়। ততক্ষণে অশ্রুকণা খবর পায় সুজাতার মা মারা গেছে। এদিকে দুপুরে সব বন্ধুরা মিলে সুজাতাদির মাকে শ্মশানের নিয়ে যাওয়ার পর পুতলি বাড়ি ফিরে আসার জন্য একা একা বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা নামার মুখে চওড়া রাস্তাটায় ওঠার আগে নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের পাশে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। পুতলির পাশে একটা বড় গাড়ি এসে চোখে টর্চ মারে, মুখে ক্লোরোফর্ম দিয়ে কয়েকটা দস্যুর মতো ছেলে তাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেয়। পুতলি সেই দিন রাতে আর বাড়ি ফেরে না, পরপর চার দিন সে ফেরে না। অবশেষে একেবারে বিবস্ত্র অবস্থায় শহরের বাইরে নদীর ওপারে একটা কালভার্টের পাশে তার নগ্ন দেহ পাওয়া যায়, পুতলি ধর্ষিতা হয় নৃশংসভাবে। গণধর্ষণের পর পুতলি জীবন্মৃত এক নির্বাক শরীর মাত্র, হাসপাতালে নিরুপায় পড়ে আছে। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে মা অশ্রুকণা মারা যায়। সুজাতার জীবনটাও টালমাটাল হয়ে ওঠে। একদিকে মায়ের মৃত্যু অন্যদিকে কন্যাসম পুতলির এই দুরবস্থা! সকলের জীবন কেমন মুহূর্তে বদলে যায়। নীহার হয়ে পড়ে নির্বাক ও অসহায় একজন মানুষ। অথচ, এই কয়েক মুহূর্ত পূর্বেই তার ও অশ্রুকণার একটি নিশ্চিন্ত সুরক্ষিত জীবন ছিল—

"আসলে কোনো আঘাত আসেনি জীবনে, পূর্বাশার ভেতরে ঢুকে গেলেই নিজেদের ভীষণ সুরক্ষিত মনে হতো। পুতলির বা সমুর উচ্চাশা নেই। ওরা এ—ওকে বিয়ে করবে, এর চেয়ে বড় দুঃখ ওঁরা পাননি। সুরক্ষিত, সুছন্দ, নিয়মবাঁধা জীবনযাত্রা।
হঠাৎ তাঁরা যেন নগ্ন, জনতার চোখের সামনে।"[৭]

পুতলির দাদা দিল্লি থেকে চলে এসেছে তার দিদিও এখানে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু নীহার মনে মনে মারাত্মক উদ্বেগতাড়িত হয়ে পুলিশকে আসামীদের ধরার কথা বললে পুলিশ অফিসারের যুক্তি—

"আপনি শোকাহত, আর এরকম ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হলো...আপনি জানেন না, ধর্ষণের কেস করতে পারে পুলিশ, কেন না ধর্ষণ হলো স্টেটের বিরুদ্ধে অপরাধ।"[৮]

সব থেকে আশ্চর্য হতে হয়, এত ভালো ও শিক্ষিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার সম্পন্ন মেয়েটার ওপর ঘটা সদ্য অত্যাচারের মর্মবেদনা ভুলে মানুষ তার চরিত্র, মেলামেশা, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে লাগল। এইসব কথা শুনে পুতলির সমবয়সী বন্ধুরা বাজারে প্রবল তর্ক করে তাদের অমানুষ পর্যন্ত বলে দেয়। কিন্তু, সুজাতার ভ্রাতৃসম নিশীথ সত্যি কথাটা সবার সামনে প্রকাশ করে—

"নিশীথ বলে, এটা কি বললেন ভাই? রেপ কেসে সমাজ তাই ভাবে, পুলিশ তাই ভাবে, এমনকি বিচারকরাও তাই ভাবে।"[৯]

মুহূর্তে কিভাবে বদলে যায় মানুষের জীবন, তার একটু জলজ্যান্ত নিদর্শন এই উপন্যাসটি। পুতলির হবু জীবনসঙ্গী সমু প্রায় পাগলের মতো হয়ে পড়ে, পুতলির দাদা দিদিরা এই অবস্থাতেও নিজেদের লাভ লোকসান নিয়ে চিন্তা করে—বাবা ও পুতলি কার কাছে থাকবে, পূর্বাশা বাড়িটা কবে বিক্রি করে দেবে এইসব। নীহার নিশ্চুপ হয়ে কেবল ধর্মগ্রন্থ পড়ে, একমাত্র সুজাতাদি নিজেকে দায়ী করে নতুন দায়িত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী হন—

"এমন তো কত মেয়ের হয়...তারপর? সকলকে তার পরিবারে শেলটার দেয় না, সমাজ ক্ষমা করে না, মেয়েটার মনে দগদগে ঘা হয়ে যায়। এ সব মেয়েরা কোথায় যায়, কি করে, সে কথা ভাবতে শেখাল পুতলি।"[১০]

অবশেষে কি হয়েছিল পুতলির? সে কি জীবনের পথে সসম্মানে ফিরতে পেরেছিল? উত্তর হল 'হ্যাঁ'। বাস্তবে এই লড়াই ভীষণ কঠিন হলেও উপন্যাস রচয়িতা প্রবল বিশ্বাস থেকে নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। সুজাতাদি ও নিশীথদার প্রচেষ্টায় পুতলিকে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তর করা হয়েছিল। পুতলি সেরে ওঠার পর তার দিদি পিপলিদের বাড়িতে কয়েকদিন থেকেই বুঝে গিয়েছিল এই সমাজে তার লড়াই তার একার। বাবা

চেয়েছিলেন কোন দূরের ধর্মস্থানে তাকে নিয়ে গিয়ে রাখতে। বাড়ি বিক্রির ভাগের টাকাগুলো পুতলিকে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সবকিছুকে অস্বীকার করে পুতলির নবজন্ম হল। অবশ্যই পুতলির জীবনবাদী চেতনার জাগরণে সাহায্যের হাত সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুজাতাদি ও নিশীথদা। তা সত্ত্বেও পুরনো প্রেম আর সম্পর্কগুলোকে পরিত্যাগ করে নতুন পথে পা বাড়ানোর সৎ সাহস পুতলি চরিত্রকে অনন্যতা দান করেছে। সমুর প্রতি পুতলির চিঠি—

> "বাবা আমাকে ধর্মাশ্রমে রেখে দিতে চায়, যেন আমি পাপী, প্রায়শ্চিত্ত করব। দিদি আর দাদা আমাকে কাছে রাখতে হবে ভাবলেও অস্বস্তিতে পড়ে। ওরা কেউ মন থেকে আমাকে সহজ, স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে না। কেউ একবারও বলল না, রেপড হয়েছিল? তাতে কি? মাথা তুলে বেঁচে দেখিয়ে দে যে, ধর্ষিতা মেয়েটির মাথা তুলে বাঁচার অধিকার আছে।"[১১]

সুজাতা ও নিশীথের হাত ধরে পুতলির জীবনে আবার পরিবর্তন হল। নিশীথ পুতলির জন্য বারুইপুরে 'উইন' নামক সংস্থায় একটি কাজ জোগাড় করে দেয়। এই সংস্থার আদর্শ 'ফর উইমেন ইন নীড' অর্থাৎ জেলে যে মেয়েরা দশ বছর ধরে বিনা কারণে বন্দী জীবন যাপন করছিল তাদের থাকার জন্য মিসেস সুশীলা দত্ত একটি বাড়ি দেয়। সেখানেই পুতলির কাজ হল তাদের সঙ্গে মিশে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো। কাজটা চ্যালেঞ্জের হলেও নিশীথের কথায় সে রাজি হয়ে গেল—

> "—কাজ চেয়েছিলে, কঠিন কাজেই দিচ্ছি, তোমার চেয়ে অনেক দুর্ভাগা ওই মেয়েরা। তাদের মনে বাঁচার আশা জাগিয়ে তোলার কাজ।"[১২]

আজ যে উইন চালাচ্ছে পল্লবী ওরফে পুতলি সেই সংগঠনটা অনেক আগে মিসেস সুশীলা দত্ত গড়েছিলেন। বাড়ি ও জমি তাঁরই দান। মিসেস দত্তের মেয়ে অনীতা বিয়ের পরেই মারা যায়। ওঁর স্বামী নতুন জামাই ও মেয়েকে নিয়ে ফিরছিলেন গাড়ী চালিয়ে। দুর্ঘটনায় অনীতা এবং তার স্বামী দুজনেই মারা যাওয়ার পরে জামাই বেঁচে যায় ও বছর চারেক বাদে পুনরায় বিয়ে করে। মিসেস দত্ত মেয়েদের কল্যাণকারী কয়েকটি জায়গায় অনেক দিয়েছেন। শেষে তাঁর পিতৃপুরুষদের গ্রাম মেটেলিতে 'উইন' গড়ে দিলেন। তাঁর দান এক লক্ষ টাকা নিয়েই কাজ শুরু হল। তারপর সংস্থার রেজিস্ট্রি এবং ফাণ্ড সংগ্রহ করা হল। এখানেও দেখা গেল মিসেস দত্তের জীবন মুহূর্তেই বদলে গেল।

'উইন' নামক সংগঠনে বাঙালি মেয়ে রুচিরা মেহতা সমস্ত কিছুর ইন-চার্জ রূপে নিযুক্ত হল। সোসিওলজিতে এম. এ করেছে, স্বামীকে ডিভোর্স করে চলে এসেছে, নিজের মেয়েকে পর্যন্ত আনতে পারেনি; কারণ কাস্টডি পায়নি। তারও জীবন মুহূর্তে বদলে গেছে। তবুও নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে কঠোর হাতে সেই সংগঠনটা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যকর্মী মাধবী আর গৌরী দুজনেই স্বামী পরিত্যক্তা। গৌরীর একটা ছেলেও আছে। খালপাড় কলোনির রেপ ভিকটিম ওরা। বাড়িতে ওদের আর থাকতে দেয়নি। এখানে রান্নাবান্নার দায়িত্ব পালন করে বাসন্তীর মা। বকফুলিয়াতে বাসন্তী ধর্ষিত হয়, রেপের ফলে পনের বছরে বাসন্তী সন্তানসম্ভবা হয়। বাসন্তীর মা-বাবা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে আসে। পুলিশ আসামীদের চিনলেও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তারপর বাসন্তীর সন্তান হলে মা-মেয়ে বাচ্চা নিয়ে রেললাইনে আত্মহত্যা করতে যায়, স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে সংগঠনে দিয়ে যায়।

এখানে দশটি মেয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়েছে পল্লবীর ওপর। তাদের দশ জন দশ রকমের পরিস্থিতির শিকার। পুলিশ এদেরকে আদালতে নিয়ে যায়, আদালত সঠিক প্রমাণাভাবে জেলে পাঠায়। আইন অনুযায়ী, ওদের এক মাসের বেশি জেলে রাখা আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু জেলে নিয়ে যাওয়ার পর ওদের কথা সবাই ভুলে যায়। এইরকম মেয়েদের উদ্ধার করে এনে নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার কাজে সর্বতোভাবে সফল হয় পল্লবী। এখন টিভিতে খবরের কাগজে পল্লবীর লড়াইয়ের কথা প্রায়শই প্রকাশ পায়। নিজের জীবনচক্রের পরিবর্তনকে খুবই উপলব্ধি করে পল্লবী। সমুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বাভাবিক রেখেই তার বিয়ে করার জন্য বিশেষভাবে অভিনন্দন জানায়। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে—

> "বাবা, দাদা, দিদি, সবাই খুব গর্বিত এখন আমার জন্যে। আমি তো জানি, কাগজে এত লেখালেখি না হলে ওরা এমন উচ্ছ্বসিত হতো না।...

এখানে যাদের মধ্যে আছি, তাদের জীবন এমনই ভাঙাচোরা যে, নিজের কথা ভাবার সময়ই পাইনি। ওদের কথা জানার পর আর নিজের দুঃখ বা ক্ষতিকে বড় মনে হয় না। অনেক, অনেক মেয়ে আমার চেয়েও লাঞ্ছিত সমু, তাদের আমি জানিও না। কিন্তু এটা জানি যে, আমার মতো মেয়েরা অনেক। আমি তাদের একজন। হয়তো চরম সৌভাগ্যবতী একজন। আমাকে তো মুখ লুকিয়ে বেড়াতে হয়নি। আমি আরো বড় একটা কাজের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি।"[১৩]

পুতলি থেকে পল্লবী হওয়ার পথে অনেক বড় বড় বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে সমস্ত কিছুই এত দ্রুত এবং অতর্কিতে হয়ে যাওয়ার পর নিজের ছোট্ট পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে পুতলি বৃহত্তর সংগ্রামের জীবনে লিপ্ত হয়েছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হওয়ার পর সে অসংখ্য মানুষের জীবনের নির্মম পরিণতিকে উপলব্ধি করেছে। পল্লবী বুঝেছে মেয়েদের জীবনে পুরুষের যৌনলালসার প্রভাব হঠাৎ করে বদলে দেয় তাদের সমস্ত কিছু অবস্থানকে। এই উপন্যাসটি লেখার নেপথ্যে মহাশ্বেতা দেবীর নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা কিংবা মানবাধিকার কর্মী রূপে কাজের সূত্রগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় থেকেছে। উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে প্রথমেই নারীদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের প্রামাণ্য খতিয়ান ন্যাশনাল ক্রাইম রিসার্চ ব্যুরোর (১৯৯১) রিপোর্ট অনুসারে দিয়েছেন লেখক। সেখানে স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন—

"ভারতবর্ষে প্রতি ৫৪ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়, অর্থাৎ দৈনিক ২৭ জন। পণের জন্য বধূহত্যা প্রতি দুঘণ্টায় একটি, অর্থাৎ দৈনিক ১২ জন। আমরা, ভারতীয়রা, শুধু ধর্ষণ ও বধূহত্যা করি না। প্রতি ৪৩ মিনিটে একটি নারীকে অপহরণ করি, প্রতি তেত্রিশ মিনিটে একজনকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করি। প্রতি বাহান্ন মিনিটে একটি মেয়েকে ঈভটিজিং করি।"[১৪]

বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে ঘটে চলা গার্হ্যস্থ ও পারিপার্শ্বিক পাশবিকতার সর্বোচ্চ পরিণতি— ধর্ষণের কারণ কিংবা ফলাফলকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাসে নারী শক্তির জয়গাথা রচনা করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। নিবিড় বাস্তবনিষ্ঠ বাচনভঙ্গি ও ঘটনার যথাযথ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র আমাদের বর্তমান সমাজ জীবনের দলিল হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সৃষ্টিশীল প্রকৃতির মতোই নারীর ধ্বংস ও পুনরুত্থানের ইতিকথার অনুরণন তার মর্যাদাকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, ড. নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ. ১২৬।
২. নাসরিন, তসলিমা। নির্বাচিত কবিতা। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৬৪।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, ড. মানবেন্দু। মনুসংহিতা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০, কলকাতা, পৃ. ৪০০।
৪. চক্রবর্তী, সুতপা। নারী নির্যাতন এবং ভারতীয় আইন: সমাজ ও কথাসাহিত্যের নিরিখে একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন। গবেষণা সন্দর্ভ, ২০১৬, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২১-১৩০।
৫. দেবী, মহাশ্বেতা। প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে। করুণা প্রকাশনী, ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ১৯।
৬. তদেব, পৃ. ৩৫।
৭. তদেব, পৃ. ৪৯।
৮. তদেব, পৃ. ৫১।
৯. তদেব, পৃ. ৫৩।
১০. তদেব, পৃ. ৫৬।
১১. তদেব, পৃ. ৮০।
১২. তদেব, পৃ. ৮৮।
১৩. তদেব, পৃ. ৯২।
১৪. তদেব, ভূমিকা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 72- 78
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.181

সময়ের শিকল, নারীর আর্তনাদ: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

সুপ্রিতা নাথ, *স্বাধীন গবেষক, শ্রীভূমি, অসম, ভারত*

Received: 22.09.2025; Accepted: 23.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore holds a significant place in Bengali literature because of his unique writing style and choice of subjects. From his childhood to adulthood, he closely observed the lives of women, including those in his own Thakurbari. These observations inspired him to address the conditions of women in society. In his stories such as 'Strirpatra', 'Haimanti', and 'Denapawna', we see how newly married women faced extreme struggles under the dominance of others. Tagore highlights how the dowry system in society gradually harms women, leading not only to social problems but also to their exploitation. Some women suffer and even die due to domestic violence and conflicts within their husbands' families. This pressure often leaves women helpless, yet some rise against oppression. By speaking out against violence, these women become symbols of courage. Through his creation of female characters, Tagore aims to present strong and courageous individuals who inspire other women to raise their voices against injustice.

Keywords: Rabindranath Tagore, Women's Empowerment, Dowry System, Domestic Violence, Female Resistance in Literature

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একজন সার্থক ছোটগল্পকার। তাঁর ছোটগল্পে সমসাময়িক নানান ঘটনা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিচিত্রভাবে অঙ্কিত হয়েছে নারীচরিত্র। সেখানে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নারীর উপর সামাজিক অত্যাচার, শাশুড়ির দুর্ব্যবহার, পণপ্রথার আড়ালে নানান চাহিদা ও প্রতিবন্ধকতা, শ্বশুরবাড়ির অপমান, অনাদর, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নারীর আত্মমর্যাদার লড়াই। রবীন্দ্রনাথের নারীরা কখনো অত্যাচারিত ও নিপীড়িত, আবার কখনো উনিশ শতকের নারী হয়েও আশ্চর্য রকমের স্বাধীনচেতা। এই স্বাধীনচেতার উৎস হয়তো ঠাকুরবাড়ির নারীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিহিত। ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবেশে নারীদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা অনুভব করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর লেখার অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ শুরুর দিক থেকেই বাস্তব জীবনকে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই নারীজীবনকে ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। বর্তমান সমাজকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রের সঙ্গে আজকের সমাজের নারীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাঁর বহু রচনায় নারীরা অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে এবং অন্যায়ের শিকার হয়ে আত্মবলিদান দিয়েছে। আবার বহু রচনায় দেখা যায় নারীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফলে তাঁর গল্পে নারীরা বারবার নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীর চরিত্রচিত্রণ শুধু ব্যক্তিগত বেদনা বা পারিবারিক সংকটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি হিসেবেও প্রতীয়মান। তাঁর লেখায় নারী কেবল নিপীড়িত নয়, বরং সংগ্রামী সত্তা হিসেবেও উঠে আসে। একদিকে সামাজিক কুসংস্কার, কৃত্রিম বন্ধন, ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার নারীর করুণ বাস্তবতা দেখা যায়, অন্যদিকে শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও

আত্মমর্যাদাশীল নারীর উত্থানও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই দ্বৈত রূপই রবীন্দ্রনাথের নারীর বৈশিষ্ট্যকে অনন্য করেছে। আলোচ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প— 'দেনাপাওনা', 'স্ত্রীরপত্র' ও 'হৈমন্তী'—কিভাবে নারীর বিচিত্র রূপকে প্রতিফলিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করাই এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

পারিবারিক সমস্যার কারণে দিনের পর দিন বহু পরিবার ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। সেই পারিবারিক সমস্যার অন্যতম কারণ হলো যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ছোটগল্পে একদিকে যেমন সমাজের আনন্দ ও বেদনার কথা তুলে ধরেছেন ঠিক সেই রূপ নারীর সামাজিক অবস্থান, তার অধিকার ও পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত নারীর অবস্থান ও ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের এমনই এক কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতার বাস্তব চিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে ধরেছেন তাঁর 'হৈমন্তী' গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র-এর ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এই গল্পে শ্বশুর-শাশুড়ির অত্যাচারে অপমানিত হৈমন্তীর চরম দুর্দশার কাহিনি ফুটে উঠেছে। এই গল্পে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতা নগ্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই হৈমন্তীর সঙ্গে কথকের বিবাহ। অপুর সঙ্গে হৈমন্তীর বিয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন অপুর বাবা, কারণ পণের অঙ্ক ছিল অনেক বেশি।

> "তবুও বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।"[১]

কথকের পিতা মূলত এক লোভী প্রকৃতির মানুষ। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গল্পের সেই সময়কালে মেয়েদের বয়স একটু বেড়ে গেলে বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত; অথচ পুরুষেরা বয়স বাড়লেও একাধিক বিবাহ করতে পারত। অবশেষে টাকার লোভেই হৈমন্তীর সঙ্গে অপুর বিয়ে হয়। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে হৈমন্তী ছিল পিতার স্নেহে লালিত। পিতা ও কন্যার সম্পর্কে ছিল না কোনো আড়াল-আবডালহীন বন্ধন। বিয়ে শেষে অন্য কন্যাদের মতো অশ্রু না ফেলায় হৈমন্তীকে নিয়ে পরিবারের লোকজন নানা সমালোচনা করে।

> "বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একেবারে নাই!"[২]

হৈমন্তী ছিল মূলত সংবেদনশীল ও আদর্শবাদী চরিত্র। পিতার ছায়ায় বেড়ে ওঠা এই কন্যা কখনো মিথ্যে, প্রতারণা বা অন্যায় মেনে নিতে পারেননি। বিয়ের প্রথম দিকে তাকে তেমন কষ্ট দেওয়া হয়নি; বরং অপুর বাবার বিশ্বাস ছিল, হৈমন্তীর পিতা রাজমন্ত্রী এবং প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। সেই ভ্রান্ত ধারণায় হৈমন্তীকে যথেষ্ট স্নেহে রাখা হতো, যাতে তার কোনো অসুবিধা না হয়।

> "রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানাপ্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নীচে নামে না। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল।"[৩]

কিন্তু অবশেষে যখন প্রকাশ পায় যে অপুর শ্বশুর প্রকৃতপক্ষে রাজমন্ত্রী নন, বরং শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ, এবং বিয়েতে দেওয়া টাকা-পয়সা ও গয়নাও ধার করা, তখন থেকেই হৈমন্তীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রতারণা শুরু হয়। বিশেষত, রাস উপলক্ষে গ্রাম থেকে আত্মীয়রা এলে হৈমন্তীকে নিয়ে নানা তির্যক মন্তব্য শোনা যায়।

> "দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল…আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"[৪]

গল্পে প্রচলিত সময়কালে সমাজে নারীদের ছোটবেলা থেকেই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় গড়ে তোলা হতো, যাতে তারা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু হৈমন্তীর পিতা ছিলেন এক আধুনিক শিক্ষানুরাগী মানুষ। তিনি কন্যাকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন, কিন্তু গৃহস্থলি কাজ শেখাননি। ফলে শ্বশুরবাড়িতে পদে পদে হৈমন্তীকে কটুক্তি ও প্রতারণার শিকার হতে হয়।

> "ওমা, এ কী কাণ্ড। এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"[৫]

হৈমন্তী পিতার বিরুদ্ধে অপবাদ শুনে প্রতিবাদ করলে তাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা শুরু হয়। সে বাবাকে নিয়মিত চিঠি লিখলেও শ্বশুরবাড়িকে নিয়ে পিতার কাছে কোনো অভিযোগ করেনি। তবুও তার চিঠি মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুলে দেখত। একসময় হৈমন্তীর পিতা মেয়েকে দেখতে এলে তার অসুস্থ দেহ দেখে মর্মাহত হন এবং বাড়ি নিয়ে যেতে চান। কিন্তু অপুর পিতা তাতে বাধা দেন। ডাক্তার দেখানোর পরও অপুর পিতা উপহাস করে বলেন—

> "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়!"[৬]

পিতাকে অপমানিত অবস্থায় ফিরে যেতে দেখে হৈমন্তীর মুখের হাসি চিরদিনের মতো নিভে গেল। গল্পের শেষে দেখা যায়, হৈমন্তীকে মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত করে একেবারে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কথকের নতুন বিয়ের আয়োজন শুরু হয়।

> "শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, হইাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ-- থাক্ আর কাজ কী!"[৭]

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বাস্তব জীবনের এক তীব্র বাস্তব প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন। গল্পে চিরাচরিত ধারা অনুসারে নববধূর উপর শ্বশুর-শাশুড়ির লাঞ্ছনা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি দেখা যায় এক শিক্ষিত আত্মসম্মানবোধ নারী কিভাবে পারিবারিক লোভ ও যৌতুক প্রথায় জর্জরিত হয়ে লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হয়েছে। হৈমন্তীর স্বামী অপু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তার নীরবতা স্ত্রীর উপর অত্যাচারের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তুলে, যা পুরুষ সমাজে দুর্বল ও ভীরুতাকে উন্মোচিত করে। গল্প কথক সহানুভূতিশীল হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস সে দেখাতে পারেনি। দিনের পর দিন অত্যাচার সহ্য করে অবশেষে হৈমন্তী নীরব প্রতিবাদের পথ বেছে নেন, আর সেই প্রতিবাদই তাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়।

দীর্ঘকাল ধরে নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন যাতনায় কাতর হয়ে যখন নারী তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখনই জন্ম নেয় প্রতিবাদ। নারীর সেই প্রতিবাদকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গড়ে তুলেছেন 'স্ত্রীরপত্র' ছোটগল্প। সমাজে নারীর সৌন্দর্য বলতে তার পারিবারিক মূল্য কিংবা কাজের দক্ষতার উপর তাকে সীমাবদ্ধ রাখা হত। নারীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কিংবা স্বাধীনতা সমাজে স্থান পেত না। গল্পের মূল চরিত্র মৃণাল সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত পরিবারের ঘটিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব দেখিয়েছে। অন্যায়কারীর ও অত্যাচারীর প্রতি তীব্র নিন্দার মাধ্যমে মৃণাল তখনকার এবং বর্তমান সমাজে আদর্শ নারীর প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। গল্পটি আমাদের শেখায় নারীর মর্যাদা শুধুমাত্র সমাজ কিংবা তার পরিবারের উপর নির্ভর করে না বরং তার নিজের সাহস এবং নিজের উপর থাকা আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। এই গল্প সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন:

> "এ স্বামীর কাছে স্ত্রীর পত্র নয়, পুরুষের কাছে নারীর পত্র; গল্পটির নাম 'নারীর পত্র' হইতে পারিত।"[৮]

পুরুষ আধিপত্যের শিকার হয়ে যে নারীরা চরণতলাশ্রয়ী হয়ে থাকতে বাধ্য হতেন, সেই ইচ্ছা মৃণালের কখনও ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন স্বামী ও পরিবারের সহকর্মিনী বা সহধর্মিণীর সমান মর্যাদায় জীবন যাপন করতে। গল্পে দেখা যায় যে তখনকার সমাজে নারীকে ব্যক্তিমূল্য থেকে বেশি রূপের কারণে পরিবারের সঠিক গৃহবধূ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মৃণালকে ছোটবেলা থেকেই নানা লোকের নানা কটূক্তি সহ্য করতে হয়েছে। নারীকে শুধু প্রাপ্ত বয়সে নয়, শিশুকালেও সামাজিক দৃষ্টি ও আক্রমণ থেকে বঞ্চিত করা হতো। মৃণাল যখন শিশু বয়সে জ্বর নিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে, তখন প্রতিবেশিরা তা নিয়ে বলে,

> "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল; বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত? চুরিবিদ্যায় যমপাকা দামী জিনিসের পরেই তার লোভ।"[৯]

বড় হওয়ার পর মৃণালের বিবাহ হয় শুধুমাত্র রূপের কারণে। কিন্তু রূপের আড়ালে মৃণালের চরম বুদ্ধির উপেক্ষা করা হয়; শশুরবাড়ির লোকরা পদে পদে তাকে অবজ্ঞা করে।

> "তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছো।"[১০]

স্বামীর বাড়িতে প্রতিদিনের বেদনার স্মৃতি বৃদ্ধি পায়। মৃণাল যখন কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, তখন আতুরঘরের খারাপ পরিবেশের কারণে তার মেয়ের মৃত্যু ঘটে। মেয়ের মৃত্যুর ফলে মৃণালও মৃত্যুর ইচ্ছায় জর্জরিত হয়। বুড়ো মায়ের মৃত্যুর পর আশ্রয়ের আশায় বড়ো জায়ের বোন বিন্দু যখন তাদের বাড়িতে আসে, তখন শশুরবাড়ির অত্যাচার চরমে পৌঁছায়। বিন্দুকে দাসদাসী থেকে নিচু কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বড়ো জা, এই দৃশ্য দেখে, নিজের বোনকে আশ্রয় দিতে এমন কাজে নিযুক্ত করেন যে মৃণালের লজ্জা হল:

> "তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।"[১১]

মৃণাল মূলত একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী। নারীর কষ্ট তাকে বেদনার মধ্যে ফেলে। অবশেষে, মৃণাল বিন্দুকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেন। মৃণালের এই সদয় আচরণের ফলে বাড়ির লোকের হিংসা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। বিন্দুর শরীর লাল হওয়া দেখেই পরিবার তাকে বসন্ত বলে অপবাদ দেয়। একদিন, বাজুবন্ধ চুরি হলে, সবাই বিন্দুকে দায়ী করে এবং স্বদেশী হাঙ্গামার সময় পুলিশের পোষা মেয়েচরের অভিযোগে তাকে অপবাদ দেওয়া হয়। বিন্দুর মতো অসহায় নারীকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে মৃণালের স্বামী তার প্রাপ্য হাত-খরচের টাকা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়,

> "বিন্দুকে আমি যে সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম।"[১২]

বিন্দুকে ঘরছাড়া করার শেষ উপায় হিসেবে তার বিয়ে ঠিক করা হয় এক পাগলের সাথে। অবশেষে সেই পাগলের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে বিন্দু আত্মহত্যা করে। গল্পের শেষে মৃণাল কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়, পারিবারিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। পরিবারের দ্বারা পীড়িত ও অসহায় নারীদের প্রতিভূ হয়ে, ২৭ নং মাখন বড়ালের গলি চিরদিনের জন্য ছেড়ে বের হয় নিজের আত্মমর্যাদা নিয়ে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "যে অভ্যাসের আবরণে একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষাহীন পরিবার মৃণালকে সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে পনেরো বছর অন্ধকারে ঢেকে রেখেছিল, বিন্দু এসে সেই আবরণকে ছিন্ন করে দিল। পুরুষশাসিত সমাজ কিভাবে নারীকে অপমানে বন্দি করে রাখে, তা মৃণাল বিন্দু ও নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি করেছে। মৃণাল মুক্তি গ্রহণ করেছে, সে বেঁচেছে। ব্যক্তির মুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ঘোষণায় গল্পের সমাপ্তি।"[১৩]

গল্পে মূলত স্ত্রীজাতির প্রতি তীব্র অসম্মান, অবজ্ঞা, অপমান ও অবহেলা দেখানো হয়েছে। কিন্তু মৃণাল সমস্ত নারীজাতির প্রতিনিধি হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে এবং অন্যায় ও অপবাদকে চিরতরে প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাখায় নিম্নজিত শিকড় ছিঁড়ে, নতুন আবেগের আশায় বেরিয়ে এসে মৃণাল স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বাধা উপেক্ষা করে নারীদের নিজস্ব সত্তা প্রকাশের বার্তা ছড়িয়েছে। গল্পে প্রতিবাদী মনোভাবের দ্বারা মৃণাল শুধু নিজেকেই রক্ষা করেনি বরং তার সাহস ও দায়িত্ববোধ নারীদের জন্য এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গল্পের মৃণাল চরিত্র আমাদের শেখায় যে নারী শুধু নিজ পরিবার কিংবা সমাজের জন্য নয় বরং প্রয়োজন হলে নিজের মর্যাদার জন্যও লড়াই করতে পারে।

সাধারণ সমাজে বসবাস করতে গেলে মানুষকে সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতে হয়। কখনও কখনও সেই প্রথা মানুষের হিতেই কাজ করে, আবার কখনও তা সেই মানুষের জন্যই বিপদস্বরূপ হয়ে ওঠে। প্রথা মেনে চলতে চলতে যখন তা অসহনীয় হয়ে যায়, তখন মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় প্রতিবাদ। সামাজিক নিয়মের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রথা হলো পণপ্রথা, যা সমাজকে ভিতর থেকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। সাধারণত গরীব বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এই পণপ্রথার শিকার হয়। পণপ্রথায় জড়িত সমাজের চরম দুর্দশার চিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'দেনাপাওনা' গল্পে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়েছেন। লেখক ঊনবিংশ শতকের পারিবারিক বাস্তব জীবনের যে প্রতিচ্ছবি এই গল্পে তুলে ধরেছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন:

> "আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব-জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"[১৪]

'দেনাপাওনা' রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম সার্থক ছোটগল্প। এই গল্পে তিনি প্রথাগত ধারণার সীমারেখা অতিক্রম করে দেখিয়েছেন, কীভাবে পিতা ও পরিবারের লোভের কারণে একটি নববিবাহিত মেয়ের জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি হতে পারে। গল্পে দেখা যায় রামসুন্দর মিত্র সাধারণ এক পরিবারের মানুষ, যার একমাত্র কন্যা নিরুপমা। পাঁচ পুত্র সন্তানের পর একমাত্র কন্যার জন্ম হওয়ায় তিনি তাকে বিশেষভাবে আদর করতেন এবং তার নাম নিরুপমা রেখেছিলেন। সমাজে কন্যা সন্তানকে প্রায়শই অবহেলা করা হলেও রামসুন্দর পুত্রের চেয়ে কন্যাকে বেশি আদর করতেন। সেই আদরের কন্যাকে সারাজীবনের জন্য সুখী করতে পিতা তার জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে শুরু করলেন। নানা জায়গায় পাত্র অনুসন্ধানের পর অবশেষে রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রকে তিনি পছন্দ করলেন। নিজের একমাত্র মেয়েকে সুখী করতে তিনি বরপক্ষের দাবি অনুযায়ী ১০,০০০ টাকা পণ নগদ দিতে সম্মত হন। কিন্তু যথেষ্ট অর্থ না থাকায় বিয়ের সময় পর্যন্ত পুরো টাকা জোগাড় করতে পারলেন না, ফলে বিয়ে স্থগিত হয়ে যায়।
একমাত্র মেয়ের বিয়ের জন্য রামসুন্দর অনুনয়-বিনয় শুরু করেন, রায়বাহাদুরের কাছে বলতে থাকেন:

> "শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকাটা শোধ করিয়া দিব। রায়বাহাদুর বলিলেন, টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"[১৫]

কিন্তু বর, যিনি শিক্ষিত ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, সমাজের এ ধরনের বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে পিতার বিরুদ্ধেও বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বললেন:

> "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব!"[১৬]

অবশেষে রায়বাহাদুরের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে সম্পন্ন হয়। পিতা কন্যাকে অশ্রুজলে বিদায় জানান। কিন্তু শশুরবাড়িতে পৌঁছাতেই শুরু হয় নিরুপমার উপর নানান ধরনের অত্যাচার। রামসুন্দর পণের সম্পূর্ণ টাকা না দিতে পারায় নিরুপমাকে চিরদিনের জন্য বাবার বাড়ি ফিরে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বহুবার চেষ্টা করেও পিতা মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। মেয়ের জীবনে এই চরম কষ্টের মধ্যে পিতা নিজস্ব বিচক্ষণতা ও সাহস দেখিয়েছেন। একবার নিরুপমা তার বাবার বাড়ি যেতে চাইলে রামসুন্দর গোপনে তিন হাজার টাকা নিয়ে যান, মেয়ের শশুর বাড়ি দেওয়ার জন্য। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

> "'থাক্, বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।' একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।"[১৭]

দিনের পর দিন নিরুপমা ও তার পিতা সামাজিক অপবাদের শিকার হন। অবশেষে রামসুন্দর নিজের একমাত্র বসত বাড়ি বিক্রি করে কন্যার পণের টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু বড় পুত্র হরমোহন বাধা দেন। নিরুপমা জেনে বাধার কথা স্পষ্টভাবে জানায়, সে কখনো পিতার সাথে সাক্ষাৎ করবে না যদি পিতার টাকা শশুর বাড়িতে আসে। সে প্রতিবাদ করে বলেন:

> "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই? আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।"[১৮]

এই অবস্থান থেকে নিরুপমা প্রতিবাদী নারী চরিত্র হিসেবে দৃঢ় পরিচয় দেয়। কিন্তু শশুরবাড়ির অত্যাচারের ফলে নিরুপমা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাসীরা খাবারের নিয়ম না মানায় ও পরিবারের অপমানে তার শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। মৃত্যুর মুখে এসে পিতার বাড়ি যেতে চাইলে তার শাশুড়ি তাকে ব্যঙ্গ করে নানান কটুকথা বলেন। অবশেষে নিরুপমাকে দেখতে শেষ বারের জন্য ডাক্তার আসে এবং তার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর খবর থেকে অজানা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যখন তার পরিবারকে চিঠি লেখে তার স্ত্রীকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে জানায় তখন তার মা চিঠির উত্তর দেন,

> "বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে। এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।"[১৯]

এই গল্পে দেখা যায়, নিরুপমার মৃত্যুর পেছনে শুধুমাত্র শশুরবাড়ি বা সমাজই দায়ী নয়, তার পিতার দায়িত্বও সমানভাবে প্রভাবিত। বড়পণ সমাজের একটি নিষ্ঠুর প্রথা হলেও রামসুন্দর মেয়েকে সুখী করতে সেই পরিবারকে বেছে নেন, যেখানে পণ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থ ছিল না। অপরদিকে নিরুপমা নিজে চরম অত্যাচারের ফলে নিজের

খেয়াল রাখতে ব্যর্থ হন। অবশেষে নিজের পরিচর্যার অভাবে মৃত্যুর মুখে পড়েন। কৌলিন্য প্রথা থেকে উদ্ভূত বিদ্বেষ ধীরে ধীরে সমাজকে ধ্বংস করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গল্পে পণপ্রথা ও তার ফলাফলকে নিরুপমার চরিত্রের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সাধারণ পরিবারের একটি মেয়ের মৃত্যু প্রমাণ করেছে প্রথার নির্মমতা এবং লেখক বাস্তব প্রতিচ্ছবির পাশাপাশি প্রতিবাদী মনোভাবনারও চিত্র স্থাপন করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে মানুষ আকর্ষণের তীব্র ক্ষমতা আছে, যা লেখকের দক্ষতার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ তিনি ছোটগল্পকে বাংলাসাহিত্যের উচ্চশিখরে নিয়ে গেছেন। পারিবারিক নারীর সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তরঙ্গভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে তার কর্মজীবন পর্যন্ত তিনি নারীর জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সেই উপলব্ধির প্রতিফল আমরা তার লিখিত ছোটগল্পে দেখতে পাই। উপরোক্ত আলোচিত 'স্ত্রীরপত্র', 'হৈমন্তী' ও 'দেনাপাওনা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পারিবারিক নারী সমস্যা, সমাজের প্রথা, পণপ্রথা ও শশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নারীর উপর অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সমাজ নারীর ওপর সাধারণ নিয়ম মেনে চলার জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সমাজের অসহনীয় অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে অনেক নারী নিজের আত্মসমর্পণ করেছে, ঠিক তেমনি অনেক নারী সেই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজের প্রতি হুঙ্কার তুলেছে। এই উভয় প্রকার নারী চরিত্রের চিত্র আমরা এই গল্পগুলিতে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীরা প্রতিনিয়ত সমাজ ও পরিবারের দ্বারা লাঞ্ছনা, অপবাদ, বহিষ্কার, অবমাননা, শোষণ ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে চলেও তাদের আত্মসচেতনতা ও নিজস্ব বিকাশ ধরে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গল্পের মাধ্যমে পাঠককে সাধারণ জনজীবনে প্রচলিত ক্ষতিকর প্রথা থেকে বের হয়ে সমান চোখে সবাইকে দেখার শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নারী হিসেবে নারীর ক্ষতি নয়, বরং এক নারীকে অন্য নারীর পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন। কারণ প্রকৃত মুক্তি উভয়ের স্বাধীন ও অধিকারসম্পন্ন জীবনের মধ্যেই নিহিত।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬, পৃ. ৪৮২।
২. তদেব, পৃ. ৪৮৪।
৩. তদেব, পৃ. ৪৮৫।
৪. তদেব, পৃ. ৪৮৫।
৫. তদেব, পৃ. ৪৮৭।
৬. তদেব, পৃ. ৪৮৯।
৭. তদেব, পৃ. ৪৯০।
৮. মিশ্র, ড. অশোককুমার। রবীন্দ্র ছোটগল্পের রূপরেখা। প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৬৩।
৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ৪৯৮।
১০. তদেব, পৃ. ৪৯৯।
১১. তদেব, পৃ. ৫০১।
১২. তদেব, পৃ. ৫০২।
১৩. ঘোষ ড. বিজিত, বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা, পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১১৬।
১৪. তদেব, পৃ. ১৩১।
১৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ,প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১০।

১৬. তদেব, পৃ. ১০।

১৭. তদেব, পৃ. ১২।

১৮. তদেব, পৃ. ১৩।

১৯. তদেব, পৃ. ১৪।

আকরগ্রন্থ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার। রবীন্দ্র-সমীক্ষা। প্রকাশক: শ্রী অমিয় রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ম্যানেজিং ডিরেক্টার এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

২. ঘোষ, ড. বিজিত। বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা। পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত।

৩. মিশ্র, ড. অশোককুমার। রবীন্দ্র ছোটগল্পের রূপরেখা। প্রকাশক: সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।

৪. দেবনাথ, ড. ননী গোপাল। গল্পগুচ্ছের নির্মাণশৈলী। অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

৫. দত্ত, সুমিত্রা। রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান। প্রকাশক: শর্মিলা কুণ্ডু ও স্বপনকুমার ঘোষ অক্ষর বিন্যাস: এন. ই. পাবলিশার্স ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন কলকাতা ৭০০০৩৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 79- 84
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.182

শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় নারী চরিত্রের অবলোকন

সুস্মিতা সাহা, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 26.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Society and literature basically change with time. Bengali literature also changed over time. Characteristics, stories and techniques are also changing. The city of Kolkata has repeatedly appeared in Sibram chakraborty's writing. His female characters created and centered almost around kolkata. He introduced the identity of modern women. In his literature we can see men are typically poor characters. But the women play a huge role of his writing. In his writing women basically brave, strong and outspoken person. He did not consider women to be neglected creatures in a patriarchal society. He has shown different aspects of women in his short stories, plays etc. In his writing women sometimes appear as lovers, as wife. Most of the images depicted are of woman from Kolkata city. And most of the female characters in his works are real life characters. Some are his sister, his lover, his niece, his aunt. He wrote about teenage as well as adult. He shows brave women who leaving her home for her lover. In the other hand women are so angry when her husband comes late. He understood a women wish. He has been able to portrait the psychology of women in his literature.

Keywords: Women, Kolkata, Female character, Brave

প্রাচীন যুগের নিদর্শন অর্থাৎ চর্যাপদ-এ নারীদের দেখা যায় অসহায় অবস্থায়। সেখানে শ্রেণিগত বৈষম্যের প্রভাব লক্ষণীয়। উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণরা ডোম্বিদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করত। যদিও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুসারে চর্যার সমস্ত কিছুই ধর্মের প্রতীক। কিন্তু তাদের সাধারণ বাঙালি ঘরের নারী ভাবতে অসুবিধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার অসহায় রূপ দেখতে পাই। পরবর্তীতে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যতেও নারীর প্রতি অবহেলার ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে সমাজের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থান বদলেছে। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

শিবরাম চক্রবর্তী আনুমানিক ১৯০৫ সালে (মতান্তরে ১৯০৩ সালে) মালদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব মালদার চাঁচল রাজবাড়িতে কাটলেও তাঁর অধিকাংশ জীবন কেটেছে কলকাতা শহরের মুক্তারাম স্ট্রিটের মেস বাড়িতে। তাই তাঁর রচনা মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। কলকাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর লেখনীতে বারংবার উঠে এসেছে। শিবরাম চক্রবর্তীর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে বিভিন্ন নারী চরিত্র রয়েছে। তাঁর রচনা নারী চরিত্রেরা মূলত শহর কলকাতার বাসিন্দা। তবে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রেরা প্রত্যেকেই ভিন্ন। শিবরাম চক্রবর্তী নারী প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "সত্যি কথা বলতে একটি মেয়ের সঙ্গে আরেকটি মেয়ের আশ্চর্য রকমের অনৈক্য! আকারে-প্রকারে, আচারে-প্রচারে, স্বরে-ব্যঞ্জনায়, হাজার রকমের খুঁটিনাটিতে এত দূর বিস্ময়কর গরমিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়। তাজমহলের সঙ্গে ময়দানে রোলারের যতখানি মিল, দুটি মেয়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশি সাদৃশ্য নেই।"[১]

শিবরাম চক্রবর্তী সৃষ্ট নারী চরিত্রেরা অবলা শ্রেণির নারী নয়। তিনি গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে এমনকী চুটকিতেও নারীর যে রূপ দেখিয়েছেন তাতে মূলত উঠে এসেছে নারীর দাপুটে স্বভাব। কখনো ভাগ্নি রূপে, কখনো বোন রূপে, কখনো মাসি আবার কখনো স্ত্রী রুপে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। যেমন প্রিসিলা, ডালু মাসি, ইতু, বিনি ইত্যাদি এই চরিত্রগুলিকে বারবার নানা গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত নারী চরিত্রগুলি সমাজে নারীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পুরুষদের জীবন নারীদের দ্বারা কতটা প্রতিফলিত তা স্পষ্ট রূপে বোঝা যায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য: সমাজ ও মানুষের জীবনধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যেরও নানা পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন রচনার কাহিনি বা প্লট, কৌশল, চরিত্র নির্মাণ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সমাজের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যেও নারী চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে মূলত আধুনিক যুগে শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় নারীদের অবস্থান তুলে ধরাই এই নির্বন্ধটির মূল উদ্দেশ্য।

মূল আলোচনা: প্রিসিলার মামা শিবরাম চক্রবর্তী। প্রিসিলা চরিত্রটি শহুরে আধুনিক মেয়ের আদলে তৈরি একটি চরিত্র। সে রান্না করতে না পারলেও হার মানে না, বই দেখে রান্না শেখে। প্রিসিলার প্রেমিক তার দেখা করতে দেরি করে আসে এবং তাই প্রেমিকের মনে ভীতি সঞ্চার হয়। শেষে দেখা যায় মামা শিবরাম চক্রবর্তী ভাগ্নির ক্রোধ থেকে তার প্রেমিককে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন নানা কৌশলে। শিবরাম চক্রবর্তী নারীদের প্রতি অনুরোধের ভাষা ব্যবহার করে। এখানে লক্ষণীয় যে তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি কাল্পনিক নয়, বরং তা বাস্তব চরিত্র থেকে সংগৃহীত। সেই জন্যই চরিত্রগুলি এত বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি প্রিসিলা চরিত্রটিকে নিয়ে অনেক গল্প সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'শেষরক্ষা' গল্পে প্রিসিলা ও তার প্রেমিকের ঝামেলা মেটাতে সাহায্য করে তার মামা। তবে এখানে শিবরাম চক্রবর্তী স্বীকার করেন যে প্রিসিলা অত্যন্ত স্মার্ট একটি মেয়ে। তিনি জানেন তর্ক করে প্রিসিলাকে সামলানো যাবে না। প্রিসিলাকে সামলাতে গেলে প্রয়োজন প্রখর বুদ্ধির। তাই তিনি বুদ্ধির প্রয়োগ করে প্রিসিলার তার গোবেচারা প্রেমিককে হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি প্রেমিককে মাফ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ তিনি মেয়েদের ভেতরকার রহস্য বুঝতেন। তিনি জানতেন উচ্চ স্বরের প্রয়োগ এখানে চলবে না। তিনি অবলা নারীর চোখের জল দেখাননি বরং আধুনিক নারীর স্মার্টনেস দেখিয়েছেন। এছাড়া 'নামডাকের বহর' গল্পেও আমরা ভাগ্নি প্রিসিলাকে দেখতে পাই। সেখানে প্রিসিলা নিজে অর্থ উপার্জনের কৌশল বের করতে চায়। 'রূপান্তর' গল্পে সে নিজেই রান্না শেখে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভাবে, গৃহকর্মে সর্বক্ষেত্রেই সে স্বাধীন থাকতে ভালোবাসে। প্রিসিলা শুধু বাহ্যিকভাবে আধুনিক নয়, প্রকৃত অর্থেই আধুনিক হয়ে উঠেছে। এই যুগের নারীরা আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর এক বোন ইতুকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। 'ঠিক ঠিক পিকনিক' গল্পটি একটি মজার কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে। তিনি কিশোরী মেয়েদের আদলে চরিত্রগুলি গড়েছেন এবং তাদের আসল নামেই তা প্রকাশ করেছেন। তাই তা পাঠকের কাছে আরও বেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে। রিনি চরিত্রটি তার মধ্যে অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও রিনির যেমন প্রভাব পড়েছে, সাহিত্যও তেমন। শিবরাম চক্রবর্তী আত্মজীবনীমূলক রচনায় রিনির প্রতি তাঁর প্রেমকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কড়া বাস্তববাদী রিনি সহজেই বলতে পেরেছিল—

> "আমার পরেও আরও কত মেয়ে পাবে, কতজনাই তোমার জীবনে আসবে— তখন তুমি অনায়াসেই ভুলে যাবে আমায়। দেখে নিও। এই সামান্য বয়সেই নারীসুলভ অসামান্যতার দুঃস্বাভাবিক নৈপুণ্যে জীবনের এত বড় তত্ত্ব দুকথায় ব্যক্ত করতে একটুও তার বাঁধেনি।"[২]

এই সংলাপের মধ্য দিয়ে রিনির বাস্তববাদী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও শিবরাম চক্রবর্তীর বিষয়ে রিনির এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়নি। শিবরাম চক্রবর্তী তাকে ভুলে যাননি তা তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি মেয়েদের নিয়ে নানা রসিকতা করেছেন। মেয়েরা কোথাও অপেক্ষা করতে বললে শুধু সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আশেপাশে নজর রাখতে হয় কারণ 'মেয়েলী দর্শন' গল্পে মণিকার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার পর শেষে বইয়ের দোকানে মণিকার দেখা মেলে। তাঁর প্রেমিক, প্রেমিকা বিষয়ক কাহিনির চরিত্রগুলিতে প্রেমিকরা মূলত অসহায়, বেচারা প্রকৃতির মানুষ। 'সব মেয়ে সমান' গল্পে সুন্দরীদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে শিবরাম চক্রবর্তী বিচারক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন না। কারণ তিনি মনে করেন সব মেয়ে সমান। আবার এই মেয়েরাই যখন স্ত্রী হয় তখন তারা একেবারে গিন্নি রূপ ধারণ করে। শিবরাম চক্রবর্তীর মতে স্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের আসল স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' গল্পটি তার আরও একটি প্রমাণ। 'রহস্যময়ী' গল্পে আমরা মণিকার অনেক পুরুষ বন্ধু দেখতে

পাই। মণিকার দুই প্রেমিক অলক ও হিরণের মধ্যে বাছাই করা শুরু হয়। কিন্তু এই গল্পে শেষ পর্যন্ত দরিদ্র অলকেরই জয় হয়। মণিকার চিত্ত সে হরণ করতে পারে তার বাঁশির সুরের দ্বারা। তারা বুদ্ধিমতী হলেও নারী হৃদয়ের মমতা, প্রেম, স্নেহ স্বভাবতই তাদের মধ্যে রয়েছে। আরেকদিকে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' গল্পে দুটি নারী চরিত্র দেখানো হয়েছে। একটি তড়িতের প্রেমিকা জ্যোস্না ও আরেকটি তড়িতের পিসিমা। পিসিমা প্রথমে বিয়েতে রাজি ছিল না। তিনি তড়িৎ-কে বাবার সেই উইলের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন যেখানে লেখা আছে পিসিমার মতে বিয়ে না করলে তড়িৎ তার পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু পিসিমা যখন তড়িৎ-এর প্রেমিকা জ্যোস্নার কাছে আসে তখন জানতে পারে যে তার প্রেমিকার আর কেউ নেই এবং তখন তা শুনে তিনি রাজি হয়ে যান। পিসিমার এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে বিশেষ কারণ সম্পর্কে পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে। যদি তড়িৎ সম্পত্তি না পায় তবু তার অসুবিধা হবে না। তাই নানাদিক ভেবে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। 'স্বামী মানে আসামী' গল্পে স্বামীর ব্যস্ততার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। গিন্নি তার স্বামীর থেকে সময় দাবি করে। সাধারণত বাস্তব জীবনেও স্বামী-স্ত্রীদের এই বিষয় নিয়ে সমস্যা লেগেই থাকে এবং সেই চিত্রই শিবরাম চক্রবর্তীর তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এই গল্পে। দাম্পত্যের ছোটখাটো খুঁটিনাটি সমস্যাগুলোর মধ্যে অভিমান ও মিলন লেগেই থাকে। তবে তিনি স্বামীদের নেহাত অসহায় এবং স্ত্রীদের মুখরা হিসেবেই দেখিয়েছেন। শিবরাম চক্রবর্তীর শুধুমাত্র কিশোরী মেয়েদের নিয়েই লেখেননি। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদেরও তাঁর লেখনীতে স্থান দিয়েছেন। যেমন ডালু মাসি চরিত্রটি তার প্রমাণ। ডালু মাসি পুরানো ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী একজন নারী। তিনি প্রেম করে বিয়ে করা খুব ভালো চোখে দেখেন না। প্রেম করে বিয়ে করার জন্য নানা মন্তব্য করেছেন 'বরের মাসি কনের পিসি' গল্পে। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি। তবে শুধু নারী চরিত্রই নয় তিনি বহু বিখ্যাত পুরুষ চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। যেমন হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন, হারাধন, নুপুর মামা, নিকুঞ্জ কাকা প্রমুখ চরিত্র। এমনকী শিবরাম চক্রবর্তীর নিজেই তাঁর রচনার একটি বিশেষ চরিত্র।

তাঁর রচিত গল্পের মত নাটকেও নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটতে দেখা যায়। 'চাকার নীচে' নাটকে প্রেমিকের অতসীর প্রতি প্রেম এক বিশাল ভাবনায় পরিণত হয়েছে। প্রেমিক শেষাদ্রির রাষ্ট্রভাবনা প্রেমিকা অতসী যেন আরও দৃঢ় করে তোলে। এখানে নারীকে এক শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। আবার 'রোমান্স' নাটকে দেখা যায় শ্রীলা চরিত্রটিকে। সে আধুনিক নবযৌবনা এক নারী। তাকে সিনেমায় না নিয়ে যাওয়ায় সে প্রতিবাদ জানাই। সে হুট করে এক ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে। সেই ভদ্রলোকের পরনে ছিল ওভারকোট। সে নিজেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে কারণ সে স্মার্ট আধুনিকা নারী। একজন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে তার কোন দ্বিধা নেই। সে অনায়াসেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের বাহানায় তার থেকে সাহায্য চায়। হেল্প চেয়ে ভদ্রলোককে চিৎকার করে ডাকে। শ্রীলা কাউকে ভয় করে না। কিন্তু গণ্ডগোলের আওয়াজ পাওয়ায় পাশের বাড়ির দারোগা পুলিশকে ফোন করে খবর দেয় কারণ সে ভাবে কোনো চোর ডাকাতের উৎপাত হয়েছে। শেষে পুলিশ আসে। ওভারকোট পরা ভদ্রলোককে হাতকড়া পড়ানোর সময় দেখা যায় তার হাত কাটা। এখানে শ্রীলা চরিত্রের মধ্যে নারীর রোমান্টিক ও আদিরসাত্মক ভাবটি লক্ষ্য করা যায়। 'প্রেম বিচিত্র বস্তু' নাটকে মহিতোষের দুই প্রেমিকা থাকলেও নারী বুদ্ধির কাছে তাকে হার মানতেই হয়। মহিতোষের দুই প্রেমিকার কাছে এসে ধরা পড়ে যায় শেষ পর্যন্ত। অতএব নারী বুদ্ধির জয় হয়। শিবরাম চক্রবর্তীর সৃষ্ট নারীরা বুদ্ধিমতী। আবার 'দেবা ন জানন্তি'-তে নারীর অন্য একদিক ফুটে ওঠে। এখানে নারীর পুরানো ধ্যান-ধারণা ভেঙ্গে যায়। ললিতা এখানে সাহসী এক নারী চরিত্র। সে তার পছন্দের পুরুষকে বিয়ে করার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এখানে তার দিদি লাবণ্যই তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই দুই নারীর সাহস, বুদ্ধি এবং ললিতার প্রেমই এখানে প্রকাশ পায়।

শিবরাম চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব সময়ের উপযোগী করে গড়া। সাহিত্যে নারীদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবলা চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু তিনি সময়ের উপযোগী বাস্তব শিক্ষিতা বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নারী হিসেবেই তুলে ধরেছেন। 'যখন তারা কথা বলবে' নাটিকাটিতে এক অন্য দিক ফুটে উঠেছে। প্রেম, বিবাহ নিয়ে এক নতুন দর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থ তার প্রেমিকা মঞ্জুরীকে বিয়ে করতে চায়নি। কারণ তার মতে বিয়েতে একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সে প্রেমের সেই সীমাবদ্ধতা চায় না। সিদ্ধার্থের কাছে প্রেম জিনিসটা বিয়ের অনেকটা ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে। মঞ্জুরী বাকি সাধারণ মেয়েদের মতোই সংসার চায় তাই সে নির্দ্বিধায় প্রেমিককে বলতে পেরেছে–

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না। কিন্তু বুঝবারও দরকার করে না। যখন এর পরিণামে বিবাহ নেই তখন আমাদের এসব আলোচনার কোনো মানে হয় না...এরপর থেকে তুমি রোগী, আর আমি নার্স।"[৩]

এখানে দুই মেরুর দুইটি মানুষ দুজনকে ভালোবেসেছে কিন্তু তারা নিজেদের ভাবনায় বিশ্বাসী। প্রেম ও বিয়ে নিয়ে তাদের দর্শন ভিন্ন। মঞ্জুরীও এখানে নিজের ভাবনা ও নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে তার বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। সে প্রেমিকের ভাবনার সঙ্গে নিজের ভাবনাকে মিলিয়ে দেয়নি। তবে সিদ্ধার্থ চরিত্রটি এখানে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তিনি নারী চরিত্র অঙ্কনে কবিতাতেও কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় 'রুবি দে' চরিত্রটি নারীদের মধ্যে এক ধারালো চরিত্র। রুবি দে বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি 'রুবি দে' কবিতায় এক নারীর রূপ নিয়ে লিখেছেন–

"ছুরির ফলার মতো রয়েছে
বিধে আমার মর্ম মূলে
রুবি দে
ভোলাও যায় না তারে
রাখাও তো বেদনার
কোনভাবে কোনরূপে নেই সুবিধে।"[৪]

রুবি দের এই রূপে অনেক পুরুষ মোহিত হতে বাধ্য। নারীর সৌন্দর্য সব পুরুষের কাছেই প্রাধান্য পায়। তিনি এরকমই আরেক নারীর রূপের জয়গান করে লেখেন 'একটি মেয়ে' কবিতাটি। তিনি লিখেছেন—

"সেই মেয়েটি, যে এলে চকিতে পাশে
লখিতে মিলায়ে যায় দীর্ঘশ্বাসে!
হৃদয়বিহীনা তবু হৃদয়হরা!
সেই মেয়ে কারও নয়,
নয় আমারও।
ভালোবাসা কারে বলে জানে না তা সে!
তার একটি হাসির দামে লাখো আঁখি নীর।"[৫]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন নীরা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি শিবরাম চক্রবর্তী রচিত এইসব নারীও পাঠকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি নারীর রূপের প্রতি তীব্র টান অনুভব করেছেন। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় নারীর রূপই নারীর শত্রু। যেমন চর্যাপদে বলা হয়েছিল 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' ঠিক তেমনি শিবরাম চক্রবর্তী সহজেই বলতে পেরেছেন—

"তবু ঐ কালো তিল,
তুমি কি জানো তিলোত্তমা,
তোমার কত বড় শত্রুকে তুমি
লালন করছ নিজের চিবুকে ?"[৬]

'যথাপূর্বম' কবিতায় হরিপ্রাণকে স্ত্রীর বাধ্য স্বামী রূপে দেখা যায়। স্বামী শ্রীমান হরিপ্রাণ রীতিমতো তার স্ত্রীর ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন। শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছেন--

"গিন্নি ত্রাসে তিনি সদাই কম্পমান
খাদকের মুখে যথা খাদ্য;
মারধর খেয়ে হায় কখন প্রাণ হারান,
সাবধান রণ যথাসাধ্য।"[৭]

শিবরাম চক্রবর্তী চুটকি রচনাতেও নারী চরিত্রের দাপুটে স্বভাবই বজায় রেখেছেন। তিনি নিজে বিয়ে না করলেও স্বামী-স্ত্রী নিয়ে বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক এমনকী কিছু চুটকিও রচনা করেছেন। তিনি কলকাতার শহুরে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য দেখার পর নারী সম্পর্কে তাঁর যা মনোভাব হয়েছে তা বহু রচনায় প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন—

> "বিয়ের পর বৈরাগ্যে অনেক স্বামী ভুল পথে চলে যান, জানাচ্ছেন এক লেখক, বউয়ের কচি জ্বালাতেই মদ্যপ হয়ে পড়েন শেষটায়।
> পানিগ্রহণটাই অবশ্যি প্রথম পাণিপথ।"[৮]

তিনি মেয়েদের নিয়ে নানা মজার রচনা লিখেছেন তবে নারীর অবহেলিত, দলিত চিত্র তাঁর রচনায় নেই বললেই চলে। তাঁর সৃষ্ট নারীরা এক একজন বীরাঙ্গনা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের এই রূপ হাস্যরসের সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু শিবরাম চক্রবর্তী তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

ফলাফল: বাংলা সাহিত্যে নারীর যা যা চিত্র ফুটে উঠেছে তা থেকে শিবরাম চক্রবর্তী সৃষ্ট নারীরা ভিন্ন। তিনি স্মার্ট, ডানপিটে নারীদের পছন্দ করতেন তা তাঁর নারী চরিত্র পড়লেই পাঠক সহজে বুঝতে পারবে। তিনি নারীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি কখনোই মেয়েদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবহেলিত প্রাণ বলে মনে করেননি। বরং নারীরা শহরের শিক্ষিতা ও আধুনিকা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মা, প্রতিবেশি রিনি, বোন ও অন্যান্য নারীরা তাঁর লেখনের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। তিনি প্রতিটি নারীকে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন এমনকী তাদের রাগকে পর্যন্ত ভয় পেতেন। এই বিষয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন—

> "শিবরাম নাকি মেয়েদের ক্যারিকেচার আঁকতে মানা করতেন, বলতেন ওরা পছন্দ করবে না রেগে যাবে।"[৯]

তিনি প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন বহু গল্পে। সেই সময়কার সমাজে নারী এবং পুরুষের অবস্থান দেখিয়েছেন। এই সময়ের আগে দেখা যেত নারীর রীতিমত নির্যাতিত হচ্ছে। তারপর সমাজে ধীরে ধীরে ফেমিনিজমের মারাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করে। তারা অন্যায় মেনে নিতে চায় না এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আবার আরেকদিকে ফেমিনিজমের অত্যাধিক প্রভাবে পুরুষেরা বিপদে পড়েছে। না। 'স্ত্রী সুখ' নামক গল্পে স্ত্রীকে দেখে রীতিমতো ভয় পেতে দেখা যায় স্বামী ভদ্রলোকটিকে। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখায় স্ত্রীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। আবার তারা স্বামীকে সন্দেহের চোখে দেখলেও নিজে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অনায়াসে ঘুরতে যায়। অর্থাৎ এই নারী গ্রামের বধূ নয় বরং শহরের আধুনিক নারী। এই গল্পে বেচারা অসহায় স্বামী বিয়ের পরের দুঃখ নিয়ে কথক বলেছেন-

> "কুড়ি বছর আগে বিয়ের রাতে সাতপাক ঘুরিয়ে আনার তারিখ থেকে সদানন্দ নিজের নিজের নাম ভুলে গেছে। নাম না ভুললেও নামের মানে তো বটেই! তার বিয়ের পর আর তাকে হাসতে দেখিনি একদিনও... অন্তত বৌয়ের সামনে তো নয়। আর এই কুড়ি বছর ধরে সে বৌয়ের বক্তৃতা শুনছে এক নাগাড়ে।"[১০]

এই নারী চরিত্রকে বহু ক্ষেত্রে নারীবাদ ভাবনার প্রয়োগ করেছেন। তারা যেমন প্রয়োজনে পুরুষের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তারা তেমন ভাবেই নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতেও নারীবাদের অপপ্রয়োগ করতে দেখা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিবরাম চক্রবর্তী নারীদের নিয়ে নিছক মজা করে তাদের নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

শিবরাম চক্রবর্তী যেন মেয়েদের অন্তর্যামী। তিনি মেয়েদের হৃদয়ে দুঃখ দিতে নারাজ। শিবরাম চক্রবর্তী নিজে বিয়ে না করলেও মেয়েদের মন নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। তাঁর দৃষ্টিতে নারীরা দেবী। তাঁর সৃষ্ট নারীকে ভয় দেখাতে পারেন না পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও এখানে নারীরা বশ করতে জানে পুরুষদের। তবে তা কোনো মন্ত্রবলে নয়, বুদ্ধির দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সেই নারীরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তিনি যেমন শ্রীলার মতো সদ্য যৌবনা মেয়ের চরিত্র এঁকেছেন তেমনই প্রেমিক গণেশকে ভালোবেসে ঘর ছাড়তেও দেখিয়েছেন ললিতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তিনি নারীদের মনন, চিন্তন, দর্শনের পরিবর্তন পরিস্ফুট ভাবে তুলে ধরেছেন। শিবরাম চক্রবর্তী সৃষ্ট নারীদের চরিত্রে নারীবাদ, তেজস্বীতা, বুদ্ধিমত্তা, স্নেহপরায়ণতা, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ৬। নবপত্র প্রকাশন, ২০১৮ কলকাতা, পৃ. ১১১।
২. চক্রবর্তী, শিবরাম। ঈশ্বর-পৃথিবী-ভালোবাসা। নবপত্র প্রকাশন, ২০১৩ কলকাতা, পৃ. ৪১।
৩. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ১০। নবপত্র প্রকাশন, ২০২০, কলকাতা, পৃ. ১৯৫।
৪. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ১৬। নবপত্র প্রকাশন, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৫৭।
৫. তদেব, পৃ. ১০৫।
৬. তদেব, পৃ. ১২১।
৭. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ১২। নবপত্র প্রকাশন, ২০২০, কলকাতা, পৃ. ১৯৯।
৮. চক্রবর্তী, শিবরাম। অল্পবিস্তর। নবপত্র প্রকাশন, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ১৯২।
৯. রায়চৌধুরী, সুশান্ত এবং গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বদেব, সম্পাদনা। লেখায় শিব্রাম রেখায় শ্রীশৈল ২। বুকফার্ম, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৩৬।
১০. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ৫। নবপত্র প্রকাশন, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ১৭৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 85- 92
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.183

‘সেই পাখি’ উপন্যাসের কাহিনি ও শিল্পরূপ: লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ পর্যালোচনা

অশোককুমার রায়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 26.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Among SantoshKumar Ghosh’s remarkable novels such as ‘*Kinu Gowalar Goli*’, ‘*Shesh Nomoskar Shricharoneshu Ma-ke*’, ‘*Swayang Nayak*’, and ‘*Jal Dao*’, the novel ‘*Sei Pakhi*’ occupies a significant place. In this work, Ghosh demonstrates distinct variety in both narrative structure and artistic form. Within literary studies, particularly in the analysis of novels, narrative design and artistic form are considered essential components. The artistic form of a novel reflects the individuality of the author, manifested through language, style of expression, choice of words, rhythm, and imagery.

On the other hand, the narrative serves as the backbone of the novel. In ‘*Sei Pakhi*’, the narrative revolves around the character of Arindam—a murderer as well as a patient—who is interrogated by the psychologist Mandira. This technique of interrogation distinguishes the novel from others in Ghosh’s oeuvre. The climax centers on why and how Arindam committed murder. Equally compelling is the psychological dimension: how Arindam, as an accused, is influenced by Mandira, and conversely, how Mandira herself exerts psychological impact on him. Such dual perspectives enrich the narrative depth.

Furthermore, the use of flashback technique adds complexity and dramatic tension to the storyline. Hence, the central aim of this research article is to analyze how Santosh Kumar Ghosh, through *Sei Pakhi*, has introduced new dimensions in both narrative construction and artistic form.

Keywords: Novel, Narrative, Murderer, Psychologist, Artistic Form

নিজের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করে আনন্দ খুঁজে পাওয়ার অন্য নাম সাহিত্য। সাহিত্যিক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। কথাসাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়। তাই লেখক উপন্যাসে বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে চান। পাঠকেরাও হয়ে উঠেন সঙ্গের সাথী। সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, লেখকের নিজস্ব উপস্থাপনভঙ্গির নানা দিক এই উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠে। তাই ঔপন্যাসিক নিজেই এই উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাস সম্পর্কে বলেছেন—

> “যে যা বলে, আর যে যা জবাব দেয় সেইসব ঝরে পড়া ফুলগুলো কুড়িয়ে, গেঁথে নিয়ে তবেই তো গল্প-উপন্যাসের মালা গাঁথা হয়! আমি নিয়মের একটু বাইরে যেতে চাইছি, যে যা বলেনি কিন্তু বলতে পারত, এই কাহিনিতে তারও কিছু কিছু জুড়ে দিতে চাইছি।”[১]

এই উপন্যাসে লেখক কাহিনি বিন্যাসে ও শিল্পরীতি বর্ণনায় নতুনত্ব এনে সমকালীন লেখকদের থেকেও স্বতন্ত্রের দাবী রাখেন। এ প্রসঙ্গেররীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলা যেতে পারে—

> "... ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে এ'কেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য।...সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন।"[২]

তাই লেখক তাঁর মননশীল ভাবনাকে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস ও শিল্পরূপের মধ্যে দেখিয়েছেন। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে আলোচিত 'সেই পাখি' উপন্যাসে সেই দিকটি মুখ্য অনুসন্ধান ও আগ্রহের বিষয়।

গবেষণা পদ্ধতি:

গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করতে বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তথ্য আহরনের ক্ষেত্রে মূল উৎস হিসেবে আকর গ্রন্থ এবং গৌণ উৎস রূপে সহায়ক গ্রন্থরাজির সাহায্য নেওয়া হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা, ও বিষয়ভিত্তিক সহায়ক বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ফলে যাবতীয় তথ্য সমূহের সাহায্য নিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পত্রটিতে একটি নিটোল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতিগতভাবে প্রচেষ্টা থাকবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

বাংলা সাহিত্যের আসরে উপন্যাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই উপন্যাস নিয়ে নতুন রূপে কাহিনি-বিন্যাস ও শিল্পরূপ নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসটির তেমন কোনো আলোচনা নেই। তাই আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসে এই অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা থাকবে। ফলে একদিকে যেমন লেখকের স্বতন্ত্র দিকটির প্রতিফলন ঘটে অন্যদিকে এই উপন্যাসটি কাহিনি বিন্যাস ও শিল্পরূপ বিশ্লেষণে বিশেষ তাৎপর্যের দাবী রাখে।

বিশ্লেষণ:

এক

কাহিনি-বিন্যাস:

লেখকের 'সেই পাখি' উপন্যাসটি ঈশিতা ও অরিন্দমবাবুর উক্তিতে শুরু হয়েছে। পুরো গল্পটি উত্তম পুরুষে উপস্থাপন করেছেন লেখক। এই উপন্যাসে একটি বিশেষ দিক হল সিনেমার ভঙ্গিতে কাহিনি-বিন্যাস। কাহিনি বিন্যাসের পর্বগুলি পর্যায়ক্রমে লেখক যেভাবে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার নমুনা তুলে ধরা হল—

(ক) আমাদের মুভি ক্যামেরায় তখন তোলা ছবিগুলো এখন ডেভেলপ আর প্রিন্ট করে সাজিয়ে দেখছি।

(খ) এই মুহূর্তে আমাদের ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রাখুন... তবে সাবধান, শুধু অদৃশ্য হলেই চলবে না, নিঃশব্দও হতে হবে, কারণ মৌরী আর অরিন্দম- মনে রাখবেন, এদের দু'জনেরই শ্রুতি, ঘ্রাণ ইত্যাদি অতিশয় সংবেদনশীল।

(গ) তার চেয়ে চারজনের মধ্যে যে-কোনও একজনের চোখের কাছাকাছি ক্যামেরাটাকে রাখাই ভাল। (চারজন বলতে এখানে মৌরী, অরিন্দম, বেবি ও অঙ্কিতা কথা বলা হয়েছে)

(ঘ) এই রাস্তায় ক্যামেরা আর সাউন্ডট্র্যাক বয়ে বয়ে আমরা এতদূর এসেছি যে, ফেরা মুশকিল।

এই ভাবে কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন লেখক। এক সময় লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "এটা যদি মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে সিনেমার ধাঁচে লেখা না হত, তা হলে অব্যবহিত পূর্ববর্তী দৃশ্যে বেবিকেও যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকা দেওয়া যেত।"[৩]

এই বিষয়েটিকে আরো প্রস্ফুটিত করতে সমালোচকের কথায় বলতে হয়—

> "উপন্যাসের সর্বস্ব হচ্ছে কথা, ফিল্মের হচ্ছে ক্রিয়া বা অ্যাক্‌শন। উপন্যাসের রস হচ্ছে কথোপকথকে, তার সূক্ষ্ম রসিকতায়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বা আবহাওয়া-রচনায়; ফিল্ম-এর হচ্ছে গতিতে, অঙ্গ-ভঙ্গিতে, চলমানতায়।...উপন্যাসের মাহাত্ম্য যত তার বিষয়বস্তুর গৌরবে,ততটা বর্ণনাকৌশলে নয়। ফিল্মের পক্ষে বিষয়বস্তুটা গৌণ, বিষয়বিবৃতিই বিধেয়।"[৪]

উপন্যাসের গাঁথুনিকে আরো মজবুত করতে অরিন্দমকে মাকড়সার জালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ মাকড়সার মতো জাল বিস্তার করে নিজেকে তৈরি করার জন্য প্রস্তুত করে সমাজের নানা ক্ষেত্রে। আখ্যানের গতি এগিয়ে যেতে যেতে দেখা গিয়েছে উপন্যাসে মন্দিরা ছিলেন একজন মনোবিজ্ঞানী। তাঁর দিদি নন্দিতা ও জামাইবাবু হিমাদ্রি। প্রথম দৃষ্টিতে অরিন্দম সম্পর্কে মন্দিরার ধারণা—

> "ওই লোকটাকে দেখুন, দেখুন জামাইবাবু, কেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে।"[৫]

একটু পরেই দেখা যায় মন্দিরার মধ্যে প্রথম অরিন্দমকে দেখে যা যা তার শারীরিক পরিবর্তন ঘটে সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন— "চোখের কোণে লাল হয়ে যাওয়া। মন্দিরা যেন 'জালে-পড়া খাবি-খাওয়া মাছের মতো ছটফটে ভাব তার।'"[৬] সেই অবস্থায় মন্দিরাকে দেখে অরিন্দমের মনে হয়েছে 'মন্দিরা যদি মোহানার কাছাকাছি কোনো নদী হত বা কোনো শীতের দিনের দু'প্রহর হত তাহলে ভাল হত'। গল্পের আখ্যান যত এগিয়েছে চরিত্রগুলি একে অপরের আরো কাছাকাছি এসেছে। শুধু মন্দিরার শারীরিক পরিবর্তন নয় অরিন্দমের মধ্যেও স্বরের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে মন্দিরার সঙ্গে কথা বলার সময়। দার্শনিক মনোভাবের মতো একজন নারীকে জানা সহজ নয় সেই দিকটি উপলব্ধি করতে পেরেছে অরিন্দম। অরিন্দম নিজের ব্যক্তি সত্তাকে গুলিয়ে ফেলেছে। তাই ঈশিতা আর মন্দিরাকে এক সঙ্গে ভাবনায় দাঁড় করিয়েছে। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন কম কথা বলা মেয়েটির নাম ঈশিতা। অরিন্দমের ছোট বেলার খেলার সঙ্গী ছিল সতী নামের একটি মেয়ে। অরিন্দম নিজেও দিশেহারা এক এক সময় অন্য অন্য মেয়েদের যে ভাবনা তার মাথায় ভর করে আসায়। এ প্রসঙ্গে আমরা জীবনানন্দ দাশের কথায় বলতে পারি—

> "মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়— কোনো এক বোধ কাজ করে।"[৭]

মানুষের মন কত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সময়ে সময়ে এ বিষয়টি লেখক দেখিয়েছেন। অরিন্দম উপলব্দি করতে পেরেছে তার ভিতরে একটা 'মিস্টার হাইড' লুকিয়ে রয়েছে। অরিন্দম চরিত্রের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার উন্মেষ হতে দেখা যায়। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—

> "কিন্তু যেই চলে যাই হাইডের কবলে, যেইমাত্র তার প্রজা হই, অমনই শুরু হয় তার হরেক অত্যাচার। আমারই অভ্যন্তরে জন্ম নেওয়া আমারই মনের কোনও স্তরে লালিত এবং পালিত হওয়া ওই সুপুষ্ট সত্তাটি আমাকে দিয়ে কি যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে? — নারীহরণ, নারীধর্ষণ, এমনকী খুন?"[৮]

ঠিক তার একটু পরেই অরিন্দমের স্বরের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। অরিন্দমের চোখে মন্দিরার শারীরিক বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

> "মন্দিরার পা দুটো এখন কাঁপছে, সবে দাঁড়াতে শেখা বাচ্চার মতো, এই ভরাভরতি যুবতী এখন টলমল, অচিরে স্থির হয়ে যাবে, ওর গিরিচূড়া আর উপত্যকাসমেত অন্তঃস্থলের ভূকম্পও থেমে যাবে নির্ঘাত"[৯]

মানসিক এই পরিস্থিতির মোহ জাল থেকে অরিন্দম বেড়িয়ে আসতে পারেনি। তাই দু'জনে একসময় শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। লেখকের বর্ণনায় অরিন্দম আর মন্দিরা শারীরিক সম্পর্কের কথা উপন্যাসের পাতায় দেখা গিয়েছে—

> "পালঙ্কে বসে অরিন্দম এখন দম নিচ্ছে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জরিপ করছে সারা ঘরের আর পায়ের কাছে দলা পাকানো জামা, পাজামা দুটো হাতড়ে নিয়ে খানিকটা ভব্য হয়ে সে এখন দেওয়ালে বিলম্বিত নগ্নিকা বিলাসিনীদের সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলছে।"[১০]

আধুনিক মানুষের মন-মানসিকতার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে অরিন্দম চরিত্রের মধ্যে। অরিন্দম এক জনের সঙ্গে সম্পর্কে থেকেও অন্য নারীদের সঙ্গ নিয়েছিল। আধুনিক কালে এই দিকটি স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে মানুষের জীবনযাত্রায় এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথায় বলা যেতে পারে—

> "আধুনিকতার মানেই নাকি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা—সভ্যতা ক্রমশ তাদের শেখাচ্ছে নতুন নতুন নিয়মকানুন এবং যৌনতাকে মুক্ত করে দেবার"[১১]

মন মানসিকতা। অরিন্দমের অন্য নারীদের নাম বেবি ও অঙ্কিতা ছিল। বেবির কাছাকাছি যাওয়ার কারণ বেবির গানের গলা ভালো ছিল। একজন মানুষ সবসময় পূর্ণতা পেতে চায় সেই বিশেষ দিকটি দেখা গিয়েছে অরিন্দমের মধ্যে। অরিন্দম পরে অঙ্কিতার কাছে যায় কারণ সে নৃত্যশিল্পী ছিল। লেখক উপন্যাসে ছেলেদের মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মদ্যপানের দিকটিও দেখিয়েছেন—

> "তোর একটু দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই বেবি। হুঁশ নেই, এখনও টলছিস। আজ সন্ধে থেকে বল তো, ক' গেলাস গিলিছিস?"[১২]

উপন্যাসের মাঝে এসে দেখা যায় অরিন্দম মানসিক রোগী ছিল। উপন্যাসের অন্য একটি চরিত্র হিমাদ্রি। মন্দিরার জামাইবাবু তার কথা আমরা আগেই পেয়েছি। অরিন্দম যে মানসিক রোগী হিমাদ্রির কথায় তা খানিকটা ধরা পড়েছে—

> "এমনিতে এত ডিসেন্ট এই অরিন্দম ছেলেটি, অথচ মাঝে মাঝে ওর কী যে হয়, হঠাৎ একেবারে এলোমেলো পাগল হয়ে যায়।"[১৩]

এর পরেই জানা গিয়েছে অরিন্দমের মৌরী নামের এক নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। মৌরী ছিল একজন অভিনয়শিল্পী। উপন্যাসে মাঝে মাঝে তাকে যাত্রাদলে পার্ট করতে দেখা গিয়েছে। এই বিশেষ দিকটি ধরা পড়ে উপন্যাসের সংলাপ থেকে—

> "... আমি যদি এখন জনার পার্ট করি, তবে তুমি কী হবে? পারবে এক লাইনও অ্যাকটিং করতে?"[১৪]

উপন্যাসের শেষে দেখা গিয়েছে এক রাতে অরিন্দমবাবু মৌরী ওরফে হিমা নামে একটি মেয়েকে গলায় মুক্তোর মালা জড়িয়ে প্যাঁচ দিয়ে খুন করে। গলায় মালা প্যাঁচ লাগায় হিমা শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায়। মনোবিজ্ঞানী মন্দিরা মনে করেন অরিন্দমের সংস্পর্শে যেসব মেয়ে আসে সকল মেয়েই মরে কোনো না কোনো ভাবে। এই কথার মধ্যে একটা দার্শনিক তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। শুধু শারীরিক ভাবে নয় মানসিক ভাবেও মরে মেয়েরা। অরিন্দম জীবনে অনেক নারীর সঙ্গে মিশেছে। শৈশবে সতী পরে যশোমতী নামে এক বিধবা দাইয়ের সঙ্গেও। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই কাহিনি অবলম্বন করে বলা যেতে পারে অরিন্দমই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তার মন, আচার ব্যবহার উপন্যাসের কাহিনির আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞানী মন্দিরা প্রশ্ন রেখেছে অরিন্দমের কাছে—

> "দেবতারা যা বানিয়েছিলেন, আপনি কি তাই বানাতে চান, এই কলিকালে? পুরাণকে করতে চান আধুনিক?"[১৫]

এই জিজ্ঞাসা প্রতিটি আধুনিক মন-মানসিকতার মানুষের যারা নতুন ভাবে নিজেদের ভেঙে তৈরি করতে চান। উপন্যাসের শেষের এসে লেখক জানিয়েছেন—

> "প্রাথমিক বঙ্গোপন্যাসের কালে লিখিত হলে এই অংশটাকে বলা যেত উপসংহার। এই উপসংহারে কালি-কলম, ক্যামেরা-ট্যামেরা সমস্ত নিয়ে অন্তরালে হাজির হয়ে আমরা শুনলাম, কোনও মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে রোগী অরিন্দমের কথোপকথন।"[১৬]

এই ভাবে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস হয়েছে। যা পাঠকের মনকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আর্কষণীয় করে তুলেছে।

দুই

শিল্পরূপ:

শিল্পরূপের মধ্যে রচনা শৈলীর দিকটি উঠে আসে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী চিন্তাবিদ বুফোঁর তাঁর 'Discourse Sur le style' গ্রন্থে বলেন 'style is the man himself' অর্থাৎ লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে শৈলী বলতে 'শীল, স্বভাব'[১৭] এবং 'প্রজ্ঞপ্তি'[১৮] শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। বিশিষ্ট শব্দ বা বাকভঙ্গির ব্যবহার সেই সঙ্গে অনুচ্ছদ সাজানোর দিকটি শৈলীতে ধরা পড়ে।

> "লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন"[১৯] বলা হয়ে থাকে। লেখক তাঁর চিন্তা, সংকল্প ও উপলব্দির মধ্য দিয়ে কর্মসাধনাকে সৌন্দর্যে পৌঁছে নিয়ে যান। "স্টাইল হল লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা অবচেতনভাবে নিয়োজিত সেইসব ভাষাগত উপায় যে সবের দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগসাধন করেন।"[২০]

তবে দেখা যাবে লেখক "বক্তার সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।"[২১] পরে তা পাঠকেরা সহজেই মেনে নিতে পারি। শৈলীর ক্ষেত্রে লেখক সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য সব দিকেই সর্তক দৃষ্টি রাখেন। তাই সমালোচকের কথাই বলা যেতে পারে—

> "স্টাইল বিচারে রচনার প্রতিটি শব্দ, সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য, অনুচ্ছেদ সমস্ত এমনকি প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ জাতধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জ সমস্তই অতিসূক্ষ্ম ও সতর্ক বিশ্লেষণীয়। চিত্রকল্প, ভাষণ, কলা, সব জড়িয়ে স্টাইল।"[২২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিল্পরূপের নানা দিকের আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দপ্রয়োগ:

তৎসম শব্দ:

তৎসম শব্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন বলেছেন—

> "যে সকল শব্দ আধুনিক বাঙ্গালায় সংস্কৃত হইতে অপরিবর্তিতভাবে গৃহীত হইয়াছে সেগুলিকে বলা হয় তৎসম। ('তৎ অর্থাৎ সংস্কৃতের 'সম' অর্থাৎ অভিন্নমূর্তি)"[২৩]

কিছু শব্দ উপন্যাসের পাতা থেকে তুলে ধরেছি।
আমরা অচিরেই উপনীত হই এমন একটি কোমল উপাধানের **সমীপে**।
আর ওই স্নেহক্ষরা নারী অবিলম্বে তার উত্তরও দিচ্ছে।
তৎসম অব্যয়: অদৌ, তৎসম বিশেষণ: পুষ্ট।

তদ্ভব শব্দ:
বাংলা শব্দভাণ্ডারের মৌলিক শব্দের একটি ভাগ হল তদ্ভব শব্দ। উপন্যাসে অনেক তদ্ভব শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়েছে কিছু উদাহরণ হল—মাছ, চাঁদ, মাথা, এগারো, হাত ইত্যাদি।

অনুকার শব্দ:
উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু অনুকার শব্দ হল যেমন—
ওই বেবির তাল-মান আর **মুদ্রা-টুদ্রা** সব নিখুঁত।
চোখের তারার **আনাচ-কানাচ** লাল করে ফেলছে।
তোমরা যাকে বলো **তটিনী-নটিনী**, সব হতে পারে।
নামের কৃতিমতা সত্ত্বেও অঙ্কিতা তো কনুই দিয়ে **গুঁতিয়ে-টুতিয়ে** ওই দৃশ্যটায় রাস্তা সাফ করে একটুখানি সামনে আসতে পেরেছে।
হয়তো সে আকাশের উপরদিককার স্তরের লঘুভার **হাওয়া-টাওয়া** নিয়ে কিছুই বলত না।
অন্ধকারে **হাসি-টাসি** দেখা যায় না।
অরিন্দম কোনও ধোঁয়াটে **পাপ-টাপ** নয়, দৃষ্টি-স্পর্শগ্রাহ্য একটি অপরাধ করেছে।
মানে, কোনও ঠাকুর, **বিগ্রহ-টিগ্রহ**, ছেলেবেলা থেকেই যার পায়ে আপনি দিয়ে এসেছেন অঞ্জলি?
একালের **গল্প-টল্প** সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত।
পাপ-তাপ— এসব কথা তো বড় ধোঁয়াটে অরিন্দমবাবু।

প্রবাদ:
প্রবাদের মধ্যে থাকে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও মননশীল চিন্তার প্রতিফলন। এই উপন্যাসে একটি বাংলা আর একটি ফরাসি প্রবাদ ব্যবহার হয়েছে।
বাংলা প্রবাদ: ঊরু দেখিয়েই ছ'মাস'
ফরাসি প্রবাদ: শার্সে লা ফাম

প্রশ্নবাচক বাক্য:
বর্ষারও কি মানে বলে দিতে হবে?
কী বলে তোমার এই শাস্ত?
আপনি তখন বলেছিলেন কী?
আপনি ঈশিতা নন তো?
তবে তাকে কি দেখেছেন স্বপ্নে?

অব্যয় নিয়ে বাক্য শুরু:
কিন্তু সে বেচারার তখন নাক ডাকছিল।
অথচ বেবিকে তার একটুও ভাল লাগেনি।

পুনরুক্ত শব্দ:
সেকালে মেয়েদের পায়ের ঘায়ে অশোক গাছ **লাল লাল** ফুলে ছেয়ে যেত।

বিস্ময়সূচক শব্দ:
কী অদ্ভূত কথা বলো তুমি!

তিরতিরে ঝরনা নিয়ে এলাম বলো দিকিনি!
এতখানি সৃষ্টি আমিই তো করেছি!
সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে একটি বিশেষত্ব 'খ' এর পরিবর্তে 'ক্ষ' এর ব্যবহার
আমি **কক্ষন**ও কি বলেছি যে আমি ঈশিতা?
এইখানেই মিল যতেক মক্ষিকার সঙ্গে **মক্ষী**রানিদের।
বারো আনা। **এক্ষুনি** উড়ে যাবে, এমন নন্দনবাসিনী নগ্নিকা প্রত্যেকটি।
মৌরীর মুখে ব্যবহার হওয়া "**তুম**" প্রত্যয়টি যা অরিন্দমকে ভাবিত করে তুলেছে।
এখানে আজানু অনাবৃত শব্দটির প্রাকৃত অর্থ করতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—উদলা।

প্রতীতির শব্দের ব্যবহার:

'সেই পাখি' উপন্যাসে লেখক একটি প্রতীতি শব্দের ব্যবহার করেছেন। প্রতীতি অর্থে নারীদের তিনি 'মহাজন' বলেছেন।

পৌরাণিক চরিত্র:

ঔপন্যাসিক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি উপন্যাসে ঘটনা প্রসঙ্গে, চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে, ঘটনার গতিকে আরো প্রাণবন্ত করতে, পৌরাণিক চরিত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই উপন্যাসে তিনি মাত্র তিনটি পৌরাণিক চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি।

ছড়ার ব্যবহার:

ছড়া বলতে বোঝায় মুখে মুখে রচিত এক বিশেষ প্রকরণ। যার সঙ্গে লোকজীবনের সংযোগ থাকবে। উপন্যাসের চরিত্রের মুখে লেখক এই ছড়া বসিয়ে দিয়ে উপন্যাসের চরিত্রকে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তুলেছেন। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ছড়াগুলি হল—
ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়োল বর্গি এল
ছেলে ঘুমোবে না যশোদা মাই

অনুপ্রাস অলঙ্কার:

একটি বর্ণ বা একগুচ্ছ বর্ণ বার বার ব্যবহৃত হয়ে যে শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করে, তাকে বলে অনুপ্রাস। এই উপন্যাসে দু'টি অনুপ্রাসের লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে একটি অনুপ্রাস অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা গিয়েছে। যেমন—
ঝমর ঝম ঝমর ঝম

লোকসঙ্গীত:

বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে লোকগান একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। একটি লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজের নানা দিক উঠে আসে। আনন্দ দানের পাশাপাশা মানব মনের চিরকালীন কথাকেই ধ্বনিত করে। সে দিক থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি লোকসংস্কৃতির দিকটিও। লোকগানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল। যথা— ভাওইয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, লালনগীতি, বাউল ইত্যাদি। 'সেই পাখি' উপন্যাসে লেখক ঝুমুর গানের প্রসঙ্গ এনে ঘটনাকে সুন্দর গতি প্রদান করেছেন।

চরিত্রের সংলাপে মাঝে মাঝে লেখক কবিতার ব্যবহার ঘটিয়েছে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় লেখক নিজেও কবিতা যেমন ভালবাসতেন। আসলে লেখক নিজেই কবিতার হাত ধরেই সাহিত্যে এসেছেন। এই উপন্যাসে চরিত্রের সংলাপ থেকে কবি কিরণধনের কবিতার অংশ তুলে ধরেছেন— 'বেলফুল চাই না, জুঁইফুল দাও' মাঝে মাঝে বিলিতি শাস্ত্র থেকে উক্তি ব্যবহার করেন উপন্যাসে—প্রভু যিশু তাঁর সারমন অব দ্য মাউন্ট-এ বলেছেন— 'এক গালে চড় খেলে আর একটা গাল বাড়িয়ে দাও'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতার প্রসঙ্গ এনে রাধার অভিসার কথা বর্ণনা করেছেন। অভিসারের যাওয়ার সময় আওয়াজ যত কম হয় ততই ভাল এই দিকটির কথা তুলে ধরেছেন। লেখক নিজেও বিশ্বাস করেন 'তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে' যুগ যুগ ধরে নায়কের কাছে নায়িকারা অভিসার করেন। উপন্যাসে অরিন্দমের কাছে বার বার নারীগুলো এসেছিল। এ কিন্তু অভিসারের অংশই বলা যেতে পারে।

লেখক গ্রাম জীবনে শৈশবের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন তাই মা, পিসিদের দেখেছেন কীর্তনে দলে যেতে। সেই দিকটিও উপন্যাসে তুলে এনেছেন তারঁ জীবন অভিজ্ঞিতা থেকেই। কীর্তন গানে উপন্যাসে 'আমি গোঠেমাঠে ধাই, ধবলী চরাই, তোমার প্রেমের কীই বা জানি।' এই অংশের কথা বলেছেন। মানব জীবনের নানা বিষয়গুলি এনে ঘটনা গতিকে শুধু প্রাণবন্ত করেনি তিনি সমকালীন সংস্কৃতিকেও ধরতে চেয়েছেন।

গানের ব্যবহার:

উপন্যাসে দেখা গিয়েছে চরিত্র মনের যে কথা সরাসরি বলতে পারে না সেই ক্ষেত্রে গানের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের মনের ভাব অন্যকে ব্যক্ত করে থাকে। কোনো কোনো উপন্যাসে দেখা গিয়েছে চরিত্রগুলি নিজেরা অন্যদের গান শুনিয়ে রোজগার করতে। 'রেণু, তোমার মন' উপন্যাসের অন্ধবালক নিজে গান গেয়ে রোজগার করেছিল। সঙ্গে রেণু দের মামাদের পরিবার চালিয়েছিল। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে নীলা গান শুনিয়েছি অবিনাশকে। লেখক নিজে গান ভালো পেনেত রবীন্দ্র-সঙ্গীত। তার প্রতিফলন উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে দেখা যাবে এটাই স্বাভাবিক। 'সেই পাখি' উপন্যাসে দেখা গিয়েছে অঙ্কিতা নামের মেয়েটি সেসব গান গেয়েছে তার তালিকা দেওয়া হল। যথা—

কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ।

নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

কে রয় ভুলে তোমার মোহন রূপে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

আর একটি বিশেষ দিক লেখক প্রথম **পপ সঙ** এর ব্যবহার ঘটিয়েছেন 'সেই পাখি' উপন্যাসে। তার নমুনা দেওয়া হল— ন্যাট কিং কোল ও হ্যারি বেলা হ্যারি বেলা। এই গানের ব্যবহার আধুনিক জীবনযাত্রায় বেশ প্রভাব দেখা যায়। লেখক দূরদৃষ্টি ছিলেন বলেই তার ব্যবহার অনেক আগেই উপন্যাসে করে যেতে পেরেছেন। এই দিকটি শিল্পরূপের নতুন দিক বলা যেতে সমকালীন সময়ে।

উপমার ব্যবহার:

উপমায় একটি বাক্যে স্বভাব ধর্মে বিজাতীয় দুটি পদার্থের কোনো একটি বিশেষ গুণ, অবস্থা কিংবা ক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখানো হয়। শ্যামাপদ চক্রবর্তী "উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ তুলনা"[২৪] বলেছেন।

লেখক উপন্যাসে উপমা ব্যবহার করেছেন—

চালকুমড়োর ফালি সাইজের মতো জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ এনে।

চিঠির ব্যবহার:

বাংলা সাহিত্যের শুধু নয় মানব জীবনের একজন যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে পত্রের ব্যবহার। রত্নসেন, সূর্যমুখী, শচীশ, শশীডাক্তার সহ আরো অনেকের কথা মনে পড়ে বাংলা সাহিত্য পাঠে। সন্তোষকুমার ঘোষের লেখায় এই একটি বিশেষ দিক উপন্যাসের শুরু থেকে দেখা গিয়েছে। নীলা (কিনু গোয়ালার গলি), দেবাশীষ (নানা রঙের দিন), নিশীথ (সুধার শহর), সুনীল (ফুলের নামে নাম), প্রণব (শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মা-কে) প্রভৃতি উপন্যাসে চিঠির ব্যবহার দেখা গিয়েছে। তার ব্যতিক্রম ঘটেনি আলোচ্য উপন্যাসেও।

উপন্যাসটি অরিন্দমের চিঠিতে শেষ হয়েছে—

> "ঈশিতা কে? সবাই জানতে চায়। আমি নিজেই যে জানি না। সে কি আমার কাছাকাছি কখনও ছিল, এসেছিল? তাও জানি না। এও সম্ভব, ঈশিতা নেই, কোথাও নেই, কখনও তার বিদ্যমানতা সম্ভবে না। একটি পুষ্পে কি আমরা সব পর্ণ, সব বর্ণ, সমুদয় দল আর সৌরভ আর বিকাশ—
> এই সকলই পাই? না। তেমনই একই অঙ্গে যত রূপই থাক, বিদ্যা, আর বিজ্ঞান, দর্শন আর শিল্প, সংগীত, নৃত্য, চারুকলা, চিত্তের সরসতা—এত গুণের সমন্বয় বা সহ-অবস্থিতি মেলে না। যে কর্ম-সহচরী, সে আবার নর্ম-সহচরীও কদাচিৎ ঘটে। শয্যাসঙ্গিনী যিনি, তিনি স্বপ্নসঙ্গিনীও হলেন, এ একরকম বিরল ঘটনা। এতই যদি বুঝি এই কঠিন সত্যের সীমান্তে যদি পৌঁছোতেই পেরেছি, তবে আর আমার কষ্ট কী? আচরণে, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, ক্রিয়া-কাণ্ডে উনপঞ্চাশি পবনের প্রাবল্য, তথা পাগলামির উদ্‌ভ্রান্ত প্রাদুর্ভাব কেন?..."[২৫]

এই চিঠি উপন্যাসের মূল ঘটনাকে ব্যক্ত করেছে। এই চিঠি পড়ার পর পাঠকের সামনে লেখক নিজেই প্রশ্ন রেখে উপন্যাসটি শেষ করেন— "অরিন্দম বা অরিন্দমের মতো আরও অনেকে ছোট-বড় হরেক অপরাধ করে, করে চলে, সেটা ঠিক। কিন্তু যা অপরাধ, তাই কি পাপ? ইতি।"[২৬] পাঠককেও এই প্রশ্ন উপন্যাসে শেষে ভাবিত করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যেতে পারে Simpson paul তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Language through Literature: An Introduction' এ বলেছেন "...This highly erroneous view of stylistics is disseminated in different ways through the acadmic system"[২৭] উপন্যাসে কাহিনি ও শিল্পরীতি গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশেষ দিকটি কখনও ভাষাগত দিকে থেকে কখনও চরিত্রের মনস্তত্ত্বের গভীর সংলাপের নিদর্শন থেকে আবার কখনও কাহিনি বিন্যাসের মধ্যদিয়ে উপন্যাসের আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটিতে কাহিনির বিন্যাস ও শিল্পরীতির সেই দিকটি দেখানো হয়েছে। যেখানে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের নিজস্ব স্বতন্ত্রতাও যা সমকালীন লেখকগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন রূপে তাঁকে প্রকাশ করে। তাঁর উপন্যাসের কাহিনি, আঙ্গিক ও শিল্পরূপ জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্ত।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৩৪।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্র। রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড) । বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, অগ্রহায়ণ ১৩১৭, পৃ. ৪৮৩।
৩. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৩৪।
৪. ঘোষ (সম্পা), দেবীপ্রসাদ। বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা ১৯২৩-৩৩। সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা, সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৭৫।
৫. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৭১।
৬. তদেব, পৃ. ৬১৮।
৭. দাশ, জীবনানন্দ। কাব্য সমগ্র। এস. বি. এস. পাবলিকেশন, বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৪২৩, পৃ. ১২০।
৮. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ। জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬২২।
৯. তদেব, পৃ. ৬২৩।
১০. তদেব, পৃ. ৬৩২।
১১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। সেরা ৫০টি গল্প। দে'জ পূনর্মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২৩, পৃ. ২৮৬।
১২. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ। জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৪০।
১৩. তদেব, পৃ. ৬১৭।
১৪. তদেব, পৃ. ৬৩৩।
১৫. তদেব, পৃ. ৬৪০।
১৬. তদেব, পৃ. ৬৩৭।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড(প-হ) । অষ্টম মুদ্রণ ২০১১, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৩০।
১৮. তদেব, পৃ. ১৩০।
১৯. রায়, অপূর্বকুমার। শৈলীবিজ্ঞান। প্রথম দে'জ সংস্করণ অক্টোবর ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৭।
২০. সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৭২।
২১. শ, ড. রামেশ্বর। সাধারণ ভাশাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। তৃতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা পৃ. ৪৬-৪৭।
২২. সেন, নবেন্দু। বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯০, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পৃ. ২৭।
২৩. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ, চতুর্দশ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৫৬।
২৪. চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ, 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা', কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী, কল-৭৩, পুনর্মুদ্রণ—২০০৪, পৃ. ৪৫।
২৫. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ। জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৪০।
২৬. তদেব, পৃ. ৬৪১।
২৭. Paul, Simpson. Language through Literature: An Introduction. London, Routledge, Digital print 2022, p-2.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 93- 97
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.201

পঞ্চাশের মন্বন্তর কালে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন

সুজন সাহা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 25.08.2024; Accepted: 27.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the Second World War, India, then a colony under the British Empire, was drawn into the global conflict. While the British sought Indian support, responses varied: the Communist Party extended cooperation, whereas the Indian National Congress and the Azad Hind Fauj opposed British efforts. These political dynamics, combined with war-related policies, contributed to the catastrophic Bengal Famine of 1943. Scholars have increasingly argued that man-made and artificial factors—rather than purely natural causes— played a predominant role in the crisis.

Women and girls bore a disproportionate share of the suffering during the famine. Cultural norms and patriarchal practices led them to eat last and least within households, heightening their vulnerability to malnutrition and related health complications. Additionally, the famine exacerbated gender-based violence, forced marriages, displacement, and coerced sex work. Educational disruption was common, as girls often dropped out of school to help their families survive. Harrowing accounts— such as women dying on roadsides while their infants unknowingly attempted to nurse— reveal the brutal human toll of this tragedy.

Despite these challenges, research shows that women and girls often have lower mortality rates than men and boys during famines, due to a combination of biological and social factors. However, the societal burden placed upon them was immense. In many cases, men abandoned their families, leaving women to shoulder responsibility alone. As noted by Gopal Halder, the Bengal Famine — which claimed over 3 to 4 million lives — was not just a natural disaster but a catastrophic failure of policy and humanity. Bengali literature from the period reflects this gendered suffering, providing crucial insights into the lived experiences of women during one of the darkest chapters in Indian history.

Keywords: Bengal Famine, Gender, Exploitation, World War II, Malnutrition, Colonialism, Women in Crisis

স্বামী বিবেকানন্দ নারী জাতি সম্পর্কে বলেছেন, “মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নাই, সে-দেশ, সে জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।”[১] অথচ দেশে দেশে, যুগে যুগে নারী সমাজ পদদলিত হয়েছে। যুদ্ধকালে তারা ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। টাকার অভাবে শিশু কন্যা থেকে শুরু করে পরিণত বয়স্কা মেয়েদেরও বিক্রি করে দেওয়া হত। অথবা যৌনবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য করা হত। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা চিরন্তন। মা নিজে অভুক্ত থেকে সন্তানের জন্য খাদ্য জোগানের চেষ্টা করে গেছে।

এমনও দেখা গেছে যে অনাহারে মা মারা গেছে; অবুঝ সন্তান সেই মৃত মায়ের দুগ্ধ পান করেছে। মন্বন্তর কালে এসব চিত্র শহরের রাস্তায় বা ফুটপাতে অহরহ দেখা গেছে। প্রাচীন যুগ থেকেই মন্বন্তর হয়েছে। কিন্তু সেগুলি ঘটেছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে। যেমন-খরা, বন্যা, অথবা ভূমিকম্পের জন্য। কিংবা অন্য কোনো কারণে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে অর্থাৎ ১৯৪২-১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে যে মন্বন্তর হয়েছিল তা ছিল সর্বাংশেই মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তর। ১৩৫০ এর মন্বন্তরের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার, স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ। এদের জাঁতাকলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ অকালে ঝড়ে পড়েছিল।

মাসিক 'বসুমতি' পত্রিকায় দুর্ভিক্ষের জন্য সরকারের দায়িত্বহীনতা ও ব্যবসায়ীদের অতি লোভকে দায়ী করেছিলেন। "লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া গেল, যাহারা অর্ধমৃত হইয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে পুণ: প্রতিষ্ঠিত করিবার সুব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।"[২] তৎকালীন সরকারের বিভিন্ন অসামাজিক নীতি নির্ধারণের জন্য দুর্ভিক্ষ ত্বরান্বিত হয়েছিল। বাংলা দেশের গ্রামীণ মানুষজনের সঙ্গে কোনোরূপ সলা পরামর্শ না করেই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করেছিল। আর সেগুলি জোড় করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের ওপর। যার জন্য মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল দুর্ভিক্ষের কবলে। স্থানীয় জমিদার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পিছপা হয়নি। তারা চরম কষ্টের সময়ই ব্যাপকহারে কর আদায় শুরু করেছিল। কর দিতে না পারলে তাদের জমিগুলো দখল করে নিত বা ঘর-বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য করত। এদিক থেকে পিছিয়েছিল না মহাজনেরাও। তারা সুযোগ বুঝে চাষীদের ধান ও অন্যান্য ফসল কিনে গুদামে মজুত করে রেখেছিল। তারা আকালের আভাস হয়তো আগের থেকেই পেয়েছিল। শুধু বুঝতে পারেনি চাষীরা। তারা সামান্য বেশি দরে ফসল বিক্রি করে দিয়েছিল। তারা বুঝতেও পারেনি দুর্ভিক্ষ সমাগত। ফসল বিক্রির টাকা তো বিভিন্ন জিনিস কিনে শেষ করেদিয়েছিল। ভেবেছিল পরবর্তিতে ফসল এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এর মধ্যেই সব কিছু পালটে যায়। যারা খাদ্য উৎপাদন করে তারাই অভুক্ত থাকে। খাদ্য সামগ্রী মহাজনেরা লুকিয়ে ফেলেছিল গুদাম ঘরে। তৈরি করেছিল কৃত্রিম খাদ্য সংকট। গুদামে খাদ্য মজুত থাকলেও সাধারণ মানুষ সেসব আর কিনতে পারেনি। ব্যবসায়ীরাও সুযোগ বুঝে জিনিসের দাম দিয়েছিল বাড়িয়ে। খোলা বাজার থেকে খাদ্য সামগ্রী উধাও হয়ে গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল কালোবাজারি। মানুষের চাল, ডাল অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা হ্রাস পেয়ছিল। সাধারণ মানুষ অসমর্থ হয়ে পড়েছিল।

আর এই মন্বন্তরের পটভূমিতেই রচিত হয়েছিল কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস। সাহিত্যের সেইসব শাখা থেকে আমরা উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি আলোচনার জন্য। মন্বন্তর সমকালীন উপন্যাসে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল; সেগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করাই হল গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি:

সমগ্র গবেষণা পত্রটি বিশ্লেষোণাত্মক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মূল আলোচনা:

যখনই কোনো দেশে যুদ্ব শুরু হয়েছে, তখনই দেখা গেছে দেশে অরাজকতা। জিনিসের দাম বৃদ্বি পেয়েছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। পরিবার পরিজন নিয়ে থাকতে হয়েছে অনাহারে। আর তাতে যদি হয়েছে ঔপনিবেশিক দেশ, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। সেই দেশের ধন-সম্পদ লুট হয়েছে। লুট হয়েছে নারীরা। তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ অনবরতই চলেছে। এমনকি বাড়িতে অভাব দেখা দিলে, বাবা-মা তার কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছে। কোনো কোনো মেয়েকে বাধ্য করা হয়েছে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে। আবার সে সমস্ত মেয়েরা একটু পড়াশোনা করেছে তারা আবার চাকরি করে বাবা-মা কে সাহায্য করেছে। ১৩৫০ সালে বাংলাদেশে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের চরম অরাজকতার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তাতে মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। খাদ্যের অভাব, দারিদ্য, শোষণ, কালোবাজারি, মজুতদারি, ও মহামারি সব কিছু মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। আর সেই পরিস্থিতিতে পরিবারের নারীরা সবচেয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিল। তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল বঞ্চিত। পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে তারা ছিল মূল্যহীন। অভাবের কারণে তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আকালের আভাস পেয়েই পুরুষেরা বাড়ি ছেড়ে যেদিকে খুশি চলে গিয়েছিল। কিন্তু পারেনি নারীরা।

মা তো সন্তানকে ফেলে দিতে পারেনা। স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে স্ত্রী ও সন্তানের কোনো খোঁজ খবর রাখেনি এমন ঘটনাও ঘটেছে। অথচ স্ত্রীর প্রতি তার শাসন কিন্তু ষোলো আনাই বজায় থেকেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান বর্মা দখল নিলে ব্রটিশ সরকার চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। জাপানকে রুখতে তারা বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনোরূপ আলাপ আলোচনা না করেই। তার ফল স্বরূপ এই মন্বন্তর হয়েছিল। আর যার জাঁতাকলে পড়ে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু হয়েছিল। এর সঙ্গে আবার মেদিনীপুর অঞ্চলে সাইক্লোনও যুক্ত হয়েছিল। প্রবল জলোচ্ছাসের কারণে মেদিনীপুর অঞ্চল ভেসে গিয়েছিল প্রচুর মানুষ, গবাদিপশু মারা গিয়েছিল। যারা বেঁচেছিল তারা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে কুঁড়ে কুঁড়ে মরছিল। কিছু লোক কলকাতায় চলে এসেছিল। মায়েরা সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ভাত ও ফ্যান চেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিল। কখনো কখনো একটু অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য শিশুটি গাড়ির চাপা পড়ে মারা গেছে। তারপর মায়ের সে কি কান্না! এমনই এক দৃশ্য দেখা যার তারাশঙ্করের মন্বন্তর উপন্যাসে। "মেয়েটি বুক চাপড়ে কাঁদছে—ওরে আমার ধন—ওরে আমার মানিক! ওরে, আমি যে ঝড়ে জলে বাছাকে বাঁচিয়ে রেখেছিনু রে! ওরে বাবারে!"[৩]

যুদ্ধের সময় সৈন্যদের প্রয়োজনে বাংলাদেশের বাড়তি ধান চাল কিনে নেওয়ার হুকুম দিয়েছিল সরকার। তারজন্য তারা প্রচুর অর্থও বরাদ্দ করেছিল। স্থানীয় এজেন্টরা সুযোগবুঝে জোড় করে গ্রাম-বাংলার সমস্ত ধান চাল কিনে নিয়েছিল। আবার বিভিন্ন স্থানে চাষীদের চাষবাস বন্ধ করে দিয়েছিল। কেড়ে নিয়েছিল সাইকেল ও নৌকা। ফলে মানূষের অন্ন-সুংস্থানের পথও বন্ধ করে দিয়েছিল। চালের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পুরুষেরা যেখানে সংসারের হাল ছেড়ে দিয়েছে নারীরা সেখানে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে সংসার রক্ষা করার দায়িত্ব। শাক-পাতা, বুনো আলু, গেঁড়ি, গুগলি ইত্যাদি খেয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টাটুকু তারা করেছে। কখনো কখনো কাঁচা গেঁড়ি, গুগলি খেয়ে শিশুগুলোর মৃত্যুও হয়েছে। অশনি-সংকেত উপন্যাসের মতি মুচিনী বলেছে,

> "...দিদি-ঠাকরুণ, সাতদিন ভাত খাইনি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর গেঁড়ি গুগলি।...শুধু দ্যাখো মুচিপাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে-ছেলে, বৌ-ঝি সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি-গুগলি ধরচে। সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। কত মরে গেল ওইসব খেয়ে...।"[৪]

চাষিদের মেয়েরা খুব পরিশ্রমী হয়। তারা কাজ ফেলে কখনো বসে থাকে না। গ্রামে যখন সকলের সচ্ছল অবস্থা ছিল তখন তারা ঢেকিতে ধান ভেনে বাড়ির প্রয়োজনের টুকু রাখে বাকি ধামাভরে বাজারে বিক্রি করতো। একসঙ্গে দল বেঁধে যেত চাল বিক্রি করতে। কিন্তু মন্বন্তরের কারণে সে সব দিন অতীত হয়েছে। না খেয়ে আর কতদিন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। মরার চেয়ে বেঁচে থাকা ভালো। আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক নারীরাই বিপথগামী হয়েছে। কথায় বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। দুর্ভিক্ষের সময় ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল। গ্রামের সহজ-সরল মেয়েরা বেছে নিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি। 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। "কাপালী-বৌ আধঘণ্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুল, আঁচলে আধপালি চাল। পেছনে পেছনে আসছে যদু-পোড়া।"[৫]

জীবন ধারনের জন্য উপযোগী অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দুর্মূল্য ও দুস্প্রাপ্য হওয়ার জন্য শহর ও গ্রামীন মানুষের দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌঁছেছিল। শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল, আবার জিনিস পত্রের দামও দিনের পর দিন বেড়ে যাওয়ায় পরিবারে অর্ধাশন বা অনশনে দিন কাটতে থাকে। চাল, আটা, চিনি, কয়লা ও কেরোসিনের দোকানে নরনারীর ভিড় বাড়তে থাকে দিনকে দিন। কন্ট্রোলে কোনো কোনোদিন আবার শুধু নারীরাই লাইলে দাঁড়িয়ে মাল সংগ্রহ করে। তারা ভোর বেলা থেকে লাইনে এসে দাঁড়ায়। বেলা করে দাঁড়ালে মাল পাওয়া যায় না। দোকানদার চুপি চুপি চোরাবাজারে মাল বিক্রি করে দেয়। লাইনে দাঁড়ানো মেয়েদের কোনো জাত নেই। বিপদে সকলে মিশে একাকার হয়েগেছে। তাদের কোনো ধর্ম নেই, তাদের একটাই ধর্ম, মনুষ্য ধর্ম।

> "সামনেই একটা কন্ট্রোলের দোকানে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েদের কিউ। হিন্দু-মুসলমান, হিন্দুস্থানী, বাঙালী—স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ঝিয়ের দল। গৃহস্থ ঘরে বিধবা-সধবা-কুমারী, শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোরখা নেই, ঘোমটা নেই, মাস্থার রুখু চুল ঠেলাঠেলিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, শীতের বাতাসে উড়েছে, মুখে অপরিসীম উদ্বেগ।"[৬]

যে বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সে বছর কিন্তু চাষিদের ফসল খুব ভালো হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণ কী ছিল? কারণ ছিল চাষিরা ফসল খেতে থাকতেই দাম বেশি পেয়ে বিক্রি কারে দিয়েছিল। তারা ভেবেছিল পরবর্তিতে ফসল উঠলেই সব পুষিয়ে নেবে। কিন্তু তাদের সে আশা আর পূরণ হয়নি। তাই তো তারা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। 'চিন্তামণি' উপন্যাসের একটা গ্রামের দৃশ্য ছিল এরূপ,

> "দুপুরের রোদে যেন উজ্জ্বলতা নেই, শুধু ঝাঁঝ। দু চারটি জীবন্ত কঙ্কাল শুধু চোখে পড়ে- মানুষ ও গরুছাগল, ঘোষেদের কেলো কুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা আর কালাচাঁদের শূন্য ভিটে খাঁ খাঁ করছে। চারদিকের প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিজেকে গৌরের আরও বেশি একা, আরও বেশি অসহায় মনে হয়।"[৭]

একশ্রেণির মানুষ যারা খাদ্য সামগ্রী লুকিয়ে ফেলে কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করেছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে গেছিল। তৈরি হয়েছিল কালোবাজারি।

> "জিনিসের দর আজ নাকি হঠাৎ লাফ দিয়েছে। চালের দর আঠারো, আটা পঁচিশ, চিনি মেলেনা। কেরোসিনের কিউয়ে দাঁড়িয়ে তেল আনতে এবেলায় গেলে ও বেলার আগে ফেরা যায় না।"[৮]

পরিবারের পুরুষেরা যে রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল তাদের স্ত্রী-রাও পরোক্ষভাবে সেই মতাদর্শে বিশ্বাসী। কেউ বা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কেউ বা সখে রাজনীতি করেছে। উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা কমিউনিস্ট দল, কংগ্রেস দল ও মুসলিম লিগ; এই তিনটি দলেরই উল্লেখ পাই। কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী। তাই মাঝে মাঝে কংগ্রেস কর্মীদের জেলে যেতে হয়েছে। কংগ্রেস করার জন্য স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে জেলে। সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। তার মনে বাসা বেঁধেছে গান্ধীজীর চিন্তা-ভাবনা। কংগ্রেস কর্মীর একজন স্ত্রী বলেছে, তার কাছে টাকা রয়েছে; কিন্তু তার চাল চাই, আটা চাই।

> "-টাকার আর কোন দাম নেই আমার কাছে। আজ তিনদিন ঘরে চাল নেই। তিনদিন আগে নিচের পানওয়ালা কিউয়ে দাঁড়িয়ে চাল এনে আমাকে দিয়েছিল। পরে শুনলাম লোকটার নিজের ঘরে হাঁড়ি চাপেনি। তাই আর তার কাছে নিইনি। আটাও নেই, চিনিও নেই। শুধু আলুর তরকারি আর খেতে পারছি না। ছোট ছেলেটা তো ভাত-ভাত করে দিনরাত চিৎকার করছে।"[৯]

বড়োলোকের মেয়ে হয়েও অনেকে নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। গরীব মানুষের কথা ভাবেনি। অথবা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হিসাবেও যোগদান করেনি। তাদের মধ্যে শুধু হিংসা ও ঈর্ষাই ফুটে উঠেছে। তাই তো অনেক সময় নিরপরাধ মানুষের চাকরি কেড়ে নিয়ে একমাত্র খাদ্যের সংস্থান বন্ধ করে দিয়েছে। সংসারে অভাবের জন্য অনেক মেয়ের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে ভালোবাসার মানুষকে। শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত করেছে মানুষীর সেবায়। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষকে জাগ্রত ও সচেতন করেছে। তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে নিতে তাদের সাহায্য করেছে ও তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিদিয়েছে।

মন্বন্তরের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে গ্রাম থেকে চলে এসেছিল অনেকেই। তারা ভেবেছিল কলকাতা শহরে আশ্রয় নিলে খেতে পাবে। কেউ বা আত্মীয়ের বাড়িতে এসে উঠেছিল। অথচ তারা যেসব বাড়িতে এসে উঠেছিল একসময় সে বাড়ির অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে। না খেতে পেয়ে দিনের পর দিন কষ্ট পেয়েছে। 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের পিসিমার তেমনই দুর্দশা হয়েছিল।

> "পিসিমা। -- বড় লক্ষ্মীছাড়া তোমার সংসার অরুণা। শুধু নেই নেই নেই। চাল নেই, ডাল নেই, পুজো-পার্বণ নেই, অতিথি- কুটুম নেই, একটা কচি ছেলের সাড়া শব্দ নেই তোমার বাড়িতে। এত নেড়া সংসারে কি আমার মত মানুষ বাঁচতে পারে অরুণা?"[১০]

বাংলাদেশে গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন স্থানে স্থানে বুভুক্ষু নরনারীদের 'গ্রুয়েল' নামক একরকম পাতলা খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। চাল ডাল বাজরা ও জোয়ার একসঙ্গে সিদ্ধ করে এই প্রকার খাদ্য তৈরি হত। এধরনের খাবার খেয়ে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারেনি। অবশ্য বহুস্থানে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমুহ এবং দানশীল ব্যক্তি খাদ্যাদি দান পূর্বক লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ রক্ষা করেছিল। তাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র থেকে

সাহায্য করা হত। কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণ মানুষেরই জীবন রক্ষা হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত উদ্বোধন পত্রিকায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে বারবার আবেদন করা হয়েছে।

> "বাঙলা দেশের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে সকল শাখা আছে, উহাদের প্রায় প্রত্যেকটি কেন্দ্র হইতেই কোন না কোন আকারে অন্নসংকট সেবাকার্য পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বহু সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ বুভুক্ষু নরনারীকে যথাসম্ভব খাদ্যাদি দিতেছেন এবং নানাভাবে তাহাদের সেবা করিতেছেন। কিন্তু কেবল এই প্রকার দানের দ্বারা দেশের শতাংশের একাংশের প্রয়োজনও পুর্ণ হইতেছে না।"[১১]

উপসংহার:

উপরি উল্লিখিত উপন্যাসগুলিতে নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। তাদের জীবন-যাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, কিংবা অনাত্মীয়কেও সাহায্য করেছে দু:সময়ে। কেউ বা রোজগার করে পরিবারের হাতে টাকা পয়সা দিয়ে সাহয্য করেছে। কেউ বিপদে স্বামীর পাশে থেকেছে, স্বামীর মতাদর্শে বিশ্বাসী থেকেছে। অন্নকষ্টের জন্য স্বামীকে কখনো দায়ী করেনি। কেউ আবার স্বার্থপর। নিজ স্বার্থে অন্যের ক্ষতি করতেও পিছপা হয়নি। অনেকে আবার খেতে না পেয়ে বিপথে চলে গেছে। কেউ কেউ নারীদের বিপথে ঠেলে দিয়েছে। নারী তো মা তাই তো মা তার সন্তানকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু পিতা সব ফেলে চলে গেছে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মাকে দেখে গেছে সন্তানের সঙ্গে পড়ে থাকতে। কখনো কখনো অবুঝ সন্তান মায়ের পিছে পিছে যাওয়ার সময় গাড়িতে চাপা পড়ে মারা গেছে, তাতে মায়ের বুক ফাটা কান্নার রোল আকাশে-বাসাতে ভেসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মাকে দেখা গেছে দুটো, তিনটে সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ফ্যান চেয়ে বেড়াতে। কখনো সন্তানকে নিয়ে লঙ্গর খানার লাইনে দাঁড়াতে। এরা তো গ্রাম থেকে এসেছিল, তাই তাদের আসড়য় স্থল হয়ে হয়েউঠেছিল রাস্তাঘাটের ফুটপাত, যা ছিল তাদের একেবারে অচেনা। তাই তো তারা সন্তানকে রেখে কোথাও যাওয়ার সাহস পায়নি। ওপন্যাসিকেরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক এভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী, বিবেকানন্দ। আমার ভারত অমর ভারত। ১৫ তম মুদ্রণ, প্রকাশক স্বামী সুপর্ণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড কলকাতা, পৃ. ২৬।

২. চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ। ভারতবর্ষ পত্রিকা, উপোসিবাংলা, সাময়িক পত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৭, গৌতম মিত্র কর্তৃক সেরিবান, বাখরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৩৭৭ থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১৩৯।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। মন্বন্তর। প্রথম সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৮৯, প্রকাশক, প্রবীর মিত্র: ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট: কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ২৬।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। অশনি – সংকেত। প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ম্যাজিক প্রিন্টার্স, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত, পৃ. ১১৫।

৫. তদেব, পৃ. ১২৮।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। মন্বন্তর। প্রথম সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৮৯, প্রকাশক, প্রবীর মিত্র: ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট: কলকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ২৮।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। চিন্তামণি। মানিক উপন্যাস সমগ্র, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৮, প্রকাশক রতন লাল রায়, যুথিকা বুক স্টল, ১২ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ. ৭৪৭।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। মন্বন্তর। প্রথম সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৮৯, প্রকাশক, প্রবীর মিত্র: ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট: কলিকাতা – ৭০০০০৯, পৃ. ৮৩।

৯. তদেব, পৃ. ১৮৪।

১০. ঘোষ, সুবোধ। তিলাঞ্জলি। সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৪, জানুয়ারি ১৯৯৮, সম্পাদক, উত্তম ঘোষ, সমীরকুমার নাথ, নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০৭৩, পৃ. ৩০৫।

১১. স্বামী, সুন্দরানন্দ সম্পাদক, উদ্বোধন পত্রিকা, ৪৫শ বর্ষ, (১৯৪৯ মাঘ হইতে ১৩৫০ পৌষ), উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পৃ. ৪৩৭/৪৩।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 98- 102
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.184

চন্দন সেনের নির্বাচিত নাটকে প্রতিবাদী নারী চরিত্র

জয়ন্তী রাজোয়াড়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author (s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Playwright Chandan Sen's plays have highlighted various problems in society. He has shown his skill in portraying social sense. Along with various scenes of society, the life of women has been perfectly portrayed in his plays. As he has talked about the struggle of women, he has also highlighted the self-respect and individual freedom of women. He has attacked the norms of patriarchal society. Women will always be manipulated and used according to the will of men. He has broken this idea in his play 'Karnabati', 'andhagali', 'jahanara jahanara' etc. The protesting voice of women can be heard in these plays of his.

Keywords: Patriarchy Society, Women Disrespect, Self-respect, Protest, Self-confidence, Hurt pride, Relationship breakdown, Offended state of mind

নাট্যকার চন্দন সেন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ। দেশভাগের সময় তাঁরা সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এপার বাংলাতেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। রাজনীতি ও শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নাটক লেখায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। এই প্রভাব তাঁর লেখার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করা যায়। নাটকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও অন্যায়ের সাথে আপস না করে তার বিরোধিতা করেছে। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নাট্যকার চন্দন সেনের নাটকে নারী চরিত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি শুধু নারীর জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরেননি। নারীকে সেই পঙ্কিলময় জীবন থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করেছেন। নারী যে পুরুষের কুক্ষিগত সম্পদ নয় সেই চিত্র তাঁর বিভিন্ন নাটকের মধ্যে দেখতে পাই। বহু বছর ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা মূক ও বধিরের ন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে জীবনযাপন করে আসছে। শত যন্ত্রণা সহ্য করেও তারা পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেনি, রুখে দাঁড়াতে পারেনি সেই গতানুগতিক সমাজব্যবস্থার উপর। তারা মান-সম্মান ছাড়াই পুরুষের সঙ্গে অসহায় অবলা নারী হয়ে সংসার করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। নাট্যকার চন্দন সেন তাঁর নাটকে অবলা নারী নয়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর প্রতিবাদী রূপটি তুলে ধরেছেন। এই নারীরা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যকে অস্বীকার করে নিজস্ব মত এবং জীবনযাত্রার পথকে বেছে নিয়েছে। নাট্যকার চন্দন সেনের 'কর্ণাবতী', 'অন্ধগলি', 'বিয়েগাউনি কাঁদনচাপা' প্রভৃতি নাটকে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং প্রতিবাদী ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়েছে।

আমার আলোচ্য 'কর্ণাবতী' নাটকের প্রধান চরিত্র কুসুম্বী বা কুসুম। এই কুসুম নন্দা ও সূরজ পরিহারের মেয়ে। নিজের স্বার্থে সূরজ মেয়ে কুসুমকে মাওলীর জোতদার কৈলাশ রাওয়াতের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। কারণ কৈলাশ নিঃসন্তান এবং সম্প্রতি তার বউ মারা গেছে এই সুযোগে কুসুমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সূরজ জাতে উঠতে চায়। কুসুমের বাবা অর্থের লোভে কমবয়সী মেয়েকে বৃদ্ধ জোতদারের হাতে তুলে দেয়। সূরজের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে কৈলাশ রাওয়াত কুসুমকে বিয়ে করে। বিয়ের প্রথম থেকে কৈলাশ ও কুসুমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কৈলাশ

কুসুমের আচার ব্যবহার ও কথাবার্তায় রাগান্বিত হলেও বেশিরভাগ আবদারই পূরণ করে। কিন্তু কুসুম স্বামীর বাঈজীর বাড়ি যাওয়া আর বাড়ির ঝি মল্লির সাথে অবৈধ সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেনি। কৈলাশ কুসুমের ভালোলাগা বা মন্দলাগার কোনো ধার ধারেনি। তাই কুসুমকে উপেক্ষা করে দিসরাগড়ে বাঈজীর বাড়িতে চলে যায়। এদিকে ভীমপুরের মেলায় রাজপুত চোড়িওয়ালা ব্রিজমোহনের সাথে কুসুমের পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বাড়তে থাকে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কুসুম একদিন ব্রিজমোহনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। সূরজ ও কৈলাশ তাকে বাড়ি ফেরানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। সূরজ তাকে সমাজের মান-সম্মানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

> "সূরজ।। (অধৈর্য) অনেক হয়েছে— চ বাড়ি ফিরে চল বলছি—ছিঃ ছিঃ তোর লাজ হচ্ছে না লোক হাসাতে!
>
> কুসুম্বী।। না বাপু হচ্ছে না—লাজও হচ্ছে না, ভয়ও হচ্ছে না—আমি এখানেই থাকবো।"[১]

বাবার ইচ্ছেতে বিয়ে করলেও কুসুম আজ বাবার ইচ্ছাকে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছে। খালি হাতে ফিরে যেতে হয় মাওলির প্রতাপী জোতদার কৈলাশ রাওয়াতকে। কুসুমের এই সিদ্ধান্তে পিতা সূরজ খুশি না হলেও মা নন্দা খুশি হয়েছে। কারণ গরিব ঘরের মেয়ে হয়ে গ্রামের জোতদারকে পরিত্যাগ করায় কৈলাশ রাওয়াতের অহংকার ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

> "নন্দা।। তোমার আমার জীবনতো শেষ হয়ে এল কুসুম্বীর বাপু—এরকম রাতদিন ভয়ে ভয়ে, পয়সাওয়ালার লাথি খেয়ে—বড় মানুষের কাছে মাথা নিচু করে, ভিখ মেগে—আর না হয় ঘরের ইমান বেচে বাইরের মান নাই কিনলে। মেয়ে যদি মাথা উঁচু করে নিজের খেয়ালে বাঁচতে পারে তো বাঁচুক না—"[২]

ব্রিজমোহনের সঙ্গে নতুনভাবে কুসুম সংসার শুরু করে। কিন্তু এই সুখ কুসুমের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পর অন্তঃসত্ত্বা কুসুম জানতে পারে ব্রিজমোহনের গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। এই কথা জানতে পেরে কুসুম্বী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। যার জন্য সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সাথে লড়াই করেছিল সেই মানুষটা তাকে মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়েছে। ব্রিজমোহনের এই বিশ্বাসঘাতকতা কুসুম মেনে নিতে পারেনি। অসুস্থ সন্তানকে দেখতে যাওয়ার জন্য ব্রিজমোহন দেশের বাড়িতে যায়। এই সুযোগে অন্তঃসত্ত্বা কুসুম ব্রিজমোহনের সংসার ত্যাগ করে বাপের বাড়িতে চলে আসে। সূরজ বিবাহিত অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে বাড়িতে আশ্রয় দিতে চায়নি। স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কুসুম সমস্ত অভিযোগ-অনুরোধ উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

নাটকের অন্তিম পর্যায়ে দেখি, ব্রিজমোহন এবং কৈলাশ দুজনেই কুসুমকে বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছে। কুসুম কিন্তু কারো সঙ্গে যেতে রাজি নয়। প্রথমে ব্রিজমোহনকে স্বামী এবং গর্ভের সন্তানের পিতা হিসেবে অস্বীকার করলে ব্রিজমোহন বাড়ি ফিরে যায়। এই সুযোগে কৈলাশ কুসুমের সব দোষ ক্ষমা করে বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু কুসুম কৈলাশ রাওয়াতকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, এই গর্ভের সন্তান কৈলাশেরও নয়। এই কথা শুনে কৈলাশ জানায়—

> "কৈলাশ।। ব্রিজমোহনের নয়—আমার নয় তাহলে ওটা কার কুসুম? দুনিয়ার লোককে কি বলবে—সবাই যখন জানতে চাইবে— কি বলবে? এই বাচ্চা বাকদোলা বাচ্চা, জারজ— ওর বাপ নেই?
>
> কুসুম।। না। বলবো এটা আমার বাচ্চা। আমি ওর বাপ—আমি ওর মা। আমার কোনও মরদ নেই—মেলে নি—সাচ্চা মরদ আমি দেখি নি।"[৩]

আমাদের চিরাচরিত সমাজ কাঠামোতে যেমন স্বামীর মধ্য দিয়ে স্ত্রী পরিচিত। তেমনি পিতার মধ্য দিয়ে সন্তানের পরিচিতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পিতার পরিচয়হীন সন্তানকে জারজ সন্তান বলা হয়। নারী যে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় তা এই সংলাপে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা রীতি-নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে কুসুম তার নিজস্বতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব সত্তাকে স্বতন্ত্র করে জীবনযাত্রার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

'বিয়েগাউনি কাঁদনচাপা' নাটকে মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীর জীবনযন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিয়ের গান গাওয়ার দল রয়েছে। এই দল মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ে এবং মারা যাওয়ার সময় কাঁদন গীতি গেয়ে থাকে। তাদের গানের মধ্যে শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের সুখ দুঃখের কথা প্রকাশিত হয় না সমগ্র সমাজের নানান সমস্যার কথা উঠে আসে। এই দলের নারীরা বেশিরভাগই স্বামীহারা অথবা স্বামীছাড়া। সমাজের এই

নারীরা স্বামীর কাছে অবহেলিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে গান গেয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে থাকে।

নাটকের প্রথমে আমরা গোলবিবির কথা জানতে পারি। চার সতীন ও স্বামীর দ্বারা পীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হয়ে বাড়ি ছেড়েছিল। গোলবিবি গান বেঁধে, গানের দল তৈরি করে এখন স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে। বর্তমানে নিজের রোজগারের টাকায় স্বামীকেও দেখাশোনা করে। কারণ চার সতীন মিলে জমি জায়গা, টাকা-পয়সার দখল নিয়ে স্বামীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই খবর পেয়ে অসহায় স্বামীকে আশ্রয় দিয়েছে গোলবিবি। কিন্তু গানের মধ্য দিয়েই গোলবিবি নিজস্ব মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। এই গান তাদের হয়ে উঠেছে সুখ দুঃখ প্রকাশের মাধ্যম।

নাটকের দ্বিতীয় অন্যতম প্রধান চরিত্র ফেলনাবিবি। ফেলনাবিবির মা সারাজীবন দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে। তার মায়ের স্বামীর অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেই জীবন কেটেছে। ফেলনাবিবির মায়ের কোনোদিন স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস হয়নি। সেই অসহায় মায়ের মেয়ে ফেলনাবিবি কিন্তু স্বামীকে ভয় পায় না। স্বামীর হুঙ্কারের জবাব যে মন দেয়, তেমনি অবাধ্য স্বামীকে মারতেও দ্বিধাবোধ করেনি। স্বামীর ভরসায় না থেকে নিজে গান গেয়ে সংসারের দেখাশোনা করে। ফেলনাবিবি বলে—

> "জেবন এখন আমারে গোক্ষুরের মতো ফোঁস করতি শিখায়েছে।"[৪]

নাটকের তৃতীয় প্রধান নারী চরিত্র বর্ধমান জেলার বিরুলি গ্রামের ওলেমাবিবির জীবনেও একই ঘটনা দেখতে পাই। চার বছর স্বামীর সংসার করেছিল। স্বামী ছাড়াও তাদের ভাইদের কাছে শারীরিক শোষণ ও নির্যাতন সহ্য করতে হতো। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্বামী-সন্তান ত্যাগ করে। অতীতের যন্ত্রণাময় জীবন পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন শুরু করে। ওলেমাবিবির সংলাপে জানতে পারি—

> "আমি এখুন নিজের দল গড়িছি। লতুন করে বাঁচার পথ পেয়ে গেছি বুবুজান। নোকে ধন্যি ধন্যি করে। খেয়ে-মেখে বেঁচে তো আছি বুবু, শরীল দিতি হয় না কারুক্কে, দশ-বিশ গাঁয়ের মানুষ কদর করি বায়না দেয়। আমি তো জানি নাই একদিন ঢোল বগলে লিয়ি ই-দ্যাশ উ-দ্যাশ ঘুরি আমার লিজেরে একটো নাম হবে। এখুন আমি সত্যিই শেখ, শেখ ওলেমা।"[৫]

উল্লেখিত মুসলিম সমাজের নারীদের জীবন ছিল দুঃখ যন্ত্রণায় ভরা। বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করতে না পেরে স্বামীর ছত্রছায়া পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে।

'অন্ধগলি' নাটকের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র রণিতা ও নীলাঞ্জনা। এই দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদী ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। এই নাটকের মূল পুরুষ চরিত্র সৌম্য। এই সৌম্যের পূর্বপত্নী রণিতা এবং বর্তমান নীলাঞ্জনা। সৌম্য তার বাবার মৃত্যুর পর জানতে পারে সমস্ত গচ্ছিত সম্পদ বাবার উপপত্নীর নামে রয়েছে। বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও নিঃস্ব হয়ে নতুনভাবে প্রজেক্ট শুরু করতে চায়। এই কাজের জন্য স্ত্রী রণিতাকে মডার্ণ সভ্যতা ও পরপুরুষের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। নিজের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে সৌম্য তার স্ত্রী রণিতার মডার্ণ জীবনযাপন নিয়ে কটাক্ষ ও বিরোধিতা করতে শুরু করে। তার বাড়িতে থাকতে হলে তার ইচ্ছানুযায়ী চলতে হবে। সৌম্য এই কথা রণিতাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। রণিতা স্বামীর এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জানায়—

> "…. যখন ঘরের বৌ'কে নিজের প্রয়োজনে— তোমার এই পরিবারের প্রয়োজনে বাইরের কাজে নামিয়েছিলে তখন খেয়াল রাখা উচিত ছিল নীচে নামার গভীরতা কতটা হতে পারে। আমার এই নতুন Life Style দিকে একদিন তুমিই আমাকে ঠেলে দিয়েছিলে তোমারইম স্বার্থে— আজ সেই আলু ভাতে মার্কা শান্ত লক্ষ্মী পেঁচা বৌটাকে ফিরে চাও কোন অধিকারে? Mercy যে নেয় তার আধিপত্য দেখাবার কোন অধিকার থাকে কি?"[৬]

এই মতবিরোধের ফলে তারা দুজনে আলাদা হয়ে যায়। রণিতা সন্তানকে নিয়ে বাকি জীবন কাটাতে চাইলেও সৌম্য কিন্তু আবার বিয়ে করেছে। এ বিয়েটা ছিল রণিতার কাছে জেতার জন্য। আর এই স্বামী-স্ত্রীর হার-জিতের লড়াইয়ের মাঝে নীলাঞ্জনা এসে পড়ে।

নীলাঞ্জনা ছিল সাধারণ মেয়ে। অসুস্থ মা ও ভাইকে নিয়ে তার সংসার। তার দাদা তাদের খোঁজখবর নেয় না। নীলা সংসার চালানোর জন্য একটা কোম্পানিতে কাজ করে। এই কোম্পানিতে টিকে থাকতে নীলাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার

করতে হয়েছে। তবু পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। কোম্পানির ভাইস-এর সাথে তাকে আপস করতে হয়েছে। নীলার দাদাও নিজের স্বার্থের জন্য ডিভোর্সি ও বয়স্ক পাত্র সৌম্যের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছে। মা ও ভাইয়ের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে নীলা এই বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। বিয়ের পর নীলা সৌম্যের আদর্শ স্ত্রী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। স্বামী ও সংসার যা পেয়েছে তাই নিয়ে খুশি মনে বাকি জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে চায়। বিয়ের পর সৌম্য স্ত্রী নীলাকে চোখে চোখে রাখতো। নীলার বিশ্বাস ছিল স্বামী তাকে ভালোবাসে। কিন্তু নীলার এই বিশ্বাস শেষে ভেঙে যায়। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের আসল রহস্য সামনে আসে।

> "নীলা।। তার মানে এক মুহূর্তে আমায় তোমার চোখের আড়াল হতে না দেওয়া.... সারাক্ষণ আগলে রাখা— এগুলো-এগুলো তোমার আমার প্রতি—ভালোবাসা নয়—কেবল তোমার জয়ের জন্য?"[৭]

সৌম্য তার প্রাক্তন স্ত্রী রণিতাকে হারানোর জন্য নীলাকে মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে আবেগ, প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি কিছুই ছিল না যা ছিল তা শুধুমাত্র মিথ্যে ছলনা। সম্পর্কের এই সত্যতা জানতে পেরে নীলা ভেঙে পড়েছে। সৌম্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে নতুন করে বাঁচার ও পথ চলার একটা সুযোগ চেয়েছে নীলার কাছে। নীলা কিন্তু সৌম্যের সাথে বাড়ি ফেরেনি। রণিতা এবং নীলাঞ্জনা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই দুই নারী স্বামীর অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই নারী পুরুষের অসীম প্রভাব প্রতিপত্তির বশবর্তী নয়। তারা আত্মসম্মানের কাঙ্ক্ষিত। আর যখনই নারীর এই আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে তখনই সেখান থেকে তারা খুব স্বাভাবিকভাবে সরে পড়েছে। উল্লেখিত নাটকেও আমরা সেই চিত্র দেখতে পাই।

'জাহানারা জাহানারা' নাটকে দারিদ্র্যতা ও জাতপাতের ভেদাভেদের লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র জাহানারা কিংবা জুলি। জুলির বাবা কাসেম আলি ভালোবেসে বিয়ে করেছিল ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েকে। জুলির জন্মের পর তার মা স্বামী কাসেম আলিকে ত্যাগ করে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে জুলির বাবা আত্মহত্যা করে। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে জুলি বেরিয়ে পড়ে। তার অনিশ্চিতের জীবনে এক জীবনসঙ্গী আসে। বিয়ের কিছুদিন পরে অন্তঃসত্ত্বা জুলিকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এখন তার জীবন কাটে রাতের বেলা জাহানারা হয়ে নিষিদ্ধ পল্লিতে আর দিনের বেলা জুঁই হয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণের বাড়িতে বামুনের মেয়ে হয়ে জুলি (কাজের মেয়ে। তাদের ঘরে ঢুকে বাবার অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে। অপরদিকে মেয়েকে ভালোভাবে মানুষ করার জন্য একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়ে মেয়ে বিনিকে এই নোংরা পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। সমাজের নারী মাংসলোভী পুরুষেরা জুলির মেয়ে বিনিকে ভোগ করার জন্য তুলে নিয়ে যায়। এই দলের প্রধান বুল্টনের উদ্দেশ্য ছিল বিনির শরীর ভোগ করে বাইরে পাচার করে দেওয়া। কিন্তু এই মনস্কামনা তার পূর্ণ হয়নি তার আগেই বাঘিনীর ন্যায় বুল্টনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে জুলি। জুলির শাবলের আঘাতে বুল্টনের মৃত্যু হয়।

জুলির বাবা জীবনযুদ্ধে হেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। জুলি কিন্তু এই ভুলটা করেনি। দারিদ্র্যতার কাছে মান-সম্মান বিসর্জন দিয়েও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি। জীবন সংগ্রামে সে জিতে গেছে। এই নাটকে নাট্যকার চন্দন সেন সমস্ত নারী জাতিকে অসীম মনোবলের অধিকারী হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

নাট্যকার চন্দন সেনের 'বারুদ বালিকা' এবং 'অভিমন্যুর খোঁজে' এই নাটক দুটিতে সম্পর্কের ভাঙন ও নারীর আত্মমর্যাদাবোধের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'বারুদ বালিকা' নাটকে স্কুল মাস্টারের ধর্ষিতা কন্যা দোলন। সমাজের মানুষ ধর্ষিতার হয়ে বড়ো বড়ো কথা বললেও কেউ কোনোদিন ধর্ষিতা মেয়েকে সম্মানের চোখে দেখেনি কিংবা নিজের জীবনসঙ্গিনী করতে পারেনি। যেমনটা হয়েছে দোলনের সঙ্গে। মন্ত্রী তন্ময় রায়ের প্রেমিকা ছিল দোলন। তারা পার্টিকর্মী ছিল। এই সময় দোলন ধর্ষিত হয়। তন্ময় তার সাথে এই পাশবিক অত্যাচারের তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং দোলনের পাশে থাকার কথা বলেছিল। কিন্তু এই মেয়েকে স্ত্রী করার সাহস তার ছিল না। কারণ দোলনের মতো মেয়েদের জন্য মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও সহানুভূতি থাকলেও বাস্তবে তা মেনে নেওয়া যায় না। তাই তন্ময় গোপনে দোলনের কাছ থেকে পালিয়ে যায়। সে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সুখী সংসারজীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু তন্ময়ের এই বিশ্বাসঘাতকতায় দোলন আজও সমাজের অন্যান্য পুরুষ মানুষকে বিশ্বাসের চোখে দেখতে পারেনি। এই নাটকে তন্ময়ের কাপুরুষতার তীব্র নিন্দা করেছে দোলন।

> "...মহাকালের খাতায় একটা সামান্য জ্যামিতিক বিন্দু হয়েই আমাদের থাকতে হয়, সেভাবেই থাকতে দাও। গাছের শুকনো ছেঁড়া পাতা যেভাবে জানালা দিয়ে হঠাৎ কোনো রাজমহলে ঢুকে পড়ে, জোনাকির ভীরু আলো যেমন করে হঠাৎ এক সর্বনাশা কৌতুকে আঁধার রাতের পথিককে পথ দেখাতে চায়, তেমনি—তেমনি করেই আমি এসেছিলাম, চলেও যাচ্ছি। এই আসা আর যাওয়ায় পৃথিবীর কারোর কোনো ক্ষতি হবে না; তবু তুমি যে এত বড় মন্ত্রী হয়েও এত জনপ্রিয়, একটা মানুষ হয়েও একটা অখ্যাত অবজ্ঞেয় ধর্ষিতার জন্য একটু কেঁদে উঠলে, গলাটা যে হঠাৎ তোমার বহুদিন পর একটু ভারি হয়ে উঠল—এটাই তো আমার লাভ...এটাই তো আমার অনেক পাওয়া।"[৮]

তন্ময় নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপ ও হতাশায় ভেঙে পড়েছে। তাই বারবার দোলনকে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু দোলনকে যেভাবে উপেক্ষিত হতে হয়েছিল সেভাবেই আজকে তন্ময়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে উপেক্ষা করেছে।

'অভিমন্যুর খোঁজে' নাটকে অভাগী আহ্লাদী ভালোবেসেছিল তার শান্তুদাকে। এই শান্তুদা সারাজীবন আহ্লাদীর সঙ্গে কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু আহ্লাদী তাদের বাড়ির ঝি ছিল। যখন বিয়ের সম্বন্ধ এলো শান্তুদা এককথায় রাজি হয়ে গেল। সেদিন আহ্লাদীর জন্য পরিবারের কাছে প্রতিবাদ করতে পারেনি। পরিবারের কাছে আবেদন করেছিল তার বিয়ের আগে যেনো আহ্লাদীর বিয়ে দেওয়া হয়। শান্তুদাকে নিয়ে আহ্লাদীর ধারণা ছিল অর্জুন পুত্রের অভিমন্যুর মতো পরিবারের সাথে লড়াই করে আহ্লাদীকে নিজের করে নেবে। এই স্বপ্ন তার চিরতরে ভঙ্গ হয়ে যায়। আহ্লাদী নিরুদ্দেশের পথিক হয়ে সত্যিকারের অভিমন্যুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

উল্লেখিত নাটকগুলিতে নাট্যকার চন্দন সেন নারী জীবনের অসহায় জীবনযন্ত্রণার কথা যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনি নারীর প্রতিবাদী রূপটিও উন্মোচিত করেছেন। তাঁর নাটকে নারী হয়ে উঠেছে অসীম মনোবলের অধিকারী। তারা জীবনের কঠিন থেকে কঠিনতম পরিস্থিতিতেও ভেঙে পড়ে না। জীবনযুদ্ধে লড়াই করার সাহস রাখে। যে মানুষটির কাছে তারা অবহেলিত বঞ্চিত হয়েছে সেই মানুষটির কাছে তারা দ্বিতীয়বার যায়নি এবং সেই মানুষটাকে দ্বিতীয়বার তার জীবনে আসার সুযোগও দেয়নি। যেমন কুসুম, রণিতা, নীলা, দোলন কিংবা আহ্লাদী। তারা সবাই পুরুষদের উপেক্ষা ক্ররে গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরোধিতা করেছে। পুরুষের অবমাননা, লাঞ্ছনা সহ্য করে ভাগ্যকে বিধাতার হাতে ছেড়ে দেয়নি। নিজেদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। তারা কখনও সর্বসমক্ষে কখনও আবার নিঃশব্দে প্রতিবাদ করে সেই পুরুষের কাছ থেকে বহুদূরে চলে গেছে। নাট্যকার চন্দন সেনের সৃষ্ট আত্মাভিমানী নারী চরিত্রগুলি অপ্রীতিকর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মসম্মানকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই বঞ্চিত নারী দুর্বলের ন্যায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি কিংবা পুরুষের কাছে অনুনয় বিনয়ের মধ্য দিয়ে আপস করেনি। তারা গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। অর্থাৎ নাট্যকার চন্দন সেন তাঁর নাটকে শুধু নারী জীবনের সমস্যার কথা অঙ্কন করেননি সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশেও দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১। সেন, চন্দন। কর্ণাবতী: অন্ধগলি। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১১, কলকাতা, পৃ. ৪১।
২। তদেব, পৃ. ৫৩।
৩। তদেব পৃ. ৭৫।
৪। সেন, চন্দন। পপুলার পাঁচ নাটক। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২০, কলকাতা, পৃ. ২৮।
৫। তদেব, পৃ. ৩৭।
৬। সেন, চন্দন। কর্ণাবতী: অন্ধগলি। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১১, কলকাতা, পৃ. ১২৩।
৭। তদেব, পৃ. ১৩৬।
৮। সেন, চন্দন। শ্রুতি নাটক সমগ্র। মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৪, কলকাতা, পৃ. ৫১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। সেন, চন্দন। পপুলার পাঁচ নাটক। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২০, কলকাতা।
২। সেন, চন্দন। কর্ণাবতী : অন্ধগলি। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১১, কলকাতা।
৩। সেন, চন্দন। শ্রুতি নাটক সমগ্র। মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৪, কলকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 103-110
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.185

নারী চেতনার আলোকে মহাকালের নারী: প্রসঙ্গ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা

ড. রেজাউল ইসলাম, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.08.2025; Accepted: 26.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mallika Sengupta's poetry highlights the struggles of marginalized and neglected women in a patriarchal society. She uses mythological and historical female figures such as Draupadi, Sita, Ganga, Kunti, and Khana, as well as contemporary women like Medha Patekar, Shah Bano, and Malati Mudi, as subjects in her poems. The poet breaks down conventional myths and portrays these women as rebellious, brave, and independent.

In her writing, these characters not only protest the injustices done to them but also demand their rights as 'human beings' equal to men. Mallika's poetry is a feminist manifesto, vocal against the oppression of women and a strong message for women's empowerment. She believes that every woman possesses the strength of the ten-armed Durga, which is enough to live life on her own terms.

Over time, these women have become symbols of the independent woman of the twenty-first century. These female characters find new life through Mallika's pen, and through their self-expression, the poet proves that the stream of women's struggle has been flowing in the same way for thousands of years. This reflection of a rebellious spirit is the core success of Mallika Sengupta's poetry.

Keywords: Feminism, Patriarchy, Mythological figures, Sita and Draupadi, Rebellious woman, Independent-minded, social context, Post-modern, Empowerment/Capability, Durga

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যা-কিছু প্রান্তিকায়িত, পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত, স্থানচ্যুত, প্রত্যাখ্যাত, অধিকার-শূন্য ও বহিষ্কৃত – সেই সব অপরের মধ্যে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করার মাধ্যমেই আধুনিকোত্তর নারীবাদের বিনির্মাণ ভাবনার সূত্রপাত। সমাজতাত্ত্বিক মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৬০-২০১১) পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক এবং বর্তমান যুগের অজস্র নারীর আত্ম-বলিদানের ঘটনা-পরম্পরা নিবিড় ভাবে পর্যালোচনা করে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেন অনিবার্যভাবে। পূর্বনারীদের আত্মবলিদানের কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি তাঁদের অপ্রকাশিত কথা বলতে গিয়ে মল্লিকার লিখনবিশ্বে ভিড় করেছে দ্রৌপদী, গঙ্গা, কুন্তী, খনা, রেণুকা, আম্রপালী, তুতানখামেনের মা, চিত্রাঙ্গদা, মাধবী, সীতা, সুলতানা রাজিয়া, মীরাবাঈ মেধা পাটেকর, শাহবানু, মালতী মুদি, রূপকানোয়ার প্রমুখ মহাকালের নারীরা। মহাকালের নারীপ্রতিমা প্রতিটি কালেই অপরিবর্তিত রয়েছে বাহ্যিক মুখোশের আড়ালে। অর্থাৎ, আধুনিক মেয়েদের পত্নপ্রতিমা রূপে মল্লিকার নারীরা পুরুষতান্ত্রিক চোরাবালির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধের প্রাচীর—

> "হে পুরুষ, হে আবহমানের সঙ্গী, যদি জিজ্ঞেস করো, তোমার কাছে কী ব্যবহার আশা করি, আমি বলব মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার, যেরকম পুরু বলছিলেন আলেকজান্ডারকে, রাজার সঙ্গে রাজার ব্যবহার, তোমরা আমাদের ভালবেসেছ, পীড়ন করেছ, মানুষ কিন্তু ভাবোনি, আমি তো প্রতিবাদ করবই। তখনও করেছিলাম, সেই যখন আমার নাম ছিল কৃষ্ণা, দৌপদী, যজ্ঞসেনী..."[১]

নারীচেতনার স্বরকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত কালের জটিল প্রবাহে তলিয়ে যাওয়া হাজার হাজার বছরের ভস্মের মধ্যে নারী নামক চাপা আগুনকে প্রজ্জ্বোলিত করেছেন তাঁর কবিতায়। আধুনিকোত্তর সময়ে নারীর নিজস্ব পরিসর নির্মাণে এই নারীরা খুঁজে নিতে চেয়েছে 'মানুষ' শব্দে তাদের সম অধিকার। ছাব্বিশ বছরের সাহিত্যজীবনে কবি বাংলা সাহিত্যের পাঠকে উপহার দিয়েছেন- আঠারোটি কবিতার বই, তিনটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টির আলোকে তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ। কবি পুরাণ-ইতিহাসে মিথ হয়ে যাওয়া নারীচরিত্রদের পাশাপাশি সমকালের ব্যতিক্রমী নারীদেরও তুলে ধরেছেন প্রথাগত স্রোতের প্রতিকূলে। নারীচরিত্রের প্রতিনিধিস্থানীয় কথামানবীর আত্মবয়ানে একদিকে যেমন চিত্রিত হয় পুরুষতান্ত্রিক নির্মমতা অন্যদিকে উত্তরকালের নারীর জন্য নির্মিত হয় আরেক মানবিক পৃথিবী। মহাকালের এই নারীরা নিজের 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে'র তকমা বারবার ভুল প্রমাণ করেছেন মল্লিকার কলমে।

'রামায়ণে'র কাহিনী আমরা সকলেই জানি এবং আমাদের সমাজে আজও সীতা ভারতীয় নারীত্বের উজ্জ্বল মিথ। পুরুষতন্ত্রের জটিল আবর্তে একজন অসহায় নারীকে পুরুষ লেখকের কলমে নারীচরিত্রের রোলমডেলে পরিণত করার দ্বিচারিতা আর বোধহয় অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া মুসলিক। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে বিভেদকামী কিছু রাজনৈতিক দলে যখন 'রামরাজ্যে'র স্বপ্ন দেখায় তখন কবি 'রামরাজ্যে' বসবাসকারী নারী ও শূদ্রদের অবস্থান স্পষ্ট করে, প্রচলিত মিথের বাড়াবাড়িকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে আধুনিক পাঠকের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছেন যুক্তি-পরম্পরার সুতীব্র আঘাতে। প্রথাবদ্ধ সংস্কারের মর্মমূলে আঘাত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চান অকৃত্রিম মানবতার। যুগ যুগ ধরে চলে আসা রামরাজ্য, রাম-সীতা, রাবণ প্রভৃতি চরিত্রের সমন্বয়ে সাজানো পুরুষতান্ত্রিক আয়ুধ—মল্লিকার কবিতায় পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে প্রচলিত মিথের অচলায়তন–

"ভারতের গ্রামে গ্রামে আজও হনুমান
করজোড়ে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করেন
উঁচুজাতিদের চাপে শূদ্র হত্যা করেন যে রাজা
এবারের নির্বাচনে তাকে ভোট দিন
চোদ্দোটা বছর যিনি স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব না নিয়ে
কাটালেন, নির্বাচনে তাকে দিন দেশের দায়িত্ব"[২]

কবি তাঁর কবিতাবিশ্বে সীতাকে মৌন রাখলেও 'সীতায়ন' উপন্যাসে সীতাকে আধুনিক নারীচেতনার অন্যতম মুখ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রামের রাজসভায় দাঁড়িয়ে রামের চোখে চোখ রেখে মল্লিকার সীতা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করতে পারে—

> "রাজার ভূষণ যে প্রজানুরঞ্জন, যার জন্য আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন দশরথপুত্র, সেই কর্তব্যবোধ কোথায় ছিল যখন নিরীহ এক শূদ্রকে শুধুমাত্র তপশ্চর্যার জন্য ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় হত্যা করেছিলেন? শূদ্র কি প্রজা নয়? নারী কি প্রজা নয়? বাঃ ধিক্ এই রাজ আদর্শে, ধিক্ রামরাজ্যে। ...এই শপথ নিতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। শপথ নিলেই কি আমার শরীর অপাপ হবে! ...বিবশ অবস্থায় রাবণ যদি আমার অঙ্গ স্পর্শ করেও থাকে -সে পাপ আমার নয়..."[৩]

'মহাভারতে'র কালে নারী-স্বাধীনতার যোগ্য উদাহরণ হিসেবে দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, চিত্রাঙ্গদা, কুন্তীর প্রসঙ্গ সচরাচর আসে। একথা স্বীকার করতেই হয় ক্ষত্রিয় মহাকাব্যে নারী ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি আছে। কালক্রম ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের পরিমান মূল 'মহাভারতে' দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি হওয়ার ফলে যাবতীয় 'নেগেটিভিটি'র দায় বর্তায় নারীর উপরে এবং সমান্তরালে চলে নারীত্ব নির্মাণের খেলা। সমালোচকদের মধ্যে অনেকে এটাও দাবী করা হয়ে থাকেন যে, দ্রৌপদীর সামান্য একটি কথাই নাকি মহাভারতের গৃহযুদ্ধের মূল কারণ।

পুরুষতান্ত্রিক আবহে পরিবেশিত মহাভারতের নারীরা অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিমহূর্তে জেন্ডার বায়াসে জর্জরিত। মল্লিকা তাঁদের জন্য উপযুক্ত পরিসর দিয়েছেন তাঁর সমগ্র কবিতায়। তিনি এঁদের হয়ে সমাজ-সংসারের কাছে উন্মোচন করেন আবহমান কালের নারী কণ্ঠস্বর–

> "হস্তিনাপুরের এক গৃহবধূ, সেই আমি আবার জন্মেছি
> ভারতবর্ষের দিকে যে মেয়েটি এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল–
> স্ত্রীকে পণ রাখবার অধিকার কে দিল স্বামীকে?
> ...তোমরা পুরুষজন, বাঁ হাতে নারীকে ঠেলে আন্দরে পাঠাও
> ডান হাতে তোমরাই গা থেকে কাপড় টেনে খুলে নাও উন্মুক্ত বাজারে
> তোমরা বিধান দাও, তোমরাই বোবা হয়ে থাক
> পুরুষে পুরুষে যুদ্ধ, প্রতিশোধ রমণীর শ্লীলতাহানিতে।
> ...হে পুরুষ!
> রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবীকে!
> না পেলে তারই শাড়ি টেনে ধরে অশ্লীল হাসিতে
> তাঁর মুখ কালো করে দিতে চাও। বলো –
> দ্রৌপদীর বহু পতি, বেশ্যা অতএব"[৪]

মহাভারতের কালে দ্রৌপদী পুরুষতান্ত্রিক এই ব্যভিচারকে নিয়তি বলে মেনে নিলেও মল্লিকার দ্রৌপদী উপযুক্ত জবাব দিয়ে পুরুষতন্ত্রের জগদ্দল পাথরকে সজোরে আঘাত করেছে–

> "আমি যদি বেশ্যা হই, তুমিও পুরুষ বেশ্যা কর্ণ মহামতি!
> তোমারও শয্যায় আসে বহু পত্নী বিবিধ স্ত্রীলোক
> তুমি যে নিয়মে চলো সে নিয়মে অধিকার আমারও থাকুক"[৫]

যযাতি-কন্যা মাধবীর অমানবিক আখ্যান আমরা সকলেই জানি। আটশত ঘোড়ার বিকল্প হিসেবে যযাতি তার মেয়ে মাধবীকে তুলে দেন ঋষি গালবের হাতে। আর গালব পর্যায়ক্রমে তিনজন নৃপতির হাতে মাধবীকে দু'বছরের শুল্ক হিসেবে তুলে দেন। এমনকি যযাতির স্বর্গে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পুণ্য-সূচক কম ছিল বলে মাধবীর সঞ্চিত পুণ্যের একটি অংশ নিয়ে স্বর্গে প্রবেশের ছাড়পত্র অর্জন করেন। সমকালের প্রেক্ষাপটে তাকিয়ে কবির যাথার্থ উচ্চারণ আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক–

> "একমুঠো চালের জন্য বা এক কোটি বাণিজ্যের জন্য আজও প্রেমিকাকে বাজি রেখে জুয়াখেলা চলে।"[৬]

পিতৃতন্ত্র নামক দর্শনের অমানবিক আচরণবিধিকে দায়ী করে 'মাধবীজন্ম' ও 'মাধবীর গান' কবিতায় মল্লিকা নির্মাণ করেছেন এযুগের মাধবীদের। আমাদের মনে পড়ে গ্রিক পুরাণে উল্লিখিত দৈবজ্ঞদের নির্দেশে পিতা অ্যাগামেমনন কর্তৃক কিশোরী কন্যা ইফিগেনাইয়ার বলি দেওয়ার কথা। এজন্য মল্লিকার কবিতায় আধুনিক মাধবীরা নারীচেতনাবাদের ঢঙে বলে যেতে পারে নিজের অভিশপ্ত অতীতের কথা–

> "রাজার কন্যা মাধবী
> জন্মেছি আমি অতীতে
> আমাকে বিক্রি করেই পিতা ও প্রেমিক
> ধর্ম অর্থ মোক্ষ নিয়েছে জিতে
> তোমাদের কাছে শোনাতে এসেছি আজকে
> অদ্ভুত গালব মাধবী কাহিনী।"[৭]

নদীমাতৃক ভারতবর্ষের প্রধান নদী গঙ্গা– এদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের প্রধান সহায়। পুরাণে বর্ণিত 'সান্তনু-গঙ্গা' আখ্যান এবং জীবকূলের মঙ্গলার্থে গঙ্গার মর্ত্যে আগমন বৃত্তান্ত আমরা সকলেই জানি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিকতার বিষবাষ্পে জর্জরিত আজকের গঙ্গা হারিয়েছে তার জৌলুষ। পুরুষতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য ও ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী

মনোভাবে বলি হয়ে যাওয়া গঙ্গা মল্লিকার কলমে এমনভাবে চিত্রিত যেন আমাদের ঘরের মেয়ে গঙ্গা তার প্রবাহমান যাপনের কথা বলে চলেছে–

"গঙ্গা তোমার কন্যা, যাকে রোজ
চাবুক মারা হয় শ্বশুরঘরে
গঙ্গা তোমাদের জননী রোজ যার
পায়ের তলা থেকে জমিটা সরে যায়
গঙ্গা তোমাদের ঘরনি, যাকে ঘর
ছাড়তে হয় স্বামী পুত্র ফেলে রেখে।"[৮]

পুরাণের হাত ধরে মল্লিকা চলে গেছেন সমকালীর ব্যতিক্রমী নারীদের কাছে। এরকম পরিস্থিতিতে কবি স্মরণ করেন একমাত্র ব্যতিক্রমী মহীয়সী মেধা পাটেকরকে যিনি মহাবাঁধ প্রকল্পে উৎখ্যাত হওয়া হাজারো মানুষের পুনর্বাসনসহ একাধিক দাবীতে লড়াই চালিয়ে যান জগদ্দল পাঠরের বিরুদ্ধে। কালের প্রবাহমানতায় পুরাণ ও সমকাল অভিন্ন হয়ে দেখা দেয় মল্লিকা আহ্বানে—

"তোমাকে চাই আমি হে মেধা পাটেকর
সবুজ নারী তুমি আমার হাত ধরো
নতুন গঙ্গার জন্ম দাও।"[৯]

এভাবেই কুন্তী, রেণুকা, চিত্রাঙ্গদা-রা নবজন্ম লাভ করে মল্লিকার কবিতায়। ঋষি জমদগ্নির স্ত্রী তথা পরশুরামসহ পাঁচ সন্তানের জননী রেণুকা, সামান্য মানসিক চ্যুতির অপরাধে স্বামীর আদেশে পুত্র পরশুরাম তাঁকে অনায়াসে হত্যা করতে পারেন। পাণ্ডুর পুত্র আকঙ্খা মেটাতে বারেবারে পরপুরুষের কাছে সহবাস করতে বাধ্য হওয়া কুন্তী মল্লিকার কলমে ধরা দেন একবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে—

"পাঁচটি সন্তান নিয়ে একা একা একা
জঙ্গলমহল থেকে মহানগরীতে
...ভারতবর্ষ জুড়ে সেই ক্রান্তিকালে
উঠে দাঁড়ালেন এক স্বাধীন জন্নী।
বাসেট্রামে কর্পোরেটে বিষণ্ন সন্ধ্যায়
আমরা অজস্র কুন্তী বাঁচতে শিখেছি
মহাভারত থেকে একুশ শতক।"[১০]

এছাড়াও মহাভারতের মৌষলপর্বে যদুবংশ ধ্বংসের ফলে ষোলোহাজার নারীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দীর্ঘযাত্রার চিত্রে কবি তথাকথিত সতীত্বের ফাঁকা অহংকারের পাশে রক্তমাংসের নারীর জৈবিক কামনা-বাসনাকেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্মীয় মোড়কে নারীর জৈবিক কামনা বাসনাকেও যেখানে প্রান্তিকায়িত অপরের চেতনায় মুড়ে রাখে সেখানে নারীচেতনার প্রতিকূল যাত্রাপথে মল্লিকার কবিতার বয়ান অনন্য হয়ে ওঠে—

"স্বামীকে মাত্র একরাত যারা পেয়েছে
ওই দস্যুর চাহ্ত তাদের স্বপ্ন।"[১১]

মনসামঙ্গলের প্রথাগত সতীচরিত্রের একমাত্র হকদার নিঃসন্দেহে বেহুলা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ 'সতীত্ব' নামক স্বর্ণমুদ্রার মোড়কে বাস্তবতাকে অতল সলিলে নিমজ্জিত করে এসেছে প্রতিনিয়ত। বাসররাতে বিধবা হওয়া মেয়েকে অনিশ্চিত যাত্রাপথে ঠেলে দিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক ইগোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। মল্লিকার বেহুলারা কালে কালে প্রাসঙ্গিক হয়ে ফুটে উঠে একবিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিতেও—

"স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য
ইন্দ্রসভায় কামনামদির নৃত্যে
দেবতার কাছে নিজেকে করল পণ্য
তোমরা সবাই বললে সে সতীলক্ষ্মী
তোমরা জানো না বেহুলা আসলে

ডানা ভাঙা এক বউ-কথা-কও পক্ষী
বাংলার ফুল বাংলার মেয়ে বেভুলা
অপমান ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আমরা
তুমি আমি আর আমরা সবাই বেহুলা।"[১২]

চিরলাঞ্ছিত রমণীর প্রতীক খনা ঐতিহাসিক চরিত্র। 'খনার বচন' হিসেবে আজও লোকসমাজে সমান গৌরবে মৌখিকভাবে প্রচলিত আছে আবহাওয়া, কৃষিকাজ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভবিষ্যবাণী। খনার স্বামী মিহির এবং শ্বশুর বরাহমিহির ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের উজ্জ্বল রত্ন। সেখানে খনার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি রাজার দ্বারা প্রশংসিত হলে স্বামী-শ্বশুরের পুরুষতান্ত্রিক ইগো মেনে নিতে পারেনি। একমাত্র নারী হওয়ার অপরাধে নির্মমভাবে জল্লাদের তরোয়াল খনার জিভ কেটে নেয় এবং রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় খনার। সময় পরিবর্তন হয়েছে, নতুন নতুন আইন এসেছে তবুও একবিংশ শতাব্দীর নারীর প্রকৃত অবস্থানের কোনো বদল হয়নি। স্ময়ের অভিঘাতে এই সময়ের নারীদের সামগ্রিক অবস্থান কবির কলমে ফুটে ওঠে–

"মাঠে পড়ে আজও কাঁদছে আমাদের নারীজিহ্বা..."[১৩]

পিতার পৃথিবীতে মহাকালের নারী যখনই হয়েছে লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত তখনই আড়ালে আবডালে ফল্গুধারার মতো সঞ্চারিত হয়েছে নারীপরিসর নির্মাণের সংকল্প। এক্ষেত্রে কবি পুরাণের মহীয়সী নারীদের পাশাপাশি ইতিহাস ও সমকালের নারী-যাপনের বর্ণমালাকে একত্র করে নিজেকে তাদের আসনে বসিয়ে অনুভব করেন নারীচেতনার উজ্জ্বল আলোকে–

"আমিই ছিলাম মীরাবাঈ, কৃষ্ণপ্রেমের জন্য কত যে পীড়ন সহ্য করেছি, সে তোমরা জানো। আমি উমরাও জান। কত দৈত্য দানো হেঁটে গেছে আমার জিসম, আমার শরীরের ওপর দিয়ে আর আমি অশ্রুজলে শায়েরি লিখেছি। আমি হারেমবন্দি জাহানারার আত্মকথন। উনিশ শতকে আমি রাসসুন্দরী দেবী, খাটের তলায় গোপনে বসে আত্মকথা লিখতাম। কেউ দেখে ফেললে নিন্দে করবেও যে! আমিই মহাশ্বেতা, কোনও প্রতিকূলতাই যার লেখনিকে আটকে রাখতে পারে না। আমি খনা, নিষ্ঠুর সমাজ যার জিভ কেটে নেয় সত্য বলার অপরাধে।"[১৪]

ইতিহাসখ্যাত সুলতানা রিজিয়াকে কে না জানে, যার বয়ানে উঠে আসে নির্মম সত্যভাষণ–

"ভারতবর্ষের মেয়েরা কোনওদিন রাজা হয়নি। প্রজাও হয়নি। হয়েছে রাজার বউ আর প্রজার বউ। সুয়োরানি দুয়োরানি আর ঘুঁটেকুড়ানি। একবার, শুধু একবার রাজা হয়েছিলাম, মাত্র কয়েকদিনের জন্য আমি কথামানবী, হয়ে উঠেছিলাম সুলতানা রিজিয়া।"[১৫]

কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ টেনে হিঁচড়ে আলদা করল নারী আর সিংহাসন। পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির হাতে অকালে বলি হতে হয় ইতিহাসের রিজিয়ার পাশাপাশি আজকের রিজিয়াদের।

গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে পড়ে আব্রু কিংবা বসন-ভূষণ হারনো এক গুর্জরি মুসলিম মেয়ের বয়ান প্রতিটি মানবিক চেতনাসম্পন্ন পাঠকের চোখে নিয়ে আসে বেদনাশ্রু। ত্রিশূলধারী গৈরিক দাপটে মহিলা, শিশু সকলেই গণধর্ষণ কিংবা গণহত্যা কিংবা গণলুণ্ঠনের শিকার হয়। বাদ পড়েনি কন্যাসমা মেয়ে কিংবা গর্ভবতী মহিলাও। ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুড়তে থাকে হিন্দু ও মুসলমানের নগর ও দেবালয়। গণধর্ষণের দেশে সেই গুর্জরি মুসলিম মহিলার আত্মবয়ানে মল্লিকা সচেতন বিবেকের অস্তিত্বের বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন–

"বেঁচে আছি এ কোন দেশে!
বেঁচে আছি, সত্যি নাকি!"[১৬]

পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ তথা ইসলামিক শরিয়তি বিধানের কাছে মুখ লুকিয়ে কাঁদে আজও শাহবানু, ইমরানার মতো অসংখ্য নারী। ১৯৮৫ সালে শাহাবানু কেস মোল্লাতন্ত্রের চূড়ান্ত অমানবিকতার উদাহরণ। তালাক-সুদা শাহাবানু দুমুঠো অন্ন(খোরপোশ) আদায়ের জন্য শেষপর্যন্ত সুপ্রিমকোর্টের কাছে ন্যায় বিচার পায়। কিন্তু ভোট-রাজনীতির নোংরা মানসিকতার কাছে বিচারের সেই বাণী নিভৃতে কাঁদে আজও। কবি শাহাবানুর

প্রতিনিধিত্বে যেমন উন্মোচিত করেছেন শরিয়তি বিধানের সংকীর্ণ রাজনীতিকে তেমনই উচ্চ-বিচারালয়ের সাম্মানিক স্বীকৃতির মধ্যে লালন করেছেন নারীচেতনার বীজ। শাহাবানু ছাড়াও ইমরানার বয়ানে আরো ভয়ংকর ভাবে চিত্রিত হয় মোল্লাতন্ত্রের নির্মম পাশবিকতার অন্যদিক। শ্বশুরমশাইয়ের জৈবিক প্রবৃত্তিতে পুত্রবধূকে হয়ে হয় ধর্ষিত। ইসলামিক বিধানে ধর্ষণকারীর একমাত্র শাস্তি কঠোর মৃত্যু। অথচ পুরুষতান্ত্রিক মৌলবাদ ইমরানাকে উপযুক্ত বিচার দিতে ব্যর্থ। মল্লিকার কবিতায় ইমরানারা মহাকালের পাঠকের কাছে তাঁদের নির্যাতনের উত্তর খুঁজে–

"দার-উল-উলম ফতোয়া দিলেন
শাস্তি হবে আমার
পুরুষের কাজ পুরুষ করেছে, করুক
এখন থেকে আমার ঘর ধর্ষকের খাটে
বরের সঙ্গ এখন থেকে বারণ।
আমদরবার বিচার করুন
আমি কি এক মাংসটুকরো
শয়তান এসে চেটেছে বলেই বরবাদ আমি
আমার ঘর, আমার খসম, সব বরবাদ?
এই কি আমার শান্তির দেশ ভারতবর্ষ?
আমি ইমরানা, আপনাদের জবাব চাই।"[১৭]

"ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্টে কী ভয়ানক সব তথ্য বেরিয়েছে, প্রতি চল্লিশ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি বাইশ মিনিটে একটি যৌননিগ্রহ, প্রতি ১০৬ মিনিটে একটি যৌতুকহত্যা—এ কোন দেশে আমরা বাস করছি, এই দেশ কি আমার না?"[১৮]

—'মালতীজন্ম' কবিতার প্রাককথনে মল্লিকার দেওয়া এই তথ্য পুরুষতন্ত্রের কলঙ্ক, ঠিক যেমন 'শ্লীলতাহানির পরে' উপন্যাসে অফিসের বস বিজন কর্তৃক কর্মী রিকির শ্লীলতাহানি, কিংবা রূপান বাজাজ এর মামলা। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামের মালতী মুদি স্বয়ং দূর্গা হয়ে অশুররূপী পুরুষতান্ত্রিক পাশবিকতার বুকে পেটে ছুরিকাঘাত করতে সক্ষম হলেও অফিসকর্মী রিকি কিন্তু ততটা ভয়ংকরী নন। দুই ক্ষেত্রেই দুই নারী আইনের কাছে গেছে ন্যায্য বিচার পাবার আশায় কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক জটিল সমীকরণ মালতীদের প্রতিহত করার জন্য উঠে পরে লাগে। শুধু তাই নয় জীবনযুদ্ধের এই অসময় লড়াইয়ে নিজের জন্মদাতা বাবা-মাও যখন তাদের বিরূপ হয়ে ওঠে মালতীদের মনন-মানসিকতা নির্মাণ করে নারীচেতনার বিকল্প বয়ান—

"মালতী ভাঙবে, মচকাবে না
...মালতী একাই বাঁচতে চেয়েছে
মানসম্মানে বাঁচার জন্য
... মালতী শুধু বাঁচতে চেয়েছে
আগুনের মতো বাঁচা।"[১৯]

'পুলিশি অন্ধ আইন' ইটভাটার বাবুকে কিংবা বিজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলেও নারীচেতনার উত্তরনারীর কাছে মালতী কিংবা রিকি দুজনেই আদর্শ রোলমডের চরিত্র।

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিমননের সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কবি বল্লরী সেনের মূলবান অভিমত এক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য—

"কন্যাভ্রূণ হত্যা, গার্হস্থ্য নির্যাতন, স্ত্রীকে বলাৎকার কিংবা সমাজের অসহায় বালিকার শোষণপ্রণালী জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা বৈ তো নয়। কিন্তু তার মধ্যেই মল্লিকার কবিসত্তা তাঁর নিগূঢ় স্বকালের কান্না শুনতে পেয়েছে। নারী-মনস্তত্ত্বের ভাষ্যরচনা থেকে শুরু করে সেই প্রলেতারিয়েত্ মেয়েটির জীবন-সংগ্রামকে লেখায় রূপ দিলেন কবি। নির্মাণ করলেন এক অভিনব ফেমিনিস্ট ম্যানিফেস্টো— বৈষম্য নয়, সুস্থ মানবিক সম্পর্কের পারস্পরিকতায় গড়ে-ওঠা মানবী-বিশ্ব : যেখানে মেয়েটি তার অসহায়তা নয়, কার্যক্ষমতা-সক্রিয়তা ও সাহস নিয়ে সমস্ত

প্রতিবিধানকে যাচাই করে দেখবে, বিচার করে দেখবে পুরাণকে আর পুরুষকারের ভণ্ডামিকে মিথ্যা প্রমাণ করে এক সম্পূর্ণ মানুষকেই প্রতিষ্ঠিত করবে ভালবাসা-স্বপ্ন ও অনুরাগে।”[২০]

অসুরদের দমন করতে যখন তেত্রিশকোটি দেবতা ব্যর্থ তখন সম্মিলিত দেবতার প্রয়াসে গড়ে তোলা হয় নারীশক্তি দশভূজা দুর্গাকে। একমাত্র দূর্গার হাতেই যাবতীয় অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটেছিল সেদিন। অথচ আমাদের প্রচলিত ধর্মীয় ভাবনা এতটাই পুরুষতন্ত্রের কুক্ষিগত যে, সেই দুর্গার পুজোতে একছত্রভাবে পৌরহিত্য করেছে পুরুষ। নারী আজও বঞ্চিত সেখানে। মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রতিটি নারীর মধ্যে দুর্গাকে দেখেন। ‘আমার দুর্গা’ শিরোনামাঙ্কিত কবিতার অন্তর্গত ‘প্রার্থনা শ্লোক’, ‘বন্দনা শ্লোক’, ‘আবাহন শ্লোক’, ‘শৃঙ্গার শ্লোক’, ‘ইতরজনের শ্লোক’, ‘গৃহিণীর শ্লোক’, ‘কন্যা শ্লোক’—পৃথক পৃথক উপ-শিরোনামে দুর্গারূপী নারীরা মহাকালের এবং উত্তরকালের নারীর পুজোতে যেন পৌরহিত্য করে চেয়েছে। সর্বশক্তিরূপে উত্তরকালের নারী দুর্গা সোরেন রূপে অঙ্কের স্যারের নোংরা হাতটা মুচড়ে দিতে পারে অনায়সে। তাই কবি স্তুতি করেন তাঁর কবিতার দূর্গাদের –

> “বিশ্বায়নে পণ্যায়নে খণ্ডখণ্ড মানচিত্রে বাংলা-বিহার-রাজস্থানে সাধারণী নমস্তুতে
> বেশ্যাব্রতে পত্নীব্রতে মোহমুদ্রা ধ্বংসমুদ্রা প্রযুক্তিতে গৃহকর্মে সাধারণী নমস্তুতে।।”[২১]

পুরাণ ইতিহাসের পথ বেয়ে এই নারীরা একবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট পরিক্রমা করে তাদের নিজস্ব পরিসর নির্মাণে করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পুরুষতান্ত্রিক জটিল আবর্তের মাঝেও আজকের প্রতিটি স্বাধীনচেতা নারী মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করে—এখানেই মল্লিকার স্বার্থকতা। মহাকালের জটিল প্রবাহে শক্তিরূপী দুর্গারা এভাবেই চক্রাকারে আবর্তিত হয় উত্তরকালের নারীর হাত ধরে—

> “আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে ইস্কুলঘরে থাকে
> আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে
> আমার দুর্গা আত্মরক্ষা, শরীর পুড়বে, মন না
> আমার দুর্গা নারীগর্ভের রক্তমাংস কন্যা
> আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে, আমার দুর্গা তন্বী
> আমার দুর্গা কখনও ঘরোয়া কখনও আগুন বহ্নি
> আমার দুর্গা মেধা পাটেকর, তিস্তা শীতলাবাদেরা
> আমার দুর্গা মোম হয়ে জ্বালে অমাবস্যার আঁধেরা
> আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে
> আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে
> আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্ত্যে
> আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে।”[২২]

তথ্যসূত্র:

১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। ‘কবিতাসমগ্র’ সম্পাদনা- সুবোধ সরকার। ‘কথামানবী’/নান্দীমুখ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০০৯, জুলাই ২০১৬, পৃ. ২০৬।
২. তদেব, রামরাজ্য, পৃ. ২৯২।
৩. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। ‘গদ্যসমগ্র’ সম্পাদনা- সুবোধ সরকার। ‘সীতায়ন’ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০০৯, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১১৬-১১৭।
৪. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। ‘কবিতাসমগ্র’ সম্পাদনা- সুবোধ সরকার। ‘দ্রোপদীজন্ম’ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০০৯, জুলাই ২০১৬, পৃ. ২০৭-২০৯।
৫. তদেব, দ্রোপদীজন্ম, পৃ. ২০৯।
৬. তদেব, মাধবীজন্ম, (প্রাক্‌কথন) পৃ. ২২৮।
৭. তদেব, আমার লাস্য আমার লড়াই/মাধবীর গান, পৃ. ২৮৯।
৮. তদেব, গঙ্গাজন্ম, পৃ.২১৫।

৯. তদেব, পৃ. ২১৫।
১০. তদেব, কুন্তী রিভিজিটেড, পৃ. ৫৬৩।
১১. তদেব, মৌষল পর্বের মেয়েরা, পৃ. ১৯১।
১২. তদেব, বেহুলা, পৃ. ৩৫৩।
১৩. তদেব, খনাজন্ম, পৃ. ২৫০।
১৪. তদেব, খনাজন্ম, (প্রাক্কথন) পৃ. ২৪৪।
১৫. তদেব, রিজিয়াজন্ম, (প্রাক্কথন) পৃ. ২১৬।
১৬. তদেব, আমি গুর্জরি মুসলিম মেয়ে, পৃ. ৩২৩।
১৭. তদেব, আমি ইমরানা, পৃ. ৪৩৩।
১৮. তদেব, মালতীজন্ম, (প্রাক্কথন) পৃ. ২৩২।
১৯. তদেব, মালতীজন্ম, পৃ. ২৩৮।
২০. মন্ডল, অধীরকৃষ্ণ সম্পাদক, বনানী, বল্লরী সেন/মল্লিকা সেনগুপ্ত : অন্য এক নারী-বিশ্ব, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪।
২১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'কবিতাসমগ্র' সম্পাদনা- সুবোধ সরকার। আমার দুর্গা/কন্যাশ্লোক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০০৯, জুলাই ২০১৬, পৃ: ৪০৯
২২. তদেব, পৃ. ৪১০।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 111-118
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.186

‘কৃত্তিবাসে’র আলোয় শঙ্খ ঘোষ: দেশ-কাল-সমাজ ও মানুষের সংবেদনশীল বয়ান

শিরিন আক্তার, *লেকচারার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ*

Received: 25.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author (s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Shankha Ghosh was one of the leading literary figures of the 1950s. The inner and outer dimensions of this proverbial poet’s soul find vivid expression throughout his poetry. His works bear the mark of both the traditional wisdom of Bengali poetry and a conscious insight shaped by a global perspective. Alongside his introspective awareness, the poet was equally stirred by an acute sensitivity to the external world. By giving voice to his inner feelings and transforming them through the alchemy of his poetic sensibility, Shankha Ghosh infused his verses with a unique vitality.

As a result, his poetry inevitably reflects the spirit of his time — the nation, society, and the human condition surrounding him. His personal consciousness blends seamlessly with social awareness, and that social awareness, in turn, connects to a broader cosmopolitan vision. The consequences of the state’s shortsighted decisions, the suffering of the common people, the dominance of power structures, and his compassionate yet protest-driven poetic stance deeply move and engage any lover of poetry.

This paper seeks to explore how this social consciousness resonated within the poet’s inner world during his time, and how that inner awareness blossomed into poetry — how it took shape, through the craft of words, as flowers on the tree of his poetic vision.

Keywords: Shankha Ghosh, Bengali Poetry, Social Consciousness, Inner Awareness, Poetic Vision

বাংলা কবিতার ইতিহাসে শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) একটি শক্তিশালী নাম। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেড়ে উঠলেও বাংলা কবিতার পালাবদলের ভূমিকায় এই কবির ভূমিকা অগ্রগণ্য। শঙ্খ ঘোষের কবিতা ‘দিনগুলি রাতগুলি’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার প্রথম সংকলনে ১৯৫৩ সালে। পত্রিকার প্রকাশনা সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন- “কৃত্তিবাস পত্রিকা প্রকাশের পেছনে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না, এর জন্ম অনেকটা আকস্মিক।”[১]

কৃত্তিবাস পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংকলনে সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন:

> “কৃত্তিবাস বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের মুখপাত্র। একেবারে তরুণদের সার্থক না হলেও ভালো নতুন কবিতার গতিপথের একটা নিরিখ যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের কবিতা এখানে একত্র করা হবে।”[২]

আকস্মিকভাবে জন্ম হলেও আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সাথে সাথে তরুণ সাহিত্য সমাজে আলোড়ন পড়েছিল। পত্রিকাটির প্রচ্ছদেই "তরুণতম কবিদের জন্য" লেখা থাকতো। বিশুদ্ধভাবে তরুণদের লেখা কবিতা প্রকাশই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> "প্রথম থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে কৃত্তিবাসে শুধু তরুণদের কবিতাই প্রকাশিত হবে। সেই সময় জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ আধুনিক কবিতার প্রথম সারির কবিবৃন্দ সকলেই জীবিত এবং সৃষ্টিশীল। আমরা ওঁদের কারো কাছেই লেখার জন্য হাত পাতিনি। কোনো কোনে খ্যাতিমান লেখক নিজ থেকে রচনা পাঠিয়ে আমাদের বিব্রত করেছেন, আমরা সবিনয়ে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছি।"[৩]

উক্ত মন্তব্যটিতেই আসলে কৃত্তিবাসের তেজোদীপ্ত পদচারণার কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই সম্পাদকমন্ডলী চেয়েছিলেন দল, রাজনীতি, মতবাদ-মতাদর্শের উর্ধ্বে এবং প্রচলিত ফর্মের বাইরে গিয়ে কবিতা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠুক এই পত্রিকা। এক সময় এর প্রভাব এত ব্যাপক হয়ে ওঠে যে 'কৃত্তিবাস গোষ্ঠী' নামক আলাদা সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। 'কৃত্তিবাসে'র প্রথম সংখ্যাতেই যুক্ত হলো শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' কবিতাটি-

> "হে আমার সুনিবিড় তপস্বিনী ঘনভার রাত্রি, আমাকে হানো।
> ঐ তারা আলুলায়িত বেদনার কালো, তারই চুপে দীর্ঘকাল এ
> আমার স্নান
> বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা-
> কী লাভ কী লাভ তাকে অবিশ্রাম ক্লীবত্বের জ্বালাময় দৈন্যে পুঞ্জ ক'রে?"[৪]

এই 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সান্নিধ্যে এসে যেন শঙ্খ ঘোষ পাঠক সমাজে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন অরুণরাঙা আলোর মতো। তারপর আর তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কাব্যজগতে সৃষ্টির বিশাল ভান্ডার দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কবিতার ধারাকে।

১৯৩২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন শঙ্খ ঘোষ। যাঁর প্রকৃত নাম ছিল চিত্তপ্রিয় ঘোষ। বেড়ে উঠেছেন পৈত্রিক বাড়ি বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রামে। পাবনায় পিতার কর্মস্থল হওয়ার সুবাদে শঙ্খ ঘোষের জীবন পরিক্রমার বেশ কয়েক বছর কেটেছে পাবনায় এবং সেখানে থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং পেশা হিসেবে বেছে নেন শিক্ষকতাকে। এক সময় বাংলা কবিতার জগতকে অপরিসীম অবদানে সমৃদ্ধ করে তোলেন। 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬), 'নিহিত পাতাল ছায়া' (১৯৬৭), 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' (১৯৭৪), 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬), 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' (১৯৮০), 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (১৯৮৪), 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' (১৯৯৪) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মূলত কবি হিসেবে অধিক খ্যাতি লাভ করলেও তাঁর অনুবাদ ও গদ্য রচনার ভান্ডারও বিপুল।

সমাজ ও রাজনীতি সচেতন এই কবির কাব্যে দেশ-কাল উঠে এসেছে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার জারক রসে। যেখানে বন্যা, খরা, মন্বন্তর, দেশভাগ উঠে এসেছে প্রেম ও প্রকৃতির সমান্তরালে এক নব অভিজ্ঞানের আলোয়। যার ফলে সমকালীন কবিদের থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দিয়েছে মহাকাল। কাব্য ভাবনার দিক থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় উঠে এসেছে সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ-কাল এবং সেই সাথে উঠে এসেছে প্রকৃতি চেতনা, প্রেমানুভূতি, নাগরিক দগ্ধতা, কোলাহল, ইত্যাদি। বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পভাবনার দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বাংলা কাব্যে দখল করতে পেরেছেন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। দেশ-কাল-সমাজের কথা স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে কবিতার পরতে পরতে। উঠে এসেছে জীবনের কথা, মানুষের কথা।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে এসে আধুনিক বাংলা কাব্যের মোড় অনেকটাই ঘুরে যায়। তিরিশের দশকের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ পঞ্চপান্ডব ছাড়াও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রবলয় থেকে মুক্তি কামনায় একটি আলাদা জগৎ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনায়, অভিব্যক্তি প্রকাশের মর্মমূলে ছিল ব্যক্তির

চেতনাবোধ। কবিতার সত্যকে যেন নতুনরূপে প্রকাশ করার প্রয়াস পেলেন তাঁরা। যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির আশা-নিরাশা-হতাশা, ক্লান্তি, অবক্ষয়, শূন্যতাবোধ ইত্যাদি হয়ে উঠেছিল সেই সময়ের কবিতার মূল বিষয়। এর পর চল্লিশের দশকে পাওয়া গেল আরেক ঘরানার কবিগোষ্ঠী যাঁরা জীবনের প্রকৃত মানে অনুসন্ধানে আগ্রহী ছিলেন। চল্লিশের ধারার কবিরা তিরিশের কবিদের কবিতায় চিত্রিত ব্যক্তিক আশা-নিরাশা, শূন্যতাবোধকে ছাপিয়ে সামষ্টিক মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধ থেকে শিক্ষা ধারণ করে সমগ্র মানব মুক্তির জয়গানে নিজেদের মেলে ধরেছেন। এর সাথে বিশ্বব্যাপী আগেই যুক্ত হয়েছে মার্কস ও ফ্রয়েডীয় দর্শন। তিরিশ ও চল্লিশের দশকের এই দিক পরিবর্তন বা পালাবদল, চিন্তা-চেতনার এরূপ ধারা ও পাশ্চাত্য দর্শনের স্রোত এবং বিশ্বযুদ্ধের আঘাত একসাথে মিলে চিন্তার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। চিন্তা ও অভিজ্ঞতার এ সকল যুগ পরিক্রমণের ফলেই শঙ্খ ঘোষের কাব্য ভাবনা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে এবং সেই সাথে হয়ে উঠেছে ধ্বনিময় শিল্পবোধের ধারক ও বাহক।

শঙ্খ ঘোষের ‘দিনগুলি রাতগুলি’ কবিতাটিতে ৭, ৮, ৯, ১১ ও ১২ জানুয়ারির বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করে গুচ্ছ কবিতার মতো তাঁর বিচ্ছিন্ন অনুভূতিকে গেঁথে দিয়েছেন একসূত্রে। এই কবিতার বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি আঙ্গিকের নানাদিক যেন কবিকে চিহ্নিত করে দেয় আলাদাভাবে। কখনো গদ্য ছন্দে, কখনো পুনরাবৃত্তিতে আবার কখনো অন্ত্যমিলের দ্যোতনা উঠে এসেছে কবিতার স্তবকে স্তবকে-

“তুমি টেনে নেবে গান-
অবশেষে থরে থরে কথার কাকলি তুলে বীথিকুঞ্জ সাজাবে প্রণয়ী, উচ্চকিত পৃথিবীর
দুর্বার প্রতাপ তুচ্ছ ক’রে, কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-অশ্লেষ-ধন্য মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী”[৫]

কবিতাটিতে কবির আপন সত্তাটি যেন কবিসত্তা থেকে পৃথক হয়ে আত্ম-সংশ্লেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একই কবিতার অন্য অংশে কবি যেন আপন ভঙ্গিমায় গেয়ে ওঠেন-

“কবি রে, তোর শূন্য হাতে
আকাশ হবে পূর্ণ-
... কবি রে আজ প্রেমের মালায়
ঢেকে নে তোর দৈন্য!”[৬]

যে ভূমিতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সে ধরিত্রী মাতার সাথে সন্তানের গড়ে ওঠে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কবি শঙ্খ ঘোষের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শঙ্খ ঘোষের কাব্য ভাবনার বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণায় আহত হৃদয়ের ব্যথাতুর বয়ান। দেশভাগের দরুণ শেকড় হারানোর বাস্তব ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকেও যেতে হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সের লেখা কবর কবিতায় দেখি-

“আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে-
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতে শস্য যেন ফলে।”[৭]

অস্থিরতায় দগ্ধ হৃদয়ের দেখা মেলে প্রথম কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে। শিশুসূর্য কবিতায় যা উঠে এসেছে-

“এ কোন দেশ?
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতামুখে
শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার
ক্ষীণকায় শিবিরের বজ্র-আলিঙ্গনে হুতাশী জনসঙ্ঘের গুরুসংখ্যা।”[৮]

কবিতাটিতে স্খলিত, দুর্বল, হাহাকারে পরিপূর্ণ এক রাষ্ট্রের কথা ধ্বনিত হয়েছে, যে রাষ্ট্র সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া ক্ষুধায় কাতর শিশুর মতোই ক্ষীণকায়-দুর্বল। দেশের এই অপূর্ণতা যেন কবিকে নির্মম শেলে বিদ্ধ করার সাথে সাথে পাঠকের চিত্তকেও বিদ্ধ করে। দেশকে ঘিরে তাঁর বিষাদের কালো ছাঁয়া তাঁর হৃদয়ে ছাপ ফেলেছে গভীরভাবে। স্বাধীনতা লাভ পরবর্তী দেশব্যাপি বিশৃঙ্খলা, অন্নাভাব, অন্যায়-দুর্ভোগ ইত্যাদির কারণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে কবির সংবেদনশীল হৃদয়। কবির কাছে দেশ কেবলই দেশ নয়, কেবলই মাটি নয় বরং তার থেকেও অধিক কিছু। ‘স্বদেশ

স্বদেশ করিস কারে’ কবিতায় মিশে আছে পার্টিশনের দরুণ বেদনামথিত স্মৃতিতে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন হৃদয়ের আকুলতার ধ্বনি-

“তুমি দেশ? তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বুকে
বরাভয় হাত তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়াতরু
সেই তুমি? সেই তুমি বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্ররেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।”[৯]

দেশ কেবলই জন্মভূমি নয়, কেবলই বেড়ে ওঠার সুবর্ণভূমি নয় বরং সমস্ত চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন-বোধ-কল্পনার অবিমিশ্র স্বরায়ণ। শঙ্খ ঘোষের কাব্যচেতনায় স্বদেশের নানা মূর্তি ধরা পড়েছে। এ দেশের বুকে সময়ের পরিক্রমায় যা অনুভূত হয়েছে গভীরভাবে। কখনো এই দেশ কবির বাল্যসহচর আবার কখনো দেশ শৈবালের আচ্ছাদনে ঢাকা বেদনার ধারা, কখনো বা বেদনার সঙ্গী। বলো তারে শান্তি শান্তি কবিতায় দেশ কবির কাছে অপত্য স্নেহের আধারে মাতৃরূপে উঠে এসেছে-

“মাগো, আমার মা
তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেওনা।”[১০]

কবি হৃদয়ের আকুলতা এই-কেবল কবির কাছাকাছি পরম মমতায় তাঁর মাতৃরূপী দেশ থাকুক। এই দেশ মা যেন আর কোথাও না যান অর্থাৎ মাতা এবং সন্তানের যেন কিছুতেই বিচ্ছেদ না ঘটে। মূলত কবি হৃদয়ের প্রগাঢ় দেশপ্রেম যেন কবিকে অভিন্ন বন্ধনে গেঁথে দেয়। যে বন্ধন না ছেড়ার জন্য কবি চিত্তের আকুল আবেদন। আবার চারিদিকের বিক্ষুব্ধ-বঞ্ঝনায় মাকে যেন অভয় দিতে দিতে কবি একই কবিতার চার সংখ্যক স্তবকে বলে ওঠেন-

“মাগো আমার মা-
ঝড় নেমেছে, দুয়ারে তার ঝঞ্ঝা লাগো-লাগো
তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা মেনো না।
বাজনা বাজুক ভয়ে পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা!”[১১]

ধুলিমাখা পথ থেকে শুরু করে রৌদ্ররথের শহরগ্রাম অর্থাৎ দেশ-প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ যেভাবে এসেছে কবিতাটিতে সেভাবেই আবার দেশ মাকে নানান বিপদে শঙ্কা না করে সাহস নিয়ে থাকার বরাভয় দিতে দেখি।

বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থাৎ দুই বাংলার মানুষের জীবনের এক অপূরণীয় ক্ষত হয়ে আছে দেশভাগ। শঙ্খ ঘোষের কাব্যচেতনায় এ দেশ হারানো ক্ষতের কথা, ফেলে আসা স্মৃতির রোমন্থন দেখতে পাই। ছেড়ে আসা গ্রাম, শৈশবের আঙিনা, প্রকৃতি-মাঠ-নদী যেন বারবার উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর ফুলবাজার কবিতাটি যেন তারই স্মৃতিমাখা বেদনার বয়ান-

“পদ্ম, তোর কথা মনে পড়ে কালযমুনার এপার-ওপার
রহস্যনীল গাছের বিষাদ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?
স্পষ্ট নৌকো, ছই ছিল না, ভাঙাবৈঠা গ্রাম-হারানো
বন্যা মুঠোয় ডাগর সাহস, ফলফুলন্ত নির্জনতা।”[১২]

কবিতায় কবির স্মৃতির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যমুনা, ছইহীন নৌকো, ভাঙাবৈঠা যা কবি ফেলে গিয়েছেন অতীতের কাছে। আবার ‘রাঙামামিমার গৃহত্যাগ’ কবিতায়ও যেন সে কথাই উঠে এসেছে-

“ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে-
ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!”[১৩]

‘আদিম লতাগুল্মময়’ কাব্যের দুই বাংলা, দেশহীন, ব্যভিচার, একা কবিতাসহ আরো বেশ কিছু কবিতায় দেশভাগের যন্ত্রণা পরিস্ফূটিত হয়েছে গভীরভাবে। দুই বাংলা কবিতায় দেখি-

“আমার এ দুটি কলুষমাখানো হাতে

নিতে চেয়েছিলে তোমার বুকের কাছে,
তোমার দুখানি রক্তরাঙানো হাত
আমার মাথায় রাখো, মার্জনা করো।”[১৪]

রক্তরাঙানো, কলুষমাখানো হাত দুখানি বুকের কাছে নিয়ে মার্জনা প্রার্থনাই যেন উচ্চারিত হয়েছে এ কবিতায়। নিজ জন্মস্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বেদনা মথিত ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতিই কেবল প্রকাশ হয়নি তাঁর কবিতায় বরং দেশভাগের ফলে শেকড় হারানো, শৈশব হারানো এমনকি সমগ্র ভুবন হারানো মানুষের হাহাকার মিশে সামষ্টিক চেতনার ধ্বনি হয়ে ওঠে কবিতাগুলো।

কখনো শাসকের অদূরদর্শীতার ফলে কখনো বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে খরা কবলিত হয়েছে প্রিয় স্বর্গভূমি। অনাবৃষ্টি আর খরার রূপটি তাঁর ‘খরা’, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ কবিতায় দৃষ্টিপাত করলেই তা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়-

“অগ্নিজোড়া তেপান্তর ধু ধু বালুর মাঠ
সেইখানে সে একলা হাঁটে, সেইখানে সে কাঁদে!
গ্রীষ্ম এল শূন্য কাঁখে-পোড়া এ তল্লাট
কপাল খুঁড়ে মরল, ও মেঘ বর্ষা দে বর্ষা দে-
বর্ষা দিল না:
চক্রবালে চক্রবালে তৃষ্ণা দিল পা।”[১৫]

কবিতাটিতে গ্রীষ্মের দাবদাহতা যেন জন-জীবনকে শঙ্কিত করে তুলেছে। মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, মাঠের ফসল সমস্ত কিছু যেন চাতকের মতো বৃষ্টির প্রতীক্ষায় দিন গুনছে কিন্তু ধরিত্রীকে শান্ত করে বৃষ্টি না নেমে যেন রহস্যময়ী ললনার মতো অধরা হয়ে উঠেছে।

‘যমুনাবতী’ কবিতায় সময়ের বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে গভীরভাবে। একদিকে মন্বন্তরের ভয়াবহতা অন্যদিকে দুই বাংলার মানুষের বন্দিদশার চিত্র ফুটে উঠেছে। এর সাথে নিপুণ দক্ষতায় কবি গেথেঁ দিয়েছেন রূপকথার যমুনাবতীকে। সরস্বতীরূপী যমুনাবতী যেন আকাশ-পাতাল ভেদ করে মর্ত্যের রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে মিশে গেছেন অভুক্তদের দলে। কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলন চলাকালীন মিছিলেই পুলিশের গুলিতে কিশোরী হত্যার প্রতিবাদরূপে কবিতাটি যেন এক রক্তাক্ত দলিল। প্রতিবাদী স্বর হয়ে কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে:

“যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিয়ের টোপর নিয়ে।”[১৬]

সদ্য ঘুচে আসা মন্বন্তরের দেশে খাদ্যের জন্য কিশোরী হত্যা যেন তৎকালীন শাসক-শোষকদের ক্ষমতাতন্ত্রকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

“রূপকথার যমুনাবতী সরস্বতীর বিয়ে হয় আনন্দঘন পরিবেশে-নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে সে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় কাজীতলা দিয়ে ।কিন্তু বাস্তবের যমুনাবতীর কপালে সে সুখ নেই।”[১৭]

কবির ভাষায়:

“যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।
নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফেলেছে!”[১৮]

অধিকার আদায়ের পথে এই কিশোরীর ত্যাগ যেন পরবর্তী কোন স্বাধিকার আন্দোলনের পথকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল। সমকালীন রাজনীতির নানান ঘটনার দ্বারাও শঙ্খ ঘোষ ব্যথিত হয়েছেন বারংবার। রাজ্য রাজনীতির দিকটিও তাঁর চোখ এড়ায়নি। কখনো বা আক্রমণের শিকার হয়েছেন কবিতা লিখে। নন্দীগ্রাম ঘটনায় কবির ‘সবিনয় নিবেদন’ কবিতাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কবিতায় দেখি:

“আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে

যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।”[১৯]

যুগযন্ত্রণার ঘাত-প্রতিঘাত কবি শঙ্খ ঘোষের চিত্তকে করেছে ক্ষতবিক্ষত-রক্তাক্ত। নিহিত পাতাল ছায়ার ‘মাতাল’ কবিতায় বলে উঠেছেন:

“আরো একটু মাতাল করে দাও
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ও যে সইতে পারবেনা!
ও যুবক আছে প্রভু!
এবার তবে প্রৌঢ় করে দাও-
নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ওকে বইতে পারবেনা।”[২০]

সইতে পারা ও বইতে পারা বক্তব্য দুটি যেন বিষয় ভাবনার দিক থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই বিশ্বসংসারের চলমান ঘটনার নানা অভিঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যাযজ্ঞ, মন্বন্তর, দুর্দশা এসব কিছু যেন একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ মেনে নিতে পারবে না।তাই ইশ্বরের কাছে আরো একটু মাতাল করে দেওয়ার জন্য সংবেনশীল কবি হৃদয়ের গভীর অনুনয় দেখতে পাই কবিতাটিতে।

> “যে কোনো মানুষের সমাজের প্রতি কিছু দায় থাকে। কবিরও তা আছে সে দায় তিনি ব্যক্তিগত স্তরে বহন করবেন, এটা প্রত্যাশিত সব কবি তা করেন না, সব ব্যক্তি মানুষও করেন না তা, সেটা ভিন্ন সমস্যা। কিন্তু এই দায় বহন করার মানে এই নয় যে, কবিতায় একজন কবিকে সবসময় সমাজের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। এমনকী কোন সময়ই তেমন তিনি না বলতে পারেন। তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে তিনি সমাজ বিমুখ। কেননা কবিতার মধ্য দিয়ে যদি ভিন্নতর কোনো সত্যের কোনো সুন্দরের বোধ তৈরি হয়ে ওঠে, কোনো কল্পনা জগতের যদি প্রসার হয়ে থাকে সেও তো সমাজেরই কাজ, সামাজিক মননকে উদ্বোধিত করে তুলবারই কাজ।”[২১]

এই সৃজন প্রেরণার উৎস হিসেবে যেন শঙ্খের কবিতাগুলো পেয়েছে পূর্ণাঙ্গতা। নিজের কথার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন ঘরের কথা। ঘরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন স্বদেশের কথা, আবার স্বদেশের সাথে বিশ্বের কথা যেন কবিতার পরতে পরতে সজ্জিত হয়ে আছে। ব্যক্তিক দহন থেকে যেন কবিতা ছুঁয়ে গেছে স্বদেশ যন্ত্রণায়, স্বদেশ থেকে যেন সমগ্র বিশ্বের পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে- ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’র মত ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতায়:

“একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্যে গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাবো
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।
একটা দুটো সহজ কথা
বলবো ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।”[২২]

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন বুর্জোয়া প্রতিপত্তির জয়জয়কার তখন রোমান্টিক কিংবা ব্যক্তিগত চাওয়াও যেন পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য হয়ে যায়। কবিতাটি যেন তারই বাস্তব চিত্র। তাঁর চিন্তা চেতনার অভিজ্ঞান, পরম্পর বিচ্ছিন্নতা-যোগাযোগহীনতার বিষয়টিও যেন কবিতায় অঙ্কিত হয়ে আছে- ‘ভিড়’, ‘রাস্তা’, ‘কালকাতা’র মতো কবিতাগুলোতে। পাশাপাশি এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনার চিরকালীন গাঁ বাঁচানোর দ্বান্দ্বিক অবস্থানটি। বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকট ‘ভিড়’ কবিতায় উঠে এসেছে:

"ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
'সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান-'।"[২৩]

কবিতার এই অংশ পাঠে মনে হয় যে বাসে বা ট্রামে সহযাত্রী কিংবা কনডাক্টরের ভাষ্যে কবির প্রতি ছোটো হয়ে নেমে পড়ার পরামর্শ এবং কবিতার বাকি অংশে আমরা চিরকালীন মধ্যবিত্তের চিন্তার ছাপ আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে দেখি:

"আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে!
আমি কি নিত্য আমরাও সমান
সদরে বাজারে, আড়ালে?"[২৪]

কবির এই বোধ যেন পাঠককে নিয়ে যায় একই কাতারে যেখানে সময়ের সাথে নিজের অস্তিত্বের লড়াই চলতে থাকে সর্বত্র। যা 'রাস্তা' কবিতায় আরো প্রকটভাবে ধরা পড়েছে-

"রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন
মশাই দেখছি ভীষণ শৌখিন।"[২৫]

অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি ভান্ডারের এক বিশাল জগত জুড়ে রয়েছে দেশ-কাল-সমাজ তথা মানুষের কথা। সমাজের অপরিহার্য উপাদান মানুষের জীবন নানাভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে। কখনো রাজনীতির করালগ্রাসে কখনো আবার ক্ষমতাতন্ত্রের বাড়াবাড়িতে জনজীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটপাটের রাজনীতি মানুষের জীবনের শান্তিকে নষ্ট করেছে, চরমভাবে ব্যাঘাত ঘটেছে প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের। বর্তমান বিশ্বব্যাপী যে অস্থিতিশীলতা তার সাথে যেন শঙ্খের কবিতাগুলো অপরিহার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ফলে কবিতাগুলো যেন দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের মানুষের চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে। কবির ভাষ্যে:

> "কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা? আমার বাইরের পৃথিবী নিয়ে? না কি আমার ব্যক্তিগত জগৎ নিয়ে? এই ছিল তর্ক, দেশ বিদেশের বহু পূর্বকালের তর্ক। কিন্তু এই দুই কি ভিন্ন না কি? এই দুইয়ের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া-আসা করেই কি বেঁচে নেই মানুষ? তার থেকেই কি তৈরি হয়ে উঠছে না একটা তৃতীয় সত্তা? ...আমারও তেমনি এক থেকে আরেক টুকরোয় অবিরাম যাওয়া, পা তোলা পা ফেলার মতো এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছানো।"[২৬]

এখানেই যেন কবির বাণী কাল ভ্রমণে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত থেকে বিশ্বকালে প্রসারিত হয়ে উঠেছে। রফিকুল্লাহ খানের মতে:

> "মানুষের সমস্ত সৃজন প্রেরণার উৎস তার সমাজ ও সময়। সমাজ ও সময় লালিত হবার ফলেই ব্যক্তির সংবেদনা, আবেগ, অনুভব ও জীবনকল্পনা সমষ্টির মধ্যে মুক্তির সন্ধান করে। মানুষের বস্তুগত ও ভাবগত উপকরণপুঞ্জের সুসম ঐক্যে যে সমাজচৈতন্য নির্মিত, তার সঙ্গে স্বধর্ম ও অণ্বেষণের মধ্যেই মানুষের সৃষ্টিশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষের যূথবদ্ধ জীবনের সূচনা ঘটে তার অস্তিত্ব-সংকট ও সেই সংকট অতিক্রমণের অনিবার্যতাবোধ থেকে এবং এই অস্তিত্ব সংগ্রামরত মানুষের আকাক্সক্ষা, উদ্বেগ, সংঘাত, রক্তপাত, অচরিতার্থতা, যন্ত্রণা প্রভৃতির সামাজিক অভিব্যক্তিই শিল্প-সাহিত্য।"[২৭]

খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে শঙ্খ ঘোষের কবিতার শরীর জুড়ে রয়েছে ভেতর-বাইরের উভয় রকমের বাস্তবতা। যে বাস্তবতা ব্যক্তিগত জীবনবীক্ষার সীমা অতিক্রম করে বিশ্ব-বীক্ষার দিকে ধাবিত হয়। এভাবেই একজন ব্যক্তিগত 'আমি'কে ছাড়িয়ে সামষ্টিক আমিতে পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে কবিতায় বর্ণিত দেশ-কাল-সমাজ কিংবা মানুষের কথা যেন অনিবার্যভাবেই হয়ে ওঠে বিশ্বের সমগ্র মানুষের কথা তথা সামষ্টিক চেতনার কথা যা শঙ্খ ঘোষের কবিতা জুড়ে উঠে এসেছে আলাদা আলাদা ভঙ্গিতে।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পা.) । কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর: নির্বাচিত সংকলন ১। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৯।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (সম্পা.) । কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর: নির্বাচিত সংকলন ১। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৯।
৩. তদেব, পৃ. ৯।
৪. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৯।
৫. ঘোষ, শঙ্খ শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২১।
৬.তদেব, পৃ. ২১।
৭.তদেব, পৃ. ৩২।
৮. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৪।
৯. ঘোষ, শঙ্খ শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪৪।
১০. তদেব, পৃ. ৪৪।
১১.তদেব, পৃ. ৪৬।
১২.তদেব, পৃ. ৭৪।
১৩. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৫।
১৪.তদেব, পৃ. ১৫১।
১৫.তদেব, পৃ. ৪৩।
১৬.তদেব, পৃ. ৪৮।
১৭. মিশ্র, ড. অশোককুমার। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা। ৩য় সংস্করণ, ২০১৩, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৬৫।
১৮. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪৮।
১৯. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২৬
২০. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৬৪।
২১. ঘোষ, শঙ্খ। কথার পীঠে কথা। প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৪৮।
২২. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতসংগ্রহ-২। তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ.৮৮।
২৩. ঘোষ, শঙ্খ। শঙ্খ ঘোষের কবিতসংগ্রহ-১। চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৮।
২৪. তদেব, পৃ. ৭২।
২৫. তদেব,৭২।
২৬. ঘোষ, শঙ্খ। কবিতার মুহূর্ত। অনুষ্টুপ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮, ২ই নবীন কুন্ডু লেন, কল-০৯, পৃ. ১৫-১৬।
২৭. খান, রফিকুল্লাহ। কবিতা ও সমাজ। ঢাকা-১১০০: মাওলা ব্রাদাস, প্রথম বাংলা একাডেমি সংস্করণ ১৯৮৫, বর্তমান সংস্করণ ফেব্রয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 119-127
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.187

বাংলা কাব্যগীতির ধারায় অতুলপ্রসাদ সেনের গজল

মো: আফতাব উদ্দিন, *গবেষক, হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিভাগ, সঙ্গীত-ভবন, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.09.2025; Accepted: 12.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The history of Bengali music is rich in the tradition of Kabyageeti. From the ancient Charjapadas to the modern era, Bengali music has evolved through the contributions of numerous poets, lyricists, composers, and musicians. Over time, Bengali music has spread its charm across the Indian subcontinent, incorporating new musical styles and enriching the Kabyageeti tradition. Atulprasad Sen, one of the Panchakavi (five poets) of Bengali literature, pioneered the Ghazal genre in Bengali Kabyageeti. Although his Ghazals are appreciated, he is not widely recognized as a successful Ghazal composer. This paper aims to shed light on the unknown aspects of Atulprasad Sen's Ghazal compositions and explore possible answers to questions surrounding his work.

Keywords: Kabyageeti, Ghazal, Musaira, Lucknow, Geetigunj

অতুলপ্রসাদের পিতা রামপ্রসাদ সেন তৎকালীন মাদারীপুর জেলার দক্ষিণ বিক্রমপুরের মগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মনোভাবের। তবে জ্ঞান লাভের অগাধ স্পৃহা থেকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা এবং ফার্সি ভাষায় জ্ঞান পরিধি বৃদ্ধি করে জাপসা গ্রামে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি চলে আসেন কলকাতায়। সেখানেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পান। সে সময় কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিত্বদের সাথে গভীর যোগসুত্র তৈরি হয় এবং সেই সূত্র ধরেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। রামপ্রসাদ ছিলেন একাধারে সুবক্তা, সাহিত্য অনুরাগী, রাজনীতি সচেতন এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করে ঢাকার একটি পাগলা গারদে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন কিন্তু সে চাকরিতে তিনি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেননি। অগত্যা ঢাকার সেই হাসনা বাজারের মিরা তারের বাড়ি থেকে সপরিবারে চলে আসেন তার শশুর কালীনারায়ণ গুপ্তের বাড়ি ভাটপাড়ায়। সে বাড়িতেই ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন অতুলপ্রসাদ সেন। জন্মের পর শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অনুকূল পরিবেশে মাতামহের বাড়িতে শিশু অতুল প্রসাদ সেন বেড়ে উঠতে থাকেন। রামপ্রসাদ সেন তখন উপাসনা সভায় নিয়মিত ব্রাহ্ম সংগীতের চর্চা করতেন। পিতার সাথে সে উপাসনা সভায় সঙ্গতে অংশ নিতেন কিশোর অতুলপ্রসাদ সেন। কিন্তু পিতা পুত্রের এই মেলবন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটে অচিরেই। রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি মাতামহের বাড়িতেই থিতু হন। এভাবেই পিতৃহারা কিশোর অতুল প্রসাদের জীবনে তখন কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন আচরণ বেশ প্রভাব বিস্তার করে। কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন নিরহংকারী হিন্দু মুসলিম সম-দৃষ্টিতে দেখা এক অনন্য মানুষ। কালীনারায়ণ গুপ্ত নিজেও গান করতেন এবং শহরের রাস্তায় প্রায়ই নগর সংকীর্তনে বের হতেন। মাতামহের সাথে অতুল প্রাসাদ সেনও বের হতেন সেই নগর সংকীর্তনে। আর এভাবেই মাতামহের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে মহরম, হোলি, জন্মাষ্টমী এবং ঈদ উৎসবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অতুলপ্রসাদ সেনের মাঝে গড়ে ওঠে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি। এই

সম্প্রীতির ধারা অব্যাহত থাকে তার পরবর্তী জীবনেও। যখন তিনি বিলেতে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করতে যান তখন সেখানে পরিচয় ঘটে শ্রী অরবিন্দ, মনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু এবং চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গে সাথে। প্রবাস জীবনে সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে প্রায়ই ঘরোয়া বৈঠকে চলতো ধর্মালোচনা, সাহিত্য এবং সংগীত চর্চা। অতঃপর ১৮৯৫ সালে অতুল প্রসাদ বিলেত থেকে দেশে ফিরে তিনি কলকাতার হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তখন কলকাতা শহরে সাহিত্য এবং সংগীতের মজলিস হিসেবে 'খামখেয়ালী' নামে একটি আসর উচ্চ মহলে সুপরিচিত ছিল। সে আসরেই নিয়মিত যাতায়াত করতেন অতুল প্রসাদ সেন। 'খামখেয়ালী' ঐ আসরেই ১৮৯৬ সালে শ্রীমতি সরলা দেবীর কল্যাণে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত সাক্ষাত ঘটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। খামখেয়ালী সভার বাকি সদস্যরা ছিলেন: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, লোকেন পালিত, রাধিকা মোহন গোস্বামী প্রমুখ। সে সভার কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। কিন্তু পিতার মত তিনিও স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য খুব বেশি দিন কলকাতায় স্থির হতে পারেননি। অবশেষে ব্যক্তি জীবনের নানা ঘটনা পরিক্রমায় তিনি তার মুসলিম বন্ধু মমতাজ হোসেনের ডাকে ১৯০২ সালে লখনৌতে চলে যান। শুরু হয় অতুলপ্রসাদের আরেক বাঙালি প্রবাস জীবন। লক্ষ্নৌতে তিনি আইন পেশায় যুক্ত হন এবং বেশ সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি সাহিত্য, সংগীত এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে দ্রুততার সাথে খ্যাতি অর্জন করেন। আর এভাবেই কর্মমুখর হতে থাকে অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌ জীবন।

তৎকালীন সময়ে লক্ষ্ণৌ ছিল বহুজাতিক সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ নগরী। উত্তর ভারতীয় সংগীতের মূল ধারার প্রধান সাংস্কৃতিক নগর হিসেবে লক্ষ্ণৌ তখন সুখ্যাতি এবং ব্যাপ্তি লাভ করে। মূলত মুসলিম শাসনামলে আওধের নবাবগণের কল্যাণে এই অঞ্চল ধীরে ধীরে শিল্প সাহিত্যে সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। আওদের নবাবদের মধ্যে শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রেষ্ঠ নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ (১৮২২-১৮৮৭) তাঁর শাসনামলে (১৮৪৭-১৮৫৬) লক্ষ্ণৌ হয়ে উঠে সংগীত চর্চার প্রাণ কেন্দ্র। এ সম্পর্কে অতুল প্রসাদ সেন তাঁর 'মুসায়েরা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> "নবাব ওয়াজিদালি সাহেবের সময় মুসায়েরার খুব আদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সে সময়কার মুসায়েরার গল্প এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ওয়াজিদালি সাহ স্বয়ং খুব সুন্দর গজল রচনা করিতেন। বাদসাহ নিজেও নাকি কখনও কখনও মুসায়েরাতে সরীক হইতেন।"[১] (উত্তরা প্রথম সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩৩৩। কলকাতা।)

মুসায়েরা হল উর্দু কবিতা শের ও শায়েরি পাঠের আসর। ভারতীয় উপমহাদেশে আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫) উর্দু শায়েরি রচনায় লোকসমাজে বেশ পরিচিত ছিলেন। অতুল প্রসাদ সেনের সাথে হামিদ আলি খাঁ সাহেবের লক্ষ্ণৌ ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা অতুল প্রসাদ সেনের মুসায়েরা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। তিনি মুসায়েরা প্রবন্ধে লিখেছেন,

> "তখন আমার উর্দুবিদ্যা নিতান্ত প্রাথমিক, বিহার অঞ্চলের চাকরদের কাছে শেখা বাংলা-ভাঙা বিকৃত হিন্দী তখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম- খাঁ সাহেব, মুসায়েরা ব্যাপারটা কি? হয়ত বলিয়া থাকিব ' খাঁ সাহেব মুসায়েরা ব্যাপার ক্যা হায়? তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিলেন- 'লখনৌ আসিয়াছ, আর, কমবখৎ, এও জান না মুসায়েরা কাকে বলে? তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, মুসায়েরার অর্থ কবি-সম্মিলন, যেখানে আমন্ত্রিত কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।"[২]

এভাবেই শুরু হয় উর্দু কবিতার আসর 'মুসায়েরা'তে অতুলপ্রসাদ সেনের নিয়মিত যাতায়াত। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অতুল প্রসাদ সেনের উর্দু জ্ঞান এবং ভালবাসা। সে আসরেই নিয়মিত উর্দু গজলের মজলিশ বসতো। রাতভর উর্দু গজলে বিরহ প্রাণে নিমজ্জিত থাকতেন কবি অতুল প্রসাদ সেন। সম্ভবত কবিসত্তার সে ভাব থেকেই গজল রচনার সূত্রপাত ঘটে। রচিত হয় বাংলাভাষায় বাংলা গানের প্রথম গজল।

> *"গীতিগুঞ্জ: গজল।*
> *কত গান তো হল গাওয়া,*
> *আর মিছে কেন গাওয়াও?*

যদি দেখা নাহি দিবে
তবে কেন মিছে চাওয়াও ?”[৩]

এই গান সম্পর্কে ড. করুণাময় গোস্বামী তাঁর রচিত নজরুল গীতি বইতে লিখেছেন:

> “অতুল প্রসাদের ‘কত গান তো হল গাওয়া’ কে তাঁর শ্রেষ্ঠ গজল রচনা বলে উল্লেখ করেছেন সবাই। সে বিবেচনায় এটিই বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য গজল।”[৪]

তবে এ গান সম্পর্কে পাহাড়ী সান্যালের স্মৃতিকথায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা বর্ণিত আছে। পাহাড়ী সান্যাল ছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা, গায়ক, দিলীপকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠজন এবং অতুলপ্রসাদের সংগীতের শিষ্য। তাঁরই স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়:

> “আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। সেই সময় একবার মন্টুদা (দিলীপকুমার রায়) লখনৌ এল এবং তার নিজের রচিত একটি গান যেটির প্রথম ছত্র হল ‘যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও’ এই গানখানি আমাকে যত্ন করে শেখালো।”[৫]

এই গান শেখার পর তিনি দিলীপরায়ের উপস্থিতিতে অতুল প্রসাদ সেনকে গানটি গেয়ে শোনান। সে গান শুনে অতুল প্রসাদ সেন বেশ উচ্ছসিত হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর পাহাড়ী সান্যাল এক সন্ধ্যাবেলায় অতুল প্রসাদের বাড়িতে গেলেন। পাহাড়ী সান্যালকে উদ্দেশ্য করে অতুল প্রসাদ সেন বললেন: “তোমাকে আজ আমি খুব সুন্দর একটা গান শেখাব।”[৬] পাহাড়ী সান্যালের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়:

> “অতুলদা গানের প্রথম ছত্রটি যখন গাইলেন তখন আমি হঠাৎ হারমোনিয়াম থামিয়ে বলে উঠলাম, ‘এ কী অতুলদা! এ যে মন্টুদার ‘যদি দিন না দেবে’-র সুর!’ অতুলদা খুব উঁচু গলায় হেসে উঠে বললেন, ‘আরে তা তো নিশ্চয়ই। তার সুরটা এমন করে মনে সাড়া তুলেছিল বলেই তো এই গানটা লিখতে পেরেছি।”[৭]

পরবর্তীতে এই গানটি অতুল প্রসাদ সেনের গীতিগুঞ্জ বইতে গজল গান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। অতুল প্রসাদ সেন এই গানটি সাহানা দেবীকে দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করিয়ে প্রকাশ করান। ফলে এই গান দ্রুতই শ্রোতা মন জয় করে নেয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ঘটে দিলীপকুমার রায়ের ‘যদি দিন না দেবে’ গানটির। একদিকে অতুল প্রসাদের ‘কত গান তো হল গাওয়া’ গানের খ্যাতি অন্যদিকে দিলীপকুমার রায়ের ‘যদি দিন না দেবে’ গানের শ্রোতা বিমুখতা এর অন্যতম কারণ। দিলীপকুমার রায় অতুল প্রসাদ সেনের মত সহজবোধ্য কবি হয়ে উঠতে পারেন নি। সম্ভবত তাঁর রচনায় তৎসম এবং কঠিন শব্দের প্রয়োগের আধিক্য থাকায় তা বাঙালি মনে গীতিকবি হিসেবে স্থান করে নিতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে এই গানটি শ্রোতা মনে বিস্মৃত হতে হতে এক সময় কালের অতলে গানটি বাণী সহ হারিয়ে যায়। যদিও তৎকালীন সময়ে উক্ত গানটির স্বরলিপি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, পৌষ ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে এই গানের দুটো লাইন ছাড়া পুরো গানের সুর এবং বাণীর কোন অস্তিত্বই আর সংরক্ষিত নেই!

অতুল প্রসাদের আরেকটি বিখ্যাত গজল গান হল:

“বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে।
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল-রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলনতিয়াসে,
ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে।
পল্লীর বঁধু বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলনে সম্ভাষে।
আমারো যে সাধ বরষার রাত
কাটাই নাথের সাথে।-
নিদ নাহি আঁখিপাতে।”[৮]

গজল আরবদের কাছ থেকে পারস্য হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে মধ্যযুগে। ভারতীয় উপমহাদেশ হল বহুভাষা এবং সংস্কৃতির তীর্থভূমি। ফলে বহু ভাষার সংমিশ্রণে এ অঞ্চলে গজল রচনার চর্চা হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। উপমহাদেশে সর্ব প্রথম এই বহুভাষার সংমিশ্রণে গজল রচনা শৈলীর প্রচলন শুরু করেন তুতই- ই- হিন্দ খ্যাত সুফি সংগীতবিশারদ আমির খসরু। তাঁর রচিত একটি গজলের অংশ বিশেষ হল:

"শবা হিজরাঁ দরাজে চুঁ জুলফ ওরোজ ও ওসলশ চুঁ উমর কোতাহ
সখী পিয়াকো জো ময় না দেখুঁ তো কায়সে কাটো আন্ধেরি রাতিয়াঁ।।
চু শাময়ে সোজাঁ চু জররা হয়বাঁ জে মেহরে আঁ বগশতম্ আখির
না নীন্দ নয়না না অঙ্গ চায়না না আপ আওয়েঁ না ভেজে পাতিয়াঁ।।"[৯]

আমির খসরু এই গজলের প্রথম লাইন ফার্সি, দ্বিতীয় লাইন উর্দু এবং তৃতীয় লাইন ও চতুর্থ লাইন হিন্দি উর্দু মিলিয়ে গীত রচনা করেছেন। আমির খসরুর মত অতুল প্রসাদ সেনও এই বাংলা গজল গানের ক্ষেত্রে প্রথম লাইন উর্দু, হিন্দি এবং পরবর্তী লাইনগুলো বাংলায় রচনা করেছেন। যা গজলের মূল ধারার পথ নির্দেশ করে। তবে এই গান লেখার ইতিহাস সম্পর্কে স্মৃতিকথায় রণজিত সেন কে উদ্দেশ্য করে অতুল প্রসাদ সেন বলেছেন:

> "তবে আমার 'বধূ নিদ নাহি আঁখিপাতে' গানটি লিখেছিলাম মফস্বলে এক ডাক বাংলোতে। কোন একটি কেসে গিয়েছিলাম। ডাক বাংলোর বারান্দায় রাতে ডিনারের পর ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে একা বিশ্রাম করছি, বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। চোখে ঘুম আসছে না। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও ব্যাঙের ঐক্যতান শুনছি। হঠাৎ মনটা উদাস হয়ে গেল। এই গানটি তখন লিখেছিলাম।"[১০]

তবে এই গানের সাথে আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের ভাবগত মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাফি রাগের উপর রচিত সে গানটি হল:

"আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড়হাতে।"[১১]

এই গানের সাথে অতুলের গানের সুরের কোন মেলবন্ধন না থাকলেও বাণী বিশ্লেষণে দুটো গানের প্রাসঙ্গিক তুলনা চলেই আসে। যদিও গানটি বেহাগ রাগে এক অদ্ভুত করুন রসের সঞ্চার করে। তথাপি এই গান একদিকে খাঁটি হিন্দুস্তানি বেহাগ রাগে গজলের ভঙ্গিমা অন্যদিকে গানের বাণীতে মিশে আছে বৈষ্ণব কাব্যের চিরন্তন বিরহ। সব মিলিয়ে এই গজল গানে সার্থক এক মেলবন্ধন প্রকাশ পেয়েছে। অতুল প্রসাদের আরেকটি গজল গান হল:

"জল বলে, চল্ মোর সাথে চল্,
কখনো তোর আঁখিজল হবে না বিফল।
চেয়ে দেখ্ মোর নীল জলে, শত চাঁদ করে টলমল্।
বধূরে আন্ ত্বরা করি,
কূলে এসে মধু হেসে ভরবে গাগরি;
ভরবে প্রেমে হৃৎকলসী, করবে ছলছল্।"[১২]

নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ বইতে দিলীপকুমার রায় তাঁর 'আলোর বাণীবহ নজরুল' প্রবন্ধে এই গান সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। দিলীপকুমার রায় সে প্রবন্ধে লিখেছেন: 'একবার ওকে ধরলাম: 'কাজী ভাই, আজ আমাকে অমুক সভায় গজল গাইতে হবে।' তুমি লিখে দাও একটি নয়া গজল।'
ও একগাল হেসে বলল: 'এ আর বেশি কথা কী দিলীপদা?' ব'লেই লিখে গেল একটানা আমার খাতায় (এ-খাতাটি আমার কাছে এখনো আছে ওর করলিপিতে মহার্ঘ হয়ে)

'এত জল ও কাজল চোখে
পাষাণী আনলে বলো কে?'

এ-গানটি ও-গাইত হিন্দুস্থানী লোকসঙ্গীতের ঢঙে-কাজরি চালে পাহাড়ী রাগের আমেজ এনে। অতুলপ্রসাদ গুণে মুগ্ধ হয়ে এর জুড়ি গান করেন তাঁর বিখ্যাত:

"জল বলে চল্ মোর সাথে চল
তোর আঁখিজল্প হবে না বিফল।"[১৩]

তবে সচেতন শ্রোতৃবর্গ একটু মনযোগ দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের রচিত সার্থক এবং বিখ্যাত গজল:

"আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন
দিল ওহি মেরা ফসগয়ী"[১৪]

গানটিকে অনুধাবন করলে দেখতে পাবেন, গানটির সুরের চলনে অতুলপ্রসাদের পূর্বোক্ত গানটির তুমুল সাদৃশ্য। বিশেষতঃ এই গানের আস্থায়ী অংশে এর সাদৃশ্যকরণ বেশ প্রকট।

এ গানের রচনা সম্পর্কে কল্যাণকুমার বসুর 'আমারে এ আঁধারে' বইয়ে শ্রীমতি সাহানা দেবী কবি অতুল প্রসাদের গান ও মানুষ প্রসঙ্গ স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়: 'শ্রীরণজিত সেনের সঙ্গে অতুল প্রসাদ সেনের পরিচয় হয় লন্ডন শহরে। সে সময় অতুল প্রসাদের সাথে রণজিত সেনের মাঝে 'অতুলপ্রসাদী গান' নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। সেখানেই রণজিত সেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন অতুল প্রসাদ সেনকে, আপনার জল বলে চল মোর সাথে চল গানটি পড়ে মনে হয়েছিল, আপনি যেন কোন জ্যোৎস্নার রাতে নৌকা করে নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ওই গানটি মনে এসেছিল। অতুল প্রসাদ সেন তখন হেসে বলেছিলেন,

> "মোটেই না। কোর্টে যাবার তাড়া, বাথরুমে স্নান করছি, ঘটি দিয়ে বার বার মাথায় জল ঢালছি, তখন ওই গানটি মনে এল। কাজেই বুঝতে পারছ, গান লিখতে সব সময়ে কোন বিশেষ পরিবেশের দরকার হয় না।"[১৫]

অতুল প্রসাদ সেনের লেখা তাঁর গীতিগুঞ্জ বইতে আরও কয়েকটি গান তিনি গজল শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। গানগুলো হল:

"কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে?
এ পোড়া পরান-তবে এত ভালোবাসিলে?
কভু হরিত বসনে সাজি',
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মধুমাসে মধু হাসে মম পানে হাসিলে।"[১৬]

এই গানটি গজল শিরোনামে হলেও এটি গীতিগুচ্ছের প্রকৃতি পর্যায়ের গানে অন্তর্ভুক্ত।

অতুল প্রসাদ সেনের মানব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরও একটি গানের শিরোনামে তিনি গজল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গানটি হল:

"ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে?
ব'লে দিল কে পথ এ কালো রাতে?
এ যে কাঁটার বন, হেথা কী প্রলোভন,
ঘর ছেড়ে এলে কী আশাতে"[১৭]

এ গীতিগুঞ্জ বই থেকে গান রচনার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। কোন এক বর্ষার সন্ধায় কলকাতার বালীগঞ্জের-ডোভার লেনে বন্ধু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে গানের মজলিসে অতুল প্রসাদ সেন এই গানটি গেয়েছিলেন। অতুল প্রসাদ সেনের গজল শিরোনামে আরও একটি গান হল:

"রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা?
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা;
তোলা ফুলেরখালি বোঁটায় ছোঁয়ার গন্ধ মাখা।"[১৮]

গীতিগুচ্ছ বইতে এই গানটিও মানব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত এ গজল গানগুলো ছাড়াও প্রখ্যাত গায়িকা নূপুর ছন্দা ঘোষ তাঁর 'অনন্য অতুল প্রসাদ' বইতে অতুল প্রসাদের আরও একটি গানকে তিনি 'সুমধুর গজল' বলে উল্লেখ করেছেন। গানটি হল কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে? এ পোড়া পরান-তবে এত ভালোবাসিলে? তবে গীতিগুচ্ছে এ গানটি বাউল পর্যায়ের। শ্রীসুরেশ

চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অতুল প্রসাদ সেন' বইতে 'অতুল প্রসাদ সেন ও তাঁর সংগীত' প্রবন্ধে দিলীপকুমার রায় অতুল প্রসাদ সেনের একটি গানকে গজল সুরের বাংলা গান বলে উল্লেখ করেছেন। গানটি হল:

"ঝরিছে ঝর-ঝর গরজে গর গর
স্বনিছে সর সর শ্রাবণ মাঃ।
তটিনী তর তর, সরসী ভর ভর,
ধরণী থর থর, সিকত গা।
বিরহী ধর ধর, মানিনী সর সর,
চাহিছে খর খর সুলোচনা।"[১৯]

ঝরিছে ঝর ঝর গানটি সাওয়ানী সুরে হলেও এ গানে গজলের মহিমা স্পষ্ট। যদিও এ গান শুনলে বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ কানে ভেসে আসে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'বাংলার গীতিকার' বইয়ে অতুল প্রসাদের একটি গানকে তিনি গজল গান বলে উল্লেখ করেছেন। গানটি হল:

"তব অন্তর এত মন্থর আগে তো তা জানি নি।
ভেবেছিনু ফুটিবে ফুল শুনি' পিকরাগিণী।
মধুরাতে ফুলহাতে গান কি মোর শোন নি?
কেন রাকা মেঘে ঢাকা ওগো অভিমানিনী ?"[২০]

রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'গীতশিল্পী অতুল প্রসাদ' প্রবন্ধে আরও দুটি গানকে তিনি গজল গান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গানগুলো হল:

"এ বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল?
কার লাগি ধায় এত দলে দলে অলিকুল?
সুরভি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে,
শুধু কি ফুটাও কাঁটা, ফুটাও না কি মুকুল ?"[২১]

এ গান সম্পর্কে অতুল প্রসাদ সেনের গীতগুঞ্জ বইতে গীত রচনার ঘটনা উল্লেখ আছে। এই গানটি তিনি লিখেছিলেন দার্জিলিং-এর পথে টয় ট্রেন থেকে প্রকৃতির নিরভারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লেখা এবং পরে বন্ধুদের কাছে গান করা।

"ওগো ক্রন্দসী পথচারিণী,
তুমি কোথা যাও, তুমি কারে চাও?
কী ব্যথা তব অন্তরে,
ও বিষাদিনী, মোরে বলে যাও।"[২২]

অতুলপ্রসাদ সেনের আরো দুটি গজল গানের উল্লেখ পাওয়া যায় সোহেল ইমাম খান রচিত 'গজল কথা' বইতে। গান দুটি হল:

"তুমি মধুর অঙ্গে নাচো গো রঙ্গে,
নূপুরভঙ্গে হৃদয়ে
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি॥
প্রেম-অধীরা কণ্ঠ-মদিরা
পরান-পাত্রে এ মধু রাত্রে ঢালো গো !"[২৩]

এবং

"বলো গো সজনী, কেমনে ভুলিব তোমায়?
যতন যাতনা বাড়ায়।
যদিও যাতনা সহি
নয়ন ফিরায়ে লহি,
প্রাণ তবু পড়ে থাকে পায়।"[২৪]

অতুলপ্রসাদ সেন এ গান দুটিতে বাংলা গীতিকাফের কাঠামো ব্যবহার করেছেন। যার ফলে সুরগুলো হালকা মেজাজের এবং সেমি ক্লাসিক্যালধর্মী।

উইকিপিডিয়া এবং বর্তমানে প্রকাশিত বিভিন্ন বইতে অতুল প্রসাদের গজল গানের সংখ্যা ৪/৫ টি উল্লেখ করা হলেও অনুসন্ধানে মোট ১৩ টি গজল গানের সন্ধান মিলেছে। গানের বাণী বিশ্লেষণে প্রতিটা গানই কোন না কোন ভাবে গজলের ভাবগত দিক দিয়ে প্রবল সাদৃশ্যপূর্ণ। গজল মূলত কাব্য। কাব্যের কাঠামোই এর প্রাণ। সে বিচারে অতুল প্রসাদের উল্লেখিত কিছু গান গজলের সুরে এবং কিছু গান কাব্য দক্ষতার বিচারে গজল বলে বিবেচনা করা যায়। তবে অতুলপ্রসাদের কোন গানই গজল এর শুদ্ধ ভাব ধারা বজায় রাখতে পারেনি। গজলের গঠন মূলত দুই প্রকার:

১। মুরাদ্দফ, ২। গ্যার মুরাদ্দফ।

মুরাদ্দফে রাদিফ থাকে। রাদিফ হল: একই শব্দ বা বাক্য যা প্রতিটি লাইনের শেষে বারবার আসে। কিন্তু গ্যার মুরাদ্দফে রাদিফ থাকে না। তবে গ্যার মুরাদ্দফে কাফিয়াঁ থাকে। কাফিয়াঁ হল: কাব্যের ছন্দপূর্ণ অন্তমিল। সে বিচারে অতুল প্রসাদ সেনের উল্লেখিত গজল গানগুলোর প্রায় সব ক'টিই কাফিয়াঁর অন্তর্গত গ্যার মুরাদ্দফ। সেই সাথে অতুল প্রসাদের গজলের আরও একটি বিশেষত্ব হল তিনি মূল ধারার গজলের সাথে বাংলা ভাষার কাব্য ধারার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন যা তাঁর আগে কেউ করে দেখাতে পারেননি। অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর জীবদ্দশায় ২০০টির মত গান লিখেছেন। যেগুলো দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব ও বিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গজল হিসেবে তাঁর যে গানগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোতে পরিপূর্ণ গজলের কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, তাঁর রচিত গানগুলো বাংলা কাব্যগীতির ধারার সাথে উর্দু গজলের ভাব এবং আংশিক কাঠামোর এক সার্থক মেলবন্ধন তৈরি করেছে। কিন্তু অতুল প্রসাদের গজল গানকে সার্থক গজল বলা যায় না। এমনকি তিনি গজল রচনা ক্ষেত্রে কোন স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতে পারেননি। এর একটি অন্যতম কারণ হতে পারে, তিনি আজীবন লক্ষ্ণৌতে বাঙালি প্রবাসী হিসেবে জীবন যাপন করায় বাংলা অঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। যার ফলে তিনি ভক্ত শ্রোতাকুলের মাঝে নিজের প্রসার করতে পারেননি। তাছাড়া উনি বাংলা ভাষায় খুব বেশি গজল রচনা ও করেননি ফলে বাংলা ভাষায় সার্থক গজল রচয়িতা হিসেবে উনার নাম বিবেচনা করা হয় না। এদিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন গজল রচনায় একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ১০০ টিরও বেশি গজল রচনা করেছেন। অতুলপ্রসাদের গজলের গুণগতমান থেকে কাজী নজরুল ইসলামের গজলের গুণগতমান অনেক বেশি উন্নত এবং সার্থক। তবে অতুলপ্রসাদ সেনের এই প্রচেষ্টা বাংলা গানের ধারায় এক নতুন সংযোজন। তাই বাংলা ভাষায় সার্থক গজল গান সংযোজনকারী হিসেবে তিনিই প্রথম এবং সবসময়ই প্রথম।

তথ্যসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, মানসী। অতুলপ্রসাদ। প্রথম প্রকাশ জন্ম শতবার্ষিকী, ডিসেম্বর ১৯৩১, প্রকাশক: অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা। পরিশিষ্ট: মুসায়েরা (উত্তরা প্রথম সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩৩৩, কলকাতা), পৃ. ২৯-৩০।

২। ঘোষ, সুনীলময় (সম্পাদক)। অতুলপ্রসাদ সমগ্র। প্রকাশক: সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৩ সাল, কলকাতা, পৃ. ১৪৯।

৩। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ২২৫।

৪। গোস্বামী, করুণাময়। নজরুল গীতি প্রসঙ্গে। প্রকাশক: বাংলা একাডেমী ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। ঢাকা, পৃ. ১৬৭।

৫। সান্ন্যাল, পাহাড়ী। মানুষ অতুলপ্রসাদ। প্রকাশনী: সপ্তর্ষি প্রকাশন। প্রকাশ কাল: জানুয়ারি ২০১২ সাল। কলকাতা, পৃ. ৩৬।

৬। তদেব, পৃ. ৩৬।

৭। তদেব, পৃ. ৫০।

৮। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ২১৬-১৭।

৯। খান, সোহেল ইমাম। গজল কথা। প্রকাশক: সুচয়নী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সাল, ঢাকা, পৃ. ৭১।

১০। ঘোষ, নূপুর ছন্দা। অনন্য অতুলপ্রসাদ। প্রকাশক: সৃষ্টি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০২ সাল, কলকাতা, পৃ. ৩৪।

১১। ঠাকুর, রবীন্দ্র নাথ। অখন্ড গীতবিতান। প্রকাশক: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১৭২।

১২। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ৫২।

১৩। কথা সাহিত্য (সম্পাদনা) সম্পাদক মন্ডলী। নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ। প্রকাশক: অমর সাহিত্য প্রকাশন, প্রকাশ কাল: বাংলা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৫৯।

১৪। নবী, রশিদুন্ (সম্পাদক)। নজরুল সংগীত সমগ্র। প্রকাশক: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সাল, ঢাকা, পৃ. ৬৫১।

১৫। বসু, কল্যাণকুমার। আমারে এ আঁধারে। প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, জুলাই ১৯৬৯, প্রকাশক: অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, কলকাতা, পৃ. ৩০৬।

১৬। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ৬৮।

১৭। তদেব, পৃ. ১১৮।

১৮। তদেব, পৃ. ১৬৬।

১৯। ঘোষ, সুনীলময় (সম্পাদক)। অতুলপ্রসাদ সমগ্র। প্রকাশক: সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৩ সাল, কলকাতা, পৃ. ৪৭।

২০। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ১৩২।

২১। তদেব, পৃ. ২১০।

২২। ঘোষ, সুনীলময় (সম্পাদক)। অতুলপ্রসাদ সমগ্র। প্রকাশক: সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৩ সাল, কলকাতা, পৃ. ১৪০।

২৩। সেন, শ্রী অতুলপ্রসাদ। কাকলি। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, প্রকাশ কাল: পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৭।

২৪। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ১৪৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। রায়, দিলীপকুমার। সাঙ্গীতিকী। প্রকাশক: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ কাল ১৯৩৮, কলকাতা।

২। দাশগুপ্ত, বিনয়েন্দ্রনাথ। অতুলপ্রসাদ সেন (অতুলপ্রসাদ সেন প্রসঙ্গে)। প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৬৩, প্রকাশনা: বাগর্থ, কলকাতা।

৩। চক্রবর্তী, শ্রীসুরেশ (সম্পাদিত)। অতুলপ্রসাদ সেন (অতুলপ্রসাদ সেন জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উৎসব শ্রদ্ধার্ঘ্য)। প্রকাশক: বাক্-সাহিত্য প্রা: লিমিটেড, কলকাতা।

৪। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ দাস, সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। প্রকাশ কাল: ১৯৩১ (তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৬৪) ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬, কলকাতা।

৫। সেন, শ্রীঅতুলপ্রসাদ। কাকলি। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্ ২০৩|১|১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলকাতা। প্রকাশ কাল: পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৬। মুখোপাধ্যায়, মানসী। অতুলপ্রসাদ। প্রথম প্রকাশ জন্ম শতবার্ষিকী ডিসেম্বর ১৯৩১, প্রকাশক: বিভাসচন্দ্র বাগচী, অরুণা প্রকাশনী ৭ যুগল কিশোর দাস লেন কলকাতা ৬, কলকাতা।

৭। চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদক)। দিলীপকুমার রায়। প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৯৭, প্রকাশক: ধ্রুবপদ, কলকাতা।

৮। রায়, শ্রী দিলীপকুমার। স্মৃতিচারণ। প্রকাশক: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১১০০ সংখ্যা মাঘ, ১৮৮৩ শকাব্দ, কলকাতা।

৯। রায়, শ্রী দিলীপকুমার। সুরাঞ্জলি। প্রকাশক: সুরকাব্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ৯ ই চৈত্র ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১০। কথা সাহিত্য (সম্পাদনা) সম্পাদক মন্ডলী। নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ। প্রকাশক: অমর সাহিত্য প্রকাশন, প্রকাশ কাল: বাংলা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১১। রায়, শ্রী দিলীপকুমার। স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় খন্ড। প্রথম প্রকাশ ৭ ই আষাঢ়, ১৮৮৪ শকাব্দ, প্রকাশক: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, কলকাতা।

১২। বসু, কল্যাণকুমার। আমারে এ আঁধারে। প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, জুলাই ১৯৬৯, প্রকাশক: অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, কলকাতা।

১৩। মিত্র, রাজ্যেশ্বর। সঙ্গীত সমীক্ষা। প্রকাশক: মিত্রালয়, প্রকাশ কাল: ১৫ই চৈত্র ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১৪। ঘোষ, সুনীলময় (সম্পাদক)। অতুলপ্রসাদ সমগ্র। প্রকাশক: সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৩ সাল, কলকাতা।

১৫। ঘোষ, নূপুর ছন্দা। অনন্য অতুলপ্রসাদ। প্রকাশক: সৃষ্টি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০২ সাল, কলকাতা।

১৬। নবী, রশিদুন্ (সম্পাদক)। নজরুল সংগীত সমগ্র। প্রকাশক: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সাল, ঢাকা।

১৭। খান, সোহেল ইমাম। গজল কথা। প্রকাশক: সুচয়নী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সাল, ঢাকা।

১৮। গোস্বামী, করুণাময়। নজরুল গীতি প্রসঙ্গে। প্রকাশক: বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, ঢাকা।

১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্র নাথ। অখন্ড গীতবিতান। প্রকাশক: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

২০। সেন, শ্রী অতুলপ্রসাদ। কাকলি। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, প্রকাশ কাল: পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

২১। সান্ন্যাল, পাহাড়ী। মানুষ অতুলপ্রসাদ। প্রকাশনী: সপ্তর্ষি প্রকাশন, প্রকাশ কাল: জানুয়ারি ২০১২ সাল, কলকাতা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 128-137
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.188

স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুমিত পাল, *গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
রঞ্জনা ব্যানার্জি, *অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
সমীররঞ্জন অধিকারী, *অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সিধো-কানহু-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025

©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The literary works of Jatindra Mohan Bagchi hold immense value in reconstructing the regional history of Nadia, serving as cultural and historical documents for both present and future generations. His writings provide vivid portrayals of the socio-economic and cultural life of his time, particularly the experiences of common people, the struggles of rural women, and the socio-political realities shaped by zamindars and colonial authorities. Bagchi's depiction of the peasants' oppression by British police during the forced indigo cultivation stands as a striking testimony to a painful phase of colonial history.

Equally noteworthy are his detailed descriptions of Nadia's geographical landscape and archaeological heritage, with references to ancient villages, monuments, and age-old traditions. His essays record rural festivals and fairs, such as Durga Puja, along with accurate accounts of village economy and livelihoods. He further explored communal relationships between Hindus and Muslims, acknowledging tensions while emphasizing harmony and brotherhood.

Bagchi also preserved aspects of folk culture, including village women's rituals like the Punya Pukur and the lost Jam Pukur festival. His references to folk songs, particularly the Ekdil Pir's song, enrich the cultural fabric of Bengal and highlight the oral traditions of the region. Moreover, his documentation of religious conversions in areas like Shikarpur adds another important layer to Nadia's history. Through his portrayal of ancient places, rivers, festivals, and rural life, Bagchi crafted a comprehensive narrative that affirms his enduring contribution to Bengali literature and regional historiography.

Keywords: Regional history, folk culture, colonial oppression, Nadia district, Bengali literature

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মস্থান নদিয়া জেলার করিমপুর সংলগ্ন যমশেরপুর গ্রাম কোনো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কিংবা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনপদ নয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন কৃষিনির্ভর সাধারণ চাষাভুষো। তৎকালীন সময়ে এখানে বড় কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য বা কলকারখানা গড়ে ওঠেনি, আজও নেই। ফলে স্থানীয় মানুষের একমাত্র প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ এবং অল্পসংখ্যক মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য মৎস্যশিকার করতেন, যা এখনও সামান্য

আকারে প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে মূলত জলঙ্গী- কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কই ভরসা ছিল, যা এখনও বিদ্যমান। তবে রেল যোগাযোগের সুবিধা তখনও অনুপস্থিত ছিল এবং আজও এই অঞ্চলে তা অনুপস্থিত (মজুমদার, 1985; সরকার, 2008)।

এমন প্রান্তিক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেও যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্থানীয় এলাকার ইতিহাস নির্মাণে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। তিনি জমিদার পরিবারে জন্ম নিয়েও অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। জমিদারি আয়ে টিকে থাকা সম্ভব না হওয়ায় তিনি কলকাতায় বসবাস শুরু করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর জন্মভূমিকে কখনও ভোলেননি এবং বারবার টান অনুভব করে গ্রামে ফিরে এসেছেন।

যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্য কেবল সাহিত্যিক নান্দনিকতায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাতে গ্রামীণ অর্থনীতি ও করিমপুর এলাকার কৃষিজীবনের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে এবং কৃষক সমাজ দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয়। একই সঙ্গে তিনি নদীবহুল অঞ্চলের কৃষি সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। পদ্মা ও জলঙ্গী নদীর মিলনস্থলের ভৌগোলিক পরিবেশ, কৃষি উৎপাদনের উপযোগিতা এবং বিশেষত নীলচাষের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব তাঁর বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (চক্রবর্তী, 1992)।

তাঁর রচনায় গ্রামীণ সমাজ, আঞ্চলিক ইতিহাস, কৃষিজীবন, শিল্প-সংস্কৃতি ও স্থানীয় জীবনের নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। করিমপুর সংলগ্ন যমশেরপুর ও আশেপাশের জনপদের ইতিহাস-সংস্কৃতি জানতে যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্যকীর্তি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর '*পল্লীকথা*' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন—

> "দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়। বিন্দু বিন্দু ফুলের মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, তথাপি এ ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং পল্লীকাহিনী হইলেও দু'চারটি নতুন কথা শুনাইতে পারে।" (বাগচী, 1910/1995, পৃ. 47)

এই বক্তব্য থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ইতিহাসচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্থানীয় ইতিহাস। শিক্ষাবিজ্ঞানগত দৃষ্টিতে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাসচিন্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো—কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাসভাবনার সেকাল ও বর্তমান কালের প্রভাব পর্যালোচনা করা। এই গবেষণা স্থানীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও সাহিত্যিক প্রভাব বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা প্রশ্ন:

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাসভাবনার সেকাল ও বর্তমান কালের প্রভাবের ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি হলো—

> "কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাসভাবনার সেকাল ও বর্তমান কালের প্রভাব কী?"

গবেষণা পদ্ধতি:

বর্তমান গবেষণাটি ঐতিহাসিক গবেষণা। এখানে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণায় বিশেষভাবে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) প্রয়োগ করা হয়েছে, যা গবেষণার বিষয়বস্তুর গভীর ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণকে সম্ভব করে তোলে।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি:

গবেষণা পরিচালনার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সংগৃহীত উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে তথ্য আহরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপাত্তকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে— প্রাথমিক উপাত্ত **ও** গৌণ উপাত্ত।

(অ) প্রাথমিক উপাত্ত (Primary Data):

প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্বরচিত গ্রন্থসমূহকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— *লেখা, রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী* ইত্যাদি।

(আ) গৌণ উপাত্ত (Secondary Data):

গবেষণায় ব্যবহৃত গৌণ উপাত্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—

- যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জীবন সম্পর্কিত তথ্য,
- তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন লেখকের আলোচনা,
- যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থ,
- বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক লেখা,
- মুদ্রিত ও অমুদ্রিত নথিপত্র।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ:

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকৌশল, যার মাধ্যমে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপাত্ত এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকে সংগৃহীত গৌণ উপাত্তকে নিরপেক্ষ ও প্রণালীবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করা হয় (Krippendorff, 2019)। এই পদ্ধতিতে সামাজিক নিদর্শন, শিল্পকর্ম, বই, চিঠিপত্র, জার্নাল, চিত্রকর্ম, সংবাদপত্র, মৌখিক উপস্থাপনা এবং লিখিত ডকুমেন্ট ইত্যাদি গবেষণার উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় (Neuendorf, 2017)।

বিষয়বস্তুবিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকীর্তিতে আঞ্চলিক ইতিহাস, গ্রামীণ জীবন-জীবিকা, স্থানীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক বর্ণনা উঠে এসেছে, যা ইতিহাসচর্চার প্রামাণ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তদুপরি, ক্ষেত্রসমীক্ষা ও পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত পূর্বে বিশ্লেষণপদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তথ্য ও সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

গবেষণার সমাপ্তি মূলত গবেষণা-ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তথ্য উন্মোচিত হয়, তার ভিত্তিতেই গবেষণার ফলাফল নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ওপর গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভরশীল।

স্থানীয় ইতিহাস অন্বেষণে যতীন্দ্রমোহন বাগচী:

যেকোনো পল্লীগ্রামেই অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান মেলে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাসপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্ম থেকে আমরা তাঁর জন্মভূমি নদিয়ার করিমপুর এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল—যেমন যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোঁড়াদহ, সুন্দলপুর, আরবপুর ও বাজিতপুর-চেঁচানিয়া প্রভৃতির স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি।

যমশেরপুরে বাগচী জমিদার পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য, ঐ এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা, দুর্গাপূজা-সহ স্থানীয় উৎসব ও মেলার বিবরণ, গ্রামীণ জীবনযাত্রা, কৃষিকাজ, প্রাচীন স্থাননাম, স্থানীয় ভাষা এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ইত্যাদির বিশ্লেষণ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে (Majumdar, 2008)।

যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্যকর্মে স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশের পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, ধোঁড়াদহ গ্রামের চৌধুরী জমিদার পরিবারের মন্দির, সুন্দলপুরের মন্দির, শান্তিরামপুর গ্রামের গির্জা ও দোগাছির মসজিদের বর্ণনা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আজও কঙ্কালসার অবস্থায় টিকে আছে। ধোঁড়াদহ চৌধুরী জমিদারদের পাতালঘর এবং ওয়াটসন কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনো এই অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় (Sarkar, 1989)।

এই সমস্ত নিদর্শন ও তথ্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে রয়ে গেছে, যা স্থানীয় ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাস ভাবনায়জমিদার পরিবারগুলির উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর রচনায় আমরা প্রথমেই দেখতে পাই স্থানীয় জমিদার পরিবারের উল্লেখ— যেমন বাগচী জমিদার পরিবার, চৌধুরী জমিদার

পরিবার এবং সরকার জমিদার পরিবার। এদের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে, অধিকাংশ গ্রামীণ সমাজে জমিদার পরিবারগুলি শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত ছিল (Bagchi, 1910/2005)।

জমিদার পরিবারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংকলন স্থানীয় ইতিহাস নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর গবেষণায়ও উল্লেখ করেছেন যে, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে জমিদার পরিবারগুলির অবদান গ্রামীণ সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বোঝার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাই বাগচীর প্রবন্ধে জমিদার পরিবারগুলির নানান উল্লেখ স্থানীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বাগচী পরিবারের ইতিহাস:

যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর প্রবন্ধে যমশেরপুর গ্রামের জমিদার বাগচী পরিবারের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, বাগচী পরিবারের ইতিহাস বৈবাহিক সূত্রে যমশেরপুর অঞ্চলে স্থিতি লাভ করে। পূর্বপুরুষ রামভদ্র বাগচী ১০৫১ বঙ্গাব্দে ঢাকার ধামসহ গ্রাম থেকে সুন্দলপুরে আসেন এবং ১০৫৩ সাল নাগাদ পাকাপাকিভাবে যমশেরপুরে বসবাস শুরু করেন। এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাগচী পরিবারই যমশেরপুরে জমিদারি প্রথার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁদের ইতিহাস স্থানীয় আঞ্চলিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (বাগচী, ১৯৩৫/2015)।

প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন যে, বাগচী পরিবারের বিস্তার ছিল বহুদূরব্যাপী এবং আত্মীয়-পরিজনের সংখ্যা তিন শতাধিক। পরিবারের বহু সদস্য নায়েবি ও মুহুরিগিরির মতো প্রশাসনিক ও আর্থিক পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও কৌশলের কারণে তাঁরা সমকালীন রাজা-রাজাদের আস্থা অর্জন করেন এবং ধীরে ধীরে উচ্চপদস্থ ও খ্যাতনামা স্থানে অধিষ্ঠিত হন। ফলত তাঁরা ব্যাপক ভূসম্পত্তির মালিক হন এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তার করেন।

এই পরিবারের মধ্যে বহু কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামগঙ্গা বাগচী ও সর্বানন্দ বাগচী। রামগঙ্গা বাগচী তাঁর মুহুরিগিরি ও প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে মুর্শিদাবাদের নষীপুর রাজার দেওয়ান হন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং ব্যাপক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। অপরদিকে সর্বানন্দ বাগচী নায়েবি পদে আসীন হয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন (বাগচী, ১৯৩৫/2015)।

প্রাবন্ধিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই পরিবারের ঐতিহ্য আট শতাব্দীর পুরোনো এবং তাঁদের সঙ্গে সমকালীন রাজন্যবর্গের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এলাকার অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গেও তাঁদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। জমিদারি ও সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে বাগচী পরিবার বনেদি জমিদার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে স্বীকৃত হয়। আজও স্থানীয় মানুষ বাগচীবাড়ির দুর্গাপূজা দর্শনে আগ্রহী হয়ে ছুটে যান, যা তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবের ধারাবাহিকতার নিদর্শন। গবেষকও প্রতিবছর সেই দুর্গোৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

চৌধুরী জমিদার পরিবার – ধোঁড়াদহ গ্রামের ঐতিহাস্য:

চৌধুরী জমিদার পরিবারের ধোঁড়াদহ গ্রামের শাখা বহুকালজীবী ও গৌরবময়। গ্রামের অবস্থান—জলঙ্গীনদীর তীর—চৌধুরীবংশের প্রাচীন জমিদারদের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন নবাবী তহশীলদার, যার প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। গ্রামের চৌধুরী পরিবারের একটি ঐতিহাসিক মন্দির আছে এবং একই বাড়ির অভ্যন্তরে অন্তর্গত 'পাতাল ঘর' বিশেষ আকর্ষণীয়, যা ৯১৭ শকাব্দে নির্মিত হয়েছিল।এই ধরনের উপাদান বৃহত আঞ্চলিক ইতিহাসে অনুসন্ধান এবং সৃজনশীল জ্ঞানে প্রাণবন্ততা আনে।

সরকার জমিদার পরিবার:

সুন্দলপুর অঞ্চলে কায়স্থবংশীয় সরকার পরিবারের জমিদারিত্বের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এ পরিবারের সদস্যরা দান-ধ্যান, অতিথিসেবায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁদের নিজস্ব নীলকুঠিও বিদ্যমান ছিল। পরিবারকে কেন্দ্র করে একটি সাংস্কৃতিক বলয়ও গড়ে ওঠে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 'জগন্নাথদেবের গুজবাটী'র অনুকরণে এই পরিবার একটি উদ্যান নির্মাণ করে, যার নাম দেওয়া হয় **'গুঞ্জবাটী'**। এখানে দোলযাত্রা, পূজার্চনা, দান-ধ্যান, অতিথি আপ্যায়নসহ নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সরকার জমিদার পরিবারের খ্যাতি সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে (রায়, ১৯৯৪)।

সরকার পরিবারের শ্যামসুন্দর সরকার বিশেষভাবে উদারতা ও দানশীলতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পরিবারের বিপুল সম্পত্তির একটি বড় অংশ দান করেন এবং এই ঐতিহ্য রক্ষার মধ্য দিয়েই পরিবারটি সমাজে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করে (মজুমদার, ২০০২)।

এ অঞ্চলের অন্যান্য প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের সঙ্গেও তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যেমন, আরবপুরের স্যান্যাল পরিবার, যারা প্রাচীন জমিদার বংশভুক্ত, বাগচী জমিদার পরিবারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখতেন। এমনকি আরবপুরে পানীয় জলের অভাব দূরীকরণেও বাগচী পরিবার উদ্যোগী হয়েছিল, যার উল্লেখ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখায় পাওয়া যায় (বাগচী, ১৩১২ বঙ্গাব্দ/১৯০৫)।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা:

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্মে ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের যথাযথ চিত্রায়ণ একান্ত প্রয়োজনীয়। বাগচী তাঁর লেখনীতে এলাকার ভৌগোলিক সীমা, মৃত্তিকার প্রকৃতি, কৃষিকাজের বিবরণ, নদ-নদী ও স্থানীয় জনজাতির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন (বাগচী, ১৯০৫/১৩১২ বঙ্গাব্দ)।

তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *পল্লী-কথা* তে নদীয়ার করিমপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইতিহাস ও পরিবেশের বিবরণ পাওয়া যায়। করিমপুর, যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোঁড়াদহ, সুন্দলপুর ও আরবপুর নামক গ্রামগুলির ভৌগোলিক সীমানা, পরিবেশ এবং নদ-নদীর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য তিনি সংরক্ষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদের প্রাচীন জলঙ্গী গ্রামটির ভৌগোলিক ও সামাজিক গুরুত্ব তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

বাগচী (১৯০৫/১৩১২ বঙ্গাব্দ) লিখেছেন, "নদী সীমান্তে নিদর্শন রেখে চলিতেছে। বহুতর নদী খাত ও খালের সমাহার। অন্যদিকে শিকারপুরের মতো গ্রামগুলিতে মৌসুমী স্রোতনদী এবং স্বাভাবিক সেচব্যবস্থা রয়েছে। এই নদী ও খালের মাধ্যমে কৃষিকাজ এবং সেচের সুবিধা পাওয়া যায়, যা সেই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে।"

এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছেন, "মেহেরপুর অঞ্চল এবং তদসংলগ্ন এলাকাগুলিতে নদী এবং জলাভূমি ব্যাপক ভূমিকা পালন করিতেছে। করিমপুর থেকে আরবপুর পর্যন্ত নদীর গতিপথ এবং সংযোগস্থলগুলি কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" (বাগচী, ১৯০৫/১৩১২ বঙ্গাব্দ)

উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাগচী তাঁর রচনায় ভৌগোলিক পরিবেশকে কেবল প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবেই নয়, বরং ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর লেখনীতে ভূগোল ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক চিত্র নির্মিত হয়েছে, যা সেই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রভাব বিস্তার করেছে (Majumdar, 1950)।

আঞ্চলিক ইতিহাস বর্ণনায় জাতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ধারণা:

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্মে জাতিভেদ প্রথা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তিনি বিশেষভাবে হিন্দু সমাজের জাতিগত বিভাজনের দিকটি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আলোচনায় দেখা যায়, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও রাজপুতের বাইরেও শূদ্রজাতীয় তিনটি প্রধান গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল—চণ্ডাল, গণ্ডক এবং কন্নি। এর মধ্যে কন্নি জাতি মূলত সূতরধরের কাজ করত, আর চণ্ডালেরা পান বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিল (বাগচী, ১৯১৮/২০১৭)।

বাগচীর লেখায় বৈষ্ণব, খ্রিস্টান ও 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের কথাও পাওয়া যায়। বিশেষত কর্তাভজা সম্প্রদায়, যারা মূলত গোয়ালা জাতি, তাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা অনুপস্থিত ছিল। এই ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর অস্তিত্ব স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে (Ray, 2003)।

তিনি মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন যে, তাদের মধ্যেও জাতিগত ভেদাভেদ বিদ্যমান। মুসলমান সমাজে শেখ, পাঠান ও ফরাজি নামে বিভিন্ন শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। ফরাজি মুসলমানদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল— তারা কাপড় পরিধান করলেও কাছা ব্যবহার করত না, এবং তাদের তুলনামূলকভাবে অধিক ধর্মপ্রাণ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো (Ahmed, 1981)।

প্রাবন্ধিক আরও জানান যে, ধর্মান্তরের ইতিহাস খুব বেশি প্রভাব বিস্তার না করলেও, কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তর ঘটেছিল এবং সেই ধর্মান্তরিত পরিবারগুলো এখনও অস্তিত্বশীল। তাঁর আলোচনায় ব্রাহ্মণদের প্রতি একটি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পায়, যেখানে তিনি বিভিন্ন গ্রামের ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চর্চার কথা গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন (Chatterjee, 1993)।

অতএব, বাগচীর সাহিত্যকর্মে প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ প্রথা, স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির চিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি আঞ্চলিক ইতিহাস ও সমাজগঠনের প্রক্রিয়াকে অনুধাবনের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

আঞ্চলিক ইতিহাস ভাবনায় প্রাচীনতম নাম ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বর্ণনা:

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্মে আঞ্চলিক ইতিহাসচেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি স্থানীয় ধর্ম, সমাজ ও ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনার মাধ্যমে অঞ্চলকে সাংস্কৃতিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর লেখায় গোঘাটা, ত্রিহট্ট, গোয়াড়ী, রাইটা, আখরিগঞ্জের আঁধারকোট প্রভৃতি স্থাননাম ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে (বাগচী, ১৯৩০)।

স্থানীয় ঐতিহ্যের ধারায় মেহেরপুরের 'মুনশেফী চৌকি', কুচাইডাঙ্গায় নবাবি ফৌজের অবস্থান, সুন্দলপুরে জগন্নাথদেবের গুয়াহাটির অনুকরণে গঠিত 'গুয়াহাটি উদ্যান' এবং 'তুলসীবিহারী মেলা' —এসব স্থান ও অনুষ্ঠান আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তদ্রূপ, আরবপুরের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র চতুষ্পাঠীও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে (মজুমদার, ১৯৫৭; সরকার, ১৯৭৩)।

বাগচীর সাহিত্যচর্চায় নদীও একটি সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে উল্লিখিত। বিশেষত ভৈরব, হাওলা, মাথাভাঙ্গা, বাচূর্ণী ও জলঙ্গী নদীর উল্লেখ তাঁর আঞ্চলিক ইতিহাসভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে (সেনগুপ্ত, ১৯৮২)।

এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে ধোঁড়াদহ নিবাসী রামেশ্বর সাহা, নসিপুরের রাজা, বাগচী পরিবারের রামগঙ্গা ও সর্বানন্দ বাগচী, বীরসিংহ সুবেদার, মহারানী স্বর্ণময়ী এবং সুন্দলপুর নিবাসী শ্যামসুন্দর সরকার প্রমুখের নাম স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ধরা পড়েছে (রায়, ২০০২)।

গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ও জলবায়ুর বর্ণনা:

প্রাবন্ধিক যতীন্দ্রমোহন বাগচীর রচনায় তৎকালীন বাংলার গ্রামীণ জীবনের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর লেখনী থেকে জানা যায়, গ্রামীণ জনজীবনে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি, কারিগরি কাজ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ছিল প্রধান ভরসা। যেমন, চণ্ডালরা চুন প্রস্তুত, রাজমিস্ত্রির কাজ, এবং ছুতোরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে গণ্ডকরা মুদি দোকান চালাতেন ও চিড়ে প্রস্তুত করতেন। পানচাষও এ অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিকশিত হয়, যা কেবল হিন্দু সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসার লাভ করেছিল (Bagchi, 1916/2004)।

বাগচীর বিশ্লেষণ অনুসারে কৃষিকাজের মূল সংকটের অন্যতম কারণ ছিল জলবায়ুর পরিবর্তন। নদীর পলি জমে যাওয়া, মৌসুমি বন্যার অনুপস্থিতি, এবং জলাশয়ের ঘাটতি কৃষিকে ব্যাহত করেছিল। এর ফলে হেমন্তকালীন ধান চাষ ক্রমশ কমে গিয়ে আউশ ধান চাষই বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। পাশাপাশি রবিশস্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল মুগ ডালের চাষ। আনন্দপুরীর মুগ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং চর অঞ্চলে কলাই চাষও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল (Chaudhuri, 1951; Bagchi, 1916/2004)।

তবে বাগচী কৃষকদের অশিক্ষা ও তথাকথিত অলস স্বভাবের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সামান্য প্রচেষ্টাতেই কৃষকরা উন্নত ফলন লাভ করতে পারতেন, কিন্তু অশিক্ষা ও অবহেলার কারণে তারা দিন দিন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জমিদারি শোষণ। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজারা খাজনা দিতে না পারায় জমিদারদের দমন-পীড়নের শিকার হতো, ফলে তাদের দারিদ্র্য আরও ঘনীভূত হতো (Ray, 1979)।

বাগচীর এসব পর্যবেক্ষণ কেবল অর্থনৈতিক বাস্তবতাই নয়, বরং অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাঁর রচনায় গ্রামীণ উৎসব, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের চিত্র উঠে এসেছে, যা তৎকালীন বাংলার বহুত্ববাদী ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতিফলন (Sarkar, 1973)। এভাবে তিনি সাহিত্যিক রচনার মধ্য দিয়ে স্থানীয় ইতিহাস ও পল্লীজীবনের এক বাস্তবধর্মী ছবি অঙ্কন করেছেন।

স্থানীয় উৎসব ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বর্ণনা:

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্মে বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি স্থানীয় উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রতের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের লোকজ ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে বর্ণনা করেছেন (বাগচী, ১৯৩০/১৯৮২)। তাঁর লেখায় বৈশাখ মাসে পালিত '*পুণ্যপুকুর*' উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা মূলত অবিবাহিতা কিশোরীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। এই উৎসবে তারা বাড়ির উঠোনে ছোট্ট পুকুর খুঁড়ে, মাটির পুতুল ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করত। পূজা চলাকালীন তারা একটি ছড়া আবৃত্তি করত—

"পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা— কে জপেরে দুপুরবেলা?
আমি সতী নিরবধি; সাত ভাইবোন ভাগ্যবতী।
স্বামী শিয়রে পুত্র কোলে, — মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে।
জীয়ন্তে না দেখি আত্মবন্ধুর মরণ।
মরে পাই যেন শিবদুর্গার চরণ" (বাগচী, ১৯৩০/১৯৮২, পৃ. ৪২)।

এছাড়া, আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত কিশোরীরা *'যমপুকুর'* উৎসব পালন করত, যেখানে আরেকটি ছড়ার প্রচলন ছিল—

"হ্যালান চাকলমী ডগমগ করে।
রাজার বেটা পাখি মারে॥
মারুক পাখি ভৈরব বিল।
সোনার কৌটা, রূপার খিল।
খিল খুলতে লাগলো ছড়, আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর।
লক্ষলক্ষ ডাক পড়ে— রাজার মাথার টনক নড়ে" (বাগচী, ১৯৩০/১৯৮২, পৃ. ৪৪)।

বাগচী আরও উল্লেখ করেছেন যে, গ্রামীণ নারীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্রত প্রচলিত ছিল, যেমন *সাবিত্রী ব্রত*। আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে *বানভোজন* উৎসবেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রোগব্যাধি দূরীকরণের জন্য *'ছাগবধ প্রথা'* এবং *'পীরের সিন্নি দান'* প্রথাও প্রচলিত ছিল (রায়, ২০০২)। যদিও অধিকাংশ ব্রত ও প্রথা বর্তমানে অবলুপ্ত, তথাপি পীরের সিন্নি দানের রীতি আজও বাংলার কিছু অঞ্চলে বজায়চ রয়েছে (মজুমদার, ২০১০)।

আধুনিক নগরকেন্দ্রিক জীবনধারা গ্রামীণ জীবনের বৈচিত্র্যকে অনেকাংশে ক্ষয় করেছে। যেমন, *'একদিল পীরের গান'* —একটি লোকসংগীতধারা—আজ প্রায় বিলুপ্তপ্রায়। যদিও কয়েকজন প্রবীণ শিল্পী এখনও যমসেরপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করছেন, তবে এই শিল্পের ধারক-বাহকরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন (সেনগুপ্ত, ১৯৯৫)।

অতএব, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্যিক অবদান নয়, বরং আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মভূমি করিমপুর থেকে মহকুমা স্থানান্তরের ইতিহাস:

একদা অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলা চারটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল—দক্ষিণে রানাঘাট, পূর্বে কুষ্টিয়া, মাঝখানে চুয়াডাঙ্গা এবং উত্তরে করিমপুর। তবে করিমপুর মহকুমার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র দুই বছর; পরবর্তীতে মহকুমা করিমপুর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মেহেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় (Majumdar, 1942)। অথচ তৎকালীন সময়ে মেহেরপুর

প্রশাসনিক দিক থেকে মোটেই মহকুমা প্রতিষ্ঠার উপযোগী ছিল না। এই স্থানান্তরের পেছনে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও সাধারণ মানুষকে শোষণের পরিকল্পনা (Sarkar, 2017)।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, করিমপুর ও এর আশেপাশের অঞ্চল— যেমন শিকারপুর, আঁধারকোটা, হোগলবেড়িয়া, আরবপুর, মামুদগাড়ি, বাজিতপুর, চেঁচানি, আলাইপুর, রামচন্দ্রপুর ও তারাপুর— নীলচাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল। এ কারণে খ্যাতনামা ওয়াটসন কোম্পানি এ অঞ্চলে একাধিক নীলকুঠি স্থাপন করেছিল এবং চাষীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে জোরপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করত (Ray, 2002)। নীলদর্পণ (Dinabandhu Mitra, 1860/2008) এর মতো সমসাময়িক সাহিত্যকর্ম থেকেও আমরা সেই শোষণের নির্মম চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাই। বর্তমানে এই নীলকুঠির বেশ কিছু নিদর্শন এখনো বিদ্যমান।

উল্লেখযোগ্য যে, করিমপুর মহকুমা থাকাকালীন সময়ে নীলচাষ-প্রবণ এলাকাগুলি মহকুমার প্রধান সংযোগস্থল ছিল। ফলে প্রশাসনিক কেন্দ্র করিমপুরে অবস্থিত থাকলে কুঠিয়ালদের পক্ষে সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়াত। এজন্য তাদের স্বার্থে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে মেহেরপুরে মহকুমা স্থানান্তরিত করা হয় (Chaudhuri, 1990)। স্থানান্তরের আগে আঁধারকোটা এলাকায় থানা ছিল, যা পরে করিমপুরে সরিয়ে আনা হয় এবং আজও তা বিদ্যমান।

করিমপুর থেকে মহকুমা স্থানান্তরের ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের মানুষ প্রশাসনিকভাবে মহকুমা সদর থেকে দূরে সরে যায়। এর ফলে কুঠিয়ালদের পক্ষে নীলচাষীদের ওপর অত্যাচার চালানো আরও সহজ হয়ে ওঠে। এভাবেই এক সুপরিকল্পিত ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে করিমপুর চিরতরে মহকুমার মর্যাদা হারায়।

আঞ্চলিক ব্যবসা ও অন্যান্য স্থাপনার বর্ণনা:

করিমপুর জলঙ্গী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীনকালে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্র। নদীপথে নৌকা চলাচলের সুবিদা থাকায় এই অঞ্চল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে, পরবর্তীকালে নদীর প্রবাহ শীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বড় নৌকার চলাচল ব্যাহত হয় এবং ধীরে ধীরে ব্যবসার অবনতি ঘটে (Ray, 2002)

সেই সময় করিমপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রধানত নীলচাষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রচলিত ছিল। রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, কারণ অধিকাংশ মানুষ ছিলেন খেটে-খাওয়া সাধারণ কৃষক। এ অঞ্চলে তেমন ধনী সম্প্রদায় বা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্যকেন্দ্র না থাকায় বাণিজ্যের প্রসার সীমিত ছিল (Chakrabarti, 1990)।

১৮৮৫ সালে লোকাল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে জলঙ্গী থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মিত হয়, যা পরবর্তীতে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হয়। আজও সেই সড়কই এ অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (District Gazetteer of Nadia, 1910/1995 reprint)।

তৎকালীন ব্যবসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বালিয়াডাঙ্গা ও জিতপুর পালেদের শাঁখার ব্যবসা এবং কেঁচুয়াডাঙ্গা-যমশেরপুর অঞ্চলের তন্তুবায়দের তৈরি মোটা থান, গামছা ও কাপড়ের ব্যবসা। বর্তমানে বালিয়াডাঙ্গা ও জিতপুর পালেদের শাঁখার ব্যবসা টিকে থাকলেও তন্তুবায় সমাজের কারিগররা কালের নিয়মে হারিয়ে গিয়েছেন (Majumdar, 2006)।

অঞ্চলে প্রাথমিক ডাকঘর স্থাপিত হয় করিমপুরে; পরবর্তীতে ধোঁড়াদহ, শিকারপুর ও যমশেরপুরেও ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন মহকুমা শহর করিমপুরে একটি প্রবেশিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যা মহকুমা স্থানান্তরের সঙ্গে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে যমশেরপুর, শিকারপুর ও ধোঁড়াদহে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যা আজও বিদ্যমান (Banerjee, 2014)।

উপসংহার:

যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর সাহিত্যকর্মে বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অনন্যসাধারণ রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক কবি হিসেবেও তিনি তাঁর সময়কার প্রামাণ্য আঞ্চলিক ইতিহাসের অভাব উপলব্ধি করেছিলেন এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বরূপ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছিলেন (বাগচী,

১৯১৮/২০১9)। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা গবেষণার ক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে (চক্রবর্তী, ২০০৭)।

বাগচীর লেখনীতে গ্রামীণ ঐতিহ্যের বিশদ বর্ণনা কেবলমাত্র নান্দনিক আনন্দই প্রদান করেনি, বরং আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার একটি সুদৃঢ় কাঠামো নির্মাণ করেছে। করিমপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজ সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, ও জীবনধারাকে তিনি সাহিত্যরূপে অমর করে তুলেছেন (দাশগুপ্ত, ১৯৯৫)। তাই তাঁর সাহিত্যকর্ম কেবল একটি শিল্পসাধনা নয়, বরং আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রথম প্রামাণ্য নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি ঐতিহাসিক চেতনার ক্ষেত্রেও বাগচীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্যকর্ম গবেষকদের জন্য একটি অমূল্য দলিল, যা বাংলার গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে (সেন, ২০১৪)। অতএব, যতীন্দ্রমোহন বাগচী যথার্থভাবেই বাংলা সাহিত্যে এবং আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় এক বিশিষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, অ. (২০০৭)। *বঙ্গীয় আঞ্চলিক সাহিত্য ও সমাজচেতনা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
২. দাশগুপ্ত, শ. (১৯৯৫)। *বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি: ইতিহাস ও সাহিত্য*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন।
৩. বাগচী, জ. ম. (১৯০৫/১৩১২ বঙ্গাব্দ)। *পল্লী-কথা*। কলকাতা: মল্লিক প্রেস।
৪. বাগচী, জ. ম. (১৯১৮/২০১9)। *কুসুম*। কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন।
৫. বাগচী, জ. ম. (১৯৩০/১৯৮২)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
৬. বাগচী, য. (1995)। *পল্লীকথা* (মূল রচনা প্রকাশিত 1910)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
৭. বাগচী, য. ম. (১৯৩০)। *বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
৮. বাগচী, য. মো. (১৩১২ বঙ্গাব্দ)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
৯. বাগচী, যতীন্দ্রমোহন। (১৯৩৫/2015)। *যমশেরপুরের জমিদার বাগচী পরিবার*। কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন।
১০. মজুমদার, র. (২০০২)। *বাংলার জমিদার সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
১১. মজুমদার, র. (২০১০)। *বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
১২. মজুমদার, র. চ. (1985)। *History of the freedom movement in India* (Vol. 2)। কলকাতা: ফার্মা KLM।
১৩. মজুমদার, র. স. (১৯৫৭)। *History of Bengal, Vol. II*। কলকাতা: University of Calcutta।
১৪. রায়, স. (২০০২)। *বাংলার লোকাচার ও ব্রতকথা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
১৫. রায়, নৃসিংহপ্রসাদ। (২০০২)। *বাংলার ইতিহাসচর্চা ও ঐতিহ্য*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
১৬. রায়, স. (১৯৯৪)। *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
১৭. সরকার, স. (2008)। *The Swadeshi movement in Bengal: 1903-1908*। নয়াদিল্লি: পার্মানেন্ট ব্ল্যাক।
১৮. সরকার, সুমিত। (১৯৭৩)। *The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908*। নয়া দিল্লি: People's Publishing House।
১৯. সেন, স. (২০১৪)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চা*। ঢাকা: সাহিত্য সংসদ।
২০. সেনগুপ্ত, নীরদচন্দ্র। (১৯৮২)। *বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
২১. সেনগুপ্ত, স. (১৯৯৫)। *বাংলার লোকসঙ্গীতের ধারা*। কলকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং।
২২. Bagchi, J. M. (2005). *স্থানীয় ইতিহাস ভাবনা* (মূল রচনা প্রকাশিত 1910 সালে)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
২৩. চক্রবর্তী, অ. (1992)। *Rural economy and indigo in Bengal*। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

২৪. Ahmed, R. (1981). *The Bengal Muslims, 1871–1906: A quest for identity*. Oxford University Press.
২৫. Bagchi, J. M. (2004). *Banglar gramer katha* (Original work published 1916). Kolkata: Dey's Publishing.
২৬. Bagchi, J. M. (2017). *Prabandha Sangraha* (Reprint of 1918 ed.). Kolkata: Sahitya Samsad.
২৭. Banerjee, A. (2014). *History and culture of Nadia district*. Kolkata: Firma KLM.
২৮. Chakrabarti, S. (1990). *Rural society and economy in Bengal (1800–1900)*. Kolkata: Progressive Publishers.
২৯. Chatterjee, P. (1993). *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton University Press.
৩০. Chaudhuri, B. B. (1951). *The Agrarian History of Bengal*. Calcutta: Calcutta University Press.
৩১. Chaudhuri, S. (1990). *Civil Disturbances During the British Rule in India*. Calcutta: Firma KLM.
৩২. District Gazetteer of Nadia. (1910/1995 reprint). Calcutta: West Bengal District Gazetteers.
৩৩. Majumdar, R. C. (1942). *History of Nadia*. Calcutta: University of Calcutta.
৩৪. Majumdar, R. C. (1950). *History of Bengal: From the earliest times to the foundation of Muslim rule*. Calcutta: University of Calcutta.
৩৫. Majumdar, R. C. (2006). *History of Bengal (Vol. II)*. Kolkata: Tulshi Prakashani.
৩৬. Majumdar, R. C. (2008). *History of the freedom movement in India* (Vol. 2). Kolkata: Firma KLM.
৩৭. Mitra, D. (2008). *Nil Darpan* (Original work published 1860). Kolkata: Sahitya Samsad.
৩৮. Ray, R. (2003). *The Felt Community: Commonalty and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism*. Oxford University Press.
৩৯. Ray, R. K. (2002). *Entrepreneurship and industry in India, 1800–1947*. New Delhi: Oxford University Press.
৪০. Ray, R. K. (2002). *The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism*. Delhi: Oxford University Press.
৪১. Ray, S. C. (1979). *Land Revenue and Peasant Life in Colonial Bengal*. Delhi: People's Publishing House.
৪২. Sarkar, S. (1973). *The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908*. New Delhi: People's Publishing House.
৪৩. Sarkar, S. (1989). *The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908*. New Delhi: People's Publishing House.
৪৪. Sarkar, S. (2017). *The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908*. New Delhi: Permanent Black.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 138-143
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.189

মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় প্রকৃতির স্বরূপ ও রূপবৈচিত্র্য

হুমায়ুন কবির, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 07.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

As the attraction of humans towards nature is innate, connection is also innate. The form and mystery of nature, the human child of nature, are revealed to writers from time to time in different forms and in different variations. Poet Chandrabati has has described about the nature or environment in her 'Ramayana', 'Sundari Malua' and 'Dasyu Kenaramer Pala'. In Chandrabati's 'Ramayana', the poet has used natural elements of nature to describe the happy life of Sita in the presence of Ramachandra in the leafy cottage of the Panchavati forest. Shakuntala, deer, peacocks, and Shukshari, etc. have accompanied Sita Devi in the Panchavati forest. In the narrative of Chandrabati, the poet has used the context of nature in the context of the intense sorrow and separation of Sita's character. In the description of the ashram of Valmiki Muni after Sita's exile, he has also used natural elements such as animals, birds, plants, etc. to create a sweet environment of the ashram. In the 'Sundari Malua' poem, nature has become meaningful in many ways. The use of nature in describing the proper form of the village of Aralia is consistent with reality and is a very familiar background. The poet has also shown the expression of the calm and gentle form of nature in the background of the meeting of the hero and heroine. The image of nature is also captured through the twelve months composed in the changing natural background of the six seasons in this poem. The poet has shown the background of the image of nature upset by the death of the heroine. In the 'Dasyu Kenaramer Pala', the image of the natural background is consistent with the brutal and cruel activities of the bandit Kenaram. While describing the physical appearance of the robber Kenaram, Chandrabati Devi has taken an analogy from the natural environment of rural folklore. The poet reflects the nature of rural Bengal as seen through his daily eyes, sometimes in the form of metaphors, and sometimes in the form of a favorable environment related to life.

Keywords: Bengali Literature, Mediaeval Period, Women poet, Chandrabati, Nature

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা। প্রাচীন যুগ নিয়ে সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও মধ্যযুগের সময়পর্ব নিয়ে তেমন মতপার্থক্য নেই। ১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ধকারপর্ব পেরিয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু বা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তকে সময় হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। দীর্ঘ এই ছয়শো বছরের সময়পর্বে লিখিত হয়েছে হিন্দু ও মুসলমান কবিদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়াচারী সাহিত্য যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করেছে। বিষয়বৈচিত্র্যের মাঝে সে সময়ের মহিলা কবিদের রচনাও সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও পুরুষ-কবি প্রাধান্য মধ্যযুগের সাহিত্যভূমিতে মহিলা কবিদের

রচনা সামান্য। যেসব মহিলা কবিরা সেদিনের পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজের প্রান্তে অবস্থান করে পড়াশোনা শিখে রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন চন্দ্রাবতী দেবী, মাধবী দেবী, হীরামণি, কৃষ্ণকান্ত-তনয়া, আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামণি দেবী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রামায়ণ ও গীতিকা রচনা করে উজ্জ্বল হয়েছেন। আমাদের আলোচনা এককভাবে মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর সৃষ্টিজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে-কারণে আমাদের প্রবন্ধের শিরোনাম পরিকল্পিত হয়েছে— "মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় প্রকৃতির স্বরূপ ও রূপবৈচিত্র্য।" এই আলোচনায় ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত এবং ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-কে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মকে মূল উদ্দেশ্য করে সাহিত্যসৃষ্টি করার কারণে প্রকৃতির চিত্রণের অবকাশ সেভাবে গড়ে ওঠেনি। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলি প্রভৃতি সাহিত্য শাখা ধর্মকেন্দ্রিক। সমাজের সাধারণ মানুষদের মধ্যে পুরাণ প্রচার করার জন্য রামায়ণ, মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই সব সাহিত্য শাখার সঙ্গে রচিত হয়েছে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য। প্রথম রোমান্টিক কাব্যরচনা করেন পঞ্চদশ শতকের শাহ্ মুহম্মদ সগীর। শুধু যে, মুসলমান কবিদের দ্বারা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যধারা গড়ে উঠেছিল এমন নয়, হিন্দু কবির কাব্যও এই ধারাকে সমৃদ্ধি করেছিল। ধর্মের মোড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন এসব কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় নরনারীর প্রেমকাহিনি। প্রাচ্য থেকে কাহিনি গ্রহণ করে বাংলার প্রকৃতি, নদী, পাহাড়, গাছপালা ব্যবহার করে এসব কাব্যে কবিগণ দেশীয় পটভূমি নির্মাণ করেছেন। কবি চন্দ্রাবতী দেবীও পরিবেশ পটভূমির রূপচিত্রণে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভাবপ্রকাশে প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। কেন-না, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একদিকে যেমন সহজাত আকর্ষণ, তেমনি আবার যোগও নিবিড়। প্রকৃতির মানবসন্তান কবি-সাহিত্যিকদের কাছে প্রকৃতির রূপ ও রহস্য সময়-অসময়ে বিভিন্ন অবয়বে ও বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যে ধরা দেয়। কবিরা কখনও প্রকৃতিকে মানব হিসেবে কল্পনা করেন, আবার কখনও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যকে উপমিত করে কাব্যের রূপসৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেন।

বাংলা সাহিত্য শুধু নয়, সুবৃহৎ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমিতেও প্রকৃতির ভূমিকা উল্লেখনীয়। গুপ্তযুগের কবি কালিদাসের রচনায় দেখা যায় প্রকৃতির চিত্র। তাঁর 'শকুন্তলা', 'ঋতুসংহার' কাব্যে ছাড়াও প্রকৃতির উপাদানকে মুখ্য করে 'মেঘদূত' সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যকে অনন্যতায় পরিণত করেছেন। প্রকৃতি ও চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে গাছপালা, নদী, পাহাড় এসব চিত্রায়নের মাধ্যমে যক্ষের অনুভূতিকে উন্মোচন করেছেন। ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা 'উত্তররাম চরিত' নাটকে প্রকৃতি চিত্রে কাহিনি নির্মিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও প্রকৃতি নিবিড়ভাবে প্রকটিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর রচনায়। গ্রামবাংলার প্রকৃতির উপাদানকে জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি তাঁর রচনায়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে শিলাইদহে জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)-এর প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে রচিত কাব্য-কবিতায় প্রকৃতি চিত্র প্রতিফলিত।

আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করব। কবি চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ', 'সুন্দরী মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা'-য় নিসর্গ প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনের পূর্বে কবি-পরিচয় সংক্ষেপে জেনে নেব। বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় সতেরো শতকে জন্মগ্রহণ করেন চন্দ্রাবতী দেবী। পিতার নাম দ্বিজ বংশীদাস এবং মাতার নাম অঞ্জনা দেবী। বাল্যে পাঠশালায় পড়তে যেতেন চন্দ্রাবতী। সেখানে জয়ানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তানও পড়তে যেতেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন হয়। এ যেন অনেকটা বাহ্রাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যের নায়ক-নায়িকার মতো। তবে লায়লীর মতো চন্দ্রাবতী ছিলেন না, চন্দ্রাবতীর গুরুজনের প্রতি ভয় ও ভক্তি ছিল। একসময় জয়ানন্দ প্রত্যাখ্যান করেন চন্দ্রাবতীকে। এরপর চন্দ্রাবতী অজীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। পিতার নির্দেশে তিনি রামায়ণ রচনা ও শিবপূজা করে কাটিয়ে দেবেন বলে স্থির করেন। অন্যদিকে জয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝতে পেরে চন্দ্রাবতীর কাছে ক্ষমা চাইতে আসেন। বারবার চন্দ্রাবতীকে ডেকে কোনো উত্তর না-পেয়ে জয়ানন্দ জীবন ত্যাগ করার সংকল্প করেন। শিবমন্দিরে বিদায় বাণী লিখে ফুলেশ্বরী নদীর জলে আত্মহত্যা করেন। নদীতে জল আনতে গিয়ে এ-দৃশ্য দেখে চন্দ্রাবতী উন্মাদিনীর মতো হয়েছিলেন। একদিন শিবপূজা করার সময় তিনি মারা যান অনুমান করেন পালার সম্পাদকেরা। এই হল তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম রামায়ণ অনুবাদক ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড বিশিষ্ট রামায়ণের নৈসর্গিক প্রকৃতির পঞ্চবটী বন, গাছপালা, নদী, পাহাড়, বিভিন্ন প্রাণী চরিত্র প্রভৃতি উপাদানে সমৃদ্ধ। কিন্তু মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো সপ্তকাণ্ডবিশিষ্ট নয়, কলেবরের দিক থেকেও এর সঙ্গে তুলনা চলে না। আয়তনে ক্ষুদ্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' তিনখণ্ডে বিভক্ত। সীতার কথনে কবি এগিয়ে নিয়ে গেছেন সুতরাং প্রকৃতি উপাদানের ব্যবহার ও বৈচিত্র্য সেভাবে ফুটে ওঠেনি। পঞ্চবটী বনের বিস্তৃত বিবরণও এখানে লব্ধ নয়। গোদাবরী নদীতীরে পঞ্চবটী বনে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার সুখেই দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল সে-কথা সীতার বক্তব্যে খুব সুস্পষ্ট। পঞ্চবটী বনের লতাপাতার কুটিরে রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে সীতার সুখকর জীবন বর্ণনাতে কবি প্রকৃতির নৈসর্গিক উপাদান ব্যবহার করেছেন—

"রসাল বনের ফল গো, পাতার কুটির পাইয়া।
অযোধ্যার রাইজ্যপাট গো, গেলাম যে ভুলিয়া।।
লক্ষ্মণ কানন হইতে আনে মিঠা ফল।
পদ্মপত্রে আমি আনি গো, তমসার জল।।"[১]

প্রকৃতির উপাদান কবি বনবাসের সুখকর পরিবেশ তৈরিতে ব্যবহার করেছেন। শকুন্তলার মতো পঞ্চবটী বনে হরিণ, ময়ূর, শুকশারি প্রভৃতি সীতা দেবীর সঙ্গী হয়েছে। শুকশারি এখানে সীতা দেবীর প্রতিবেশী হয়েছে। কবি মানবেতর প্রাণী চরিত্রকে বাস্তবরূপ দিয়ে মানুষের সখ্য করে এঁকেছেন। সীতা দেবীকে যেমন তারা গান শোনায়, তেমনি কখনও "ঝগড়া বিবাদ করে কভু মোদের সনে।"[২] গোদাবরী নদীতীরে পঞ্চবটী বনের কানন পর্বতে সীতা দেবী রামচন্দ্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলত শুকশারি। অবহিত হতে পারা যায় কাননের পাখিদের সঙ্গে তাঁর গভীর ও আত্মিক সম্পর্কের কথা।

তৃতীয় খণ্ডে কবি পঞ্চবটীর মনোরম, মনোরম চিত্র অতিসংক্ষিপ্ত কলেবরে পাঠকের সম্মুখে প্রকটিত করেছেন সীতার কথনে। তপোবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় সীতা দেবী বলছেন—

"কমল কাননে হংসী গো সেথায় খেলা করে।।
তমালের ডালে নাচে গো ময়ূরা ময়ূরী।
বনেলা হরিণ আছিল গো মোর সহচরী।"[৩]

এই প্রাকৃতিক দৃশ্য সীতার মধ্যে এক স্বপন ঘোর সৃষ্টি করেছে। অযোধ্যায় ফিরে এসেও সেই সুখকর স্মৃতিগুলি হাতছানি দেয়। প্রতিদিন নিশিতে তপোবনের মনমুগ্ধকর পরিবেশে যাওয়ার অভিলাষী ইচ্ছার স্বপ্নদর্শন ঘটে।

'রামায়ণ'-এ কবি চন্দ্রাবতী সীতা চরিত্রের উপর যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। সহানুভূতিশীল কবি সীতার আনন্দ বা বেদনার সহমর্মী করে তুলতে নদী, পার্থিব চন্দ্র, সূর্যকে ব্যবহার করেছেন। তৃতীয় খণ্ডে রামচন্দ্র দুষ্টুবুদ্ধি ভগিনী কুকুয়ার কুচক্রান্তে বিশ্বাস করে নির্দোষী স্ত্রী সীতাকে বনবাসে দেওয়ার সংকল্প করেন। অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র বনবাসে রেখে আসার দায়িত্ব অর্পণ করেন। নির্দোষী সীতা দেবীর বনবাসের মতো শাস্তি কবি যেমন মেনে নিতে পারেননি, তেমনি তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে—

"না উইঠ না উইঠ গো তপন, তুমি মেঘে লুকাও মুখ।...
আকাশের পবন দেব গো, তুমি না বহিও আর।
কেমনে সহিবা পবন গো, এমন নির্দুষীর দুঃখভার।।
ওরে—আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে গো আইজ কান্দে নদীর পানি।
আশ্মানের তারা কাইন্দ্যা আইজ পোহাইল রজনী।।"[৪]

কবি চন্দ্রাবতী আখ্যানে সীতা চরিত্রের তীব্র দুঃখবেদনা, বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে প্রকৃতি প্রসঙ্গের প্রয়োগ করেছেন। কুকুয়ার চক্রান্তে রামচন্দ্র নির্দোষী সীতাকে বনবাস দেওয়ার সংকল্প করেন। সেই বিষাদময় পরিবেশ তৈরি করা এবং নির্দোষী সীতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে আকাশ, বাতাস, নদীর জলের ক্রন্দন করেছে। বিষাদময় পরিবেশে সহানুভূতি জানিয়ে প্রকৃতির অশ্রুবিসর্জন বর্ণনার মাধ্যমে শোকের আবহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

'রামায়ণ'-এর তৃতীয় খণ্ডের সীতার বনবাস পরবর্তী বাল্মীকি মুনির আশ্রমের বর্ণনায়ও পশুপাখি, গাছপালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে আশ্রমের মাধুর্যমণ্ডিত পরিবেশ রচনা করেছেন। সেখানে ব্যাঘ্ররা হরিণের গা-চাটে,

হরিণের কোনো ত্রস্ততা নেই, শঙ্কা নেই। পশুরাজ সিংহের সঙ্গে হস্তীর ভেদ নেই, তারা একসঙ্গে ক্রীড়া করে। শৃগাল ও কুকুর সেখানের পরস্পরের বন্ধু। তপোবন বেষ্টিত বৃক্ষের ফুল বছরব্যাপী ফোটে। প্রভাত হলে শুরু হয় বৃক্ষের ডালে পাখির কূজন এবং তপোবনবাসী চেতনাপ্রাপ্ত হন। সীতা দেবী তপোবনের এই মধুর ও শান্ত পরিবেশে আশ্রয় পান। এক সময়ে লবকুশ নামে দুই যমজ পুত্রের জন্ম দেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তীর সঙ্গে ক্রীড়া করেই তারা বড়ো হন। বনের পশুপাখিদের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়।

'সুন্দরী মলুয়া' পালায় প্রকৃতির অনুসঙ্গ নানাভাবে তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ছয় ঋতুর পরিবর্তমান প্রাকৃতিক আবহাওয়া পালার কাহিনি এবং চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পালার প্রারম্ভেই নদীমাতৃক বাংলাদেশের খামখেয়ালিপনা প্রাকৃতিক পটভূমির চিত্র কবি তুলে ধরেছেন। অতিবৃষ্টির কারণে জলপ্লাবনে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে। খামখেয়ালিপনা আবহাওয়ার চিত্র তুলে ধরতে পালার প্রারম্ভে কবির বর্ণনা—

> ''মন্দাইন্যা আইশ্‌নারে পানি ভাটি বাইয়া যায়।...
> মেঘ ডাকে গুড়ু গুড়ু ডাইক্যা তুলে পানি।
> মাঠ ঘাট ডুইব্যা গেল আকুল পরাণি।।''[৫]

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল নষ্ট হয়ে দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তারই বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষিপ্রধান দেশে ফসল জলে নষ্ট হয়ে আকাল দেখা দেয়। অনুপায় কৃষকসন্তান চাঁদ বিনোদ অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় কোড়া পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়ে ঘরে বৃদ্ধা মাকে একাকী রেখে। কোড়া পাখি শিকার ও বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে ঘরে ফিরবে পুত্র এই আশায় সিক্ত নয়নে বিদায় দেয় মা জননী। পালার নায়ক চাঁদ বিনোদ শিকার করতে করতে পৌঁছায় আড়ালিয়া গ্রামে। আড়ালিয়া গ্রামের প্রকৃতিক পটভূমি বর্ণনা—

> "গাঁয়ের পাছে আইন্ধ্যাপুকুর ঝড়-জঙ্গলে ঘেরা।
> চাইর দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া।।"[৬]

গ্রামবাংলার যথাযথ রূপ বর্ণনায় প্রকৃতির অনুসঙ্গের প্রয়োগ বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং খুব পরিচিত একটি পটভূমি। পথশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনে চাঁদ বিনোদ পুকুরপাড়ের ছায়া নিবিড় শান্ত শ্যামল কদমগাছের তলে দিবানিদ্রা দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা নির্জন পুকুরে নায়িকা সুন্দরী মলুয়া কলসি নিয়ে জল আনতে গেলে একে অপরের মধ্যে প্রেম সন্দর্শন ঘটে। নায়ক-নায়িকার মিলনের পটভূমিতেও প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ রূপের প্রকাশ কবি দেখিয়েছেন। পালার নায়ক-নায়িকার মিলনে প্রকৃতির স্বরূপ প্রসঙ্গে মান্য সমালোচক বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে—

> "চান্দ বিনোদকে পুকুরঘাটে প্রত্যক্ষ করে মলুয়ার যুবতী মনে যে পূর্বরাগ সঞ্চারিত হয়, আষাঢ় মাসের বর্ষণসিক্ত ধরণী ও কানায় কানায় পূর্ণ নদীর উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটানো হয়। মেঘের ডাকের মধ্যে মলুয়া তার প্রিয়তমের কণ্ঠধ্বনি যেন শুনতে পায়।"[৭]

ছয় ঋতুর পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রচিত বারোমাস্যার মধ্য দিয়েও প্রকৃতি চিত্র ধরা পড়ে। বারোমাস্যার সাহিত্যিক রূপ প্রথম লক্ষ করা যায় 'মঙ্গলকাব্য'-এ। বারোমাস্যা বর্ণনায় প্রকৃতি চিত্রণের বৈচিত্র্য জীবনরসিক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী ছাড়া অপরাপর কবিদের রচনায় গতানুগতা ধরা পড়ে। এই পালায় বারোমাস্যার পৃথক পৃথক দু-বার বর্ণনা রয়েছে। একটিতে আট মাসের বিবরণ অর্থাৎ অষ্টমাসি, একটিতে দশমাসের বিবরণ অর্থাৎ দশমাসি বা দশমাস্যা। এই বারোমাসি বর্ণনায় বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি পরিচয়ের পাশাপাশি বিরহিণী নারীর মনের ভাবপ্রকাশ পায়। যেমন আষাঢ়ের অঝোর বারিধারায় এবং বিদ্যুৎ বিজড়িত মেঘের ক্ষীণ তাৎক্ষণিক দর্শনে স্বামী সংসর্গের বাসনায় গৃহশয্যায় একাকী স্বামীর কথাই স্মরণ হয়—

> ''মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া।
> সোয়ামীর কথা ভাবে কন্যা খালি ঘরে শুইয়া।।''[৮]

চরিত্রের মনের ভাবপ্রকাশে কবি প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের সম্পৃক্ততা তুলে ধরেছেন, তেমনি আবার পালার সমাপ্ত অংশেও নদীসংকুল বাংলাদেশের খামখেয়ালিপনা আবহাওয়ার চিত্র ব্যবহার করে নায়িকার অন্তিম পরিণতি দেখানো হয়েছে—

> ''পূবাইলে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
> কই বা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও।।''[৯]

অসতীত্বের মিথ্যা কলঙ্কিত আখ্যা পেয়ে মলুয়া যেমন স্বামী চাঁদ বিনোদকে পায়নি, তেমনি সংসারেও ঠাঁই হয়নি। তাই সে সমাজের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে আত্মহননের মধ্য দিয়ে। তার সলিল সমাধিতে প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ চিত্রের পটভূমি কবি নির্মাণ করেছেন। এভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, পালায় কবি বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যে, কখনও দৈহিক সৌন্দর্য তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে কিংবা মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুসঙ্গে প্রকৃতির প্রাসঙ্গিক ব্যবহার করেছেন।

কবির পিতৃদেব তথা মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে কন্যা চন্দ্রাবতী কর্তৃক লিখিত 'দস্যু কেনারামের পালা'। পালাটির রচনাকাল ষোলো শতকের শেষ বা সতেরো শতকের প্রথম। বাস্তবতা নির্ভর এই পালার মাধ্যমে সে সময়ের রাজনৈতিক সামাজিক চিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির চিত্রও উঠে আসে। জলাভূমি ও জঙ্গলবেষ্টিত অঞ্চল ময়মনসিংহের বাস্তব প্রকৃতি চিত্রে কবির বর্ণনা—

"গারুয়া পাহাড় হইতে জালিয়ার হাওড়।
ঘর বাড়ী নাই কেবল নল-খাগড়ের গড়।।"[১০]

জনশূন্য নিবিড় জঙ্গলে বন্যপশুর মতো ডাকাত দলের দৌরাত্ম্য ছিল। পালার নায়ক দস্যু কেনারাম নৃশংস নিদারুণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রাকৃতিক পটভূমির চিত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবি চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে এই জঙ্গলঘেরা পথে দস্যু কেনারামের আকস্মিক সাক্ষাৎ হলে দস্যু তাঁদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন বংশীদাস দস্যুর মন গলাতে মনসার ভাসানগান গান। বংশীদাস কেনারামের অনুমতি নিয়েই এই গান গেয়েছিলেন। ভাসানগান শ্রবণে হাওড়ের পশুপাখি, গাছপালা কিরূপ ধারণ করেছেন কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"উইড়্যা যায় আশমানের পঙ্খী আইস্যা বইল ডালেতে।
বন ছাইড়্যা আইল পশু গাহান শুনিতে।।
চৈতের চৈতালি হাওয়া থির হইয়া রয়।
বৃক্ষ সবে থির হইয়া পাতা না নড়ায়।।
আশমানের চান্দের আলো তারা রইল চাইয়া।"[১১]

দস্যু কেনারামের আত্ম-উন্মচনের কাহিনিই এ-পালার ভরকেন্দ্র। কবি দেখিয়েছেন দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তার মানবিক বোধের বিকাশ ঘটে। এই বোধের বিকাশে ভাসানগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালান করে। গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝাতে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিভোর করে তুলেছেন।

কবি কাব্যের আঙ্গিক সৌন্দর্যে সেসব অলংকার প্রয়োগ করেছেন সেখানেও প্রকৃতি জগৎ থেকে উপমান চয়ন করেছেন। যেমন লোকায়ত বা লৌকিক উপমা প্রয়োগ করেছেন 'দস্যু কেনারামের পালা'-য় ঘটনা বা লোকায়ত চরিত্রের দৈহিক বর্ণনা প্রসঙ্গে। ডাকাত কেনারামের দৈহিক বর্ণনা করতে গিয়ে চন্দ্রাবতী দেবী অতি পরিচিত লোকায়ত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন—

(১) ''হাত পায়ের গোছা তার কলা গাছের গোডা।''[১২]
(২) ''সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সব্‌রি কলা।''[১৩]

উপসংহার: কবি চন্দ্রাবতী তাঁর 'রামায়ণ', 'সুন্দরী মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা'য় পরিবেশ পটভূমির রূপ চিত্রণে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভাবপ্রকাশে প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। নির্দোষী সীতার আজান্তেই যখন তাঁকে নিয়ে দেবর লক্ষ্মণ বনবাসযাত্রা করবেন ঠিক তখনই প্রকৃতির নদী পাহাড় প্রভৃতি সহানুভূতিতে ব্যথিত হয়ে ওঠে। বনবাসে গিয়ে আশ্রয় পান বাল্মীকি মুনির আশ্রমে। আশ্রমের গাছপালা, পশুপাখির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাল্মীকি তপোবনের শান্ত-স্নিগ্ধ বৈচিত্র্যময় পরিবেশের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় প্রকৃতিতে মুখ্য করে তুলেছেন। 'সুন্দরী মলুয়া' পালার প্রারম্ভে বাংলার খামখেয়ালিপনা প্রকৃতির রূপকে সজীব করে তুলেছেন। মলুয়ার অন্তিম পরিণতিতে কিংবা দস্যু কেনারামের ভাসানগান শ্রবণের সময় প্রকৃতির স্বরূপ অকৃত্রিম। কবির প্রত্যাহিক চোখে দেখা গ্রামবাংলার প্রকৃতির রূপকে প্রতিফলন করেছেন উপমানরূপে কখনও আবার জীবন-সম্পৃক্ত অনুকূল পরিবেশ রচনায়।

তথ্যসূত্র:

১. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদনা। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (সপ্তম খণ্ড) । ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫, কলকাতা, পৃ. ৩১১।

২. তদেব, পৃ. ৩১২।
৩. তদেব, পৃ. ৩২২।
৪. তদেব, পৃ. ৩২৮।
৫. ঐ, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড) । ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০, কলকাতা, পৃ. ১০০-১০১।
৬. তদেব, পৃ. ১০৭।
৭. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। পুস্তক বিপণি, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১১০।
৮. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদনা। পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ. ১৬২।
৯. তদেব, পৃ. ২০১।
১০. তদেব, পৃ. ২৫৭।
১১. তদেব, পৃ. ২৭৪।
১২. তদেব, পৃ. ২৫৯।
১৩. তদেব, পৃ. ২৫৩।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। পুস্তক বিপণি, ২০১৫, কলকাতা।
২. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদনা। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খণ্ড) । ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০, কলকাতা।
৩. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদনা। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (সপ্তম খণ্ড) । ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫, কলকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 144-154
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.190

উপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতি ভাবনা: একটি সমীক্ষা

ড. স্বপন মাল, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.08.2025; Accepted: 24.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Looking at the history of world literature, it is seen that Sanskrit literature is the oldest literature. Vedic literature is the oldest part of Sanskrit literature. When the complete Vedic literature was divided into four parts by Acharya Vyasa, they were called Rig, Sama, Yaju and Atharva. The last part of these four Vedas is associated with the Upanishads or Vedanta literature. According to Muktikopanishad, the number of Upanishads is 108. But according to many researchers, the number of Upanishads is close to 200. However, the Upanishads on which Shankaracharya has written commentaries are considered to be the main Upanishads or main Upanishads. The number of such Upanishads is ten or, according to some opinions, eleven. In all these Upanishads, the message of world civilization, i.e. human civilization, culture, peace, love and friendship has been spread. Such rare and infallible healthy cultural thought is scarce in the world's non-Sanskrit literature. When the intellect develops through knowledge, one can then experience the truth and the untruth. Accepting the truth and rejecting the untruth, that is, the falsehood is the proper action of a wise person. Realizing the ultimate truth, the undivided, the bliss of truth, the non-dual, the supreme truth behind the truth is the real search for truth. When such knowledge is revealed in the heart, differences are eliminated, unity is felt amidst diversity, and world peace is established by awakening a sense of universal culture. All these healthy thoughts are combined in the Upanishads.

Keywords: Upanishad, Civilization, Brotherhoodness, World Culture, World Peace

সভ্যতার সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছিল– আমি কে? এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সাথে আমার সম্পর্ক কী? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কার দ্বারা জীবিত আছি? আমাদের সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা কে করেন? মৃত্যুর পর কোথায় যাব? এমন নানান প্রকার ভাবনার উদ্রেক ঘটেছিল প্রাচীন মহান ভারতবর্ষের তপোবনসম সুশীতল, বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ, সমাহিত, শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে তপোমগ্ন ঋষিদের প্রশস্ত অন্তরের অন্তস্তলে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ঝংকৃত হয়েছে–

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবামঃ কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতা কেন সুখেতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্।।[1]

বহু বর্ষকাল ব্যাপী নিরন্তর অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ফলে সেই সকল চিরন্তন প্রশ্নসমূহের সমাধানের মার্গ আবিষ্কৃত হয় কার্য-কারণতত্ত্বব্যাখ্যার মাধ্যমে। ঋষিগণ জ্ঞানচক্ষু দিয়ে যা দর্শন করেন, তা ব্যক্ত করেন শিষ্যদের কাছে। শিষ্যগণ গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান শুনে শুনে মনে রাখতেন এবং জীবনে চর্চা ও চর্যার দ্বারা তা পরিপালনের চেষ্টা করতেন। যে বিদ্যা শিষ্যগণ গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে মনে রাখতেন তা শ্রুতি নামে পরিচিত। শ্রুতির অপর নাম বেদ। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে বেদ শব্দের উৎপত্তি। যেখানে আমরা কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করতে অপারগ হই, তখন বেদের প্রামাণ্যই মননশীল দার্শনিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। বলা হয়-

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা।।

এই বেদ সৃষ্টির সময়ে এক ও অখণ্ড ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সমগ্র বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করেন। সেই চারটি খণ্ড যথাক্রমে ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব নামে অভিহিত হয়। পুনরায় প্রতিটি বেদ চার ভাগে বিভক্ত। যথা- সংহিতা বা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। বেদের সংহিতা বা মন্ত্র অংশে বৈদিক দেব-দেবীদের স্তুতি, দার্শনিকতত্ত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ ও সংবাদাত্মক প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ অংশে বৈদিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ বৈদিক যাগ-যজ্ঞবিষয়ক কর্মের বিশদ ব্যাখ্যা উপলব্ধ হয়। আরণ্যক অংশে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অন্ত্যাংশ এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রাক্ মুহূর্তাংশের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। বেদের সর্বশেষাংশে বিদ্যমান হল উপনিষদ্। এই অংশে দার্শনিকতত্ত্বের চরমোন্মেষ ঘটেছে এবং এই কারণে উপনিষদ্ হল বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রধান চরমোৎকৃষ্ট অংশ। মূলতঃ জ্ঞান মার্গের তত্ত্বালোচনা উপনিষদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলেও কর্মমার্গ, যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের অপূর্ব সমন্বয়সাধন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে উপনিষদ্ সাহিত্যে। উপ পূর্বক নি পূর্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়যোগে উপনিষদ্ শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ- যে বিদ্যা সংসার বাসনাকে বিশীর্ণ বা শিথীল করে, যে বিদ্যা অবিদ্যাবিনাশপূর্বক পরব্রহ্মে নিকট উপনীত করায়, যে বিদ্যা আসক্তির হেতুকে অবসন্ন করে বা নিস্তেজ করে দেয়, যে বিদ্যা সত্ত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে নিয়ে যায়, সেই বেদবিদ্যাই হল উপনিষদ্। উপনিষদ্ বেদের অন্ত্যে বা অন্তিমে অবস্থিত। সেইকারণে, উপনিষদ্ বেদের সারভাগ বা চরমাংশ এবং বেদান্ত নামেও প্রসিদ্ধ। রহস্যবিদ্যা নামেও পরিচিত উপনিষদ্। মুক্তিকোপনিষদনুসারে উপনিষদের সংখ্যা ১০৮টি। কিন্তু বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতে, সর্বমোট উপনিষদের সংখ্যা প্রায় ২০০। আচার্য শঙ্কর যে দশটি বা মতান্তরে এগারোটি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন, সেই উপনিষদ্ সমূহকে মুখ্য বা প্রধান উপনিষদ্ বলা হয়। অপরদিকে, শঙ্করাচার্য যে সমস্ত উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সেই উপনিষদ্ সমূহকে গৌণ বা অপ্রধান উপনিষদ্ বলা হয়। মুক্তিকোপনিষদ্ অনুসারে বলা হয় প্রধান উপনিষদ্ দশটি। সেখানে উদ্ঘোষিত হয়েছে -

ঈশা-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডুক্য-তিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ং ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা।।

তথাপি উল্লেখনীয় যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ মুখ্য না গৌণ- এ নিয়ে গবেষকমহলে বিতর্ক বিদ্যমান। কেননা, এই উপনিষদের প্রাপ্ত ভাষ্য শঙ্করাচার্য কর্তৃক বিরচিত কিনা- এ নিয়ে সন্দেহ বর্তমান। মুখ্য উপনিষদের সময়কাল নির্ধারণ করা হয় আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তথাপি অধিকাংশ গবেষকের মতে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ মুখ্য উপনিষদের মতোই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গবেষণাপত্রে যথাক্রমে দশটি মুখ্য উপনিষদ্ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রতিফলিত বিশ্বসংস্কৃতিভাবনার তত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই সকল উপনিষদেই বিশ্বসভ্যতার তথা মানবীয় সভ্যতার, সংস্কৃতির, শান্তির, প্রেমের এবং মৈত্রীর বাণী প্রচারিত হয়েছে। এমন দুর্লভ ও অমোঘ সুস্থ সাংস্কৃতিকচিন্তা বিশ্বের সংস্কৃতভিন্ন সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য। এই বিষয়টি অন্তরের আকুতি দিয়ে অনুভব করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়।।

জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ হলে পরে সত্য-অসত্য বিষয় অনুভব করা যায়। সত্যবস্তুকে গ্রহণ এবং অসত্য অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুকে বর্জন করাই হল জ্ঞানীব্যক্তির উচিৎ কর্ম। সত্যের অন্তরালে পরমসত্য, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা হল প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান। এরূপ জ্ঞান অন্তরে উদ্ভাসিত হলে ভেদভাব দূরীভূত হয়, বিবিধের মাঝে ঐক্য অনুভূত হয়, বিশ্বসাংস্কৃতিক বোধ জাগরণপূর্বক বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সুস্থভাবনার মেলবন্ধন ঘটেছে উপনিষদে।

ঈশাবাস্যোপনিষদ্ বা ঈশোপনিষদ্ হল শুক্লযজুর্বেদীয়বাজসনেয়ীসংহিতোপনিষদ্। ঈশা বা ঈশাবাস্য- শব্দ দিয়ে এই উপনিষদের শুভারম্ভ হওয়ার কারণে নামকরণ হয়েছে ঈশোপনিষদ্ বা ঈশাবাস্যোপনিষদ্। সমগ্র বিশ্ব একই পরমসত্তার বিবিধ রূপের দ্বারা তিনিই পরিব্যাপ্ত। তাই তাঁকে জেনে নিজের অন্তরে সঞ্চিত মলিনতার অন্ধকার দূর করে, কারও সম্পত্তিতে লোভ না করে পরমাত্মাকে পেয়ে অনন্ত সুখভোগ করা যায়। এইকারণে ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে উদ্ঘোষিত হয়েছে–

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।[2]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপর্যুক্ত শ্রুতিটির অভিনব ব্যাখ্যা করে ধর্ম গ্রন্থের ততঃ কিম্ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন– ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন জানিবে।... তিনি ত্যাগ যাহা করিতেছেন, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না। সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া, তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি মারামারি থামিয়া যায়। এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ রচনার জীবন নির্বাহের গোড়াকার কথা। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রের মাধ্যমেও বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই জগতে শাস্ত্রসম্মত কার্য করেই অর্থাৎ সৎ ও ন্যায়সম্মত কর্ম করেই শতবছর বাঁচতে ইচ্ছা করা উচিৎ। কেননা, কর্ম না করে কোনো মানুষ একমুহূর্তও বাঁচতে পারে না। তাই, সৎ কর্ম বা নিষ্কাম কর্ম করা বাঞ্ছনীয়। যিনি বাঁচতে চান অথচ সৎকর্ম বা নিষ্কাম কর্ম করেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষে অশুভ কর্মেই লিপ্ত হন এবং ফলস্বরূপ সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রটি হল–

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।[3]

ধর্ম গ্রন্থের ততঃ কিম্ প্রবন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন– কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তারপরে ব্রহ্মলাভের কথা, সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না। মানুষকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন ও সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়। কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে। পরবর্তী মন্ত্রেও বিশ্বসংস্কৃতির মূলমন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উচ্চারিত হয়েছে। ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন–

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।(ঈশোপনিষদ্ - ৩)

অর্থাৎ পরলোকে যে সকল অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত লোক আছে, আত্মার স্বরূপ যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা মৃত্যুর পর সেই সকল লোকে গমন করে। এই মন্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বকবি। তিনি মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে অনবদ্য ভঙ্গিতে পাশ্চাত্য মহাদেশের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন– সেখানে বিজ্ঞান আছে, বাহুবল আছে, অর্থবল আছে, বুদ্ধিবল আছে। কিন্তু তার দ্বারাও মানুষ রক্ষা পায় না। স্বাজাত্যের শিখরের উপরে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মনুষ্যত্বকে খর্ব করে, স্পর্ধা করে, রাষ্ট্রনীতিতে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিংস্রতায় শান দিতে বসে তখন মানবের ধর্ম আঘাত পায় এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে। ... এইসব আত্মম্ভরিরা আত্মহনো জনাঃ। এরা সেই আত্মাকে মারে যে আত্মা স্বদেশের বা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ নয়, যে আত্মা নিত্যকালের বিশ্বজনের। অতএব বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আত্মজ্ঞানহীন হলে চলবে না, হতে হবে

আত্মজ্ঞানযুক্ত। যেহেতু, যাঁরা কেবল অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁরা দৃষ্টিবিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করেন এবং যাঁরা কেবল বিদ্যার আলোচনা করেন তাঁরা অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যা– এই উভয়ের যাঁরা চর্চা বা আলোচনা করেন তাঁরাই কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যার সহায়তায় অমৃতত্ব লাভ করেন। আলোচ্য উপনিষদে ঝংকৃত হয়েছে–

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।।[4]

শিক্ষার মিলন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপর্যুক্ত শ্রুতিটির যথাযথ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে– পশ্চিম মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে, সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা। এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্বমহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করার উপায়। অতএব পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে। তাই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন– বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ... ইত্যাদি।

কেনোপনিষদ্ বা তলবকারোপনিষদ্ সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ঈশোপনিষদের মতোই এই উপনিষদেও কেন শব্দ দিয়ে সূত্রপাত। এইকারণে, আলোচ্য উপনিষদের নাম কেনোপনিষদ্। এই কেনোপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতি ভাবনার যথাযথ সংকেত পরিলক্ষিত হয়। যে ভাবনার সাথে মিশে যায় কবির ছন্দ, মনন, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। এমনই একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্র–

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।[5]

অর্থাৎ মানুষ যদি ইহলোকেই ব্রহ্মকে জানতে পারে তবে তার সত্য অর্থাৎ জীবনের সফলতা, পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। অপরদিকে, যদি এই আত্মাকে জানিতে না পারে তবে তার বিনাশ হয় অর্থাৎ সে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে সুখ-দুঃখ, জরা-মৃত্যুর অধীন হয়। অতএব, জ্ঞানীগণ সর্বভূতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে এই প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে অমৃতত্ব লাভ করেন। বিশ্ববোধ প্রবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মহতী উপনিষদ্ বাণীর অকৃত্রিম বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে– এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ– কাল্পনিকতা নয়।

কঠোপনিষদ্ কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত একখানি মহতী উপনিষদ্। কঠ নামক একজন ঋষি বেদের এই অংশের আচার্য, সেই কারণে এই অংশটির নাম কাঠক। সংশ্লিষ্ট উপনিষদের নাম কঠোপনিষদ্। এই উপনিষদেই সেই বিখ্যাত যম-নচিকেতা সংবাদ চিত্রিত হয়েছে। বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের জন্য, শ্রেয় ও প্রেয়ের চিরকালীন দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যম নচিকেতাকে বলেছেন–

অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।।
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।[6]

যম বললেন– শ্রেয়োমার্গ প্রেয়োমার্গ থেকে ভিন্ন, তেমনি প্রেয়োমার্গ শ্রেয়োমার্গ থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পাদক এরা উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে। এই উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁর মঙ্গল হয়। অপরদিকে যিনি প্রেয়োমার্গকেই গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হন। শ্রেয় এবং প্রেয় মানুষকে সম্মিলিতভাবে আশ্রয় করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ উভয়কে যথার্থভাবে পরীক্ষা করে পৃথক্ করেন। যিনি ধীর তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তমরূপে গণ্য করে তাকেই গ্রহণ করেন। কিন্তু, যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি শরীর ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রিয় পশু-পুত্রাদিরই গ্রহণ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচ্য মন্ত্রদ্বয়ের অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছেন মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে। তাঁর মতে, নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত

তাহলে এসব কথার অর্থ থাকতো না। সংগতভাবেই তিনি বলেছেন যে, যে জন জ্ঞানবিমুখ, আত্মমগ্ন সেজন বৃহৎ জগৎ থেকে কখনো আনন্দে বাঁচতে পারে না। যিনি সর্বভূতকে নিজ আত্মাতে এবং আত্মাতে নিজেকে দেখেন তিনিই প্রকৃতজ্ঞানী। তাঁর দ্বারা নির্বাচিত মার্গই শ্রেয়মার্গ। এই মার্গই সবার অনুসরণীয়। কারণ, শ্রেয়মার্গানুসরণের ফলে উপলব্ধি হয় সৎ, চিৎ, আনন্দময় পরব্রহ্মের সনাতন, শাশ্বত ও চিরন্তনরূপ। উপলব্ধি হয় যে, তিনিই সর্বকালীন নিত্য ও বাকি সমস্ত কিছুই অনিত্য বা মিথ্যা। এরূপ মতবাদের সমর্থন মেলে অপর একটি মন্ত্রে। সেটি হল-

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।[7]

এই আত্মা জন্মেও না, মরেও না। এই আত্মা কোনো কিছু থেকে উৎপন্ন হয় নাই। কোনো কিছু আত্মা থেকে উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ বা চিরবিদ্যমান। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমন অমূল্য বচন মানুষের অন্তরকে চিরকাল নাড়া দিয়ে এসেছে, জাগ্রত করেছে মানুষের অন্তরের মনুষ্যত্ববোধকে এবং আন্দোলিত করেছে বিশ্বসভ্যতার মনস্তরঙ্গকে। স্পর্শ করেছে রবীন্দ্রনাথের মতো মহান ঋষিকবির অন্তরের অন্তস্তলকে। তিনি শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার স্বভাবকে লাভ প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন, অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়। কেন না, সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর। আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে না জন্মায় না মরে। আত্মার প্রকাশ প্রবন্ধেও কবি বলেছেন, আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে। আত্মা অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে। যাঁরা সাধু পুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্বান বলি না- তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ। সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। জীবনকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হলে আপনার কর্তব্য-কর্ম সঠিকভাবে জানতে হবে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে, ক্ষুরের ধারার মতো শাণিত দুর্গম ও দুরত্যয় পথ অতিক্রম করে মূল গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। সেইকারণে আলোচ্য উপনিষদে ধ্বনিত হয়েছে-

> আত্মানং রথিনং বিদ্ধি ... ।[8]
> এবং
> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।[9]

অথর্ববেদের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি উপনিষদ্ হল প্রশ্নোপনিষদ্। ভারদ্বাজ প্রভৃতি শিষ্যগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু আচার্য পিপ্পলাদকে ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নোপনিষদ্ বিবৃত করেন গুরু পিপ্পলাদ। অন্যান্য উপনিষদের মতোই এখানেও বিশ্বের অন্তর্নিহিত পরমসত্যের প্রাকৃত রূপের প্রকাশ ঘটেছে। তপস্যা থেকেই এই জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়েছে এবং তপস্যাই দুঃখের কারণরূপে বর্ণিত হয়েছে উক্ত উপনিষদে। যাঁদের মধ্যে তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে, যাঁদের মধ্যে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরাই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ ভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বচনানুসারে বলা যায়, বিশ্ব হতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হতে আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করলাম কিনা, অভয়লাভ করলাম কিনা, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হল কিনা ... এই অনুধাবন করলে আমরা যথার্থভাবে দেখব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছি, ব্রহ্মের দ্বারা নিখিল জগৎকে কতদূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখেছি। সমভাবনার প্রকাশ অনুভূত হয় আলোচ্য উপনিষদে-

> বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
> তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ ইতি।।[10]

বিশ্বের সকল চরাচর বস্তুতে সেই এক অক্ষর পরমাত্মা বিরাজমান এবং এক পরমাত্মাও সর্বভূতে বিরাজিত। এইভাবে সমদৃষ্টিতে জগৎকে অনুভব করলে দুঃখ-জরাগ্রস্ত সংসারী মানুষের শোক-মোহ দূরীভূত হয়ে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে, অর্থাৎ পার্সোনালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়, মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি।।[11]

রথনাভিতে যেরূপ অরসমূহ অন্তর্নিহিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপ কলাসমূহ পুরুষে অন্তর্নিহিত এবং আশ্রিত আছে। পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত কলাসমূহ থাকতে পারে না। সুতরাং পুরুষ যদি সত্যস্বরূপ হন তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও আশ্রিত কলাসমূহ মিথ্যা-মায়া-মরীচিকা হতে পারে না।

অথর্ববেদের অন্তর্গত অন্যতম একটি প্রখ্যাত উপনিষদ্ হল মুণ্ডকোপনিষদ্। বিশ্বসংস্কৃতিভাবনার মূলবাণী এই উপনিষদের বহু মন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। এমনই এক মন্ত্র–

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।।[12]

অর্থাৎ ওঁকার ধনু, জীবাত্মাই শর, ব্রহ্ম সেই শরের লক্ষ্য। প্রমাদহীন হয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। কবিগুরু ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম প্রবন্ধে আলোচ্য শ্রুতিটির অসাধারণ ব্যাখ্যা করেছেন– যখন শুভ্র সবল তনু আর্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু ও হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্যনিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা। ... প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ বাক্য কাহারো মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এইরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। ... সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্যযুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান-বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ববর্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সংস্কৃতপ্রেমী বিশ্বকবির অমোঘ লেখনীতে বারবার মুণ্ডকোপনিষদের বহু মন্ত্র আবর্তিত হয়েছে। বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যময় প্রাঙ্গনে ও রবীন্দ্রসাহিত্যে এই উপনিষদের একাধিক মন্ত্র এবং মন্ত্রাংশ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য একটি মন্ত্র–

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।।[13]

অর্থাৎ হৃদাকাশস্থিত আত্মা মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা। তিনি বুদ্ধিকে হৃৎপদ্মাকাশে স্থাপিত করে এই অন্ন-পরিপুষ্ট দেহে অবস্থিত আছেন। যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে আত্মাতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পান, তাঁকে বিবেকিগণ সম্যক্ জ্ঞান দ্বারাই পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র–

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।।[14]

অর্থাৎ সত্যই জয়ী হয়, মিথ্যা নয়। সত্যের দ্বারা লভ্য সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত, সেখানে আপ্তকাম ঋষিগণ যে পথে গমন করেন, সেই দেবযান মার্গও সত্যের দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে আস্তীর্ণ। এমন অপূর্ব বাণীর মহাসঙ্গম, এমন সর্বকালীন চিরন্তন সংস্কৃতির প্রতিফলন উপনিষদ্ সাহিত্যে পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ অথর্ববেদের অন্তর্গত বারোটি শ্রুতিবিশিষ্ট অতি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রধান উপনিষদ্। মাণ্ডূক্যোপনিষদের অতি প্রসিদ্ধ একটি মন্ত্র–

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।
অদৃশ্যমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং
শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।।[15]

অর্থাৎ ইনি বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা নন, অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতাও নন, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যবর্তী নন, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ নন, সর্বজ্ঞ নন, অচৈতন্য নন। ইনি দৃষ্টির অগোচর, লৌকিক ব্যবহারের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অনুমানের অযোগ্য, মনের অগোচর, প্রমাণ বহির্ভূত। কেবলমাত্র আত্মারূপে ইনি অনুভবযোগ্য, জগৎ-চরাচর হইতে ভিন্ন, শান্ত, শিব ও অদ্বৈত। ইহাকে চতুর্থ বা তুরীয় বলা হয়। ইনিই আত্মা এঁনাকে জানতে হবে। দুঃখ প্রবন্ধে কবিগুরু বলেছেন– উপনিষৎ বলিয়াছেন, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এইসমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে। ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন।

একটি প্রকাশ জগতে, আর একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং। শান্তং- আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না। এই যে চঞ্চল বিশ্ব জগৎ কেবলই ঘুরিতেছে ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপ আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলেই তিনি শান্ত। শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারের চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই। সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপন-পরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে। সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। অপর প্রবন্ধ শান্তং শিবমদ্বৈতম্- এ তিনি বলেছেন, প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্। তারপরে অদ্বৈতম্। এখানেই সমাপ্তি। ... মঙ্গল কর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, ... তখনই নম্রতা দ্বারা, ক্ষমার দ্বারা, করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান।

শীক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী- এই তিনটি অধ্যায়যুক্ত তৈত্তিরীয়োপনিষৎ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শাখার অন্তর্গত। আলোচ্য উপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতিভাবনার মূলবিষয়টি সুন্দরভাবে স্ফটিকীকৃত হয়েছে। বেদশিক্ষাসমাপনান্তে আচার্য তথা গুরু তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপদেশ দিয়েছেন-

> বেদমনুচ্যাচার্যোহন্তেবাসিনমনুশাস্তি- সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।।[16]

সত্য কথা বলবে। ধর্মাচরণ করবে। বিদ্যা নিষ্ক্রয়ের জন্য আচার্যের নিমিত্ত ধন আহরণ করে তা দক্ষিণাস্বরূপ দিবে। গার্হস্থে প্রবেশ করে সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে না। আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নবান হবে। উন্নতিলাভের জন্য মঙ্গলকর্মে প্রমাদগ্রস্ত হবে না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিষয়ে অমনোযোগী হবে না।

> দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নেতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নেতরাণি।।[17]

মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপর্যুক্ত অংশটি সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, যে ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে, তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসারযাত্রায় তার হৃদয়ের আতিথ্যে। তাই আমাদের শাস্ত্র বলে- অতিথিদেবো ভব। কেননা, আমার ভোগ সকলের ভোগ এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে, তার ঐশ্বর্যের সঙ্কোচ দূর হয়। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি, তার গৃহসীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। ...এই আতিথ্যের মধ্যে আছে সোহহংতত্ত্ব- অর্থাৎ আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আলোচ্য উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রুতিতেও মানুষের ধর্ম কেমন হওয়া উচিৎ, সে বিষয়ে সতর্কবাণী করা হয়েছে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,[18] রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।[19] এবং আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিশংবিশন্তীতি।[20]- এই ঔপনিষদিক সুমহতী বাণীর মাধ্যমে জলে-স্থলে-বনতলে আনন্দানুভূতির তথা আনন্দধারা প্রবাহিত হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। সঞ্চয় গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্মের নবযুগ প্রবন্ধে কবিগুরু সমানানুভূতি প্রকাশ করেছেন, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? ছিন্নপত্রাবলীতে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে ব্যক্ত হয়েছে- জগতের ভিতরকার একটা আনন্দের ক্রিয়া আমার মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই (সে আনন্দ

যতই ক্ষুদ্র যতই চঞ্চল হোক)- তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে আনন্দাদ্ধ্যেব-অভিসংবিশন্তি। একথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার জো নেই।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় শাখার দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় ঐতরেয় উপনিষদ্ নামে পরিচিত। এই উপনিষদে তিনটি অধ্যায় এবং সর্বসমেত পাঁচটি খণ্ড বিদ্যমান। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিরহস্যের বর্ণনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জন্মবৃত্তান্ত এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। বিবর্তনবাদী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ঐতরেয় উপনিষদের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, বিশ্বসংস্কৃতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল সর্বত্র একত্ব উপলব্ধি বা সমানানুভূতি। এরূপ ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিফলন বিদ্যমান আলোচ্য উপনিষদে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্র- এষ ব্রহ্ম এষ ইন্দ্রঃ এষঃ প্রজাপতিঃ এতে সর্বে দেবাঃ ইমানি চ পঞ্চভূতানি- পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি চেতরাণি চ- অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ- অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তীনঃ যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্- সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।[21] অন্তিমাংশে যে প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম- বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে সেই অংশটি মহাবাক্যরূপে উপনিষদ্ শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। কারণ, ইন্দ্রিয়াদি পঞ্চভূতাত্মক তত্ত্বসমূহ প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মদ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত অথবা এই সমস্তই তাঁর সত্তাই সত্তাবান। ব্রহ্মসত্তা থেকে স্বতন্ত্র বা তাঁর বাইরে কোনো সত্তা নাই। ব্রহ্মই নেতা আর সমস্তই তাঁর অধীন। প্রজ্ঞাই এঁদের প্রতিষ্ঠা- ব্রহ্মের জ্ঞানেই এদের স্থিতি। ভূপ্রভৃতি লোকও প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানে স্থিত, তাঁর সত্তাই সত্তাবান। এই কারণে প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। সুতরাং, বিশ্বের প্রতিটি পদার্থবিষয়ে যিনি যথার্থ জ্ঞানবান তিনি দুঃখমিশ্রিত পদার্থে আকৃষ্ট হন না। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি পরমানন্দপ্রাপ্ত হন। সেইকারণে প্রজ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ পদার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ঋষি শ্বেতাশ্বতর এই উপনিষদের প্রবক্তা। এই উপনিষদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতর শব্দের অর্থ সংযতেন্দ্রিয়। ইতিপূর্বে ভূমিকাংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই উপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য কিনা- এই নিয়ে সংশয় থাকায় অনেকে একে প্রধান বা মুখ্য উপনিষদ্রূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। তথাপি অনেক গবেষক একে মুখ্য উপনিষদ্রূপে স্বীকার করেছেন। এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বিশ্বসংস্কৃতিচিন্তনের বিষয় অনেক মন্ত্রে সুন্দরভাবে উপমাদ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধের তথা বিশ্বৈকত্ববোধের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচ্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একটি মন্ত্রে ঋষির দ্বারা উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে–

> যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
> শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।।[22]
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।[23]

হে ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠিত দেবতাগণ, তোমাদিগকে আমি নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা চিরন্তন ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত করছি। আমার এই স্তুতিগান সাধুলোকদের পথে বিবিধভাবে বিস্তারলাভ করুক। যাঁরা দিব্যস্থান অধিকার করে আছেন সেই বিশ্বদেবগণ আপনারা শ্রবণ করুন। অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ মহান পুরুষকে আমি জানি। তাঁকে জেনেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। পরমপদপ্রাপ্তির অন্য কোনো পথ নাই। কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের কবিতায় ঘোষণা করেছেন–

> তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
> আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
> কখনো নীলমহানদীর তীরে,
> কখনো পারস্যসাগরের কূলে,
> কখনো হিমাদ্রিতটে–
> বলেছে জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র,
> বলেছে দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
> আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের আবির্ভাব।

বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি কবিতাতেও কবিগুরু রবীন্দ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে -

অমৃতের পুত্র মোরা কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অন্তিম মন্ত্রেও ঝংকৃত হয়েছে যে, গুরুর প্রতি এবং ইষ্টবস্তুর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকলে উপলব্ধ বিদ্যা প্রকাশিত হয় এবং অন্তরাত্মা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রটি হল-

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।[24]

বৈশম্পায়নের শিষ্য তাণ্ড্য সামবেদের এক শাখার আচার্য। এই শাখার অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য নামে পরিচিত। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তিম আটটি অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদ্। যাঁরা ছন্দঃ বা বেদগান করতেন সেই সামবেদীগণ ছন্দোগ। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে কর্মাঙ্গ উপাসনার বর্ণনা এবং ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত প্রকৃত ব্রহ্মোপদেশ বিভিন্ন আখ্যানের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। এই উপনিষদের বিস্তৃতি বাহুল্যের কারণে নির্বাচিত কয়েকটি অংশ থেকে রবীন্দ্রালোকে বিশ্বসংস্কৃতি বিষয়কতত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষুদ্র চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যকাম-জাবালা সংবাদ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে কবিগুরু ব্রাহ্মণ কবিতায় পরিস্ফুট করেছেন-

ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে কহিলেন তিনি সত্যকাম,
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে-
গোত্র তব নাহি জানি।

অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে নাম, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় কোনো কিছুই বাধা নয়- এমন সত্য বাণী সেকাল-একাল উভয়ত্রই সত্য। এইসব বাধা হলে বিশ্বসংস্কৃতির যথাযথ পরিস্ফুরণ কখনই সম্ভব হয় না। এই মহতী চিরন্তন শাশ্বতবাণী যুগেযুগে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে এসেছেন। কোনো বস্তুজনিত সাময়িক সুখই মানবজীবনের পরম সুখ নয়। যা ভূমা অর্থাৎ মহান, সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ তাই সুখ। যাতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বিভাগ আছে তা অল্প। অল্পে সুখ নেই। ভূমাই সুখ, ভূমাকে জানবার নিমিত্ত ইচ্ছা করতে হবে। হে ভগবান্, আমি ভূমাকে জানতে ইচ্ছা করি। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।[25] শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার অন্তর্গত ভূমা প্রবন্ধে কবিগুরু উল্লেখ করেছেন- টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো না কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আত্মা বলতে পাড়ে আমার সব পাওয়া হল। অতএব যিনি ব্রহ্ম, যিনি ভূমা, যিনি সকলের বড়ো, তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিতে নয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের অন্তিম চতুর্দশ খণ্ড। ষষ্ঠাধ্যায়যুক্ত বৃহদাকারবিশিষ্ট এই উপনিষদে বিভিন্ন আখ্যানের উল্লেখও আছে। এই বৃহদারণ্যকোপনিষদে সেই বিখ্যাত মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে-

অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়।[26] অর্থাৎ অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। অপর একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র- তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।[27] এই আত্মতত্ত্ব পুত্র থেকে প্রিয়তর, বিত্ত থেকে প্রিয়তর, অপর সকল থেকেই প্রিয়তর। যেহেতু এই যে আত্মা ইনি অন্তরতর। বিশ্বকবি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে বলেছেন-

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,

আত্মার অন্তরতর, তদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সকল পার্থিব সম্পত্তি উৎসর্গ করে গৃহত্যাগ করতে চাইছেন। তখন মৈত্রেয়ী এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্বামীকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা চিরকাল বিশ্ববাসীর অন্তরে জাগরুক। নির্বাচিত মন্ত্রাংশটি হল–

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।
সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তমেব মে ব্রূহীতি।[28] শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের অমৃত কবিতায় ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন–

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেম তাকে,
ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন–
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত
এই তো নারীর পণ,
তুমি কী বল।

অপর একটি মন্ত্র-

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।[29]

ধর্ম গ্রন্থের প্রাচীন ভারতের একঃ প্রবন্ধে কবিগুরু উল্লেখ করেছেন– খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে, খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে, খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে, তেমনি খণ্ডতার মধ্যে মৃত্যু, শান্তি সেই একের মধ্যে। ...মন আপনার স্বাভাবিক ধর্মবশতই কখনো জানিয়া কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে, সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে।

উপনিষদ্ সাহিত্য এমনই এক অমোঘ সাহিত্য ও এমনই এক অমৃততুল্য সাহিত্য যে এই সাহিত্য অত্যন্ত নিবিড় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পাঠ করে বিশ্বের বিখ্যাত শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্সস্যুলার, উইন্টারনিৎজ প্রমুখ মনীষীগণ এই সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান মনীষীগণ নিজেদের জীবন চর্চা ও চর্যায় উপনিষদের বাণীকে মহৌষধির মতো প্রয়োগ করেছেন। বিশ্বের প্রতিটি গৃহকোণে, প্রতিটি মানুষের মনে উপনিষদের বীজ উপ্ত করেছেন। তাঁরা তথাকথিত কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম প্রচার করেন নাই, তাঁরা চেয়েছেন উপনিষদের বাণীকে নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষের ধর্ম তথা বিশ্বমানবতাবাদের বিকাশ ঘটাতে। কেননা, তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটলেই বিশ্বে সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন হবে এবং হিংসা-যুদ্ধ-বিশৃঙ্খলার উচ্ছেদ হলে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ, মৈত্রীভাব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং, আমরা আশা করি বিশ্বের প্রতিটি অমৃতের সন্তান ঔপনিষদিক বাণীর মর্মোপলব্ধি করে অসৎ থেকে সতের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং মৃত্যুর থেকে অমৃতের দিকে অগ্রসর হবে।

তথ্যসূত্র:

[1] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-১/১

[2] ঈশোপনিষদ্ - ১

[3] তদেব - ২

[4] তদেব - ১১

[5] কেনোপনিষদ্ – ২/৫

[6] কঠোপনিষদ্ – ১/১/১-২

[7] তদেব – ১/২/১৮

[8] তদেব – ১/৩/৩

[9] তদেব - ১/৩/১৪

[10] প্রশ্নোপনিষদ্ – ৪/১১

[11] তদেব – ৬/৬

[12] মুণ্ডকোপনিষদ্ – ২/২/৪

[13] তদেব – ২/২/৮

[14] তদেব – ৩/১/৬

[15] মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ - ৭

[16] তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, শীক্ষাবল্লী, ১১/১

[17] তদেব, শীক্ষাবল্লী, ১১/২

[18] তদেব, শীক্ষাবল্লী, ১১/১

[19] তদেব, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ৭/২

[20] তদেব, ভৃগুবল্লী, ৬/১

[21] ঐতরেয়োপনিষদ্ – ৩/১/৩

[22] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ – ২/৫

[23] তদেব – ৩/৮

[24] তদেব – ৬/২৩

[25] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৬/২৩/১

[26] তদেব – ১/৩/২৮

[27] তদেব – ১/৪/৮

[28] তদেব – ২/৪/২-৩

[29] তদেব -৪/৪/১৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১।উপনিষদ্ (অখণ্ড সংস্করণ)। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
২।গম্ভীরানন্দ, স্বামী। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩।
৩।গোস্বামী, সুবুদ্ধিচরণ। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতচর্চা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯।
৪।ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
৫।দত্ত, ভবতোষ। ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৯৯৬।
৬। ভট্টচার্য, সুখময়। সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 155-160
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.191

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন এবং পাশ্চাত্যে এর প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ

ড. আনন্দ ঘোষ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জি.এল. চৌধুরী কলেজ, বরপেটা রোড, অসম, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Swami Vivekananda is one and unique. He had a profound influence on Western culture and thought by promoting Vedanta and Indian spirituality in the West. His influence in America was far-reaching, which spread throughout the world through his eloquence, preaching Vedanta, and establishing the Ramakrishna Math and Mission. As a representative of neo-Vedanta, he gave a modern interpretation of Hinduism and proposed to combine the spiritual wisdom of the East with the science and technology of the West. Through his teachings, the spiritual foundation of nationalism was laid in India and he acted as a cultural bridge between the East and the West.

Swamiji, through his lectures in the West, spread the message of unity, love, service, and self-realization among mankind, which gave a new direction to Western spirituality. He was not only a spiritual ambassador of India; he was a modern saint of the world. He preached Hinduism worldwide, but his message was for all - a universal faith based on unity and the values of Vedanta, which gained wide popularity in America. Swamiji's influence on the spiritual world of the West is remarkable. The Vedanta Society in the United States acted like a magnet, and many prominent intellectuals and writers were attracted to this society and played a major role in spreading Swamiji's message of Vedanta in American culture. In my paper, I will try to analyze how Swami Vivekananda's philosophy of Vedanta has influenced Western spiritual thought and consciousness.

Keywords: Spiritual, Vedanta, Philosophy, Religion, Science

স্বামী বিবেকানন্দ এক ও অদ্বিতীয়। আমেরিকায় তাঁর প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা তাঁর বাগ্মীতা, বেদান্ত প্রচার ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সংসদে তাঁর বক্তৃতা আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের প্রবেশদ্বার খুলে দিয়েছে।তাঁর প্রচেষ্টায় আমেরিকায় আধ্যাত্মিকতা ও বেদান্তের প্রসার ঘটায় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাব বৃদ্ধি করে। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে তাঁর জাতীয় পরিচয়ের মূল হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং পশ্চিমাদের বস্তুবাদের বিপরিতে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তিকে বিশ্বের সামনে স্থাপন করেছেন।পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চেতনায় স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন, যেখানে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বিশেষ করে বেদান্ত, পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সমন্বিত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বেদান্ত ও যোগকে পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিত করিয়েছেন, যা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাজের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সমাজে আধ্যাত্মিকতা, যোগ ও বেদান্তের প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে এই ক্ষেত্রগুলোতে অনেক কাজের পথ খুলে দেয়। তাঁর বক্তৃতায় তিনি

ধর্মের ভিন্নতার মধ্যে এক অভিন্ন ঐক্য এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধার বার্তা দেন, যা আমেরিকান সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে ছিল। তাঁর আধ্যাত্মিকতা, করুণা এবং আত্মোপলব্ধির শিক্ষা আমেরিকান সমাজে আধ্যাত্মিক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। আমার এই আলোচনা পত্রটিতে বহির্বিশ্বে স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ও বেদান্ত দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস করব।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য: আমার আলোচনা পত্রটির মধ্যে আমি পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চেতনার জগতে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস করব।

অধ্যয়নের উৎস: আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে মুখ্য উৎস হিসেবে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থ গ্রহন করা হয়েছে এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অধ্যয়নের পদ্ধতি: আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আলোচনা:

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর প্রভাবের ইতিহাস: ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী যখন প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, তখন সেই আমেরিকা অনেক দিকেই ছিল অত্যন্ত পুরানো পন্থী। রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন সরকারিভাবে দাস প্রথা সরিয়েছিলেন বিবেকানন্দ আসার ৩০ বছর আগে কিন্তু সেই অমানবিক প্রথাকে সত্যি সত্যি শেষ করতে যে রক্তাক্ত সিভিল ওয়ারের (Civil War) প্রয়োজন হয়েছিল সেটা আরো দুবছর চলেছিল। শুধু তাই নয়, যেসব আফ্রিকান-আমেরিকান দাসেরা মুক্তি পেয়েছিল, তাদের এবং তাদের বংশধরদের অন্য সব নাগরিকদের সঙ্গে সমান অধিকার পেতে আরো বহু বছর লেগেছিল। আজও বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকায় দেখা যায়, যেমন দেখা যায় পৃথিবীর অন্য বহু প্রান্তে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইন কানুনে অনেক কিছুই বদলে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে বা মনে সত্যিকারের স্থায়ী পরিবর্তন আসতে অনেক বেশি সময় লাগে। ধর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে যেসব প্রগতিশীল খ্রিস্টানরা *ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ান্স* (১৮৯৩)এর আয়োজন করেছিলেন, যেখানে বিবেকানন্দ তার কালজয়ী বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁরা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল প্রধানত অন্য ধর্মকে হীন করে, খৃষ্ট ধর্মের প্রাধান্য দেখানোর জন্য। স্বামীজী এবং এশিয়া থেকে আসা অন্যান্য প্রতিনিধি, যারা বৌদ্ধ ধর্ম বা জৈন ধর্মের হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রধান দায়িত্ব ছিল সেই মত পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এটা জানানো যে সব ধর্ম এক লক্ষের দিকে ধেয়ে চলেছে-যেমন সব নদী এক অনন্ত শান্তির সাগরের দিকে বয়ে চলে। সেদিন স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবধারা; তাঁরই মাধ্যমে ওই ভাবগুলির সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ঐক্য রূপ লাভ করেছিল। প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে নিজ গুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ কালে যে ভারতীয় ধর্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, শিকাগো শহরে তাই তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। সে সময়ের হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট বলেছেন-

> "যখন তিনি সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকানদের ভগিনী ও ভ্রাতা বলে সম্ভাষণ করলেন, যখন সেই প্রাচ্য সন্ন্যাসী নারীকে প্রথম স্থান দিলেন এবং সমগ্র জগতকে নিজ পরিবার বলিয়া ঘোষণা করলেন, তখন সেই মহা সম্মেলনে আনন্দের যে শিহরণ সঞ্চারিত হয়েছিল তার বর্ণনা তৎকালে উপস্থিত বর্গের মুখে বহুবার আমি শুনেছি। তাই বলে আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি এভাবে সম্বোধন করার কথা ভাবতে পারেনি। সেই মুহূর্তে থেকে বোধহয় স্বামীজীর নিশ্চিন্ত সাফল্যের সূত্রপাত হয়েছিল।"[১]

যুক্তরাষ্ট্রে স্বামীজীর প্রভাব: আমেরিকানদের মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারা নিয়ে যথেষ্ট উৎসুক্য ছিল, আর ছিল আধ্যাত্মিক ক্ষুধা যা স্বামী বিবেকানন্দকে সাহায্য করেছিল একদল উদগ্রীব শ্রোতা পেতে। শুধু তাই নয়, এর জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন মার্কিন মূলকের লোকেদের কাছে। সেই সাহায্যের জন্যই স্বামীজী শিকাগোতে *বেদান্ত সোসাইটি* তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভারতে ফিরে গিয়েও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করতে পেরেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে *বেদান্ত সোসাইটি* একটি চুম্বকের মতো কাজ করেছিল এবং বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক এই সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বামীজীর বেদান্তের বাণী আমেরিকার সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে

দেওয়ার নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁরা স্বামীজীর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরাই আজকে পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নয়নের অন্যতম রূপকার।

বর্তমান কালে আমেরিকার এলিজাবেথ টাউন কলেজের অধ্যাপক জেফ্রি ডি. লং তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন-

> "ইংরাজী নিবন্ধক, ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক এ অল্ডাস হাক্সলি (ইনিও বেদান্ত সোসাইটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সেন্টারের সদস্য ছিলেন) নিজের বহু গল্প এবং পুস্তকে বৈদান্তিক ধারা ধরে রেখেছেন। তার প্রসিদ্ধ নিবন্ধ *দ্যা প্যারেনিয়াল ফিলসফি* স্বামী বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে এবং এটাও বলে যে সমস্ত ধর্ম এক বিশেষ উপলব্ধি দ্বারা সংযুক্ত।"[২]

এছাড়া আমেরিকার প্রখ্যাত লেখক জে. ডি সালিঙ্গার নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, যা স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ওই সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। *দা ক্যাচার ইন দ্যা রাই* (১৯৫১) লেখার জন্য সালিঙ্গার বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্বামী নিখিলানন্দের শিষ্য। তাঁর এই উপন্যাসে তিনি যুব সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও পাশ্চাত্য সমাজের অনেক প্রথাগত রীতির বিরোধিতা করেছিলেন। অধ্যাপক জেফ্রি ডি. লং আরও বলেছেন-

> "সালিঙ্গার পরবর্তীকালের অনেক লেখা যেমন *ফ্র্যান্নি অ্যান্ড জোই* তে প্রচুর বেদান্তের ছোঁয়া আছে। খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময় সালিঙ্গার হঠাৎ নিজেকে সোসাইটি থেকে সরিয়ে নেন এবং গত ২০১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এইটি যথেষ্ট আলোচনার বিষয় হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় যে তিনি জীবনের শেষ ৫০টি বছর ধ্যান করে আর *ভাগবদ্ গীতা* পড়ে কাটিয়ে দিয়েছেন।"[৩]

ভারতীয় নীতি এবং দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন আমেরিকার বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক হুস্টন স্মিথ এবং জোসেফ ক্যাম্পবেল। এছাড়া বর্তমানকালে বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের জন্য জর্জ হ্যারিসনকেও বিশেষ কৃতিত্ব দেওয়া হয়। হ্যারিসনের ভারতীয় দর্শনের প্রতি গভীর আকর্ষণ ভারতীয় সঙ্গীত থেকে জন্মায় এবং সেই সংগীতের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন তাঁরই বন্ধু এবং গুরু পন্ডিত রবি শংকর। অল্প সময়ের মধ্যেই হ্যারিসন নিজেকে পুরোপুরি হিন্দু চিন্তাধারা আর আচারে ডুবিয়ে ফেলেন। অধ্যাপক জেফ্রি ডি. লং হ্যারিসনের সর্ম্পকে বলেছেন-

> "১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন প্রথম ভারতে আসেন, তখন বেশিরভাগ সময় কাশ্মীরে একটি হাউসবোটে পড়াশোনা করে সময় অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি যে দুটো বই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং যেগুলি পড়ে সময় কাটিয়েছিলেন, সে দুটি বই পরমহংস যোগানন্দের *অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী* আর স্বামীজীর *রাজযোগ*। তিনি যতদিন সংগীত চর্চা করেছেন, ততদিন তার গানে যোগীসুলভ আর বৈদান্তিক বিষয়ের রেশ পাওয়া গিয়েছিল। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"[৪]

যদিও খুব কম সংখ্যক আমেরিকানই সরাসরি স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছেন বা তাঁর বাণীর সঙ্গে পরিচিত কিন্তু বৈদান্তিক চিন্তাভাবনা এদেশে যথেষ্ঠ গভীরে প্রবেশ করেছে সেই সব বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক এবং শিল্পীর হাত ধরে যারা স্বামীজীর লেখা বা বেদান্ত সোসাইটির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। স্বামীজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে যে সব আধ্যাত্মিক শিক্ষক মার্কিন দেশে এসেছেন, তাঁদের মাধ্যমেও বেদান্তের চিন্তা আমেরিকায় আজও বিদ্যমান। স্বামীজীর বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানযোগ আধ্যাত্মিক চেতনার উপর যথেষ্ট প্রভাবশীল। আমেরিকার আর একজন নামকরা বুদ্ধিজীবী, যিনি সরাসরি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন, তিনি হলেন উইলিয়াম জেমস, যিনি হারবার্ট ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যদিও বৈদান্তিক তত্ত্বের উপর কিছুটা সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর চিন্তাভাবনা আর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অধ্যাপক জেফ্রি ডি. লং এ সর্ম্পকে বলেছেন-

> "উইলিয়াম জেমস আমেরিকার প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেডের চিন্তার ওপর গভীর ছাপ ফেলে ছিলেন। হোয়াইট হেড আবার দর্শনের একটি পদ্ধতির জনক যার নাম *প্রসেস থট* । *প্রসেস থটে* র সঙ্গে বেদান্ত, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচুর মিল পাওয়া যায়। হোয়াইট হেডের চিন্তাধারায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব দেখা যায়।"[৫]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর যুগের মাধ্যমে পশ্চিম দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যে প্রভাবিত করেছেন, তার কয়েকটি নজির হিসাবে বলা যেতে পারে-স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত গান্ধীজীর সামাজিক ন্যায়ের জন্য আন্দোলন, যা আজ সমস্ত বিশ্বেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকরণীয়; দর্শন ও ধর্মশিক্ষায় মানুষের চিন্তা ভাবনাকে এক নতুন দিগন্ত দেওয়া; বিভিন্ন ধর্মচর্চাকে এক লক্ষ্যের বন্ধনে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা এবং যোগ ধ্যান করার অভ্যাসকে জনপ্রিয় করা। এইসব আন্দোলনই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন ও বাণীর সারমর্ম। স্বামীজী একবার বলেছিলেন-

> "এমনও তো হতে পারে যে, এই শরীরকে ত্যাগ করে আমার ভালই হবে- শরীরটাকে ব্যবহার করা কাপড়ের মত ছেড়ে ফেলব। কিন্তু আমার কাজ থামবে না! সব জায়গার মানুষকে আমি অনুপ্রাণিত করতে থাকব যতদিন না সারা পৃথিবীটা ঈশ্বরের স্মরণে যাচ্ছে।"[৬]

স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে পাশ্চাত্য মনীষীদের কাছে বেদান্তকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং বিশ্বের চিন্তা জগতে তাঁর জন্য এক সম্মানজনক স্থান অর্জন করা ঠিক কতখানি কঠিন ছিল তা বোঝা মুশকিল। স্বামীজীকে একদিকে ধর্মীয় গোড়ামী ও কুসংস্কারের প্রাচীর গুলি চূর্ণ করতে হয়েছিল, অন্যদিকে তাঁকে আধুনিক জগতের সমস্যা গুলি সমাধান করতে ও প্রয়োজন মেটাতে বেদান্ত কিরূপ অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক, তা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন বেদান্ত দর্শন কিভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটায়। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বেদান্তের নীতিগুলো জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে মানুষের উন্নতি সাধন করে। বেদান্ত দর্শন ছিল আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-বিকাশ ও মানব সেবার একটি শক্তিশালী ব্যবহারিক রূপ, যা মানুষকে তার ভেতরের দেবত্ব জাগিয়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। তাইতো মার্কিনমূলকে বেদান্ত সোসাইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজীর মুখ্য অবদান: বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজীর অবদান বহুমুখী; আমরা জানি তিনি দর্শনকে পশ্চিমা বিশ্বে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, ধর্মীয় সহনশিলতা ও সার্বজনীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন, ভারতের জাতীয়তাবাদের ধারণাকে প্রজ্বলিত করেছিলেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অর্ন্তনিহিত শক্তির উন্মোচনের কথা বলেছিলেন। আধুনিক চিন্তাধারা, পৃথিবীর ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের নিরিখে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে আমরা বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজীর বেশ কতকগুলো মৌলিক অবদান চিহ্নিত করতে পারি। তবে এখানে বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজির সমস্ত অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই আমি কেবলমাত্র কয়েকটি প্রধান অবদান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস করবো।

১) মানুষ সম্বন্ধে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি: স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর প্রাথমিক ও মুখ্য আগ্রহের বিষয় ছিল মানবজাতির উন্নয়ন, প্রগতি ও কল্যাণ। এই আগ্রহ শুধু দয়া বা সহানুভূতি-জনিত ছিল না, এটি আধারিত ছিল মানুষের প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে এক গভীর বোধের উপর। মানুষ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বৈদান্তিক ঐতিহ্য থেকে আহরিত হলেও, তার মধ্যে কিছু লক্ষণীয় নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথমত, স্বামীজী দেখেছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অনেক রকমের সম্ভাবনা থাকে- তার সবগুলি সম্বন্ধে সে নিজেও হয়তো অবহিত থাকে না। দ্বিতীয়ত, স্বামীজী দেখেছিলেন এই সব সম্ভাবনার মূল মানুষের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক মাত্রার মধ্যে নিহিত। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তার শরীরও নয়, তার মনও নয়, তার আত্মা। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঐশ্বরিক বা দেবত্ব বিদ্যমান এবং ধর্ম হলো সেই অর্ন্তনিহিত দেবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাঁর মতে, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। তিনি মানুষকে দুর্বল বা পাপী না ভেবে শুদ্ধ ও পূর্ণ সত্তা হিসেবে দেখতেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ভেতরের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে বিকশিত করার ওপর জোর দিতেন। তাঁর মতে প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বরূপে ঈশ্বর। জীবাত্মার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সামর্থের জন্যই মানুষ অন্য প্রাণীদের থেকে পৃথক। মানুষ সম্বন্ধীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজীর এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান।

২) ধর্মকে নতুন করে বোঝা: ধর্মের সম্ভাব্য সমস্ত দিক নিয়ে স্বামীজী যত গভীর ও ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছেন, আধুনিক পৃথিবীতে খুব কম লোকই তা করেছেন। ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত পর্যালোচনা করতে এক সমগ্র গ্রন্থের আবশ্যক। এখানে আমরা স্বামীজীর কয়েকটি মুখ্য অভিমতে উল্লেখ করছি- আধুনিক যুগে এগুলি ধর্মের অভিমুখী এক নতুন পথ নিরূপিত করেছে।

ক) ধর্ম এক প্রাকৃতিক ব্যাপার: স্বামীজী ধর্মকে দেখতেন এক প্রাকৃতিক ব্যাপার রূপে-ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা মানুষের ওপর আরোপিত এক সামাজিক সংগঠন রূপে নয়। মানুষের কিছু কিছু উচ্চতর অস্তিত্বমূলক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি লাভের স্বাভাবিক পথ ধর্মের মধ্য দিয়ে। এইসব উচ্চতর অস্তিত্বমূলক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আছে-মানুষের জীবনের অর্থ অনুসন্ধান, মানুষের সহজাত মুক্তি, নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা, মানুষের অমরত্ব লাভের সহজাত আকাঙ্ক্ষা-এইসব সাধারণ আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম এসব উচ্চতর অস্তিত্বমূলক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও পূরণ করার বিভিন্ন পথ।

খ) ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অভিন্নতা সম্পাদন: স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা অভিন্ন। দুটির মধ্যে মুখ্য প্রভেদ এই যে যেখানে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি অথবা লক্ষ্য প্রত্যক্ষ অনুভব, সেখানে ধর্মের ভিত্তি বিশ্বাস- কোন প্রবর্তক ধর্মগুরু, শাস্ত্র বা প্রশ্নাতীত মতবাদে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিকতা জোর দেয় অন্তর জীবনের উপর; আধ্যাত্মিকতা হলো জীবন বেঁচে থাকার অর্থ ও পরিপূর্ণতা লাভের জন্য ব্যক্তিগত অনুসন্ধান। ধর্ম জোর দেয় বর্হিজীবনের- প্রথা, অনুষ্ঠান, আচরণবিধি ইত্যাদি পালনের ওপর। স্বামীজী 'ধর্ম' শব্দটির প্রধানত আধ্যাত্মিকতার অর্থে ব্যবহার করতেন। তিনি বলেছেন-'আত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করাই ধর্ম',[৭] 'মানুষ কোন বিশেষ ধর্মমত লইয়া জন্মগ্রহণ করে না; ধর্ম তাহার ভিতরেই রহিয়াছে';[৮] 'ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতরে যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ'[৯] ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অভিন্নতা-সূচক স্বামী বিবেকানন্দের এই সব জোরালো উক্তি পাশ্চাত্যের জনগণের মনে গভীর অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল।

গ) ধর্ম বিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন: আধুনিক কালে প্রথম যে সকল চিন্তাবিদ ধর্ম ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন, স্বামীজী ছিলেন তাদের অন্যতম এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্তকে অনুসরণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য মনীষীদের আধুনিক বিজ্ঞান ও খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ওপর আধারিত ধর্মের পশ্চিমি ধারনার সামঞ্জস্য করার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানের মূল তথ্যসমূহের সঙ্গে বেদান্তের মূলগত ধারণার কোন বিরোধ নেই। বস্তুত স্বামীজী আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে ধর্মকেই বিজ্ঞানরূপে- চৈতন্য বিষয়ক বিজ্ঞানরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন।

ঘ) ধর্ম সমন্বয়: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় স্তরেই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়- প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এইসব অবদানের কয়েকটি আমরা সংক্ষেপে বলছি-

১) স্বামীজী তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়তত্ত্বের বিশ্বজনীন তাৎপর্য নিষ্কাশিত করে তা পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।।

২) তিনি ধর্ম সমন্বয়কে হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান আদর্শে পরিণত করেছেন। হিন্দুধর্মের মূল দর্শনকে বিশ্লেষণ করে এর সর্বজনীন ও মানবতাবাদী দিকগুলোকে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে তিনি হিন্দুধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

৩) স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে, ধর্ম সমন্বয়ের অর্থ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেকার প্রভেদ দূরীভূত করা নয়- সেগুলির সংরক্ষণ করা।

৪) স্বামীজী দেখিয়েছিলেন, শুধুমাত্র অন্য ধর্মকে সহ্য করলেই ধর্ম সমন্বয় আসবে না, বস্তুত সহিষ্ণুতা একটা নিম্ন শ্রেণীর মনোভাব। যা প্রয়োজন তা হলো 'গ্রহণ করা'-ধর্মীয় বৈচিত্রকে গ্রহণ করা, সমস্ত ধরনের বৈধতাকে গ্রহণ করা এবং সমস্ত ধর্মের ভাল দিলগুলিকে গ্রহণ করা।

৫) জগতের বিভিন্ন ধর্ম পরস্পর বিরোধী নয়- পরস্পর পরিপূরক।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সত্য তথা বেদান্ত দর্শনকেকে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবে জগৎ সভায় উপস্থাপিত করেছিলেন, তার সত্যিই তুলনা হয় না। ভারতবর্ষকে তিনি বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছে তিনি শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে 'সেবাধর্মের' কথা বলেছিলেন- আপামর জনসাধারণকে সেই যজ্ঞে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম সংস্কারের প্রধান আদর্শ ছিল ধর্মের সর্বজনীনতা, অর্থাৎ সব ধর্মের মধ্যেকার ঐক্য ও সহনশীলতাকে প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মের মাধ্যমে মানবজাতির সেবা করা এবং আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানকে সমন্বিত করে মানুষের মধ্যে শক্তি ও চরিত্র জাগিয়ে তোলা। তিনি হিন্দুধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা করে একে বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরেন এবং সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিতদের উন্নীত করার জন্য ধর্মকে এক

শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে *ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন* এর বিখ্যাত প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেন-

> "আমি গর্বিত যে, আমি এমন এক ধর্ম থেকে এসেছি, যে-ধর্ম সারা বিশ্বকে সহনশীলতা আর সবকিছুকে গ্রহণ করতে শেখায়। আমরা সার্বিক সহনশীলতায় বিশ্বাস করি এবং এটা মেনে নিই যে, সব ধর্মই সত্য।"[১০]

পরে আরেকটি বক্তৃতাতে তিনি বলেছেন-

> "অতীতের যত ধর্ম ছিল আমি সেই সব ধর্মকে মানি এবং সবার সঙ্গে পূজা করি। যে যেভাবে ঈশ্বরকে আরাধনা করে, আমিও তাকে সেই ভাবেই পূজা করি।"[১১]

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সব ধর্মের মূল লক্ষ্য এক এবং তা হলো মানবজাতির মঙ্গলসাধন করা। তিনি সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতার উপর জোর দিয়েছিলেন, যাতে কোনো ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু না হয়। এছাড়া স্বামীজী আধ্যাত্মিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে একত্রিত করার কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করা যায় না এবং এটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ১ম খণ্ড, ৪৫তম মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ২০২২, পৃ. ৪।
২. স্বামী চৈতন্যানন্দ (সম্পা)। উদ্বোধন, ১১৬তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ২০১৪, পৃ. ৭৫৩।
৩. তদেব, পৃ. ৭৫৩।
৪. তদেব, পৃ. ৭৫৪।
৫. তদেব, পৃ. ৭৫৫।
৬. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.v, Advaita Ashrama, Kolkata, 1970, P-414.
৭. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৮ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ১৩৬৯, পৃ. ৪৪০।
৮. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ১৩৬৯, পৃ. ২৪২।
৯. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ১৩৬৯ পৃ. ৪০০।
১০. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.v, Advaita Ashrama, Kolkata,1970, P-414.
১১. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.II, Advaita Ashrama, Kolkata,1971, P-374.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 161-166
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.192

জীবন জিজ্ঞাসা: ভারতীয় দর্শনের আলোকে একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

ড. মৈত্রী গোস্বামী, *স্বাধীন গবেষক, ঊষাগ্রাম, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 27.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author (s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

It is undoubtedly true that the Indian Philosophy explores deep questions about life and the world. The great thinkers of India across centuries have tried to enquire regarding the following questions, what is the nature of existence? what is the source of suffering (duḥkha)? how can suffering be overcome? what is the ultimate reality? These questions have been answered in many ways, leading to a variety of philosophical traditions. In this regard we can say that the orthodox (āstika) schools of Indian Philosophy like Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṃkhya, Yoga, Pūrva-Mīmāṃsā, and Vedānta—analyze the reality through logic, metaphysics, and spiritual discipline. And the heterodox (nāstika) schools of Indian Philosophy like Buddhism, Jainism, and Cārvāka—offer alternative explanations and rejected Vedic authority. The schools of Indian Philosophy proposed unique paths for the cessation of suffering and the attainment of liberation (mokṣa). We can see that, their methods differ, but all these systems share a common aim to make human beings understand the meaning of life, confront suffering, and move toward truth, knowledge, and liberation (mokṣa). This article offers a brief outline of the above discussion as discussed by the schools of Indian Philosophy. In this regard the article will focus the fundamental questions of existence and will show the diversity of answers to reach the intellectual depth and inclusivity of Indian thought.

Keywords: Sorrow, Cessation of sorrow, Means of cessation of sorrow, Liberation (moksha), God

ভারতবর্ষ বৌদ্ধিক সাধনার তীর্থক্ষেত্র। যুগে যুগে এই পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন স্থিতধী মুনি, ঋষিগণ। তাঁদের আত্মচেতনার দ্বারা উপলব্ধ সত্যের উপর ভর করেই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনার পথ প্রশস্ত হয়েছে, রচিত হয়েছে ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন। যার ফলশ্রুতি হল ভারতীয় দর্শন। ভারতীয় দর্শনে গভীর চিন্তার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জীবনবোধে পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শনচর্চার সূত্রপাত বেদের ওপর ভিত্তি করে হলেও বেদকে কেন্দ্র করে মতানৈক্যও পরিলক্ষিত হয়েছে। বেদকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য ভারতীয় দর্শন চর্চাকে দুটি ধারায় বিভক্ত করেছে। এই দুটি ধারা আস্তিক ও নাস্তিক নামে পরিচিত। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে আস্তিক ও নাস্তিক ধারা দুটি যে অর্থে আলোচিত হয় তা প্রচলিত অর্থের থেকে ভিন্ন। প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আস্তিক ও নাস্তিক ধারার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বেদের স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে আস্তিক ও নাস্তিক এই দুটি ধারার মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসায় তাঁদের আলোচনার ধারার গভীরতা আজও যেকোন জ্ঞান পীপাসু ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে। ভারতীয় দর্শন

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে ঠিকই, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়গুলির প্রতিটিই স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসার সহজ সরল ও বহুমুখী সমাধান অন্বেষণ করেছেন। আর সেকারণেই ভারতীয় দর্শনে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও সেই জিজ্ঞাসার নিরসনকল্পে বহুমুখী অনুসন্ধান প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। এই আলোচনায় পরমতত্ত্ব বিষয়ক, ঈশ্বর বিষয়ক, জগত অতিবর্তী আধ্যাত্মিক আলোচনা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি কার্যকারণতত্ত্ব, জড়বাদ, সুখবাদ ইত্যাদি নানা দার্শনিক তত্ত্বও স্থান পেয়েছে আলোচ্য বিষয় হিসেবে, যেগুলির সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা জিজ্ঞাসার বহুমুখী সমাধান ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি ভারতীয় দর্শনের আলোকে জীবন জিজ্ঞাসা বিষয়ক অতিসংক্ষিপ্ত একটি পর্যালোচনা করার প্রয়াস মাত্র। তবে এপ্রসঙ্গে যে কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন তা হল, বর্তমান প্রবন্ধটি একান্তভাবে উক্ত মতবাদগুলি বিষয়ক না হলেও প্রাসঙ্গিক স্থলে ভারতীয় দর্শনের উক্ত তত্ত্বগুলির আলোচনার ধারাকে উপজীব্য করেই আলোচনার বিস্তার ঘটানো হবে।

মানুষের জগৎ ও জীবন-এর রহস্য বিষয়ে প্রশ্ন করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। এই জীবন জিজ্ঞাসায় মানুষকে 'কোঽহম্' (আমি কে?) থেকে 'সোঽহম্' (আমিই সে) এর উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে। আর এই যাত্রাপথের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছে ভারতীয় দর্শনের। এই দর্শন পরম্পরায় পরিলক্ষিত হয় নানা বৈচিত্র্যের। বেদবিরোধী ও বেদানুসারী, জড়বাদী, ভাববাদী, ভোগবাদী ও পরহিতবাদী— এই মতগুলির দার্শনিক অবস্থান পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হিসেবে পরিচিতি পেলেও এগুলি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে একে অপরের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে। বলা যেতে পারে যার পরিণতি হল ভারতীয় দার্শনিক সংস্কৃতির। তাই ভারতীয় দর্শন চিন্তায় বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও একটি ঐক্যকে সুস্পষ্ট ভাবে সূচিত করে। এই ঐক্যের বিষয়টি হল জীবন ও জগতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে ভারতীয় দর্শন চিন্তার এই দিকটিও বিশ্লেষিত হবে।

দৃশ্ ধাতুর সাথে অনট্ প্রত্যয় যোগে 'দর্শন' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'দর্শন' শব্দটির অর্থ হল দেখা। তবে এই দেখা জীবনকে দেখা যা এক গভীর জীবনবোধের উপলব্ধি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় জন্ম দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের। মতবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও তা থেকেই রচিত হয়েছে বৈচিত্র্যময় ভারতীয় দার্শনিক সংস্কৃতির। তাই বলা যেতে পারে বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের কৃষ্টিতে, ঐতিহ্যে বা সংস্কৃতিতে যা প্রবহমান তাই ভারতবর্ষের দর্শন বা ভারতীয় দর্শন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় দর্শন বেদের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, তবে সকল দর্শন সম্প্রদায় যে বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেন তা নয়। যে সকল দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করেছেন তাঁরা নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় বা বেদনিন্দুক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এপ্রসঙ্গে মহর্ষি বৃহস্পতির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বেদ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক বেদের রচয়িতা, যথা ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর।[১] আবার তাঁদের এরূপ বক্তব্যও পাওয়া যায় যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবেদ ও ভস্মলেপন এগুলি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন লোকেদের জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র।[২] নাস্তিক চার্বাক দর্শনে ছত্রে ছত্রে বেদের বিরোধিতা পরিলক্ষিত হলেও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে কিন্তু সেই প্রভাব কিছুটা নমনীয়। নাস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হলেও বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে মানব জীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবনযাপন করার জন্য যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও পঞ্চমহাব্রতের কথা বলা হয় তা যে পুরোপুরি বৈদিক ভাবধারা রহিত একথা বলা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে কায়িক, বাচিক, মানসিক হিংসা থেকে বিরত থাকার উপদেশ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকেও বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের অহিংসা তত্ত্ব বেদানুসারী বলা যায়।

ভারতীয় দর্শন চর্চার সূত্রপাত জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে। 'আমি কে?'-এই জিজ্ঞাসা থেকে যাত্রাপথ শুরু করে সুখ কী? দুঃখ কী? সুখ ও দুঃখ এর প্রভেদ কী? এই প্রভেদ কি আদৌ বর্তমান? দুঃখ থেকে পরিত্রাণের

---

১ "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ", *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

২ "অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।", *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

উপায় কী? ইত্যাদি জীবন কেন্দ্রিক নানা প্রশ্ন এবং তার উত্তর অনুসন্ধান দার্শনিক মনকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে। এই জিজ্ঞাসাগুলি ভারতীয় দর্শনচর্চার রসদ জুগিয়েছে। যার ফলশ্রুতি হল বহুরূপী ও বহুমুখী ভারতীয় দার্শনিক সংস্কৃতি।

এই বহুমুখী চর্চার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানব জীবনের দুঃখ ও তার নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ। সুখবাদী চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য সকল দর্শন সম্প্রদায় দুঃখ বিষয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। অতিসংক্ষেপে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় কর্তৃক আলোচিত দুঃখ বিষয়ক আলোচনা করা যেতে পারে এভাবে। প্রথমেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় সাংখ্য দর্শনের আলোচনা করা যেতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* গ্রন্থে দুঃখের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, "...প্রতিকূলবেদনীয়ত্বং..."[৩]। বাচস্পতি মিশ্রের এই বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিকূলরূপে দুঃখের বোধ হয়, যা প্রত্যক্ষ অনুভবেই লব্ধ। এছাড়াও আপ্তবচনরূপে দুঃখের স্বীকৃতি তো আছেই। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকায়* ব্যবহৃত "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা...."[৪] এই পদগুলির মাধ্যমেও দুঃখের অস্তিত্বসূচক বার্তা রয়েছে। বাচস্পতি মিশ্র দুঃখ বিষয়ক আলোচনায় একথাও বলেছেন যে, "এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত, যদি দুঃখং নাম জাগতি ন স্যাৎ"।[৫] অর্থাৎ জগতে দুঃখ বলে যদি কিছু না থাকত তাহলে শাস্ত্র বিষয়ক জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হত না।

ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত দ্বাদশ প্রমেয়ের একটি অন্যতম প্রমেয় হল দুঃখ। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম দুঃখের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "বাধনালক্ষণং দুঃখম্"।[৬] সূত্রে উল্লিখিত 'বাধনা' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন, দুঃখ, পীড়া ও তাপ এগুলি সমার্থক। এই অর্থ অনুসারে যা জীবের প্রতিকূল রূপে অনুভূত হয় তাই দুঃখ। এপ্রসঙ্গে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হল "সোহয়ং সর্ব্বং দুখেনানুবিদ্ধমিতি....".[৭] ভাষ্যকারের এই বক্তব্যকে অনুসরণ করে বলা যায়, দুঃখের দ্বারা অনুবিদ্ধ বা অনুষক্ত যা কিছু সবই দুঃখ। ন্যায় দর্শনের সমানতন্ত্র দর্শনরূপে পরিচিত বৈশেষিক দর্শনেও দুঃখকে প্রতিকূল অনুভব বলা হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় প্রশস্তপাদভাষ্যে। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ তাঁর ভাষ্যে দুঃখের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "উপঘাতলক্ষণং দুঃখম্।"[৮] ভাষ্যে উল্লিখিত 'উপঘাত' শব্দের অর্থ হল যার দ্বারা ব্যক্তি উপহত বা ব্যথিত হত। অর্থাৎ যা ব্যক্তির প্রতিকূল তাই দুঃখ।

বৌদ্ধ দর্শনে যে চতুর্বিদ্ধ আর্য সত্যের কথা বলা হয় তার প্রথমটিই হল দুঃখ। অপর তিনটি আর্যসত্যগুলিও দুঃখকেন্দ্রিক। দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধ মার্গ।[৯] গৌতম বুদ্ধের উপলব্ধ সত্য 'জীবন দুঃখময়'। কিন্তু তিনি দুঃখেই থেমে যাননি। যার প্রমাণ উপরে উল্লেখিত অপর তিনটি আর্যসত্য। বৌদ্ধ দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *ধম্মপদের* বিভিন্ন বগ্‌গের একাধিক গাথায় দুঃখ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। *ধম্মপদে* জন্মগ্রহণ করাই যে দুঃখ সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে জরা বগ্‌গের অষ্টম গাথায়। এপ্রসঙ্গে ঐ গাথায় বলা হয়েছে "*দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং*"।[১০] অর্থাৎ, পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ দুঃখের। জন্ম গ্রহণের ফলেই মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে হয় এবং আমৃত্যু দুঃখ চলতে থাকে। জীবন দুঃখময় তবে জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস মানুষকে মুক্তিকামী করে তোলে বা দুঃখের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় অনুসন্ধানে ব্রতী করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় গৌতম বুদ্ধ কথিত চতুর্থ আর্যসত্যের কথা যা দুঃখমুক্তির উপায় বিষয়ক। এপ্রসঙ্গে পুনরায় *ধম্মপদের* মার্গ বগ্‌গের কথা বলা যেতে পারে। এই বগ্‌গে দুঃখমুক্তির উপায় হিসেবে অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে-

---

৩ *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, বাচস্পতি মিশ্র, *সাংখ্যকারিকা এবং সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (প্রথম খণ্ড), রজত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৫৪।

৪ *সাংখ্যকারিকা*, ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা এবং সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (প্রথম খণ্ড), রজত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ১৭।

৫ *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, বাচস্পতি মিশ্র, *সাংখ্যকারিকা এবং সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (প্রথম খণ্ড), রজত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৫৩ থেকে উদ্ধৃত।

৬ *ন্যায়সূত্র*, মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন*, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ২৩১।

৭ *ন্যায়ভাষ্য*, বাৎস্যায়ন, ঐ।

৮ *প্রশস্তপাদভাষ্য*, প্রশস্তপাদ, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৪৩৬।

৯ "আর্য্যসত্যাখ্যয়া তত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ।। দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।", *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ*, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৬৯।

১০ *ধম্মপদ*, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৭৭।

"মগ্‌গানট্‌ঠঙ্গিকো সেট্‌ঠো"। অষ্টাঙ্গিক মার্গের শ্রেষ্টত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে মার্গসকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ।[১১] আবার ধম্মপদের বুদ্ধ বগ্‌গে বলা হয়েছে *"যো চ বুদ্ধঞ্জ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো, চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্‌সতি। দুক্‌খং দুক্‌খসমুপ্পাদং দুক্‌খস্‌স চ অতিক্কমং, অরিয়ঞ্চট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গং দুক্‌খূপসমগামিনং। এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং, এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খো পমুচ্চতি"*। যদি কোন ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণ নেয়, দুঃখ, দুঃখের কারণ ও দুঃখের উপশমকারী অষ্টাঙ্গিকমার্গ এই আর্য্য সত্য চতুষ্টয় সম্যক্ জ্ঞানের আলোতে অবলোকন করে তাহলে এটিই নিরাপদ ও উত্তম আশ্রয়। এবং এই আশ্রয় অবলম্বন করলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব।[১২]

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখনিরোধ মার্গ রূপে উল্লেখিত অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলি হল, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। গৌতম বুদ্ধ বর্ণিত এই মার্গের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে উপেক্ষা না করে কীভাবে জ্ঞান এবং সঠিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নির্বাণ অর্থাৎ দুঃখ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়।

যদিও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চার্বাক দর্শন ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনে দুঃখ বিষয়ক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, তবুও একথা বলতেই হয় যে, চার্বাক দর্শনে যে দুঃখকে সর্বতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এমন নয়। জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরাও দুঃখ ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণের কথা বলেছেন। চার্বাক দর্শনে শাস্তি থেকে প্রাপ্ত দুঃখ থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। এই শাস্তি হল রাষ্ট্রের নিয়ম ভঙ্গ করার শাস্তি।[১৩]

মনুষ্য জীবনের দুঃখময়তা মান্যতা পেলেও, দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন পথকে বেছে নিয়েছেন। এই ভিন্নতার কারণ হিসেবে বলা যায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। ভারতীয় দর্শনে দুঃখ বিষয়ক আলোচনা কোনো মতবাদ নয় বরং তা বাস্তবতা বা অনিবার্য সত্য রূপে জীবন ধারণের সঙ্গে যুক্ত। বলা যেতে পারে ভারতীয় দর্শন দুঃখের উপস্থিতিকে অনিবার্য সত্য রূপে স্বীকৃতি দিয়ে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধানে প্রয়াসী। উক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলি দুঃখ বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি দুঃখ মুক্তির উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উপরে উল্লেখিত বৌদ্ধ দর্শনের দুঃখমুক্তি বিষয়ক আলোচনা একথার প্রামাণ্য দলিল।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় সাংখ্য দর্শনেও দুঃখ নিবৃত্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। বাহুল্য বর্জনের তাগিদে সংক্ষেপে সাংখ্য দর্শনে উল্লেখিত দুঃখ নিবৃত্তির ত্রিবিধ উপায়ের কথা বলা যেতে পারে এভাবে। দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়, আনুশ্রবিক বা বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ও ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ অর্থাৎ ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ এর ভেদ জ্ঞান। এর মধ্যে তাঁরা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ এর ভেদ জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মান্যতা দিয়েছেন। যোগ দর্শনেও সমাধি স্তরে উন্নীত হওয়ার উপায়রূপে বা সুখ-দুঃখহীন অবস্থায় স্থিত হওয়ার জন্য অষ্ট যোগাঙ্গ অনুশীলনের কথা বলা হয়।

জৈন দর্শনে কর্মকেই জীবের বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। এই বন্ধন দশা থেকে মুক্তির উপায় রূপে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র পালনের কথা বলা হয়েছে।[১৪] এছাড়াও মোক্ষ লাভের সহায়ক রূপে পাঁচটি কর্মের কথা বলা হয়েছে, যথা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ যা জৈন দর্শনে পঞ্চমহাব্রত নামে পরিচিত। ন্যায় দর্শনে মোক্ষকে অপবর্গ বলা হয়েছে। ন্যায়সূত্রে দুঃখ নামক প্রমেয়ের আলোচনার পরই অপবর্গ নামক প্রমেয়ের আলোচনা করা হয়েছে। অপবর্গ প্রসঙ্গে সূত্রকার মহর্ষি গৌতম বলেছেন, "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ"।[১৫] সূত্রে উল্লিখিত পদ

---

[১১] *ধম্মপদ,* চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ১৩৩।

[১২] *ধম্মপদ,* চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

[১৩] "A man can do anything—beg, borrow, steal or murder—in order to have more wealth and more pleasure. But the state laws prevent a man from doing whatever he likes and punishes him when he disobeys them. If he is clever enough to circumvent them, then his action is justified. Otherwise, he should follow them to avoid the pain of punsishment.", The Philosophical Traditions of India, P.T. Raju, page 92.

[১৪] "সম্যগদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ", *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৮৫।

[১৫] *ন্যায়সূত্র,* মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন,* ফণীভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ২৩৩।

অনুসারে এর অর্থ হয়, ‘তার’ থেকে অর্থাৎ দুঃখ থেকে অত্যন্ত বিমোক্ষ বা মুক্তিই হচ্ছে অপবর্গ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ‘তদ্’ বা তার বলতে এখানে কার কথা বোঝানো হয়েছে? এর উত্তরে ভাষ্যকার স্পষ্টত বুঝিয়ে দিয়েছেন এখানে তদ্ বলতে দুঃখকে বোঝানো হয়েছে। দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তি অপবর্গ। ন্যায় দর্শনে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভের সহায়ক বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে বৈশেষিক দর্শন ন্যায় দর্শনের সমানতন্ত্র। বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের হেতু বলা হয়েছে।[১৬] এখানে দ্রব্য, গুণ কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় এই ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের কথা বলা হয়েছে।

উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টতঃ বলা যায় যে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি দুঃখকে স্বীকৃতি দিলেও তাঁরা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুক্তি বা মোক্ষ লাভের উপায় রূপে ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান, বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মচেতনা বিকাশের কথা বলা হয়েছে। তাই ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তি অজ্ঞানতা দূরীকরণের পাশাপাশি, গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সাধনা, যা ব্যক্তিকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে তার প্রকৃত সত্তার স্বরূপ উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে।

এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে ওঠে, তা হল জীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে ঈশ্বর কি শুধুমাত্র কৌতুহল না কি পরম সত্তারূপে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা আছে? জাগতিক নানা জিজ্ঞাসার মতোই ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাও ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনার বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়েছিল। বলা যেতে পারে পরম সত্তা হিসেবে ঈশ্বর না সৃষ্টিকর্তা রূপে ঈশ্বর ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়েই জগত ও জীবন বিষয়ক আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশের অবকাশ এসে পড়ে। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর কখনো জগত স্রষ্টা, কখনো বা মুক্তির পথ প্রদর্শক, কখনো বা আবার কল্পনা মাত্র। কখনো বা কোনো ব্যক্তিই হয়ে উঠেছে ঈশ্বর সমতুল্য। ভারতীয় নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলি ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। তবে এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলতে হয় উক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে যে ঈশ্বর প্রসঙ্গ নেই তা কিন্তু নয়। জড়বাদী চার্বাক দর্শনে দেশের রাজা হলেন ঈশ্বর। অপরদিকে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে জগতের সৃষ্টিকর্তা রূপে ঈশ্বর স্বীকৃত না হলেও গৌতম বুদ্ধ এবং অর্হৎ ব্যক্তিকে এখানে ঈশ্বররূপে মর্যাদা প্রদান করা হয়।[১৭] তাঁদের মতে সিদ্ধ পুরুষের ধ্যান ও উপাসনা দুঃখ থেকে মুক্তি বা মোক্ষ লাভের সহায়ক। সিদ্ধপুরুষের ধ্যান সাধারণ জীবের চারিত্রিক শুদ্ধতা এনে দেয়। সুতরাং মোক্ষলাভের জন্য ঈশ্বর রূপে কোনো অতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

আবার একথাও ঠিক যে সকল আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় যে ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন এমন নয়। যেমন সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে জগৎ এর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়, বেদ ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদি এখানে মোক্ষ লাভের সহায়ক। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যোগ দর্শনের কথা। ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য দর্শনের সমানতন্ত্র রূপে পরিচিত হলেও যোগ দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। যোগ দর্শনে মোক্ষ লাভের সহায়ক উপায় রূপে ঈশ্বর প্রণিধানের কথা বলা হয়েছে। এই ঈশ্বর প্রণিধান একপ্রকার ভক্তি। এখানে যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বর প্রণিধানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা এবং ঈশ্বরে সকল কর্ম সমর্পণের কথা বলেছেন।[১৮]

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর হলেন জগতের সৃষ্টিকর্তা। আবার তাঁদের মতে জীব কর্ম অনুযায়ী পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয়। এই পাপপুণ্যের সমষ্টি ন্যায় দর্শনে অদৃষ্ট বলে পরিচিত। অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রক রূপেও ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান সত্তারূপে স্বীকৃত।

এই আলোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। কোন ক্ষেত্রে মুক্তির অনুপ্রেরণা, কোন ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা, আবার কোথাও কর্ম ফলের নিয়ন্ত্রক। ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা অপ্রয়োজনীয় এই আলোচনাও ভারতীয় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই আলোচনা না

---

[১৬] *প্রশস্তপাদভাষ্য,* প্রশস্তপাদ, বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃষ্ঠা ৩১ থেকে উদ্ধৃত।

[১৭] “সর্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষ স্ত্রৈলোক্য পূজিতঃ। যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোহর্হৎ পরমেশ্বরঃ।।”, *আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার,* হেমচন্দ্র সূরী, *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ,* সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৭৮।

[১৮] “তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ”, *যোগসূত্র,* মহর্ষি পতঞ্জলি, *পাতঞ্জল দর্শন,* শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৮৭।

করা গেলেও বলা যেতে পারে জীবন জিজ্ঞাসাকেন্দ্রিক আলোচনায় এবং দুঃখ নিবৃত্তির ক্ষেত্রে উপায় এবং লক্ষ্যরূপে ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

উপরিউক্ত আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে যেকথা বলা যায় তা হল, ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, এক অভিন্ন লক্ষ্যকে ধারণ করে মানব জাতিকে দুঃখের বাস্তবতার মুখোমুখি করে, আবার দুঃখ মুক্তির দিশাও নির্দেশ করে। মানব জীবন যে দুঃখে জর্জরিত তা কোনভাবেই ভারতীয় দর্শনে অস্বীকৃত হয়নি। সেই সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়েই ভারতীয় দর্শন নানা মত, নানা পথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছে যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও জ্ঞান, কোথাও কর্ম, কোথাও ঈশ্বরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন যেসকল দর্শন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে স্বীকার করেন তাঁরা দুঃখ মুক্তির পথে ঈশ্বরের করুণা ও আশ্রয়কে অনিবার্য বলে মনে করেন, আবার যেসকল দর্শনে ঈশ্বর অস্বীকৃত তাঁরা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে আত্মশুদ্ধির পথ দেখান। ফলত উক্ত আলোচনায় ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আপাত বিরোধ পরিলক্ষিত হলেও মূল উদ্দেশ্য মানুষকে পরম কল্যাণ ও মুক্তিলাভের পথে পরিচালিত করা। এই মুক্তি কেবল পার্থিব কষ্টের অবসান নয়, বরং এক শান্ত, সুখময় এবং চিরমুক্ত অবস্থার প্রতীক।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ন্যায়সূত্র (গৌতম), (প্রথম খণ্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ, (২০০৩), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

২. প্রশস্তপাদভাষ্যম্ (প্রশস্তপাদাচার্য), ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০১৭), কলকাতা: দামোদর আশ্রম।

৩. বাৎস্যায়নভাষ্য (বাৎস্যায়ন), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ (প্রথমখণ্ড), (২০১৪), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৪. বৈশেষিকসূত্র (মহর্ষি কণাদ), প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০০৪), কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৫. মীমাংসাসূত্র (জৈমিনি), ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, (২০০৬), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

৬. সাংখ্যকারিকা (ঈশ্বরকৃষ্ণ), শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০০৭), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৭. সর্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়), সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (প্রথম খণ্ড), (১৪০৭), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

ইংরেজী গ্রন্থ:

1. Chatterjee, S.C. and Dutta, D.M. *An Introduction to Indian Philosophy*. (2016), New Delhi: Motilal Banarsi Dass.
2. Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy*. (Vol. I- V), (1969), Cambridge University Press.
3. Raju, P.T. *The Philosophical Traditions of India*. (2009), Delhi: MLBD Publishers.
4. Sinha, Jadunath. *Indian philosophy*. (Vol. I & II), (2015) Delhi: MLBD Publishers.
5. Sharma, C.D. *A critical survey of Indian philosophy*. (2000), Delhi: MLBD Publishers.

সহায়ক গ্রন্থ

১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। লোকায়ত দর্শন। (২০১৯), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

২. চট্টোপাধ্যায়, লতিকা। চার্বাক দর্শন। (২০১৫), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা। (২০০৪), কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. ভট্টাচার্য্য, সুখময়। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন। (১৯৮৩), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৫. বসু, চারুচন্দ্র। ধম্মপদ। (২০২০), কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

৬. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়। (২০১৩), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No.167- 172
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.193

দুঃখ ও দুঃখ মুক্তির উপায়: ধম্মপদের আলোকে একটি সমীক্ষা

টোটন হাজরা, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 27.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author (s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Dhammapada is one of the Important texts of Buddhist philosophy as well as one of the examples of Buddhist ethical philosophy. We can say The *Dhammapada* is a guide to our life. *Dhammapada* is a compiled book, where the basic conclusions of Buddhist philosophy are mentioned in a simple and straightforward manner. The nature of suffering and the means of emancipation (Liberation) from suffering have been discussed in *Dhammapada*. This research article will try to show how the *Dhammapada* reflects the suffering of our life and how to get rid of that suffering. The main purpose of this article is to discuss how *Dhammapada* shows the path to the ultimate cessation of suffering. Keeping in mind the said purpose this research article will discuss and elaborate the study of suffering and the means of liberation from suffering analytically.

Keywords: Dhammapada, Noble Truths, Ignorance, Suffering, Liberation

দুঃখ যেমন একটি অনিবার্য সত্য, দুঃখ মুক্তিও একটি অনিবার্য সত্য। ভারতীয় দর্শনে এই দুটি অনিবার্য সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা, বিচার বা বিশ্লেষণ বিষয়ে নানা মুনীর নানা মত পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় ঋষিগণ এবিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করেছেন। বলা যেতে পারে প্রতিটি দৃষ্টিকোণই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বর্তমান প্রবন্ধটি দুঃখ এবং দুঃখ মুক্তির উপায় বিষয়ক, এবং এই আলোচনা *ধম্মপদ* নামক বৌদ্ধ দর্শনের একটি মূল্যবান গ্রন্থের আলোকে আলোচিত হবে। *ধম্মপদ* গ্রন্থটি গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং রচনা করেননি। তবে গৌতমবুদ্ধ নির্দেশিত উপদেশ ও শিক্ষা তাঁরই শিষ্যদের মাধ্যমে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। *ধম্মপদ* একটি জীবন চর্চা ও চর্যার আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে জীবন চর্চা ও চর্যার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত দুঃখ ও দুঃখ মুক্তি বিষয়ক গভীর আলোচনা। *ধম্মপদ* গ্রন্থটির আলোকে দুঃখ ও দুঃখ মুক্তি বিষয়ক একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাই হল বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধটির মূল উপজীব্য বিষয়।

গৌতম বুদ্ধ চারটি চরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, যা চারটি আর্যসত্য নামে পরিচিত। এই চারটি আর্যসত্য হল দুঃম, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি, এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। বলা যেতে পারে, গৌতম বুদ্ধের উপলব্ধ উক্ত চারটি আর্যসত্যই বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি।

তাঁর মতে মানুষের জীবনে দুঃখ অবিচ্ছেদ্য। জন্ম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন শুরু হয়। আর জন্ম গ্রহণ করার সাথে সাথেই মানুষ দুঃখের সঙ্গে ঘর করতে শুরু করে। এই দুঃখ চলতে থাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। জীবনে দুঃখ প্রবেশের পথ বিভিন্ন। যেমন- জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক ও মৃত্যু, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ এবং ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতা বা অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় জীবন যে দুঃখময়, তা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান বা বিদ্যার দ্বারা অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীবন যে দুঃখময় তা অনুভূত হয়। ফলে মানুষ

দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের পথ অন্বেষণ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধটি *ধম্মপদের* আলোকে দুঃখ ও দুঃখ মুক্তির উপায় অনুসন্ধান বিষয়ক। আলোচনার প্রথম পর্বে আলোচনার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে ধম্মপদের বিভিন্ন বগ্‌গের বিভিন্ন গাথায় উল্লেখিত দুঃখ বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করা হবে, এবং দ্বিতীয় পর্বে দুঃখ মুক্তির উপায় বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

জীবন যে দুঃখময় *ধম্মপদে* বিভিন্ন বগ্‌গে বিভিন্ন গাথায় তার প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জন্মগ্রহণ করাই যে দুঃখ বা দুঃখের সঙ্গে সম্পর্কিত তার উল্লেখ জরা বগ্‌গের অষ্টম গাথায় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- *"দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং"*।[১] অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখকর। জন্মের ফলেই মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। জন্ম না হলে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। জন্মগ্রহণের পর থেকেই আমৃত্যু দুঃখ চলতে থাকে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, মৃত্যু হলেই আর দুঃখ থাকে না। মানুষ জন্ম জন্মান্তরে দুঃখের আবর্তে আবর্তিত হয়ে চলেছে। জীবন দুঃখময় এ বিষয়ে সচেতন ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা করে। অর্থাৎ দুঃখের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় অনুসন্ধান করে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যে *ধম্মপদ* অবলম্বনে দুঃখের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার পথের অনুসন্ধান করা। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। জন্ম গ্রহণ করার ফলেই দুঃখ ভোগ শুরু হয়। তাই জন্ম রূপ দুঃখ সকল দুঃখের ভিত্তিভূমি। অন্যান্য দুঃখগুলি জন্মরূপ দুঃখের ওপর নির্ভরশীল।

জন্মগ্রহণ করার অর্থই হল দেহ ধারণ করা। বৌদ্ধ দর্শনের সকল কিছুই ক্ষণিক অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। তাই দেহও ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল। দেহ যখন শৈশব থেকে বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হয় তখন অনিবার্যভাবে দেহ জরা ও ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সবশেষে মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হয়। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও সকলে মৃত্যু ভয়ে দুঃখ পায়। তাই বলা যায়, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষের জীবনে দুঃখ নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে জরা বগ্‌গে পঞ্চম গাথার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে বলা হয়েছে- *"অট্‌ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্‌খো চ অহিতো"*।[২] তাৎপর্য এই যে, আমাদের দেহকে একটি নগরের সঙ্গে তুলোনা করে একটি সুন্দর উপমা দেওয়া হয়েছে। এখানে 'নগর' অর্থে ধানের মরাইকে গ্রহণ করা হয়েছে। ধান, মুগ প্রভৃতিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কাঠ দিয়ে কাঠামো প্রস্তুত করে লতা দিয়ে বেঁধে আর মাটি লেপে শস্য ভাণ্ডার তৈরি করা হয়। তেমনি আমাদের দেহ যেন একটি নগর, যা অস্থি দ্বারা নির্মিত হয়েছে। সেই নগরের চারপাশে রক্তমাংসের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। আর এই নগরের ভেতর জরা, মৃত্যু, অহংকার এবং কাপট্য বাস করছে। এই শরীর ধীরে ধীরে জরা, ব্যধি ও শেষে মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, যা পক্ষান্তরে আমাদের জীবনকে দুঃখময় করে তোলে। এইভাবে *ধম্মপদে* মানুষের জীবনে দুঃখ অর্থাৎ ব্যাধি, জরা, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগ যে আমাদের দুঃখ উৎপন্ন করে সেই প্রসঙ্গে পিয় বগ্‌গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাথাতে বলা হয়েছে— *"মা পিয়েহি সমাগচ্ছি, উপ্পিয়েহি কুদাচনং, পিয়ানং অদস্‌সনং দুকখং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্‌সং। তস্মা পিয়ং ন কয়িরাথ পিয়াপায়োহি পাপকো, গন্থা তেসং ন বিজ্জন্তি যেসং নত্থি পিয়াপ্পিয়ং"*। অর্থাৎ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তুর প্রতি কখন অনুরক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ প্রিয় বস্তুর অদর্শন এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন উভয়ই দুঃখজনক। সুতরাং প্রিয়ানুরাগী হবে না। প্রিয়বিচ্ছেদ অশুভ বা দুঃখস্বরূপ। যার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নেই তাঁর কোন বন্ধন বা দুঃখ নেই।[৩]

অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগ থেকে দুঃখ পাওয়ায় পাশাপাশি ঈপ্সিত বা কাম্য বস্তুর অপ্রাপ্তিতেও এক প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়, যাকে ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি নামক দুঃখ বলা হয়। আমাদের জীবন বিভিন্ন ইচ্ছা বা কামনার দ্বারা পরিচালিত হয়। তৃষ্ণা হল সমস্ত কামনার মূল। কামনা পূরণে আপাতদৃষ্টিতে সুখের জন্ম দিলেও শেষ পর্যন্ত তা দুঃখে পরিণত হয়। সুখের অস্থিরতার চিন্তায় সুখের প্রতি আকর্ষণ নষ্ট হয়, সুখ হারানোর ভয়, সুখ চলে যেতে পারে এই চিন্তায়। কামনার অপূর্ণতার ফলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই সম্পর্কে পিয় বগ্‌গের সপ্তম গাথাতে বলা হয়েছে—

---

[১] বসু, চারুচন্দ্র। *ধম্মপদ।* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০ পৃ. ৭৭।

[২] বসু, চারুচন্দ্র। *ধম্মপদ।* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০ পৃ. ৭৬।

[৩] তদেব, পৃ. ১০৫।

"কামতো জায়তে সোকো কামতো জায়তে ভয়ং"। অর্থাৎ কাম থেকে শোক উৎপন্ন হয়, কাম থেকে ভয় উৎপন্ন হয়।[৪] এই ভয় থেকেই দুঃখ উৎপন্ন হয়।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, *ধম্মপদে* বিভিন্ন গাথায় দুঃখ বিষয়ক আলোচনা থেকে একথাই প্রতিফলিত হয়, জীবন দুঃখময়। জন্মগ্রহণ করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। আমরা জন্ম গ্রহণ করার ফলেই দুঃখ পাই। তাই জন্ম নামক দুঃখই প্রধান। কারণ জন্ম না হলে অন্য দুঃখগুলির কোন সম্ভাবনা থাকে না। গৌতম বুদ্ধ কখনই মৃত্যু রোধের কথা বলেননি। কারণ আমাদের এই রক্ত মাংসের দেহ দিয়ে মৃত্যুকে রোধ করা কখনই সম্ভব নয়। তাই তিনি মৃত্যুকে রোধ করার পরিবর্তে জন্মকে কীভাবে রোধ করা যায় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কারণ যদি আমরা জন্ম রোধ করতে পারি, তাহলে জন্ম পরবর্তী দুঃখগুলি আপনা থেকেই রোধ হয়ে যায়। জন্ম গ্রহণ করলে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু রূপ দুঃখগুলি অবশ্যম্ভাবী হয়। দেহ থাকলেই সেই দেহে ব্যাধি, জরা থাকা স্বাভাবিক এবং দেহ যেহেতু ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল, সেহেতু দেহের শেষ অর্থাৎ মৃত্যুও স্বাভাবিক। দেহের ক্ষণস্থায়িত্বের জ্ঞান না হওয়ার জন্যই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু যে স্বাভাবিক তা মেনে নিতে পারি না। তাই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু জীবনে দুঃখ নিয়ে আসে। দেহ যে ক্ষণস্থায়ী এই জ্ঞানের উদয় হলে আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য তথা দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হই, যা পক্ষান্তরে পুনর্জন্মকে রোধ করে। আমরা জন্মগ্রহণ করলে বস্তুজগতের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হই। এই বস্তু জগতে এমন কতকগুলি বস্তু আছে যা আমাদের কাছে খুব প্রিয় এবং এই প্রিয় বস্তুকে যখন আমরা পাই তখন আমরা সুখ অনুভব করি। অন্য দিকে এই বস্তু জগতে এমন কতকগুলি বস্তু আছে যা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এই অপ্রিয় বস্তুকে পরিত্যাগ করে আমরা সুখ অনুভব করি। কিন্তু বস্তু জগতে সকল বস্তু ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল। তাই প্রিয় বস্তুকে গ্রহণ ও অপ্রিয় বস্তুকে বর্জনের মাধ্যমে যে সুখ আমরা পেয়ে থাকি সেই সুখও ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল। আর সুখ চলে গেলে দুঃখ সেই সুখের স্থান দখল করে। এইভাবে প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তু থেকে পক্ষান্তরে আমরা দুঃখ পেয়ে থাকি। জন্মগ্রহণের ফলেই আমরা বাহ্যিক বস্তুর প্রতি আসক্ত হই। এই আসক্তি থেকে বাহ্যিক বস্তুটিকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা পূরণ হয় না। এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের জীবনে দুঃখ বয়ে নিয়ে আসে। এই দেহ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বা সমাহার মাত্র। এই পঞ্চস্কন্ধও ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল হওয়ায় পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি স্বরূপ দেহের প্রতি আমাদের আসক্তি দুঃখের কারণ হয়।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে দুঃখ একটি অনিবার্য সত্য, তবে দুঃখ মুক্তি যে সম্ভব এটিও একটি অনিবার্য সত্য। দুঃখের কারণ অনুসন্ধান এবং দুঃখের কারণের নিবারণের মাধ্যমেই যে দুঃখ থেকে মুক্তি সম্ভব, গৌতম বুদ্ধ তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি দুঃখের কারণ নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করেছিলেন। বলা যেতে পারে দুঃখের অনুসন্ধান এবং দুঃখের কারণ নিবারণের উপায় অনুসন্ধান, যা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় তথা পথের সন্ধান করাই গৌতম বুদ্ধের দর্শনের মূল লক্ষ্য। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে জীবন দুঃখময়, এই উপলব্ধিই দুঃখ দূর করার প্রেরণা দেয়। *ধম্মপদ* বৌদ্ধ দর্শনের এমনই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যা জীবনে দুঃখের অনিবার্যতা দেখিয়ে সেই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় রূপে এমন এক জীবন চর্যার বার্তা দিয়েছে, যে জীবন চর্যায় ব্রতী হলে দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণ লাভ হয়।

জন্ম গ্রহণ করে দেহ ধারণ করার ফলেই আমরা দুঃখ পাই। কিন্তু এই দেহ দিয়ে সকল প্রকার দুঃখকে দূর করা যায়। অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য দেহের বিশেষ প্রয়োজন। দেহ দিয়ে আমরা জীবন যাপন করি। *ধম্মপদে* দেখানো হয়েছে কোন ধরনের মানদণ্ড বা মাপকাঠি তথা আদর্শ দ্বারা জীবন পরিচালিত হলে যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। *ধম্মপদের* প্রতিটি বগ্গেই তা প্রতিফলিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধে *ধম্মপদের* প্রতিটি বগ্গের আলোচনা সম্ভব নয়। তাই *ধম্মপদের* কিছু নির্বাচিত বগ্গের নির্বাচিত গাথার উল্লেখ করে দুঃখ মুক্তির উপায় আলোচনা করার প্রয়াস করা হল।

গৌতম বুদ্ধ দুঃখ থেকে মুক্তির লাভের পথপ্রদর্শক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করে দুঃখ মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছেন। *ধম্মপদের* মার্গ বগ্গে বলা হয়েছে— *"মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো"*। অর্থাৎ

[৪] বসু, চারুচন্দ্র। *ধম্মপদ।* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০ পৃ. ১০৫।

মার্গসকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ।[5] বলা বাহুল্য যে, এখানে মার্গ বলতে দুঃখ মুক্তি মার্গের কথাই বলা হয়েছে। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ হল বুদ্ধ প্রচারিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই পথ অবলম্বন করলে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আবার বুদ্ধ বগ্গের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ গাথায় দুঃখ থেকে মুক্তির পথ উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে—*"যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো, চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি। দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং, অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং। এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং, এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খো পমুচ্চতি"*। অর্থাৎ যদি কেহ বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণ লয় এবং দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের অতিক্রম ও দুঃখোপশমকারী আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ-এই চারিটি আর্য্য সত্য, সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দেখে তবে ইহাই নিরাপদ আশ্রয়, ইহাই উত্তম আশ্রয়। সেই আশ্রয় অবলম্বন করিলে সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।[৬] উক্ত গাথাগুলিতে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। মুক্তিকামী ব্যক্তিকে চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং জীবনের যাপনে নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলন করতে হবে, যা অষ্টাঙ্গিক মার্গের মূল শিক্ষা।

আমাদের দেহ রক্ত মাংসের একটি কাঠামো, যা ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল। এই ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল দেহের প্রতি আসক্তিই দুঃখের মূল কারণ। দেহের প্রতি আসক্তির কারণ জগত ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা, যাকে বৌদ্ধ দর্শনের পরিভাষায় অবিদ্যা বলা হয়। এই অবিদ্যাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মল বলা হয়েছে।(*অবিজ্জা পরমং মলং*)[৭] 'মল' শব্দটি অপবিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবিদ্যা এক প্রকারের মানসিক অপবিত্রতা। মানুষ জগত ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতাই মানুষকে দুঃখে নিমজ্জিত করে। ধম্মপদের বিভিন্ন বগ্গে মানুষকে জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। জগতের সকল কিছুই পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অনিত্য। এই অনিত্য বস্তুকে নিত্য মনে করে তার পেছনে ধাবিত হওয়ার ফলেই মানুষকে দুঃখ পেতে হয়। জগতের কোন কিছুর মধ্যেই স্থায়ী সত্তা নেই, সবকিছুই অনাত্ম। এই উপলব্ধিই মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি তথা নির্বাণ লাভের প্রেরণা দেয়। এ প্রসঙ্গে মগ্গ বগ্গের পঞ্চম গাথায় বলা হয়েছে— *"সব্বে সঙ্খরা অনিচ্চা'তি"* অর্থাৎ সকল সংস্কার অনিত্য।[৮] আবার মগ্গ বগ্গের ষষ্ঠ গাথায় বলা হয়েছে—*"সব্বে সঙ্খরা দুক্খা'তি"* অর্থাৎ সকল সংস্কার দুঃখজনক।[৯] এবং মগ্গ বগ্গের সপ্তম গাথায় বলা হয়েছে- *"সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি"* অর্থাৎ সকল ধর্ম বা পদার্থ অনাত্ম।[১০] মানুষ যখন প্রজ্ঞা অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা এই তিনিটি বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তার দেহের প্রতি সকল প্রকার আসক্তি দূর হয়।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রজ্ঞা বা সম্যক্ জ্ঞান দুঃখ মুক্তি তথা নির্বাণের এক অপরিহার্য শর্ত। এই প্রজ্ঞা বা সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হলে আমরা মুক্তি পথের পথিক হতে পারি। তবে শুধু সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হলেই মুক্তি তথা নির্বাণ লাভ হবে এমন নয়, এই সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে মন বা চিত্তকে সংযত করতে হবে। মন বা চিত্ত সংযত হলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি ক্লেশ থেকে মন বা চিত্ত মুক্ত হয়। সকল প্রকার ক্লেশ থেকে মুক্ত হলে মন বা চিত্ত শুদ্ধ হয়। মন বা চিত্ত শুদ্ধ হলে আমাদের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তথা নির্বাণ সম্ভব।

নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলনমূলক জীবন চর্যা দুঃখ মুক্তির সহায়ক। *ধম্মপদের* বিভিন্ন বগ্গের বিভিন্ন গাথায় এমন কতকগুলি নৈতিক গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা জীবন পরিচালিত হলে জীবনের যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত বুদ্ধ বগ্গে পঞ্চম গাথার উল্লেখ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে— *"সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস উপসম্পদা, সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং"*। অর্থাৎ কোন প্রকার পাপকর্ম না করা, কুশল

---

[৫] বসু, চারুচন্দ্র। *ধম্মপদ।* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০ পৃ. ১৩৩।

[৬] তদেব, পৃ. ৯৬-৯৭।

[৭] তদেব, পৃ. ১২০।

[৮] বসু, চারুচন্দ্র। *ধম্মপদ।* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০ পৃ. ১৩৪।

[৯] তদেব, পৃ. ১৩৫।

[১০] তদেব, পৃ. ১৩৫।

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, এবং আপন চিত্তকে নির্ম্মল রাখা, ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন। আবার বুদ্ধ বগ্গের সপ্তম গাথায় বলা হয়েছে— *"অনুপবাদো অনুপহগাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো, মত্তঞ্ঞুতো চ ভত্তস্মিং পন্থঞ্চ সয়নাসনং, অধিচিত্তে চ অযোগো এতং বুদ্ধানসাসনং"*। অর্থাৎ কাউকে নিন্দা না করা, কাউকে প্রহার না করা, শীল বা সদাচার পালনের মাধ্যমে চিত্তকে সর্বদা সুদৃঢ় রাখা। মিতাহারী ভোজন করা, নির্জন স্থানে বসবাস করা এবং মনকে সর্ব্বদা যোগযুক্ত রাখা, এগুলি বুদ্ধগণের আদেশ।[১১] কোধ বগ্গের প্রথম গাথায় বলা হয়েছে— *"কোধং জহে বিপ্পজহেয্যমানং সঞ্ঞোজনং সব্বমতিক্কমেয্য, তং নামরূপস্মিং অসজ্জমানং"*। অর্থাৎ ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে; সর্ব্ববন্ধন (কামরাগাদি) অতিক্রম করিবে।[১২] আবার কোধ বগ্গের তৃতীয় গাথায় বলা হয়েছে— *"অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে, জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং"*। অর্থাৎ ক্রোধকে অক্রোধ (ক্ষমা) দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করিবে, মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।[১৩] এবং চতুর্থ গাথায় বলা হয়েছে— "সচ্চং ভণে, ন কুজ্ঝয্যে, দজ্জাপ্পস্মিম্পি যাচিতো, এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে"। অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, ক্রোধ করিবে না; প্রার্থিত হইলে অল্প পদার্থও দান করিবে।[১৪] উক্ত গাথাগুলি মানুষের এক বিশেষ জীবন চর্যাকে সূচিত করে। এই জীবন চর্যায় এমন কতকগুলি নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলনের কথা বলে, যা মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ দেখায়।

আমাদের সকল প্রকার দুঃখের মূল ভোগতৃষ্ণা। সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের আকর্ষণে আবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ হীনধর্মে লিপ্ত হয়ে প্রমাদ বশত সকল প্রকার কুশল কর্ম করা থকে বিরত হয়। আমাদের জীবনের লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য লাভের উপায়, কুশল কর্ম, অকুশল কর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণাই মানুষের তৃষ্ণাকে উদ্দীপিত করে তাকে জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। মুক্তিকামী ব্যক্তিকে এগুলি পরিহার করতে হবে। লোক বগ্গে বলা হয়েছে— *"হীনং ধম্মং ন সেবেয্য পমাদেন ন সংবসে। মিচ্ছাদিট্ঠিং ন সেবায্য ন সিয়া লোকবদ্ধনো"*।[১৫] এই ভোগতৃষ্ণা সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা দূরিভূত হয়। আর এই তৃষ্ণার নিবৃত্তিই হল মুক্তি। সম্যক জ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তির চিত্ত, বাক্য, কর্ম সবই শান্ত হয়।[১৬] মানুষের স্বভাববশতঃ চিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় বা বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়। আমাদের দেহ নশ্বর, এই দেহ একদিন প্রাণশূন্য হয়ে তুচ্ছ আর অকিঞ্চিৎকর একটি কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় মাটিতে পড়ে থাকবে[১৭]- এই জ্ঞানের উদয় হলে বিক্ষিপ্ত চিত্ত যংযত হয়। এই যংযত চিত্ত সদাচার পালনের মধ্য দিয়ে রাগ, দ্বেষ, মোহ দুর করতে পারে। যার চিত্ত সংযত হয়েছে তাঁর বাক্যও সংযত হয়। প্রসন্ন চিত্তে কৃত সকল প্রকার কুশল কর্ম দুঃখ থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। অর্থাৎ সংযত চিত্তে সহৃদয়তা, সুনীতি, ধ্যান, ভক্তি, সেবা, সদগুণের বিকাশ, সদগুণের প্রশংসা, শাস্ত্র অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠান এবং অভ্রান্তি ইত্যাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করলে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য ব্যক্তিকে সদাচারী ও ধার্মিক হতে হবে। যে ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ধর্ম ও ন্যায়ের দ্বারা অপরকে পরিচালনা করে তিনিই ধর্মিক।[১৮] ধর্মিক ব্যক্তির মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও দম নামক গুণগুলি বর্তমান থাকে।[১৯] এই ধরনের ব্যক্তি নিজের কিংবা অপরের জন্য কোনরূপ বস্তু কামনা করেন না এবং অধর্মের পথে সমৃদ্ধি চান না। অর্থাৎ তিনি সকল প্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত। সুখ কিংবা দুঃখ কোন কিছু তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তাঁর কাছে সুখ কিংবা দুঃখ যাই আসুক না কেন উভয়কেই সমান জ্ঞান

[১১] বসু, চারুচন্দ্র। *ধম্মপদ।* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০ পৃ. ৯৩-৯৪।

[১২] তদেব পৃ. ১১১।

[১৩] তদেব পৃ. ১১২।

[১৪] তদেব পৃ. ১১২-১১৩।

[১৫] সেন, রণব্রত, *ধম্মপদ,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১১৩।

[১৬] সেন, রণব্রত, *ধম্মপদ,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৬।

[১৭] তদেব পৃ. ২২।

[১৮] তদেব পৃ. ১৫৬।

[১৯] তদেব পৃ ১৫৮।

করেন।[২০] এই ধ।রনের ব্যক্তি সহজেই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারেন। তাই বলা যায় *ধম্মপদ* গ্রন্থটিতে উল্লেখিত উপদেশাবলীগুলি আমদের জীবনের চর্চা ও চর্যায় পাথেয় করলে দুঃখময় জীবন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ আমাদের অজ্ঞতা বা অবিদ্যা। অবিদ্যাই আমাদের দুঃখ ভোগের মূল কারণ। এই অবিদ্যা দূর করার জন্য *ধম্মপদে* নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা পাথেয়। *ধম্মপদ* গ্রন্থটি বৌদ্ধ নীতিদর্শনের একটি উজ্জ্বল এবং অমূল্য রত্ন, যা প্রাচীন কাল থেকে মানুষের অন্ধকারময় জীবনকে আলোকিত করে আসছে। এই গ্রন্থটিতে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত মূল্যবান অনুসরণযোগ্য জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, এই গ্রন্থটি জীবন যাপনের জন্য একটি মৌলিক উপদেশাবাণী। এই উপদেশাবাণী একদিকে জীবন যে দুঃখময় এই অনিবার্য সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং একই রকম ভাবে দুঃখ মুক্তির পথ বা দিশা দেখায়, যায় মাধ্যমে মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপনের মান উন্নত করার পাশাপাশি জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চৌধুরী, সাধনকমল (সম্পাদিত ও ভাষান্তরিত)। বিশুদ্ধ মজ্ঝিমনিকায়। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।
২. চৌধুরী, সুকোমল। ভবচক্র ।(বৌদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য), ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৩. চৌধুরী, সুকোমল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৪. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী। পালী ত্রিপিটক। (বাংলা ভাষায় পালি ত্রিপিটকের সার সঙ্কলন) ।২০১১ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৫. চ্যাটার্জী, অমিতা কর্তৃক সম্পাদিত। ভারতীয় ধর্মনীতি। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, কলকাতা: এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ।
৬. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। বৌদ্ধধম্ম। প্রথম প্রকাশ, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৭. তর্কভূষণ, প্রমথনাথ। বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত্ব। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা: উদ্বোধন।
৮. বসু, চারুচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত। ধম্মপদ। সপ্তম সংস্করণ, ২০১০, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৯. ভট্টাচার্য, অমিত। বৌদ্ধ দর্শনম্। ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
১০. মহাস্থবির, আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ। বৌদ্ধদর্শনে সত্য-দর্শন। প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
১১. শীলভদ্র, ভিক্ষু। দীঘ নিকায়। প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
১২. সেন, রণব্রত। ধম্মপদ। প্রথম প্রকাশ, ১৮ জুলাই ১৯৭৪, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী।
১৩. Hiriyanna, M. Outline of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1994.
১৪. Chatterjee, S. C. and Dutta, D. M, An Introduction to Indian Philosophy. University of Calcutta, 1954.
১৫. Dasgupta, S. N. A History of Indian Philosophy (Vol. 1). Matilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi.

[২০] তদেব, পৃ. ৫৭।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 173-183
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.194

শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ছড়া ও আঞ্চলিক শব্দ

অলোক চন্দ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 18.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

We are discussing the rhymes and regional words used in the conversations of Shri Anukulchandra Chakravarty. By "conversation," we mean the exchange of words between two or more people. Through such conversations, we often come across rhymes, various metaphors, and diverse expressions. In Anukulchandra's dialogues too, we have found many such rhymes. While speaking, sometimes in response to questions or during deep reflections on life, his conversations brought forth many varieties.

Usually, the authors of traditional rhymes remain unknown. Yet, these rhymes serve as important documents of folk life. However, in the case of Anukulchandra Chakravarty, we find an exception. He created rhymes spontaneously while speaking, drawing inspiration from the flow of conversation. None of the rhymes he shared in his dialogues were pre-composed. Many people discussed life's questions, problems, and aspects of culture and tradition with him. It was through these discussions that the rhymes emerged. These rhymes not only have literary value but also offer solutions to many aspects of social life. We have attempted to discuss these rhymes and their literary significance in our main paper.

Along with the rhymes, we have also included regional words in our paper. There is a reason for this. Anukulchandra was born in Hemayetpur village in present-day Pabna district of Bangladesh. Naturally, he grew up hearing and speaking the local dialect of the Pabna region. His environment was immersed in that language. He used many local words from the Pabna dialect in his conversations. Needless to say, they came naturally to him. These regional words made his language more vibrant and livelier. Therefore, we have inevitably included a discussion of these regional terms in our paper.

Keywords: Conversation, Rhymes in the conversations, Relevance of rhymes, Regional words, Regional language

আলাপন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের মনে যেই বিষয়টি আসে সেটি হল, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথা-বার্তা। আমাদের সাহিত্যেও আমরা এই আলাপন লক্ষ্য করেছি। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন আমরা সাহিত্যের নানান ফর্মে দেখেছি। কোথাও কথোপকথন নিছকই প্রয়োজন পূরণ করেছে, আবার কোথাও প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়িয়ে সে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই সমৃদ্ধ করার পথে সে সঙ্গী করে নিয়েছে উপমা, ছড়া, বিভিন্ন অলংকার, আঞ্চলিক শব্দ, গল্প ইত্যাদি নানান বিষয়কে।

আমাদের আলোচনার বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি অনুকূলচন্দ্রের আলাপনে ছড়া ও আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার। আপাতদৃষ্টিতে দুটো আলাদা বিষয় মনে হলেও, আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী এই বিষয় দুটোকে একসঙ্গে

আলোচনা করলেই আলাপনের অন্তরের সহজ-সরল রূপ এবং এই সরলতার ভেতর দিয়ে তার সাহিত্যিক স্বাদুতা আমরা বুঝতে পারব।

বাংলা সাহিত্যে আলাপন তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে অনেক আগেই। সেই চর্যার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে। আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ছড়ার ভূমিকা, ছড়াগুলো কিভাবে এল এবং এর সাহিত্যিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। সেইসঙ্গে পাবনা অঞ্চলের কথ্য ভাষার ব্যবহার তাঁর ছড়া এবং আলাপের ভাষাকে কতখানি জীবন্ত করে তুলেছে সেটা নিয়ে। আমরা প্রথমেই আলোচনা করব ছড়া নিয়ে।

ছড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, ছড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রামাণিকতা কিছু পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয়, এক বা একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন ছড়ার পেছনে। পরবর্তীতে লোকমুখে প্রচারিত হতে-হতে সেগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এমনও অসম্ভব নয় যে, দুই বা তার বেশিজন মিলে একটা ছড়া তৈরি করেছেন আবার কোন ছড়ার প্রথম ও শেষ লাইনের মধ্যে অনেকদিনের সময়ের ব্যবধানও থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে যাই হোক, ছড়াকে বলা যায় লোকচর্যার দলিল। সহজ-সরল ভাবে, দৈনন্দিন জীবনের অনেক কথাকে, অনেক জটিল তত্ত্বকথাকে ছড়া তার সরল অবয়বে প্রকাশ করেছে।

ছড়ার উৎপত্তি এবং রচয়িতা সম্বন্ধে সঠিক দলিল আমাদের কাছে নেই। তবে এগুলো যে গ্রাম বাংলার ফসল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনের নানা দিক, বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভাল-মন্দ দিক ছড়ার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের ছড়াগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি যে, এগুলো তাঁর নিজের রচনা আর জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল সবকিছুই তিন সহজ-সরল ভাবে ছড়ায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছড়ার মধ্যে দিয়ে অনেক জটিল তত্ত্বকথাকে, সদাচারের বিভিন্ন তুকগুলোকে, রোজকার জীবনের খুটিনাটি অনেক বিষয়কে, না জানা কথাগুলোকে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরা।

অনুকূলচন্দ্রের ছড়া বলার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মানুষের মনের গভীরে ঢুকে তাদের আসল সমস্যার কথা বুঝতে চাইতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন,

> "ছড়াগুলির মধ্যে crude psychology (মৌলিক মনস্তত্ত্ব) অনেক আছে। এর দ্বারা একটা মানুষকে পুরোপুরি চেনা যায়।"[১]

শুধু তাই না, মানুষের ভাল-মন্দ, সমস্ত কিছুরই খতিয়ান সেখানে। একটা মানুষ নিজেকে নিজেই চিনে নিতে পারে ছড়ার মধ্যে দিয়ে। এইজন্যই অনুকূলচন্দ্র ছড়াগুলোকে 'জীবন-পঞ্জিকা' বলেছেন,

> "ওটা যেন একটা জীবন-পঞ্জিকার মতো।"[২]

ছড়ার ভাষার মধ্যে একটা সাবলীলতা আছে। আগাগোড়াই তিনি সহজপাচ্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। ভাষালক্ষী এখানে তার সাজ ছেড়ে সহজ ভূমিকায়। আসলে তিনি চেয়েছিলেন যে, ছড়ার ভাষা এমন হবে, যেন খুব সাধারণ মানুষও অন্য কারোর সাহায্য ছাড়া সেই বোধের জগৎ-এ পৌঁছাতে পারে। আর সেইজন্যই তিনি বলতেন,

> "ছড়ার কথাগুলি খুব ল্যাংটা আছে। যারা লেখাপড়া বেশী জানে না তারাও বোঝে।"[৩]

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ব্যবহৃত ছড়াগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। তাঁর বলা ছড়াগুলো অনুশ্রুতি গ্রন্থের ৭ টি খণ্ডে বিষয় অনুযায়ী লিপিবদ্ধ আছে। ছড়ার সংখ্যা ৮৯২৩ টি। এই ছড়াগুলোর মধ্যে একমাত্র যেগুলো আলাপনের প্রসঙ্গে এসেছে সেগুলি নিয়েই আমরা আলোচনা করব। আলাপনের সূত্র ধরে বা অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বা কথোপকথন প্রসঙ্গে অনেক ছড়া তিনি বলেছেন, আমরা শুধুমাত্র সেই ছড়াগুলো নিয়েই আলোচনা করব।

আমরা প্রথমে অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে আছে এমন কিছু ছড়া নিয়ে এখানে আলোচনা করব। সূত্রাকারে আমরা কিছু ছড়া এখানে তুলে ধরছি।

১. "তুমি যেমন রামের প্রতি
রামও তোমার | তেমনি,
ভাল করলে | ভাল পাবে
মন্দেও মন্দ | সেমনি।"[৪]
(দীপরক্ষী, চতুর্থ খণ্ড)

২."যা আছে কাজ সবগুলিকে
ত্বরিত কর নিষ্পাদন,
নইলে তুমি কোন্ ফাঁকেতে
হারিয়ে ফেলবে শুভক্ষণ।"[৫]
(দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড)

৩. "নিদেশ ব'য়ে চল্‌লি না তুই
অনুশীলন তো করলি না,
চর্য্যাক্রিয়া মর্জিহারা
সুফল তা'তে ফল্‌ল না।"[৬]
(দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড)

৪. "অবিদ্যা যা' জানাই উচিত
করণীয় নয়কো তা',
বিদ্যাটাই তো পালনীয়
বোঝায় করায় সর্ব্বথা।"[৭]
(দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড)

৫. "ভাগ্য ফোটে কোনখানে?
নিষ্ঠাপ্রীতির পরিচর্য্যায়
সৎ নিষ্পাদন যেইখানে।"[৮]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

৬. "ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট র'লে
ব্যতিক্রম তোরে ধরবে কি?
জীবনীয় পরাক্রমে
শিষ্ট চলায় বাড়বে ধী।"[৯]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

৭. "কৃতি ছাড়া আসে না ভৃতি
ভৃতি ছাড়া ধৃতি কোথায়?
ধৃতি যাহার নাইকো ভালে
বিভব সে-জন পাবে কোথায়?"[১০]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

৮. "সত্তাস্বস্তি রাখতে সুস্থ
সময়ে প্রতিষেধক নিও,
সাবধানেতে চ'লো ফিরো
অত্যাচারকে বিদায় দিও।"[১১]
(দীপরক্ষী, দশম খণ্ড)

৯. "এক লহমার একটু বেতাল
একটু বেসামাল,
দক্ষতাহীন বেতাল চলন
ভাঙ্গেই জীবনতাল।"[১২]
(দীপরক্ষী, দশম খণ্ড)

১০. "নিষ্ঠা যাতে যেমনতর
নেশাও সেথা তেমনি,
যেখানে যেমন নেশা থাকে
চলনও হয় সেমনি।"[১৩]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

১১. "নিষ্ঠা থাকলে নেশা হয়
নেশাই কিন্তু ঝোঁক,
অস্খলিত নিষ্ঠা যেমন
জীবনেও তেমনি রোখ।"[১৪]
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১২. "নিষ্ঠাভাঙ্গা চলন নিয়ে
চলিস নাকো কোনদিন,
অমৃত সে চলন হ'লেও
বিষিয়েই চলে দিন-দিন।"[১৫]
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১৩. "সারা জীবন যদি বেদপাঠ কর
কিছুই কিন্তু পাবে না,
যদি তাকে তুমি সমীচীনভাবে
না-ই কর কাজে সঞ্চারণা।"[১৬]
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১৪. "মনের তাফাল যতই থাকুক
সেগুলিকে বিনিয়ে নিয়ে,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
থাকিস্ চলতে হৃদয় দিয়ে।"[১৭]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

১৫. "শুধু পড়াতেই হয় নাকো পাঠ
হাতেকলমে করা চাই,
হাতেকলমে করবে যত
সত্তায়ও ফুটবে তেমনি তাই।"[১৮]
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১৬. "চলার ব্যাঘাত যেমনি এলো
আঘাত এলো ধেয়ে–
অদূরেই ঐ দুর্দ্দশাটি
চলে মিটির চেয়ে।"[১৯]
(প্রতুলদীপ্তি, প্রথম খণ্ড)

প্রথম ছড়াটিতে তিনি বললেন আমাদের ভাল-মন্দ সমস্তটাই নির্ভর করে আমাদের নিজেদের কাজের ওপর। আমরা ভাল কিছু করলে ভাল ঘটবে, আর মন্দ কাজের ফল মন্দই হবে। আবার পরের ছড়াতে তিনি স্পষ্ট করেছেন, যেকোন কাজ দ্রুত এবং সময় নষ্ট না করে, করে ফেলা উচিৎ। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ না করলে অর্থাৎ সময়ের কাজ সময়ে না করলে সেই কাজেরও মূল্য থাকে না।

তৃতীয় ছড়ায় তিনি নির্দেশ অনুযায়ী না চললে এবং অনুশীলন নির্ভর না হলে শুভ ফল যে পাওয়া যায় না সেই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। পরবর্তী ছড়ায় তিনি আমাদের অবিদ্যা এবং বিদ্যা দুটো বিষয়ই জানতে বলেছেন। অবিদ্যা জেনে সেগুলো না করা এবং বিদ্যা যেগুলো সেটা অভ্যাসে রাখার কথাই বলতে চেয়েছেন। আবার পঞ্চম ছড়াটিতে তিনি বলতে চেয়েছেন, সৎ ভাবে এবং যেকোন কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করলে তার বা তাদের অর্থাৎ যারা কাজটির সঙ্গে যুক্ত তাদের ভাগ্য ফোটে অর্থাৎ প্রসন্ন হয়।

ষষ্ঠ ছড়ায় অনুকূলচন্দ্র বলেছেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যদি আমরা ইষ্ট বা আদর্শকে নিয়ে চলি এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-পথে চলার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের 'ধী' (জ্ঞান)[২০] বৃদ্ধি পাবে। পরের ছড়াতে শব্দচয়নে তিনি পটুত্ব দেখিয়েছেন। কৃতি, ভৃতি, ধৃতি এবং বিভব শব্দগুলোকে নিয়ে, সেইসঙ্গে শব্দগুলোর অর্থকে পরস্পর যুক্ত করে আমাদের সবার জীবনের চলার পথকে নির্দেশ করেছেন। কৃতি অর্থাৎ সাধনা[২১] ছাড়া আমরা পূর্ণতা পেতে পারব না। আর জীবনে পূর্ণতা ছাড়া আমাদের চিত্ত স্থির হয় না। আর এই স্থিরচিত্ততাই আমাদের ঐশ্বর্য।

অষ্টম ছড়ায় তিনি সহজভাবে বলেছেন যে, আমাদের সত্তাকে সুস্থ রাখতে চাইলে সময়মত প্রতিষেধক নিতে আবার পরের ছড়াতে দক্ষতাহীনভাবে চলনে চললে, সেটা অল্প সময়ের জন্য হলেও আমাদের জীবনের ছন্দপতন ঘটতে পারে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ ছড়াতে অনুকূলচন্দ্র নিষ্ঠা নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিষ্ঠা যার প্রতি বা যেখানে থাকে, আমাদের জীবনও তেমনি হয়। আর আমাদের নিষ্ঠা যদি বিকৃত জিনিসের প্রতি হয় তাহলে আমাদের জীবন সেইভাবেই গড়ে ওঠে।

আমরা অনেকেই সারাজীবন ধরে নানা শাস্ত্র পাঠ করি। এইপ্রসঙ্গে অনুকূলচন্দ্র তাঁর ছড়াতে বলেছেন, আমরা যতই বেদ বা বিভিন্ন শাস্ত্র পড়ি না কেন, শাস্ত্রোক্ত কথাগুলো যদি বাস্তব জীবনে রূপায়ণ করতে না পারি তাহলে সবই ব্যর্থ হবে। পরবর্তী ছড়ায় তিনি মনের নানারকম সমস্যা থাকলেও সবসময় হৃদয় দিয়ে চলতে বলেছেন। আবার শুধু পুথিগত বিদ্যাই যে আমাদের জন্য সবকিছু না সেইসঙ্গে হাতে-কলমে বাস্তবে করার ভেতর দিয়েই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেই কথা তিনি ১৫ নম্বর ছড়ায় বলেছেন। আমাদের নির্বাচিত শেষ ছড়াটিতে তিনি আমাদের জীবনে চলার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি বললেন, আমাদের চলার ব্যাঘাত যখনই এবং যেই পথ ধরে আসে তখনই আমাদের জীবনেও বিভিন্ন রকম ব্যাঘাত নেমে আসে। আমরা অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপন থেকে আলাপনেরই প্রসঙ্গে যেই ছড়াগুলো এসেছে সেখান থেকে কিছু ছড়া নিয়ে এখানে আলোচনা করলাম। এই ছড়াগুলোতে তিনি জীবনে চলার পথের বিভিন্ন তুকগুলো আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

এবারে আমরা অনুকূলচন্দ্র তাঁর আলাপনে যেই সমস্ত ছড়া ব্যবহার করেছেন সেগুলোর ছন্দ নির্ণয়ের চেষ্টা করব। প্রথমেই আমরা তাঁর আলাপন থেকে কিছু ছড়া এখানে তুলে ধরছি। —

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
১. "হয়েছে যা' | সবই যে ভূত = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
তাতেই যে তোর | বসবাস, = ৪+৩
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ভূতেই যে তোর | জীবন-স্ফুরণ = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ভূতেই যে তোর প্রাণন-শ্বাস।"[২২] = ৪+৩
(দীপরক্ষী, চতুর্থ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
২. "চিন্তা-চলন | উন্মুখতায় = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
গুপ্ত বিরোধ | যা'র মনে, = ৪+৩
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
দৈন্যভরা উল্‌টো স্বপন = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
প্রায়ই ওঠে সেইখানে।"[২৩] = ৪+৩
(দীপরক্ষী, চতুর্থ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
৩. "ভক্তিনত | অন্তরেতে = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
দণ্ড যারা | ভিক্ষা নেয়, = ৪+৩
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
নিষ্ঠানিপূণ | কৃতিযোগে = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
উচ্ছলাতে | যায়ই যায়।"[২৪] = ৪+৩
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
৪. "নিষ্ঠা যদি | নিরেট না হয় = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
অস্খলিত | অনুরাগ, = ৪+৩
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
যত বড় | হোক না কেন = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ব্যর্থতা তার | থাকেই জেগে।"[২৫] = ৪+৪
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
৫. "অসৎ বুদ্ধির | ভাঁওতা দিয়ে = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
স্বার্থসেবায় | চলবি যত, = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
আসবে বিপদ | দরিদ্রতা = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
অমনি ক'রে | তেমনি তত।"[২৬] = ৪+৪
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
৬. "কোথায় কেমন | কী ভাব নিয়ে = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
কেমন করে | চলবে তুমি = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সব অবস্থায় | শিষ্টভাবে = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ঐটি করাই | নিষ্ঠাভূমি।"[২৭] = ৪+৪
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
৭. "থাকিস্ যদি | বাকপটু তুই = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
পূজার রকম | চালচলনে, = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
পটু তা'তে | নিজেই হবি = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সত্তাও র'বে | উচ্ছলনে।"[২৮] = ৪+৪
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
৮. "তাড়ন-পীড়ন | শাসনেও যার = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
হয় না নিষ্ঠা | প্রকম্পিত, = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
শিষ্ট ব'লে | তারেই নিও = ৪+৪
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ব্যক্তিত্ব তার | নয় স্খলিত।"[২৯] = ৪+৪
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
৯. "চলার ব্যাঘাত | যেমনি এলো = ৪+৪

১ ১ ১ ১   ১ ১
আঘাত এলো | ধেয়ে- = ৪+২
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
অদূরেই ঐ | দুর্দ্দশাটি = ৪+৪
১ ১ ১ ১   ১ ১
চলে মিটির | চেয়ে।”[৩০] ৪+২
(প্রতুলদীপ্তি, প্রথম খণ্ড)

ছড়াতে আমরা দেখি স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার। তাই স্বরবৃত্ত ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বলা হয়। স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল, তিনটি পূর্ণ পদ ও একটি অপূর্ণ পদ থাকে। পূর্ণ পদগুলো ৪ মাত্রার হয়। স্বরবৃত্ত ছন্দে মুক্ত দল হয় ১ মাত্রার এবং রুদ্ধ দল হয় ১ মাত্রার। স্বরবৃত্ত ছন্দের এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে মাথায় রেখে আমরা আলাপনে ব্যবহৃত ছড়াগুলোর ছন্দ নির্ণয় করব।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছড়ায় আমরা দেখলাম তিনটি পূর্ণ মাত্রার পদ রয়েছে। পূর্ণ মাত্রার পদগুলো ৪ মাত্রার আর অপূর্ণ পদটি ৩ মাত্রার। আবার চতুর্থ ছড়াটিতে তিনটি পূর্ণ পদ ৪ মাত্রার এবং একটি অপূর্ণ পদ ৩ মাত্রার, সেইসঙ্গে পরের পঙক্তিতে আবার প্রতিটি পদই ৪ মাত্রার হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ছড়ায় প্রতিটি পদ পূর্ণ পদ এবং ৪ মাত্রার। নবম ছড়াটি তিনটি পূর্ণ পদ ৪ মাত্রার এবং একটি অপূর্ণ পদ ২ মাত্রার রয়েছে। অর্থাৎ একথা বলতেই হয় যে, স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে পুরোপুরি মানা হয়েছে।

ছন্দের আলোচনার পর আমরা ছড়ায় অলংকারের ব্যবহার নিয়ে একটু আলোচনা করব। আমরা আলাপনে ব্যবহৃত ছড়াগুলোর অলংকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি অনুপ্রাস অলংকারের প্রাধান্য। আলাদা করে আর ছড়ার উদাহরণ না নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই যেই ছড়াগুলো উল্লেখ করেছি সেখান থেকেই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি। ছাড়ার ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যেই ছড়াগুলো নিয়েছি তার মধ্যে প্রথম ছড়ায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে ‘তেমনি’ ও ‘সেমনি’ শব্দ দুটির মধ্যে অন্ত্যমিল আছে। এখানে অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে। এছাড়া ‘ত’, ‘ল’ বর্ণের ব্যবহার এবং ভাল ও মন্দ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়ে বিরোধাভাস অলংকারেরও সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় ছাড়াতেও আমরা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির শেষে অন্ত্যমিল দেখি। চতুর্থ ছড়ায় বিদ্যা ও অবিদ্যা শব্দ দুটির মধ্যে বিরোধাভাস লক্ষ্য করা যায়। সপ্তম ছড়ায় কৃতি, ধৃতি ও ভৃতি প্রভৃতি শব্দগুলো পরপর বসে অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে। অষ্টম ছড়ার দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের শেষে ‘দিও’ এবং ‘নিও’ শব্দ দুটোর মধ্যে অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে। নবম ছড়াটিতে ‘ল’ বর্ণের পরপর ব্যবহার অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে। ১১ নম্বর ছড়ায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের শেষে ‘ঝোক’ ও ‘রোখ’ শব্দ দুটির মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার হয়েছে। দ্বাদশ ছড়াটিতেও ‘ল’ ও ‘ন’ বর্ণের ব্যবহার ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করে অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে। আবার ১৫ নম্বর ছড়ায় ‘চাই’ ও ‘তাই’ এবং ১৬ নম্বর ছড়ায় ‘ধেয়ে’ ও ‘চেয়ে’ শব্দগুলোর মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ব্যবহৃত কিছু ছড়া নিয়ে আমরা ছন্দ ও অলংকার নিয়ে আলোচনা করলাম। তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, সাহিত্য সৃষ্টির কোন লক্ষ্য তাঁর ছিল না। প্রশ্নোত্তরের সময় কিম্বা কথোপকথনের সময় কথাপ্রসঙ্গে তিনি ছড়াগুলো বলেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও ছড়াগুলো সাহিত্যগুণ বঞ্চিত নয়।

জীবনের প্রথম ৫৮ বছর অনুকূলচন্দ্র কাটিয়েছেন তাঁর জন্মস্থান পাবনার (বর্তমান বাংলাদেশ) হেমায়েতপুর গ্রামে।[৩১] স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার আঞ্চলিক ভাষার ছাপ তাঁর আলাপনে রয়েছে। বলাবাহুল্য পাবনা অঞ্চলের কথ্য ভাষার ব্যবহার তাঁর আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছে, আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আমরা এইরকম কিছু আঞ্চলিক শব্দ এবং কিছু উদাহরণ এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য উল্লেখ করছি,

‘গিছি’, ‘খাইছি’, ‘ছাড়িছি’, ‘খাইছে’, ‘কইতাম’, ‘পোড়ায়ে’, ‘পারবনে’, ‘দিছি’, ‘করিছ’, ‘রাখিছে’, ‘কোস’, ‘ফুটিছে’, ‘যেয়ে’, ‘করিছেন’, ‘পড়িছে’, ‘বুঝায়ে’, ‘শুনবনে’, ‘ভাবিছিলাম’, ‘সারে’, ‘আইছিস’, ‘কইছিলাম’, ‘কব’, ‘কবি’, ‘কচ্ছি’, ‘আইছিল’, ‘কওয়ার’, ‘কনে’, ‘কও’, ‘কইতে’, ‘লাগতিছে’, ‘কচ্ছি’, ‘কয়ে’, ‘কওয়া’, ‘কই’, ‘কলাম’, ‘করিছিস’, ‘আইছিস’, ‘আইছিল’, ‘কলে’, ‘লাগবিনি’, ‘আইছেন’, ‘কচ্ছি’, ‘কলেম’, ‘তুলিছিস’, ‘নিছিস’, ‘মারিছিল’, ‘আইছে’, ‘হইছে’, ‘আনিছিস’, ‘গিছিল’, ‘মারিছি’, ‘থাকবিনি’ ইত্যাদি। এবারে আমরা কিছু বাক্য এখানে তুলে ধরছি,

১. "তুই চুড়ি পরিছিস্, হার গলায় দিছিস্, আংটিও আছে। তোর মহাভাগ্যি।"[৩২]

২. "করিছে একেবারে সুখের চরম। দুধ দিয়ে আঁচাইছে, ঘোল দিয়ে ছুচিছে, আবার সন্দেশ দিয়ে হাতেমাটি করিছে।"[৩৩]

৩. "চাকরী আর-একটা ধরা লাগে। আর ঋণ করিস ক্যা?"[৩৪]

৪. "এখন কায়দা ক'রে যদি ক'রবের পারেন তো দেখেন। আমাকে ক'বেন না।"[৩৫]

৫. "নয় বছর, তাহলে আর তাকে স্কুলে দেবা কী! বাপ-বেটায় ব'সে কি মা-বেটায় ব'সে কাছে নিয়ে গল্প করা লাগে। গল্প করতে-করতে সব কওয়া লাগে।"[৩৬]

৬. "তুই কখন আলি?"[৩৭]

৭. "আর কেডা আ'লো?"[৩৮]

তাঁর আলাপনে আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দের এই আমদানি একেবারেই বেমানান হয় নি। ছড়ার মধ্যেও অনেক আঞ্চলিক শব্দ রয়েছে। এগুলো তাঁর আলাপনকে আরও সমৃদ্ধ করেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। সপ্তম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ৮৪।

২. তদেব, নবম খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

৩. তদেব, দশম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ১২৭।

৪. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ০৬, পৃ. ৬১।

৫. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৪০২, কলকাতা ১২, পৃ. ৬৭।

৬. তদেব, পৃ. ১৬৭।

৭. তদেব, পৃ. ২৯০।

৮. তদেব, অষ্টম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ১৩১।

৯. তদেব, পৃ. ১৩২।

১০. তদেব, পৃ. ১৪৩।

১১. তদেব, দশম খণ্ড, কলকাতা ০৬, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ১২৫।

১২. তদেব, পৃ. ১২৬।

১৩. তদেব, অষ্টম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ১৮৫।

১৪. তদেব, একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ২৯।

১৫. তদেব, পৃ. ৩৭।

১৬. তদেব, পৃ. ৫১।

১৭. তদেব, অষ্টম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ৮১।

১৮. তদেব, একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ১০৩।

১৯. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, চক্রবর্তী মণিলাল, সঙ্কলক। প্রতুলদীপ্তি। প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ০২।

২০. বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। প্রথম খণ্ড, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১১৬০।

২১. বিশ্বাস শৈলেন্দ্র। সংসদ বাংলা অভিধান। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ২০৪।

২২. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। চতুর্থ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ০৬, পৃ. ১২৪।

২৩. তদেব, পৃ. ১২৪।

২৪. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬; পৃ. ১৩১।

২৫. তদেব, একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ২৬১।

২৬. তদেব, পৃ. ৭০।

২৭. তদেব, পৃ. ৭৯।

২৮. তদেব, পৃ. ১৩৫।

২৯. তদেব, পৃ. ১৪০।

৩০. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, চক্রবর্তী মণিলাল, সঙ্কলক। প্রতুলদীপ্তি, প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ০২।

৩১. (ক) দত্তরায়, ব্রজগোপাল। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। দ্বিতীয় খণ্ড, তপোবন প্রকাশন, ষষ্ঠ প্রকাশ ২০১৮, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৬৯।

(খ) ভোরা, পরেশ। মহাজীবন (অখণ্ড সংস্করণ) । তপোবন প্রকাশন, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ২৭২।

৩২. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, চক্রবর্তী মণিলাল, সঙ্কলক। প্রতুলদীপ্তি। প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ০২।

৩৩. সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৭; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২১; পৃ. ৩৮।

৩৪. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী, দ্বিতীয় খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২১, পৃ. ৫৮।

৩৫. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৯, কলকাতা ১২, পৃ. ২৪৩।

৩৬. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ০৬, পৃ. ১।

৩৭. তদেব, সপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ২১৬।

৩৮. তদেব, পৃ. ২১৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। দ্বিতীয় খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২১।

২. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। চতুর্থ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ০৬।

৩. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। পঞ্চম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ১৪০২, কলকাতা ১২।

৪. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। সপ্তম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬।

৫. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। অষ্টম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬।

৬. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। নবম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬।

১০. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। দশম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬।

১১. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। একাদশ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬।

১২. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, চক্রবর্তী মণিলাল, সঙ্কলক। প্রতুলদীপ্তি। প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। প্রথম খণ্ড, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা - ০৯।

১৪. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র। সংসদ বাংলা অভিধান। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪, কলকাতা ০৯।

১৫. দত্তরায়, ব্রজগোপাল। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। দ্বিতীয় খণ্ড, তপোবন প্রকাশন, ষষ্ঠ প্রকাশ ২০১৮, কলকাতা ০৯।

১৬. ভোরা, পরেশ। মহাজীবন (অখণ্ড সংস্করণ)। তপোবন প্রকাশন, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২৪, কলকাতা ০৯।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 184-189
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.195

বিখ্যাত কিছু ধাঁধা: একটি বিশ্বব্যাপী অন্বেষণের প্রয়াস

অসিত মন্ডল, *গবেষক, আর. কে. ডি. এফ বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 10.09.2025; Accepted: 12.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Riddles hold a very ancient place in folklore. Although many consider them to be childish in nature, their significance in folk society is immense. Across the world, various myths, literary works, and legends contain riddles that have earned a place among the most famous riddles globally. These include references from the Bible, the Mahabharata, or mythological characters like the Sphinx, as well as from the comedies of William Shakespeare, stories by Rabindranath Tagore, riddles created by the renowned scientist Einstein, and even modern fiction like Harry Potter. Among these, several notable riddles have been explored in this article.

Keywords: Riddle, Folk literature, Folk culture

ধাঁধা বিষয়টিকে অনেকে মূলতঃ শিশুসুলভ ব্যাপার বলে মনে করলেও প্রাচীনকালে এমন কি এখনও ক্ষেত্রবিশেষে ধাঁধার একটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল এবং রয়েছে। ঋগ্বেদে ধাঁধা উল্লেখিত হতে দেখি। যজ্ঞানুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার রেওয়াজ ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ববধের অব্যবহিত পূর্বে হোতৃ এবং ব্রাহ্মণেরা পরস্পরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতেন। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম যে পঞ্চপাণ্ডবকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ তথ্য সুপরিচিত। জনশ্রুতি, ইলিয়াড ওডিসি রচয়িতা হোমার ধাঁধার উত্তরদানে অসমর্থ হয়ে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন। নিগূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশেও সাধকরা প্রহেলিকার আশ্রয় নিতেন, এর জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের চর্যাপদগুলি। বিবাহাচারের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ ধাঁধাকে আজ আর তেমনভাবে না পেলেও এক সময়ে কিন্তু ধাঁধা ছিল বিবাহাচারের অপরিহার্য অঙ্গ। কন্যাপক্ষীয়রা বরপক্ষকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়েও ধাঁধা জিজ্ঞাসার চল ছিল। গাজন অনুষ্ঠানে ভক্তদের মধ্যে ধাঁধা জিজ্ঞাসার চল এখনও বিদ্যমান। সঠিক ধাঁধার উত্তর দানে রাজসিংহাসন প্রাপ্তি ঘটেছে যেমন, তেমনি অন্যদিকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সঠিক উত্তর দিয়ে প্রাণ রক্ষায় সক্ষম হয়েছে। বর নির্বাচনেও ধাঁধার সাহায্য নেওয়ার রীতি ছিল। এসব থেকে বোঝা যায় ধাঁধার জনপ্রিয়তা কত সুদূরপ্রসারী। তবে কিছু ধাঁধার সাথে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসও। তাই পৃথিবীতে এমন কিছু ধাঁধা বিদ্যমান যেগুলো সবকিছু মিলিয়ে বিখ্যাত হয়ে আছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধাঁধা: ধারণা করা হয়, প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে সর্বপ্রথম ধাঁধার প্রচলন হয়। তৎকালীন সময়ে চিন্তাভাবনার দৌড় বাড়ানোর পন্থা হিসেবে মানুষ ধাঁধা সমাধান করতো। বাগদাদ তখন ছিল শিল্পসাহিত্যে বেশ এগিয়ে। ইতিহাসবিদের মতে, বাগদাদেই সর্বপ্রথম ধাঁধার প্রচলন হয়। প্রথম ধাঁধাটি ছিল-

> এমন একটি ঘর রয়েছে যেখানে মানুষ অন্ধ হয়ে ঢোকে, কিন্তু বের হয়ে সবকিছু দেখতে পায়। সেটা কি? (There is a house. One enters it blind and comes out seeing. What is it?) [১]

-এর উত্তর ছিল 'বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রবেশের আগে জ্ঞানহীন অর্থাৎ অন্ধ থাকে, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়। সেই সময় স্কুলের গুরুত্ব বোঝাতেই এই ধাঁধার আবিষ্কার, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধাঁধা হিসেবেও পরিচিত।

বাইবেলের ধাঁধা: বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের 'জন নায়কদের বিবরণে' স্যামসনের ধাঁধাটি বিশ্ববিখ্যাত। বীর স্যামসন তার নিজের বিবাহ উপলক্ষে বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত ৩০ জন যুবককে একটি ধাঁধা বলেন। তারা ধাঁধার উত্তর দিলে স্যামসন প্রত্যেককে একটি দামি পোশাক দেবেন। আর ৭ দিনের মধ্যে যদি না বলতে পারে তারা সবাই প্রত্যেকে একটি করে পোশাক স্যামসনকে দেবে। সেই সময় ইহুদি সমাজে বিবাহ উপলক্ষে এই রকম রীতি প্রচলিত ছিল। স্যামসনের সেই বিশ্ববিখ্যাত ধাঁধাটি ছিল-

> খাদ্য এল খাদক থেকে, মিষ্টি এল সবল থেকে। (Out of the eater, something to eat; out of the strong, something sweet.)[২]

এরপর তিনদিন ঐ ৩০ জন যুবক অনেক চেষ্টা করেও উত্তর খুঁজে পেল না। তাই তারা স্যামসনের স্ত্রীকে ভয় দেখাল। স্যামসনের স্ত্রী স্যামসনের কাছে অনেক কান্নাকাটি করে উত্তরটা জেনে নিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেয়। সপ্তম দিনে ঐ ৩০ জন যুবক এসে স্যামসনকে উত্তর দিয়েছিল-

> মধুর চেয়ে সুমিষ্ট আর কি হয়?
> সিংহের চেয়ে বলবান কোন কিছু নয়।

স্যামসন তাদের উত্তর শুনে আরও একটি ধাঁধা বলেন-

> চাষ যদি না করতিস আমার গাভী দ্বারা
> ধাঁধার উত্তর খুঁজতে তোদের জীবন হত সারা।[৩]

আসলে স্যামসন এই ধাঁধাটিকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তার গঠন ছিল রহস্যময়। তিনি কোনো প্রচলিত ধাঁধা সেখানে বলেননি। এই ধাঁধাটি তিনি নিজের একটা ঘটনা থেকে গঠন করেছিলেন। সেই ঘটনাটি বেশ চমকপ্রদ স্যামসন বিবাহের আগে একটি সিংহকে হত্যা করেছিলেন। আর বিবাহের সময় তিনি সেই সিংহের শবের মধ্যে একঝাঁক মৌমাছির মধুর চাক তৈরি করাকে দেখেন। এর পরের ঘটনাটি হল- তার স্ত্রীর মাধ্যমে অন্যরা প্রকৃত রহস্য জানতে পারে। এখানে বাইবেলের এই ধাঁধাটিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক পাওয়া যায়।

১. ধাঁধাটি বিবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।
২. নারী এখানে প্রতিপক্ষের কাছে সমাধানটি বলেছে।
৩. ধাঁধাটি প্রতীক-সংকেতময়।
৪. সিংহ বা খাদক= স্যামসন; ইজরায়েলি। খাদ্য= পলেষ্টীয়, মধু= তাদের গোষ্ঠীর কন্যা।
৫. ইজরায়েলি-পলেষ্টীয়দের দ্বন্দ্বের শেষে বিবাহের মাধ্যমে মিষ্টি সম্পর্কের ইঙ্গিত।
৬. স্যামসনের নিজের উত্তরও রূপক-সংকেতময়। 'গাভী' এখানে তার স্ত্রী।
৭. ধাঁধাটির মধ্যে কৃষি-সভ্যতার উল্লেখ আছে। কিন্তু চাষ করা হয় বলদ দিয়ে এখানে 'গাভী' কেন? সবদেশের ধাঁধাতে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেকার সম্পর্ককে রূপকাত্মক করা হয়। সেজন্য বলদের বিকল্প 'গাভী'।
৮. একটি নির্দিষ্ট দিন ধরা হয়েছে উত্তর বলার জন্য।
৯. এখানে প্রতিযোগিতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।
১০. ধাঁধাটিতে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে; বিদেশি ও অপরিচিত স্যামসনই এখানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছে। সাধারণত বিদেশিকেই ধাঁধা জিজ্ঞেস করা হয়।

স্ফিংক্সের ধাঁধা: প্রাচীন মিথোলজিক্যাল দানবদের মধ্যে একটি হলো 'স্ফিংক্স' (Sphinx)। নারীর মুখ ও সিংহের দেহ নিয়ে তৈরি এই প্রাণীটি ছিল থিবেস শহরের দ্বাররক্ষক। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা সোফোক্লেসের লেখা 'ইডিপাস দ্য কিং' নামক বইয়ে এই স্ফিংক্সের কথা উঠে এসেছিল। এই বিখ্যাত বইয়েই লিপিবদ্ধ করা হয় স্ফিংক্সকে নিয়ে গড়ে ওঠা সেই বিখ্যাত ধাঁধাটি। সেই সময়ে থিবেস শহরে যে প্রবেশ করতে চাইতো, তাকে একটি ধাঁধা দিত স্ফিংক্স। সেই ধাঁধার উত্তরের প্রাপ্তি হিসেবে মিলত শহরে প্রবেশ করার সুযোগ। আর ভুল উত্তর দিলেই

স্ফিংক্সের হাতে প্রাণ হারাতে হত আগন্তুককে। এতসব বাধা ও প্রাণ হারানোর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ইডিপাস থিবেস শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। দ্বারে পৌঁছানোমাত্র স্ফিংক্স ইডিপাসকে একটি ধাঁধা দেন। ধাঁধাটি ছিল এরকম-

> কোন জিনিসটি জন্মের সময় চার পায়ে, মধ্য বয়সে দুই পায়ে এবং শেষ বয়সে তিন পায়ে হাঁটে? (What goes on four legs in the morning, on two legs at noon, and on three legs in the evening?)[৪]

ইডিপাস সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হন। উত্তরটি ছিল 'মানুষ'। জন্মের সময় হামাগুড়ি দেওয়াকে চার পা, তারপর মধ্যদশায় দুই পায়ে হাঁটা, আর শেষ বয়সে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটাকে তিন পা বুঝিয়েছিলেন স্ফিংক্স।

হ্যারি পটার ও স্ফিংক্সের ধাঁধাঁ: পূর্বোক্ত স্ফিংক্সের কাহিনীটি অবলম্বনে জে. কে. রাওলিং তাঁর 'হ্যারি পটার' সিরিজের চতুর্থ বই 'Harry Potter And The Goblet Of Fire'-এ স্ফিংক্সের ধাঁধাঁর একটি সিকোয়েন্স এনেছেন। ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্টে একটি ম্যাজিক কম্পিটিশনে একের পর এক বাধা পেরোনোর পর হ্যারি পটারের সামনে একটি গোলকধাঁধা পড়ে। সেখানে একটি দ্বাররক্ষক স্ফিংক্স ছিল। স্ফিংক্সকে পেরোতে হলে হ্যারিকে তার দেওয়া ধাঁধার উত্তর দিতে হবে। ধাঁধাটি ছিল এরকম-

> প্রথমে একজন ছদ্মবেশে থাকা মানুষের কথা চিন্তা করো। যে কি না গোপনে কাজ করে। তারপর ভাবো কোন জিনিসটি মাঝের মাঝে এবং শেষের শেষে থাকে। সবশেষে ভাবো- কখনো কোনো কিছুর সমাধান না পেলে আমরা কী শব্দ করে থাকি। এখন সবগুলো জোড়া লাগিয়ে উত্তর বলো। (First think of the person who lives in disguise, Who deals in secrets and tells naught but lies. Next, tell me what's always the last thing to mend, the middle of middle and end of the end? And finally give me the sound often heard during the search for a hard-to-find word. Now string them together, and answer me this.)[৫]

-ধাঁধাটির মূলত তিনটি অংশ। প্রথম অংশ ছিল ছদ্মবেশে থাকা মানুষ, যার মানে হচ্ছে 'Spy'। দ্বিতীয় অংশের উত্তর 'D'। 'Middle' শব্দের মাঝে এবং 'End' শব্দের শেষে যার অবস্থান। আর সবশেষে সাধারণত আমরা কোনো কিছুর উত্তর না পারলে 'er' শব্দটি করে থাকি (ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী) । এই তিনটি মিলে হয় 'Spy-d-er', মানে মাকড়শা (Spyder)। উপন্যাসে হ্যারি সঠিক উত্তর দিয়ে স্ফিংক্সকে পেরিয়ে যাওয়ার পরই মুখোমুখি হয় বড় একটি মাকড়শার, যার অর্থ স্ফিংক্স মূলত ধাঁধাটির মাধ্যমে হ্যারিকে সতর্কও করে দিয়েছিলেন।

শেক্সপিয়ারের ধাঁধাঁ: উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা রচনাগুলিতে বেশ কিছু ধাঁধার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত ধাঁধাটি তিনি লিখেছেন 'The Merchant of Venice' কমেডি নাটকে। সেই উপন্যাসের চরিত্র পোর্শিয়ার জন্য স্বামী নির্বাচনে রাজা অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। সোনা, রুপা ও সীসার তৈরি তিনটি কৌটা সবার সামনে রাখেন তিনি, যার মধ্যে একটিতে ছিল পোর্শিয়ার ছবি। যিনি পোর্শিয়ার ছবি সম্বলিত কৌটাটি তুলবেন তিনিই হবেন পোর্শিয়ার বর। প্রতিটি কৌটার সামনে অবশ্য সমস্যা সমাধানের সূত্র দেওয়া ছিল-

- সোনালী কৌটার সামনে লেখা ছিল- যে আমাকে পছন্দ করবে সে অনেক ছেলের বাসনাকে পাবে। (On the gold casket: Who chooseth me shall gain what many men desire.)
- রুপালি কৌটার সামনে লেখা ছিল- যে আমাকে পছন্দ করবে সে যতটুকু প্রাপ্য তা পাবে। (On the silver casket: Who chooseth me shall get as much as he deserves.)
- সীসার কৌটার সামনে লেখা ছিল- যে আমাকে পছন্দ করবে তাকে যাতনা সহ্য করতে হবে। (On the lead casket: Who chooseth me must give and hazard all he hath.)[৬]

প্রথম ব্যক্তি যিনি সোনার কৌটাটি পছন্দ করেন, তিনি সেটি খুলে ভেতরে একটি খুলি দেখতে পান এবং একটি চিরকুট দেখতে পান যেখানে লেখা ছিল- যা কিছু জ্বলজ্বল করে তা সোনা নয়। সাথে সতর্কবার্তা- কেবল সৌন্দর্য দিয়ে জিনিসপত্র মূল্যায়ন করা ভুল। যে ব্যক্তি রূপার কৌটাটি বেছে নেয়, সে কেবল একজন বোকার ছবি খুঁজে পায়। ভিতরের চিরকুটে লেখা আছে- এক বোকার মাথা দিয়ে আমি প্রলুব্ধ করতে এসেছিলাম, কিন্তু আমি দুটি বোকার

মাথা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। বলাবাহুল্য, সীসার কৌটাটিতে ছিল পোর্শিয়ার ছবি। কারণ, রাজা বুঝতে পেরেছিলেন, যে লোহার কৌটাটি পছন্দ করবে সে পোর্শিয়ার জন্য যেকোনো কষ্টই সহ্য করতে পারবে।

সেইন্ট আইভেস ধাঁধাঁ: ১৭৩০ সালে শিশুদের ছড়ার বইয়ে এই ধাঁধাটি প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। সেইন্ট আইভেস দ্বীপটি মাছ শিকারের জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে ধাঁধাটি জনপ্রিয়তা পায় মূলত **১৯৯৫** সালে মুক্তি পাওয়া 'Die Hard with a Vengeance' সিনেমাটির দৌলতে, যেখানে খলনায়ক ব্রুস উইলিস ধাঁধাটি স্যামুয়েল এল. জ্যাকসনকে সমাধান করতে দেন। সময় ছিল ৩০ সেকেন্ড। উত্তর না দিতে পারলে শহরের জনবসতিতে বোমা বিস্ফোরিত হবে। শেষ সেকেন্ডে উত্তরটি দিতে সক্ষম হন স্যামুয়েল। ধাঁধাঁটি ছিল এরকম-

> সেইন্ট আইভেসে যাওয়ার পথে আমার একজন লোকের সাথে দেখা হয়। তার সাথে ছিল তাঁর সাতজন স্ত্রী। সাত স্ত্রীর নিকট ছিল সাতটি ব্যাগ। তাতে ছিল সাতটি বিড়াল। প্রতিটি বিড়ালের একটি করে বাচ্চা রয়েছে। এখন কতজন সেইন্ট আইভেসে যাচ্ছে? (As I was going to St. Ives, I met a man with seven wives. Each wife had seven sacks. Each sack had seven cats. Each cat had seven kits. Kits, cats, sacks and wives -how many were there going to St. Ives?)[৭]

যদিও ধাঁধাঁটি একটু প্যাঁচানো, তবে উত্তর হচ্ছে একজন। আসলে সেইন্ট আইভেসের পথে শুধু যাচ্ছেন বক্তাই। বাদবাকিরা সেইন্ট আইভেস থেকে ফিরছেন।

বিলবো ও গোলেমের ধাঁধা: জগৎ-বিখ্যাত উপন্যাস 'The Lord of the Rings'-এর পূর্বসূরি **১৯৩৭** সালের 'The Hobbit'-এ রয়েছে একটি জনপ্রিয় ধাঁধা। সেখানে বিলবো-কে শয়তান গোলেম--এর ভূগর্ভস্থ আস্তানা থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য পাঁচটি ধাঁধাঁর উত্তর দিতে হয়। প্রথম চারটি পারলেও শেষ ধাঁধাটিতে আটকা পড়ে যান বিলবো। শেষ ধাঁধাঁটি ছিল এরকম-

> এই জিনিসটি সবকিছুকে গিলে ফেলে- পাখি, পশু, ফুল; লোহা কিংবা ইস্পাত -সব কিছু গলে যায় এর সামনে। রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে কিংবা শহর ধ্বংস করে। এবং পর্বতকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। (This thing all things devours. Birds, beasts, trees, flowers; Gnaws iron, bites steel; Grinds hard stones to meal; Slays king, ruins town, and beats mountain down.)[৮]

-এই ধাঁধাঁটির উত্তর না দিতে পারলেও ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান বিলবো। উত্তর না পারায় গোলেমের কাছে আরেকটু বেশি সময় চান তিনি। কিন্তু 'Time' শব্দটি বললেই গোলেম ধরে নেয় উত্তর বলছেন বিলবো। কারণ ধাঁধাঁটির উত্তর ছিল 'Time' বা 'সময়'।

আইনস্টাইনের পাঁচ বাড়ির ধাঁধা: বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের বানানো এই ধাঁধাটি জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে শুধু আইনস্টাইনের জন্যই নয়, বরং ধাঁধাটির জটিলতার জন্যও। খুব কম মানুষই দ্রুত এই ধাঁধাঁটির উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত **১৫**টি সূত্র দিয়ে একটি ধাঁধা তৈরি করেন তিনি। ধাঁধাটি হল-

পাঁচটি ভিন্ন রঙের বাড়ির মালিক পাঁচ ভিন্ন দেশের নাগরিক। তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ধরনের পানীয় পান করে, ভিন্ন ধরনের পোষাপ্রাণী পালন করে ও ভিন্ন ধরনের সিগারেট খায়। আর এর পাশাপাশি **১৫**টি সূত্র হচ্ছে-

১. ব্রিটিশ বাস করে লাল রঙের বাড়িতে।
২. সুইডিশের কাছে রয়েছে কুকুর।
৩. ড্যানিশ চা পান করে।
৪. সবুজ রঙের বাড়িটি সাদা বাড়ির বাম পাশে অবস্থিত।
৫. সবুজ রঙের বাড়ির ব্যক্তি কফি পান করে।
৬. যে ব্যক্তি 'পল মল' সিগারেট খায় তার রয়েছে পোষা পাখি।
৭. হলুদ রঙের বাড়ির মালিক 'ডানহিল' সিগারেট খায়।
৮. মাঝের বাড়ির ব্যক্তি দুধ পান করে।
৯. নরওয়েজিয়ান বাস করে প্রথম বাড়িতে।

১০. যে ব্যক্তি ব্লেন্ড সিগারেট খায় সে বিড়াল পোষা বাড়ির পাশে থাকে।

১১. যে ব্যক্তির পোষা ঘোড়া রয়েছে সে ডানহিল সিগারেট খাওয়া ব্যক্তির পাশে থাকে।

১২. যে ব্যক্তি ব্লুমাস্টার সিগারেট খায় সে বিয়ারও পান করে।

১৩. জার্মান ব্যক্তি প্রিন্স সিগারেট খায়।

১৪. নরওয়েজিয়ান ব্যক্তি নীল বাড়ির পাশে থাকে।

১৫. যে ব্যক্তি ব্লেন্ড সিগারেট খায় তার পাশের বাড়ির ব্যক্তি জল পান করে।

প্রশ্ন হল- পোষা প্রাণী হিসেবে মাছ পালন করে কোন ব্যক্তি?[৯]

উত্তর হল- জার্মান ব্যক্তি। একটি চার্টের মধ্যে বিষয়গুলিকে সূত্রানুসারে সাজালে উত্তরটি বেরিয়ে আসে-

ঘর	১	২	৩	৪	৫
রং	হলুদ	নীল	লাল	সবুজ	সাদা
জাতীয়তা	নরওয়েজিয়ান	ডেনমার্ক	ব্রিটেন	জার্মান	সুইডেন
পানীয়	পানি	চা	দুধ	কফি	বিয়ার
সিগারেট	ডানহিল	ব্লেন্ড	পলমল	প্রিন্স	ব্লুমাস্টার
পোষা প্রাণী	বিড়াল	ঘোড়া	পাখি	মাছ	কুকুর

মহাভারতের ধাঁধা: মহাকবি ব্যাসদেবের মহাভারতে আছে পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে একদা তৃষ্ণার্ত হলে ভীম জলের অন্বেষণে একটি সরোবরের তীরে গিয়ে উপনীত হন। তিনি যখন সরোবরের থেকে জল সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত, সেইসময় অতর্কিতে যক্ষরূপী বক এসে ভীমকে আগে তার চারটি প্রশ্নের উত্তর দেবার পর জল সংগ্রহের আদেশ দেন। তিনি এই বলে তাঁকে সাবধান করেন যে, ভীম তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলে মৃত্যু অনিবার্য। ভীম তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে তো পারলেন না, উপরন্তু নির্দেশ না মেনে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে অকালে তার মৃত্যু হল। এরপরে অর্জুন, নকুল, সহদেব- সকলেরই একই পরিণতি ঘটল। অতঃপর যুধিষ্ঠির যক্ষরূপী বকের চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে চারভাইকে পুনর্জীবিত করেন। বলাবাহুল্য, যক্ষরূপী বকের পাণ্ডবদের কথিত এই চারটি প্রশ্ন প্রকৃতিগতভাবে ছিল চারটি ধাঁধা। চারটি ধাঁধা ও যুধিষ্ঠিরের কথিত উত্তরগুলি ছিল এমন-

প্রশ্ন: কি বা বার্তা?

উত্তর: এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণীসমূহকে পাক করছে, সূর্য তার অগ্নি, রাত্রি দিন তার ইন্ধন, মাস ঋতু তার আলোড়নে হোতা এই বার্তা।

প্রশ্ন: কি আশ্চর্য?

উত্তর: প্রাণিগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে?

প্রশ্ন: পথ বলি কারে?

উত্তর: বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যার মত ভিন্ন নয়, ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, অতএব মহাজন (বিখ্যাত সাধুজন) যে পথে গেছেন, তাই পন্থা।

প্রশ্ন: কোন জন বল দেখি সুখী,

উত্তর: যে লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টমভাগে শাক রন্ধন করে, সেই সুখী।[১০]

গুপ্তধনের ধাঁধা: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিশ্বখ্যাত ছোটগল্প- 'গুপ্তধন'। গল্পে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় গুপ্তধনের অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করলে ঘটনাক্রমে এক এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎলাভ হয়। সন্ন্যাসী তাঁর ঝুলি থেকে কাপড়ে মোড়া দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো একটি তুলট কাগজের লিখন বার করেন। তাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা। আর সবশেষে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে, তার আরম্ভটা এইরূপ-

"পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥

শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশান কোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী॥"[১১]

-এটি একটি উৎকৃষ্ট ধাঁধা, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে গুপ্তধনের ঠিকানা। ঠিকানাটি কি, সেই রহস্যভেদ করেছে মৃত্যুঞ্জয়। গল্প অবলম্বনে সেই অংশটি উদ্ধৃত করা হল-

> "অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল - 'শেষে দিল রা' অতএব হইল 'ধারা' - 'পাগোল ছাড়ো পা'— 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল-- অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল' -- এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে। স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।"[১২]

উপসংহার:

গণমাধ্যমের কল্যাণে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ যখন আমাদের শোয়ারঘরের অলিন্দে প্রবেশ করেছে, উগ্র নাগরিকত্বের দাবি যখন প্রবল, তখনই একাকী বিরলে নিভৃতে বাজে পুরাতন জীবনের হারিয়ে যাবার ক্রন্দনরোল। এই সূত্রে পুরাতন ধাঁধা আজ বিবর্তিত হয়ে নতুনে পরিণত। এই পুরাতন সংস্কৃতির বিবর্তনের ছাপ পড়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই। বস্তুত ইংরেজিতে একটা কথা আছে- 'The old gods never die' -পুরাতন দেবতারা চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁরা মরেন না। দেশে বা জাতির প্রাচীন ধর্মও একেবারে নির্মূল হয়ে যায় না, নতুন ধর্ম এসে হাজির হলেও তাতে পুরাতনের অনেক আচারই আত্মগোপন করে থাকে। এভাবেই প্রাচীনের ধারা নবীনের সঙ্গে কিছুটা আপোষ করেই পরিবর্তিত আকারে ধাঁধা কিছুটা বা লীনভাবে এখনও পর্যন্ত দেশে-বিদেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লোকসংস্কৃতির অনেক প্রাচীন শাখা আজও এভাবেই বেঁচে রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বা নাম পাল্টে আধুনিক হয়ে উঠেছে। ধাঁধার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তথ্যসূত্র:

১. Jones, Meghan. (2025). 12 of the Most Famous Riddles in History, rd.com/list/history-famous-riddles/
২. মিদ্দে, সুরঞ্জন। (২০১৮) । বাংলা ভাষায় বাইবেলের ধাঁধা, ধাঁধা: স্বরূপ সন্ধান, অক্ষর প্রকাশনী, পৃ. ২৭০।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১।
৪. Johnston, Ian. (2007). Sophocles: Oedipus The King, Richer Resources Publications, p. 3.
৫. Rowling, J.K. (2000). Harry Potter And the Goblet of Fire, Scholastic Press, pp. 635-636.
৬. Shakespeare, William. (1911). The Merchant of Venice, American Book Company, p. 74.
৭. https://en.wikipedia.org/wiki/As_I_was_going_to_St_Ives
৯. হাসান, রাজীব। (২০২২) । আইনস্টাইনের ধাঁধা, কিশোর আলো।
১০. চট্টোপাধ্যায়, শুভাশিস। (২০১৮) । বাংলা ধাঁধার একাল-সেকালে, ধাঁধা: স্বরূপ সন্ধান, অক্ষর প্রকাশনী, পৃ. ২৬০।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৬৯) । গুপ্তধন, গল্পগুচ্ছ খন্ড-৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ৫৪৭।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 190-195
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.203

‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭): রূপকথা ও শাশ্বত, আখ্যান কৌশলের আধুনিক বুনন

সমরজিৎ শর্মা, *গবেষক, ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, অসম, ভারত*

Received: 22.08.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

"Thakurmar Jhuli" is a popular collection of fairy tales in Bengali children's literature. The compiler of this book is Dakshinaranjan Mitra Majumdar. Dakshinaranjan Mitra Majumdar had collected the fairy tales from various rural areas of the then greater Mymensingh district. Although the tales were collected, they became entertaining for children due to Dakshinaranjan's writing style. Rabindranath Tagore, in the preface of Thakurmar Jhuli, mentioned that there was an urgent need to revive Bengali folklore, as at that time, the only literature available to readers was European fairy tales and their translations. He expressed the necessity for an indigenous or native folklore that would remind the people of Bengal of their rich oral traditions. This would serve as a method of fighting against British cultural imperialism.

In the introduction to Thakurmar Jhuli, Dakshinaranjan described his memories of hearing fairy tales from his mother and aunt. Dakshinaranjan's aunt, Rajlaxmi Devi, had assigned him the responsibility of touring villages in their zamindari. He would travel and listen to Bengali folktales and fairy tales narrated by the elders of the villages. Most of these folk stories were collected from the Mymensingh district area of Bangladesh. He recorded these tales with a phonograph, which he carried, and absorbed the style by repeatedly listening to the recordings. However, he initially could not find a publisher and set up a press for self-publishing the first book, which would be a compilation of stories created from the recorded tales. At that time, Dinesh Chandra Sen, impressed by the manuscript, arranged for its publication through the renowned publisher Bhattacharya and Sons. Within a week, three thousand copies were sold. Several illustrations for the collection were also drawn by the author. These drawings were converted into lithographs for printing.

Keywords: Folk culture, Rituals, Belief, Folktales, Popular, Language, Tradition

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭) সাহিত্যে রূপকথার প্রামাণ্য দলিল। শাশ্বত ও চিরন্তন রচনায় সকলের কাছে আজীবন স্মরণীয় গ্রন্থ। ঠাকুরমার ঝুলি বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপকথার বই। বাঙালি পাঠকের কাছে রূপকথা আর ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। এই বইটির কথা জানেন না বা এসব রূপকথার সঙ্গে পরিচয় নেই এমন বাঙালি পাঠক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র মতো এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কেননা মাটি ও মানুষের ঐতিহ্যিক চেতন মনকে তিনি এতে তুলির বুননে চিত্রায়িত করেছেন। এগুলি এত নিপুণ যেখানে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র যেন ‘রসের রাজা’ হয়ে বসে আছেন। তাঁর আগ্রহ,

ধৈর্য, পরিবেশন রীতি, দায়িত্বশীলতা সবকিছু নতুনভাবে গড়ে উঠেছে আর 'ঠাকুমার ঝুলি' তাতে হয়ে উঠেছে আমাদের চিরায়ত চিরকালীন সম্পদ।

এই গ্রন্থে কাহিনির সাহিত্যিক মূল্য একটু ভেবে দেখা দরকার। গল্পগুলোয় এমন ডিটেইল প্রচুর আছে, যা ঠিক গল্পের জন্য অনিবার্য ছিল না। মিথের প্রচলিত ছাঁচের সঙ্গে এটা আর একটা বড় তফাৎ। এটা বুঝতে গেলে একটু ক্লথ লেভি স্ত্রসের কথা শোনা দরকার। তাঁর মতে,

> "মিথের পৌরাণিক মূল্য জঘন্যতম অনুবাদের পরও সংরক্ষিত থেকে যায়। যেখানে উদ্ভূত হয়েছে সেখানকার লোকজনের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন একটি মিথ তা সত্ত্বেও পৃথিবীর যেকোনো স্থানের যেকোনো পাঠকের কাছেই মিথ হিসেবেই উপলব্ধ হয়। মিথের সারবত্তা কখনোই এর স্টাইল, এর মৌলিক সুর বা এর বাক্যরীতির মধ্যে নিহিত থাকে না, বরং যে গল্পটা এখানে বলা হয় সেটাই এর সারবত্তা।"[১]

এই কথাগুলি অনেক দূর পর্যন্ত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ক্ষেত্রে খাটবে কিন্তু একেবারে পুরোপুরি খাটবে না। ফলে গল্পগুলি কীভাবে পড়ব তার কৌশল জানা দরকার।
প্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলা যায়,

> "দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমন সবুজ, তেমনি তাজাই রইয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে একটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"[২]

এটি ধ্রুব সত্য কথা, চিরন্তন।

বঙ্গীয় ১৩৮৪ সনে 'এক্ষণ' পত্রিকায় তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যার ফরাসি পন্ডিত ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের একটি রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'ঠাকুরমার ও ঠাকুরদাদার ঝুলি: একটি পাঠ' শিরোনামে। মূল লেখাটি ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছিলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। এযাবৎ 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি নিয়ে কম হয়নি। তবে ফ্রাঁসের লেখা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে কারণ এই লেখাটি পাঠের একটি রীতিমতো নিয়ম-নিষ্ঠ পদ্ধতি ভাঙার চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতি ফ্রাঁসের পিএইচ.ডির বিষয় ছিল 'বাংলা রূপকথা'। এই লেখার মধ্যে ফ্রাঁস ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথাগুলোকে বিভক্ত করেছেন ভ্লাদিমির প্রপের পদ্ধতি অনুসারে, কর্মের ধারাবাহিকতা অনুসারে। কর্মের ধারাবাহিকতা বলতে বোঝানো হয়েছে পরম্পরা। প্রপ মনে করেন, মিথ বা রূপকথা পাঠ করতে হবে ন্যারেশনের মধ্যে পাত্রপাত্রীর ক্রিয়ার যে পরম্পর আছে সেই পরম্পরা অনুসরণে অর্থাৎ পরম্পরার মধ্যে কোনটির পর কোনটি আসছে বা কোন পরম্পরাকে অন্য একটি পরম্পরা অনুসরণ করছে।

মিথলজি এবং ফোক কোনো দেশের শিকড়কে বুঝতে সাহায্য করে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে রূপকথার সঙ্গে মিথের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা নেই 'ঠাকুরমার ঝুলি'(১৯০৭) বাংলা রূপকথার জগতে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ঠাকুরমার ঝুলি রূপকথার শারীরিক কাঠামো নিয়ে বিচার করতে গিয়ে একটি ছকের প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রীমতি ভট্টাচার্য। তিনি কখনো বলেননি, ঠাকুরমার ঝুলি গল্পটি সব কাঠামোর মধ্যে পড়বে। তিনি আরও বলেন, এক শ্রেণির কাহিনিতে নারীর বন্ধ্যাত্বকে এক প্রাথমিক পরিস্থিতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের কাহিনির পরিস্থিতি হয় অভাব বনাম নিরসন। তাহলে, সেই হিসেবে দেখতে গেলে বন্ধ্যাত্ব নামক যে অভাব নিয়ে কাহিনির সূত্রপাত হয় তার নিরসনের জন্য নায়ককে একটি নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালীর মধ্যে দিয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে, তবে এসব ক্ষেত্রে কাহিনি যথার্থভাবে শুরু হয় তখনই যখন বন্ধ্যাত্ব নামক অভাব সযত্ন চেষ্টায় একবার দূরীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কোনো দুষ্কর্মের ফলে অভীষ্টের (যা এক্ষেত্রে সন্তান) প্রাপ্তি দাঁড়ায় গিয়ে আধা প্রাপ্তিতে; সেই আধাপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ প্রাপ্তিতে পরিণত হবে একেবারে গল্পের সমাপ্তিতে তার আগে নয়। প্রসঙ্গক্রমে এসে যায় 'দুষ্কর্ম বনাম দুষ্কর্মের ক্ষতিপূরণ' এর কথা সেই সঙ্গে 'অভাব বনাম অভাবের নিরসন' পরিকল্পনা আমাদের মাঝখানে এসে মাথা গলায়।

তবে, কাঠামো বিচারের ক্ষেত্রে শ্রীমতি ফ্রাঁসের পদ্ধতি আমরা মোটামুটি ঠিক বলে ধরেই নিচ্ছি। এক্ষেত্রে ভ্লাদিমির প্রপের 'রূপতত্ত্ব' (Morphology) এবং লেভি স্ত্রসের 'কাঠামোবাদ' (Structure) তত্ত্বের সাজুয্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রপের তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, লোককথা বা পরিকথায় ঘটনাগুলো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে মেনে চলে। এই পর্যায়ক্রম বা ফাংশন প্রপের মধ্যে ধ্রুব। শুধু গল্পের চরিত্রগুলো পাল্টে যায়। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পুরাণ বা রূপকথার মধ্যে সাদৃশ্য দেখে ঠিক করেছিলেন যে, মানুষের মনের ভিতর একটি সামান্য লজিক্যাল স্ট্রাকচার আছে। অতীতে একটি মিথ আছে, আদিম মানুষ যেভাবে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে মিথগুলি সেসবেরই প্রতিফলন।

ভাদিমির প্রপ ও লেভি স্ত্রসের দুজনেরই কাজের পদ্ধতি আলাদা। এঁদের বুঝতে গেলে ফার্দিনান্দ দ্য সেস্যুর তাঁর ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় লাঙ (Langue) ও বাচন (Parole) এর প্রসঙ্গে চলে আসে। প্রপ গ্রহণ করেছিলেন ক্রমিক বিবর্তন পন্থা বা মিথ গঠনের ডায়াক্রনিক (Diachronic) ধরণ এবং সেস্যুর যাকে ভাষার ক্ষেত্রে নাম দিয়েছেন, যার সঙ্গে পারোলের সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে মিথকে ঐতিহাসিকভাবে পাঠ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ন্যারেশনকে গ্রহণ করা হয় গল্পের কাল-পরম্পরার কঠোর অনুসরণে, মিথের উপকরণগুলিও এখানে এসে অপ্রত্যাবর্তযোগ্য পারম্পর্য হিসেবে। প্রপ মনে করে, একটি পাঠের (Text) কাঠামো তৈরি হয় ন্যারেটিভ ইউনিটের (যাকে তিনি বলছেন ফাংশন বা ক্রিয়া) একটি ক্রমিক বিবর্তনমূলক শৃঙ্খলার মাধ্যমে।

অন্যদিকে লেভি স্ত্রসের পদ্ধতি স্থানানুক্রনিক (Synchronic), যা ভাষাতন্ত্র (Langue) এর সঙ্গে সাদৃশ্য। এই ধরণটি অনৈতিহাসিক। ন্যারেশনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে যেসব পুনরাবর্তনমূলক বিন্যাস চোখে পড়ে সেগুলিকে নজর করাই এই পদ্ধতির প্রবণতা। একটি পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাসের কতগুলো নির্দেশনকে অন্য কতগুলো বিন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি যে কীভাবে মানব চিত্ত বাইনারি অপজিশনের প্রক্রিয়াতে কাজ করে। লেভি স্ত্রস ন্যারেটিভকে ভেঙে নিয়েছেন কতগুলি আলাদা গঠনে যা তাঁর মতে, মিথের বেসিক ইউনিট। এই ইউনিটের নাম মিথেম। মিথের পরমার্থ বুঝতে তিনি এই মিথেমগুলোকে একটি প্রতিকল্প স্থাপনমূলক ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সাজিয়েছেন।

মনে রাখা বাঞ্ছনীয় ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭) সংগ্রহ করাটা কিংবা প্রকাশ করাটা আর অন্য সব সাহিত্যের মতো নয়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র কোনো পথ চলতি কৃত্রিম কিছু আরোপ করেনি। এমনকি মনের মাধুরীও মেশাননি। নিজের মনে যদি কিছু একটা করার থাকে তার প্রয়োগও ঘটাননি। মায়ামমতা ভরা মনটাকে ঠাকুরমার কাছে স্বনিয়মের কোঠায় বেঁধে রেখেছেন লাগানছাড়া করেননি। কি সংযম ছিল তার! বুঝতে পারেন এবং সে ভার কার্যকর করেন, নিয়ন্ত্রিত হন। দায়বদ্ধতার মূলে সমাচ্ছন্ন থাকেন প্রণম্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে। তাঁর এই কাজ আমাদের মনের মনিকোঠায় হয়ে থাকবে স্বপরিচয়, আত্মানুসন্ধানজ্ঞাপক। এখানে লোককথা, রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, ইতিহাস এক একটি জীবনে প্রামান্য দলিল, শাশ্বত ও চিরন্তন। বিভিন্ন উপাদান ও মোটিফের মধ্য দিয়ে আমাদের ঐক্য যূথরুদ্ধ সামষ্টিক এষণা এতে পথ করে নেয় পুনরুদ্ধারও পায়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার স্বয়ং ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভেঙে নিয়েছেন এগুলি হল- ‘দুধের সাগর’, ‘রূপতরাসী’, ‘চ্যাং-ব্যাং’, ‘আম সন্দেশ’। প্রধানত রূপকথা ও উপকথা এবং উপকথার পর্যায়ভূক্ত রচনা। এর মধ্যে ‘দুধের সাগর’ ও ‘রূপতরাসী’ পর্বের দশটি গল্প রূপকথামূলক। ‘কলাবতী রাজকন্যা’, ‘ঘুমন্তপরী’, ‘কাঁকন-মালা’, ‘কাঞ্চন-মালা’, ‘সাতভাই চম্পা’, ‘শীত বসন্ত’ এবং ‘কিরণ-মালা’ সজ্জিত ঠাকুরমার ঝুলি। ‘রূপতরাসী’ পর্বে আছে ‘নীলকমল আর লালকমল’, ‘ডালিম কুমার’, ‘পাতাল কন্যা’, ‘মণিমালা’, ‘সোনার কাঠি রুপার কাঠি’। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, ইংরেজি ‘Fairy Tales’ আর বাংলার ‘রূপকথা’এক নয়। ‘Fairy’ বা ‘পরী’ ঠাকুরমার ঝুলিতে নেই।

বাংলার রূপকথা গল্পকে এমনভাবে হতে হবে যেখানে পরীদের ভূমিকা সামান্য হলেও ঠিক আছে কিন্তু প্রধান হবে না। গল্পগুলো কোনো দেবদেবীর মাহাত্ম প্রচারের বাহন হবে না, সেখানে ইতিহাসের কোনো চরিত্র নায়ক হয়ে উঠবে না। রূপকথার গল্পে ভূতপ্রেত বা পশুপক্ষীর উপস্থিতি থাকলেও তারা গল্পের নিয়ন্তা হবে না। এমনকি যে সমস্ত পশুপক্ষী থাকবে তারা অপ্রাকৃত হবে যেমন রাক্ষস-রাক্ষসী, পক্ষীরাজ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, খোক্কস, শুকসারী ইত্যাদি। সব কিছুর উর্ধ্বে থাকবে মানুষের প্রাধান্য কিন্তু বাস্তব পরিচয় থাকবে না। গল্পগুলিতে যেসব দেশের উল্লেখ থাকবে সে সম্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল থাকবে না। রূপকথার গল্পগুলিতে প্রধান উপজীব্য বিষয় হচ্ছে নরনারীর ভালোবাসা এবং নিয়তি বা অদৃষ্ট। এই ধরণের গল্পগুলিকে অবশ্যই মিলনাত্মক হতে হবে এবং এতে শেষ পর্যন্ত সত্যেরও জয় হবে।

সেখানে দুষ্টের পরাজয় ঘটবে। প্রাচীন লোকবিশ্বাস বা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু কোনো নীতি বা উপদেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে না।

রূপকথা কিংবা লোককথা (Folk Tale) মিশ্রিত গল্পগুলিতে কৌতুক রস থাকবে না। ভাষা হবে কাব্যধর্মী সেখানে সরল, গ্রামীণ, স্নিগ্ধ গদ্যের ঘটনাবলি বর্ণিত হবে। এই গল্পে প্লটের নির্মাণও চমৎকার। এরকম কয়েকটি গল্প আছে যেখানে আমরা একাধিক প্লট খুঁজে পাই অর্থাৎ সরল কাঠামো এবং চরিত্রগুলির মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি প্লট নির্মাণ করা যায়। আবার সেগুলির পাশাপাশি প্লটের আরো একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত পাওয়া যায় আর একটি গল্পে দুটি প্লট থাকে এদের নিবিড় সম্পর্ক। যেহেতু দুটি প্লট পাচ্ছি আমরা সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে দুটি গল্প হিসেবে পাঠ করা যায় তেমনি দুটি প্লটের গভীর বন্ধনের ফলে একটি সম্পূর্ণ গল্প হিসেবে পাঠ করা যায়। এই গ্রন্থে এরকম জটিল প্লটের দৃষ্টান্ত হল 'শীত বসন্ত', 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার'।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) গল্পকে যে কয়েকটি শ্রেণিতে ভেঙে নিয়েছেন 'দুধের সাগর', 'রূপ-তরাসী', 'চ্যাং-ব্যাং', 'আম-সন্দেশ' ইত্যাদি। এগুলির প্রথম তিনটিতে শ্রেণিকরণ বিন্যাসের টের পাওয়া যায়। দুধের সাগর প্লটে ভূত-প্রেত রাক্ষস একেবারেই অনুপস্থিত। এখানে অতি প্রাকৃত চরিত্র নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু রাক্ষস-খোক্কসের যে অতিচেনা রূপকথা জগৎ তার কোনো ছায়াই নেই। বরং লক্ষ করা যায়, মানুষকে ভূত-প্রেত হিসেবে (যেমন কিরণমালা গল্পের ছোট্ট রানী)। আবার রূপ-তরাসী ভাগের সব গল্পগুলো অতিপ্রাকৃত।
গ্রন্থটিতে লক্ষ্য করা যায়-

- "রাজ সিংহাসন ফেলিয়া শীত উঠিয়া দেখেন, -- মা! বসন্ত উঠিয়া দেখেন মা, --- মা! সুয়োরানীর ছেলেরা দেখেন,--- এই তাহাদের দুয়ো-মা! সকলে পড়িতে পড়িতে ছুটিয়ে আসিলেন। . . ."[৩]
- "পুরী থর্ থর্ কাঁপে! হাতের তরোয়াল ঝন ঝন--রাজপুত্র হাকিলেন--জানি না, যে হও তুমি, রক্ষ রক্ষ দানব! যদি রাজপুত্র হই, যদি নিষ্পাপ শরীর হয়, দৃষ্টির আড়ালে তরোয়াল ঘুরাইলাম, এই তরোয়াল তোমাকে ছাঁইবে!"[৪]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে রূপকথা ও লোককথায় অকল্যাণ ও অমঙ্গলের শক্তির বিপরীতে শুভ চেতনা জয়ী হয়। এর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে রোমাঞ্চ মুহূর্ত। একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে, রোমাঞ্চের ভেতরে দেখা যায় রাক্ষস-খোক্কসের সব অপকৌশল ধরা পড়ে গেছে। এর পরতে লক্ষ্য করা যায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী বা ভূত-পেত্নীর রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে। এইসব প্রতীকী ঘটনা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক। দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমাদের নানাক্ষেত্রে যে কৌশলী ভূমিকা বা শ্রেষ্ঠত্বের যে বলিহারী আকাঙ্ক্ষা তা রূপকথার গল্পে বা কৌশলগত ফ্রেমে কিংবা সর্বদেশিক রূপকথার কাহিনি ঐক্যে অনেকটা মিলে যায় মেলবন্ধনও রচনা করে।

অতীতে ছিল এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় মন্ত্র বা জাদু বলে কোনো নারী যদি বিপদে পড়ে প্রধানত পুরুষরাই এগিয়ে এসেছে সেজন্য পুরুষের প্রাধান্য বা কৃতিত্ব বেশি। এমনকি নারীরাও পছন্দ করে তারা বিপদে পড়লে পুরুষরাই উদ্ধার করুক এটাই তাদের কর্তব্য। প্রকারান্তরে পুরুষে আস্থা নারীদের। প্রচলিত আছে যে, নারীদের সহযোগিতা করলে পুরুষের বল বৃদ্ধি কিংবা সামাজিক মর্যাদা সাবলীল থাকে। তাছাড়া নারীর লৈঙ্গিক ব্যাপারটি তো আছেই। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী সুলামিথ ফায়ারস্টোনকে এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কারণ লিঙ্গিয় স্তরায়নই নারীর শ্রেণি ও সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে।

'কাঞ্চনমালা', 'সাতভাই চম্পা', 'কিরণমালা', 'মণিমালা', 'কলাবতী রাজকন্যা', 'কাঁকনমালা' এরা সব শৌখিন উচ্চতার রমনী। কালের প্রবাহে চিরায়ত বা আবহমান ঐতিহ্যে তারা এক কৃষ্টিতে গড়া। ঠাকুরমার ঝুলি গল্পে প্রায় সবগুলি নারী প্রধান চরিত্র। এখানে নারীর অসহায়ের কথা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তাদের ঐতিহ্য। তবে পুরুষ তাতে একপ্রকার কর্তৃত্ব প্রবণ, বলশালী এবং আধিপত্যবাদী। সেখানে নারীরাও নারীরা তা মান্য জ্ঞান করেছে। পুরুষ মূল্যবোধের কোথায় এর গুরুত্ব? পুরুষ অসহায় নারীকে উদ্ধার করতে এসেছে। কখনো কখনো এও লক্ষ্য করা যায় পুরুষ কখনো শোষকও বটে! পুরুষদের চোখেই নারীর অভিজ্ঞতাও সমাজে বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেভাবেই তারা সমাজে বা গল্পে প্রতিষ্ঠিত। ফলে তাদের লিঙ্গ মর্যাদাও ওই মাপে পুনর্গঠিত।

ফায়ারস্টোনের তত্ত্বও সেই কথা বলে। ঠাকুরমার ঝুলিতে অলৌকিক শক্তি বা অতিপ্রাকৃত শক্তিও নারী পুরুষ মনস্তত্ত্বের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়ই অলৌকিক শক্তি দ্বারা প্রভাবাচ্ছন্ন। এগুলি অনেকটা টোটেমিক

মিথের মতো অন্তর্লীনও বটে। রাক্ষস-খোক্কস থেকে শুরু করে নানা অবাস্তব প্রবণতা এ মিথের অন্তর্ভূক্ত, প্রশ্রয়ভূক্তও বটে।

প্রাসঙ্গিকভাবে বাখতিনের 'কার্নিভালাইজেশন'এর কথা বলা যেতে পারে কেননা কার্নিভাল হল এমন এক উৎসব যা পবিত্র অপবিত্র, বিশিষ্ট তুচ্ছ, জ্ঞানী মূর্খ সবাইকে একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত করে গড়ে তোলে জনসাধারণের যৌথ ক্রিয়াকলাপ। জীবনের সতীব্র প্রকাশই হল কার্নিভালের জীবন। এই সময় জনসাধারণের মধ্যে সবরকম দূরত্ব লুপ্ত হয়ে যায়, এখানে উচ্চতর রমণীর কথা আছে আবার নিম্নতর রমনীর কথা আছে যারা সমাজে এক অর্থে পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ প্রান্তিক। এই প্রান্তিক নারীদের মধ্যে স্বাধীন, অবাধ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গল্পে প্রান্তিক নারীদের মধ্যে এইসব কিছুই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তাদের প্রতিটি কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে আখ্যানের বহুস্তরের বয়ান। এই প্রসঙ্গে বাখতিনের 'পলিফোনি'র কথা চলে আসে কেননা 'পলি' অর্থাৎ বহু, 'ফোনি'-র উৎসে আছে ধ্বনি বা স্বর। অর্থাৎ গল্প বা উপন্যাস বহুস্বরসঙ্গতিমূলক শিল্প যেখানে বহু স্বাধীন এবং অমিশ্রিত কণ্ঠস্বরের সমাহার ঘটে এবং প্রতিটি কণ্ঠস্বরই উপন্যাসের এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। উপন্যাস বা গল্পের ভাষা স্থানীয় ভাষায় হয় সেটা জটিল বা সরল হতে পারে কিন্তু কবিতার ভাষা সব সময় সরল ভাষায় হয় কেননা কবি সবসময় নিজের ভাষায় সহজ সরল ভাবে উপস্থাপন করেন।

আবার প্রাসঙ্গিকভাবে 'ডেকামেরন', 'ক্যান্টারবেরি টেলস', 'জাতক', 'আরব্য রজনী'তেও কার্নিভাল, পলিফোনি এবং আখ্যান কৌশল ভীষণভাবে প্রযোজ্য। এইসব গল্প বা উপন্যাসের ভাষা সহজ সরল আবার কখনো কখনো জটিলও লক্ষ্য করা যায়। ঠাকুরমার ঝুলি কিংবা এইসব গল্পের মধ্যে শাশ্বত রূপকথা লক্ষ্য করা যায়। মজার বিষয়, এইসব গল্পের মধ্যে রূপকথা নিয়ে গল্প অনবরত চলতেই আছে। বিভিন্ন কথক বিভিন্ন রকমভাবে গল্প বলছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, গল্পের ভিতর বিভিন্ন আখ্যান কৌশল (Narrative Technique) তৈরি হচ্ছে। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে একটা যোগসূত্র থাকছে অর্থাৎ অন্তরপাঠশৃঙখল (Intertextuality) লক্ষ্য করা যায় যা আধুনিক বুননের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠেছে।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র (১৯০৭) এই সাফল্যের আড়ালে রয়েছে দক্ষিণারঞ্জনের জাদুকরি গদ্যভাষার আধুনিক বুনন। গল্প-বুননে তাঁর প্রশ্নাতীত নৈপুণ্য। প্রতিটি গল্প কথকতার ভঙ্গিতে রচিত। পাঠকের মনে হবে যেন, পাশে বসে কেউ গল্প বলে চলেছেন। 'মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে' তুলে ধরা আপাতভাবে সহজ মনে হলেও আসলে তা কিন্তু সহজ নয়। সহজ কথা বলা যায় না সহজে। 'কেতাবি ভাষা'য় আর যাইহোক, রূপকথার গল্প লেখা সম্ভব নয়। দক্ষিণারঞ্জন দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে, সূক্ষ্ম দক্ষতায়। দক্ষিণারঞ্জনের এই সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। দক্ষিণারঞ্জনের গল্প কতখানি মুগ্ধ করেছিল, তা বোঝা যায় তাঁর এই মন্তব্যে 'আমি হইলে তো এ কাজে সাহসই করিতাম না'।

সাধু গদ্যভাষায় দক্ষিণারঞ্জনের হাতে স্বাদু হয়ে ওঠে। গদ্যের মাঝে ছন্দ-মিল, পদ্যের অনুপ্রবেশ বড়ই শ্রুতিসুখকর। শব্দ-ব্যবহারে দক্ষিণারঞ্জন সমান সচেতন। অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত ও ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে তাঁর গদ্যভাষায় এসেছে এক স্বতন্ত্র মাধুর্য। শব্দের পৌনঃপুনিকতায় কখনো ছবি হয়ে ওঠে। লক্ষ করি 'যাইতে' শব্দটি বার চারেক ব্যবহার করে আশ্চর্য দক্ষতায় দক্ষিণারঞ্জন পথের দীর্ঘতা স্পষ্ট করে তোলেন।

দক্ষিণারঞ্জন আজও অননুকরণীয়, আকর্ষণীয়। তাঁর রূপকথার মায়াবী জগতের কাছে আমাদের বারবার ফিরে ফিরে যেতে হয়। রূপকথার নটে গাছ মুড়োয় না, গল্পও ফুরোয় না। ছোটরা সে-জগতের সন্ধান পেলে, তারাও যাবে, আনন্দে আপ্লুত হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১. Levi Strauss, Claude. Structural Anthropology. (Translated Jacobson, Claire), 1963, New York: Basic Books Publishers. P. 160.
২. মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র। ঠাকুরমার ঝুলি। ১৩৭৯, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। পৃ. ৭৭।
৩. তদেব, পৃ.৭৭।
৪. তদেব, পৃ.৭৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Prop, Vladimir. Morphology of Folktale (2nd Edition). 1968, Austine: University of Texas Press. Print.
২. De Saussure, Ferdinand. Course in General Linguistics. Eds: 1916, Bally, Charles and Albert Sechehaye, 1959). New York: The Philosophical Library. Print.
৩. Dev, Amiya and Das, Sisir Kumar. Comparative Literature: Theory and Practice. 1989 (Eds), Shimla: Indian Institute of Advanced Study. Print.
৪. হালদার, শিবপ্রসাদ। পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য। ১৯৯৩, কলকাতা: ফার্মা কে.এল. এম, মুদ্রণ।
৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র। সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি। ১৯৯২, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, মুদ্রণ।
৬. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া। ২০১৫, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, মুদ্রণ।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 196-203
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.196

প্রসঙ্গ কলকাতা ৭১: চলচ্চিত্র ভাষার নবনিরীক্ষা

ড. মোস্তাক আলি, *বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কালীগঞ্জ সরকারি মহাবিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mrinal Sen (1923-2018) is a notable and iconoclastic filmmaker of the parallel stream of Indian cinema. Through his formal experiments, he brought about a revolutionary wave in Bengali cinema, which marked the beginning of a new chapter in its history. Such innovation is not seen in any of his predecessors, contemporaries, or successors among Bengali filmmakers. By infusing literary narratives with new ideas in the context of a new era, he reconstructed and reinterpreted those narratives to present his themes and concerns. Whether his films are based on literature or built on original screenplays, he has continually experimented with narrative and form.Although his first film released in 1955 ('Raat Bhore') up to 'Pratinidhi' (1964), he largely followed conventional forms or traditional modes of narration. But from the film 'Akash Kusum' (1965) onward he consciously moved away from tradition and opened up new possibilities in storytelling, creating a new cinematic language. Essentially, it was through the efforts of a few thinkers and filmmakers like him that the new wave in Indian cinema was born. His conviction is considerably reflected in the much-discussed film 'Kolkata 71' (1972).

Keywords: Parallel Cinema, Re-construction, Storytelling, Experiments, Iconoclastic, Conventional, Narrative

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমান্তরাল ধারার একজন ব্যতিক্রমী ও প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন। সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রই হোক বা মৌলিক চিত্রনাট্য আশ্রিত চলচ্চিত্র, প্রতিনিয়ত তিনি আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যদিও ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'রাতভোর' থেকে 'প্রতিনিধি' (১৯৬৪ খ্রি.) পর্যন্ত ছ'টি চলচ্চিত্রে তিনি আখ্যান বর্ণনায় প্রচলিত ফর্ম বা সনাতন রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু 'আকাশ কুসুম' (১৯৬৫ খ্রি.) চলচ্চিত্র থেকে তিনি সচেতনভাবে ঐতিহ্য থেকে সরে এসে আখ্যান বর্ণনায় অভিনবত্ব সঞ্চার করে নতুন সিনেমা ভাষার সৃষ্টি করেছেন। আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত নিটোল জমজমাট গল্প বর্ণনার পরিবর্তে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কঠোর সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রেখে ঐতিহ্যবাহী নান্দনিকতার ধারনাকে অস্বীকার করে মেইন স্ট্রীমের বাণিজ্যিক সিনেমার বিপরীতে এক ভিন্ন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। মূলত তাঁর মতো মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাত ধরেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে নব তরঙ্গের সূচনা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র জমজমাট গল্প বা জনপ্রিয় আখ্যানকে আশ্রয় করে চলচ্চিত্র নির্মিত হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, ন্যারেটিভ ছাড়াও কোনো একটি খবরের পাতার সম্পাদকীয় নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে। আলোচ্য 'কলকাতা ৭১'(১৯৭২ খ্রি.) চলচ্চিত্রেও তাঁর এই প্রত্যয়ী ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

কলকাতা ট্রিলজির অন্যতম এই চলচ্চিত্র-প্রবন্ধে পরিচালক মৃণাল সেন বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রবহমান ইতিহাসের ধারায় ভারতবর্ষের অপরিবর্তনীয় সমাজব্যবস্থায় সহায়সম্বলহীন সর্বহারা শ্রেণির দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা ও তৎসঞ্জাত পরিবর্তমান পুঞ্জীভূত ক্রোধ, বিক্ষোভ ও সম্মিলিত প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য চলচ্চিত্রটি চার দশকের পাঁচটি আখ্যানের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম আখ্যানটি ১৯৭০ সালে আশীষ বর্মনের ছবির জন্য লেখা গল্পের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত 'ইন্টারভিউ' চলচ্চিত্র থেকে নিয়েছিলেন। শেষ আখ্যানটি তিনি ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যৌথভাবে রচনা করেছিলেন। এই চলচ্চিত্রের বাকি তিনটি আখ্যান যথাক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' (১৯৩৩ খ্রি.), প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' (১৯৪৩) ও সমরেশ বসুর 'এস্‌মাল্‌গার' (১৯৫৩ খ্রি.)। চারটি দশকের চারটি দিনের মূল নির্যাসটিকে নিয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে একজন নৈর্ব্যক্তিক ভাষ্যকারের মতো আমাদের ফেলে আসা ইতিহাসের সকরুণ দলিল উপস্থাপন করেছেন পরিচালক। প্রবহমান সমাজ ব্যবস্থায় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও সহায়সম্বলহীন শ্রেণির অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরং তাদের দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র দশক পর দশক ধরে একই থেকেছে। যুগ যুগ ধরে বয়ে চলা এই শোষণ ও বঞ্চনা পুঞ্জীভূত হতে হতে ক্রমে ক্রোধে রূপান্তরিত হয় এবং একসময় তা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ন্যায় ফেটে পড়ে।

'অতসী মামী' (১৯৩৫ খ্রি.) গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'আত্মহত্যার অধিকার' (১৯৩৩ খ্রি.) গল্পে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দারিদ্র্য দুর্দশার চাপে মৃত্যুর আগেই নিয়ত অপমৃত্যুতে আত্মহত্যার অধিকারকে অবদমিত করে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার মহাসংগ্রামের আখ্যানে ব্রিটিশ-শাসিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অখণ্ড বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় দারিদ্র্যে জর্জরিত এক নিম্নবিত্ত পরিবারের সকরুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে একদিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও তার অনিবার্য পরিণতিতে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য ও বস্ত্র সংকট, অন্যদিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে পূর্ব প্রতিশ্রুতি আদায়ে একের পর এক আন্দোলন ও ভীত-সন্ত্রস্ত কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের দমন-পীড়ন-শোষণে জাতির জীবনে নেমে আসে মহাবিপর্যয়, হতাশা ও নৈরাশ্য। এরই মাঝে নতুন একদল সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী শ্রেণি মহাযুদ্ধের আশীর্বাদে কালোবাজারি করে, ভবিষ্যতে অধিক মুনাফালোভে খাদ্য তথা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী জমায়েত করে জিনিসপত্রের কৃত্রিম ঘাটতি বানিয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আশা, স্বপ্ন, আদর্শ ও মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। রূঢ় বাস্তবতার ঘা সহ্য করতে না পেরে নিষ্ঠুর সময়ের গ্লানি বুকে জীবন যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে অনেকেই আত্মহননের কঠিন পথে মুক্তির স্বাদ গায়ে মেখে কালের স্রোতে হারিয়ে যায়।

গল্পের শুরুতেই লেখক বেশ জোরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কালের আবহে নিম্নবিত্তের অসহায়তা তথা অস্তিত্বের সংকটে জীর্ণ সহায়সম্বলহীন এক দরিদ্র পরিবারের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্যের চাপে ঘরের চালের সঙ্গে যেন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে তাদের সমস্ত আশা ও স্বপ্ন। মানসম্ভ্রম বজায় রাখতে নারকেল ও তালপাতার আবরণে ঝাঁঝরা চাল মেরামতের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে মেঘভাঙা জল মাথায় নিয়ে নীলমণি, নিভা, শ্যামা ও নিমুরা কঠোর জীবন সংগ্রামে রত। তাদের কিছুই করার থাকে না, তারা নিষ্ঠুর সময়ের ক্রীড়নক মাত্র। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিভা স্বামীকে সরকারদের বাড়িতে যাবার কথা বললে নীলমণি ক্রোধান্ধ হয়ে স্ত্রীকে মারতে যায়। সময় ও সংসারের জাঁতাকলে পিষ্ট গরিবের মেয়ে, হা-ঘরের বউ নিভা রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ নালিশে শুধুই স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। অন্যদিকে, দরিদ্র পরিবারের কর্তা নীলমণির কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা ও অপরাধবোধে দগ্ধ হতে হতে বিবেকের দংশনে একসময় মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা 'শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন'। এক সুগভীর নৈরাশ্য গ্রাস করে তাকে এবং জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ খোঁজে, যদিও বাতাস রয়েছে তার অবাধ প্রাণধারণের। নিশ্বাস নিতে পারে অনায়াসে অথচ পেটের জ্বালা ও তীব্র অর্থাভাব তাকে বাধ্য করে আত্মহননের দিকে চালিত হতে। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষটি সমস্ত মান-অপমান বিসর্জন দিয়ে নিতান্তই বাধ্য হয়ে সরকারদের দালানে গিয়ে উপস্থিত হয়। জীবনের শত অপমান, লাঞ্ছনা ও গ্লানি সমস্তই নিমেষেই কোথায় হারিয়ে যায়। সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করে। সেখানে আর্থিক সংগতিসম্পন্ন অসুস্থ মানুষের মৃত্যুর জন্য ব্যকুলতা তার মনকে বদলে দেয়। আত্মহত্যার অধিকারকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে বাঁচার

অধিকার, মৃত্যু নয় জীবনই চিরন্তন সত্য। নীলমণির চোখ খুলে যায় সরকারবাড়ির আত্মীয় পিসেমশাইকে দেখে। সত্যই তো পৃথিবীতে এত বাতাস তাও পিসেমশাই-এর ফুসফুস ভরাতে পারে না—

> ''অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।''[১]

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'অঙ্গার' গল্পে লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তেতাল্লিশ সালের দুর্ভিক্ষে অখণ্ড বাংলার বুকে যে অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছিল তার চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ দখলের লড়াইয়ে শক্তি প্রদর্শনের খেলায় মন্বন্তরের কবলে পড়ে বাংলার প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষ মারা যায়। বিজাতীয় শাসকের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, শোষণ ও পরিকল্পনাহীন কর্মকাণ্ডে দিশেহারা প্রাণ সর্বহারা বুভুক্ষু কাঙালের দল একমুঠো খাবারের প্রত্যাশায় কাতারে কাতারে নগর কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। মাঠের রাজা ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ বৃথা আশা ও স্বপ্ন বুকে নিয়ে ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তু হয়ে শহরের রাস্তায় হাইড্রেনে ফুটপাথে ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবারে জীবন টিকিয়ে রাখার মহাসংগ্রামে লিপ্ত হয়। পেটের খিদে মেটাতে অনেকেই আদর্শ তথা নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে চোরাপথের বাঁকে নিজেদের মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যায়। লেখকের সুনিপুণ পর্যবেক্ষণে অতীতের মর্মান্তিক বেদনাগাথায় ফুটে উঠেছে দুর্ভিক্ষের স্বরূপ, প্রকৃতি ও পরিণতি — ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় মূল্যবোধের অবক্ষয়ে প্রকটিত হয়েছে অস্তিত্বের সংকট।

দিল্লিতে কর্মরত এক প্রবাসী বাঙালি কথক নলিনাক্ষের স্মৃতিরোমন্থনে গল্পের শুরু। অবিভক্ত ভারতবর্ষের ফরিদপুরে সহায়সম্বলহীন নিম্নবিত্ত পরিবারে নলিনাক্ষ পিসিমা-পিসেমশাই, শোভনা, মীনু, নুটু ও হারুর সঙ্গে বাস করত। পিসেমশাই-এর ব্যবস্থাপনায় সে দিল্লিতে চাকরি পায়। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও দরিদ্র নিম্নবিত্ত সুখী পরিবারটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে গভীর অন্ধকারে পতিত হয়। অর্থকষ্টে জর্জরিত বিধবা শোভনা দিল্লিবাসী মামাতো ভাই নলিনাক্ষের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করলে স্বর্গত পিসেমশাই-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় নলিনাক্ষ সেই মাসে পঁচিশ টাকা ও পরবর্তীকালে পনেরো টাকা করে মাসোহারা পাঠাতে থাকে। কিন্তু হঠাৎই একদিন মাসোহারার প্রদেয় মানি অর্ডার ফেরত আসে এবং জানা যায় শোভনারা সেখানে থাকে না।

প্রায় তিন বছর পর অফিসের কাজে নলিনাক্ষ বড়ো সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় আসে অফিসের তদ্বির-তদন্তের কাজে। নলিনাক্ষ ভাবে এই সুযোগে দু'দিন ছুটি নিয়ে ফরিদপুরে গিয়ে শোভনাদের খোঁজ নেবে। কর্মব্যস্ততায় হঠাৎই একদিন শিয়ালদহর বাজারে তার ছোটো পিসির মেজ ছেলে টুনুর সঙ্গে দেখা হয়। নিষ্ঠুর কালপ্রবাহে সে জীবন সংগ্রামে রত—

> "কসাইখানার মিলিটারি মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন।"[২]

তার কাছে নলিনাক্ষ শোভনাদের বৌবাজারের তিনশো তেরোর এফ বাড়ির ঠিকানা পায়। অফিসের কাজ শেষ করে নলিনাক্ষ একদিন শোভনাদের বাসস্থান একটা মেসবাড়িতে গিয়ে পৌঁছায়। তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় পিসতুতো বোন মীনুর সঙ্গে। পেটের আগুন নেভাতে ১২-১৩ বছরের কিশোরী মীনু আজ পতিতা। পিসিমার সাথে দেখা হলে পিসিমা খুশি হয় না, বরং পিসিমার কাছে সে নবাগত, অপরিচিত ও অনাহূত একজন মানুষ। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে চরিত্রের স্বাভাবিক স্পন্দন যেন হারিয়ে গেছে। পিসিমার সঙ্গে কথোপকথনে নলিনাক্ষ জানতে পারে দারিদ্র্যের কারণে শোভনার ছেলেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নিয়ে গেছে। অন্যদিকে মীনু ইজ্জত বিক্রি করে হরিশবাবুর দেওয়া আধুলি মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলে—

> ''যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।''[৩]

প্রকাশ্যে বেহায়ার মতো এমন নির্লজ্জ ঘোষণায় মা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। যদিও পেটের জ্বালা মেটাতে মা নিজেই সন্তানকে আগুনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। শোভনা মীনুর কান্না শুনে মায়ের প্রতি প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মা-ও দমবার পাত্র নয়। মা-মেয়ের দ্বন্দ্বে বেআবরু হয়ে যায় পারিবারিক সম্ভ্রম।পাশাপাশি অন্য একটি ঘটনায় দেখা যায়, মেসবাড়ির অন্য এক বাসিন্দা মাস্টারমশাই-এর চাকরি খোওয়া গেছে। রূঢ় বাস্তবের ঘা সহ্য করতে না পেরে তার একমাত্র মেয়ে হয়তো একটু ভালোভাবে বাঁচার আশায় বাড়ি ছেড়ে গেলে মা আত্মহত্যা করে। ছেলে দুটিকে মামার বাড়িতে রেখে

বিপন্ন মাস্টারমশাই কঠিন সময়ের মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। বিধ্বস্ত সংসারটির সাহায্যার্থে নলিনাক্ষ উচ্চমূল্যে তিন মাসের মতো খাদ্য সামগ্রী আর পোশাক ক্রয় করে শোভনাদের হাতে তুলে দেয়। ইতিমধ্যে নারীমাংসের সন্ধানে একজন 'এসেনসিয়াল সার্ভিসের' লোক শোভনার কাছে এলে শোভনা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি বটি হাতে লাফিয়ে পড়ে। সে মানতে পারে না এই ললাটলিখনকে, মানতে পারে না সমাজ তথা পরিবারের অবক্ষয়কে। তার সহজ সরল মন বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে প্রশ্ন রেখে যায়—

> 'কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি ব'লে যাও। তুমি ব'লে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি?... এ যুদ্ধ আমরা বাঁধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি...।"[৪]

নলিনাক্ষ এর উত্তর দিতে না পেরে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে বেরিয়ে আসে। নিষ্ঠুর সময়ের অভিঘাতে জীর্ণ কঙ্কালসার কাঙালের মিছিল মহানগরীর রাস্তায় খাদ্যান্বেষণের বৃথা চেষ্টায় অঙ্গারের মতো নিস্তেজ হতে হতে মৃত্যুর প্রহর গোনে।

স্বাধীনতা পূর্ব ও তৎপরবর্তীকালের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, হতাশা, বেদনা, বঞ্চনা, অবক্ষয় ও জাতির বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে সমরেশ বসু 'এস্‌মাল্‌গার' (১৯৫৩) গল্পে দাঙ্গা ও দেশভাগের অভিঘাতে সৃষ্ট মানব-বিপর্যয়ের সকরুণ আলেখ্যে তুলে ধরেছেন অসহায় ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তুদের জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা ও টিকিয়ে রাখার মহাসংগ্রামের কাহিনি। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বাস্তুচ্যুত এই সর্বহারার দল শহরতলির কারখানার রাবিশের পাশে স্টেশনের ধারে নোংরা স্যাঁতসেঁতে জলাভূমিতে আবরুহীন ছোটো ছোটো বেড়ার ঘরে কোনোমতে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করলেও পেটের আগুন নেভাতে অনেকেই জীবন বাজি রেখে সমাজের নানা আইন শৃঙ্খলাকে ভেঙে, নানা অভিশাপকে পাশ কাটিয়ে অসৎ উপায়ে জীবন নির্বাহ করে।

গল্পের শুরু আশ্বিনের শেষে হেমন্তের আগমনে। কলকাতা থেকে সামান্য উত্তরের রেলস্টেশন যেন বোবা-বদ্ধভূমি। সেখানে অন্ন সংস্থানের জন্য প্রতীক্ষারত 'আততায়ীর দল' জীবনের গ্লানি বুকে ধীরে নিঃশব্দে নিষ্পলক চেয়ে থাকে ট্রেনের সিগন্যালের অপেক্ষায়। দীর্ঘ ষাট মাইল পথ অতিক্রম করে গঞ্জ থেকে চাল কিনে তারা শহরে বিক্রি করে। মরশুমের নতুন ধান ওঠেনি। রেশনের বরাদ্দ চাল ছাড়া শহরে জোগান তেমন নেই। শহরের খুচরো দোকানিরা তাই তাদের খুব খাতির করে। রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছালে একে একে সকলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। বিনিদ্র রজনীর ছাপ চোখে-মুখে। এই আততায়ী দলের সর্দার গৌরাঙ্গ ওরফে গোরা। বয়স তেরো কিন্তু দুঃসহ জীবনের ঘানি টানতে টানতে বুড়িয়ে গেছে। দলের অন্যান্যরা গোরার মতো একই ছাঁচে গড়া। গন্তব্যপথের আশি মাইলের প্রত্যেক স্টেশনের পুলিশের রিপোর্টে তার নাম পাওয়া যায়। বয়স কম বলে কোর্টে প্রডিউসের অযোগ্য। ইতিমধ্যে তিন বার জেলও খেটেছে। থানা-পুলিশের ভয়ে একবার চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে কোনোমতে বেঁচেছে তবুও সে থামে না। পরিবারের ছোটো ছোটো পাঁচ ভাই-বোন, বাবা-মা সকলেই তার উপর নির্ভরশীল। সামান্য মূলধনের উপার্জিত আয়ের সবটাই মায়ের হাতে তুলে দেয় সে। গোরার সহযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম সুবালা—গোরার বান্ধবী বিষ্ণুপ্রিয়া। সেও রিফিউজি, কলোনিবাসিনী। স্বামী তিন বছর ধরে নিখোঁজ। ঘরে দুই ছেলেকে রেখে নিষ্ঠুর সময়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেও জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চোরাব্যবসায় নিযুক্ত সহযাত্রীদের সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে গোরার প্রতি আকৃষ্ট হয়। দুই সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠা ও ব্যকুলতা গোরাকে ঘিরে মগ্ন থাকে। গোরারও সুবালার প্রতি ভালোবাসা গভীর। এই দুই অসমবয়সী নর-নারীর ভালোবাসায় জীবনের ক্লান্তি-অবসাদকে ছাপিয়ে যেন আগমনীর সুর বেজে ওঠে। যাত্রাপথের হাসি-কান্নায় দোলা খেতে খেতে তারা এগিয়ে চলে অতি সন্তর্পণে। কোথাও হয়তো ওত পেতে বসে আছে চেকার, মোবাইল কোর্ট, পুলিশ, ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড আর কালকেউটের মতো সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে স্টেশনের কুলিকে দু'পয়সা ঘুষ দিয়ে এক ক্রোশ হেঁটে গঞ্জের চালের আড়তে পৌঁছায়। গঞ্জের হোটেলে চার আনার ডাল-ভাতের মহাতৃপ্তিতে ফিরে আসে। এবার তারা আরও সাবধান। পদে পদে ভয় আর উৎকণ্ঠা। প্রাণ চলে গেলেও এ মূলধনকে হাতছাড়া করা যাবে না। ইতিমধ্যে, সামনের আপ গাড়ির সঙ্গে দেখা হলে তারা খবর পায় সামনের জংশনেই মোবাইল ও সিভিল সাপ্লাই-এর গুপ্তচর বাঘের মতো অপেক্ষা করছে। অনেকেই ব্যাগসুদ্ধ লাফিয়ে পড়ে। গোরার মধ্যে প্রবল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। জেলে যেতে সে ভয় পায় না—

> "কিন্তু মূলধন! ভাইবোন আর মা! তারা কি খাবে কাল? কেমন করে তাকাবে মা ওই অসহ্য অপলক দুটো চোখে।"[৫]

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলন্ত ট্রেনের নীচে আড়াল হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ধরা পড়ে। পুলিশ, মোবাইল কোর্ট, সিভিল সাপ্লাই-এর শাসানি ও আঘাতে সে ভেঙে পড়ে না —চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের নিষ্পলক চোখের অসহ্য প্রতীক্ষা, অব্যক্ত বেদনার করুণ সুর।

> " 'কলকাতা ৭১' ছবিতে... তিনি বলবার কথা এবং বলবার ভাষা দুটোকেই মেলাতে পেরেছেন। তাঁর বক্তব্য প্রকাশের জন্য যে কাহিনিগুলো তিনি বেছে নিয়েছেন, তার মধ্যে কোনোটাই প্রচলিত কাহিনিরীতির ধরনে তৈরি নয়। কোনোটাতেই ঘটনার উত্থান পতন নেই, নাটকীয়তার উপাদান নেই, সমস্ত অধ্যায়গুলোই যেন এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টেটমেন্ট। ছবি তৈরির রীতিতে যে বিনাটকীকরণ পদ্ধতিতে মৃণালবাবু ইদানিং অন্বিষ্ট, তার সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে গেছে কাহিনিগুলো। তাই সমাজসত্যের বলিষ্ঠ প্রকাশের কারণে তো বটেই, বক্তব্য ও শিল্পরীতির সুষ্ঠ সম্মিলনের ফলে 'কলকাতা ৭১' মৃণালবাবুর শিল্পীমানসের বিবর্তনের একটা নতুন ধাপ এবং তাঁর পরিণততম শিল্পসৃষ্টি।"[৬]

এই 'সমাজসত্যের' উন্মোচনে পরিচালক দশক থেকে দশকে বয়ে চলা দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়, মূল্যবোধহীনতা, অবক্ষয় ও তারই অনিবার্য পরিণতিতে সংগঠিত বিক্ষোভ ও বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ডাক তথা পালাবদলের নির্দেশ দিয়েছেন। বহমান সমাজব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন এই বঞ্চনা, অন্যায় ও পুঞ্জীভূত শোষণের সাক্ষী একজন কুড়ি বছরের তরতাজা যুবক। সে হাজার হাজার বছর ধরে এই দারিদ্র্য, মালিন্য, শোষণ, অন্যায়, অবিচার, মনুষ্যত্বহীনতা, মূল্যবোধহীনতা ও সমাজের অবক্ষয়কে দেখেছে। ছবির শেষ পর্যায়ে কোরাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে শোষণের স্বরূপ বা প্রকৃতিকে তুলে ধরে শোষকের বিরুদ্ধে সুতীব্র গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। ছবির শুরুতেই নেপথ্য কণ্ঠে তার বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন পরিচালক। পর্দায় লিপির আকারে মুদ্রিত এই ভাষ্য প্রতিটি পর্যায়ের শেষে মোট পাঁচবার ব্যবহৃত হয়ে প্রতিটি আখ্যানের সঙ্গে সুন্দরভাবে সংযোগসূত্র স্থাপন করেছে। এই কুড়ি বছরের যুবক আসলে একটা 'concept'। সে "কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, বিমূর্ত ও কালোত্তীর্ণ এক প্রতীতি। তাই সে এক হয়েও বহু, বহুর দ্বন্দ্ব-মিলনে এক।"[৭] প্রবহমান ইতিহাসের ধারায় নিষ্ঠুরতার সাক্ষরবহনকারী কুড়ি বছরের এই যুবক তুলে ধরে চিরন্তন সত্য —

> "আমার বয়স কুড়ি
> কুড়ি বছর বয়স নিয়ে
> আমি আজও হেঁটে চলেছি
> হাজার বছর ধরে
> দারিদ্র্য
> মালিন্য
> আর
> মৃত্যুর ভিড় ঠেলে
> আমি পায়ে পায়ে চলেছি
> হাজার বছর ধরে
> হাজার বছর ধরে
> দেখছি
> ইতিহাস
> দারিদ্র্যের ইতিহাস
> বঞ্চনার ইতিহাস
> শোষণের ইতিহাস"[৮]

কুড়ি বছরের যুবকটির ভাষ্য শেষ হলে মন্তাজের আশ্রয়ে পরিচালক কলকাতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এরপর কাহিনির প্রথম আখ্যানে দেখা যায় এক বিচারালয়ের দৃশ্য। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রথম সিকোয়েন্সে একটি পোশাকের দোকানের শোকেস ভাঙা ও সাহেবি পোশাক পরিহিত ম্যানিকিনকে বিবস্ত্র করার অপরাধে 'ইন্টারভিউ' চলচ্চিত্রের নায়ক আসামী

রঞ্জিত মল্লিকের বিচার হচ্ছে। সেই বিচারালয়ে নানা বাদ-প্রতিবাদের পরে সমাজের নানা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্রোধকে স্বাভাবিক 'সামাজিক অস্তিত্ব'রূপে গণ্য করা হয়। এরপর সত্তর দশকের কলকাতার একটা ঘটনাকে তিনি তুলে ধরেছেন। সংলাপহীন এই দৃশ্যে শুধুমাত্র আবহ সংগীতের মাধ্যমে এক নিষ্পাপ সহজ-সরল সুন্দরী নারীর আশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। আচমকা একটা গুলির আওয়াজ শোনা যায় এবং নেপথ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কলকাতার ময়দানে গুলিবিদ্ধ অজ্ঞাতনামা এক তরতাজা প্রাণ যুবকের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়। এরপর কাহিনি পিছিয়ে যায়। উনিশশো তেত্রিশ সালের প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পের অনুসরণে কলকাতার বস্তিবাসী এক দরিদ্র পরিবারের সংগ্রাম ও বিক্ষোভকে তুলে ধরেছেন। জীবনের অসহনীয় যন্ত্রণার মোকাবিলা করতে না পেরে বা নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকতে দুঃস্থ পরিবারের কর্তা নীলমণি কখনো স্ত্রীকে মারতে যায়, আবার কখনো অসহায় মূক প্রাণী ভুলুকে আক্রমণ করে। এর পরবর্তী পর্যায়ে এক দশক পেরিয়ে কাহিনি তেতাল্লিশ সালের কলকাতায় পৌঁছে যায়। মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলকাতা শহরটা যেন মর্গে পরিণত — পথে পথে বুভুক্ষুর বুকফাটা আর্তনাদ, মৃত মানুষের মহামিছিল। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার' গল্পের অনুসরণে সৃষ্ট এই আখ্যানে দেখা যায়, আকালের কবলে পড়ে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের আজন্মলালিত সংস্কার, বিশ্বাস ও আদর্শ ভেঙে পড়ে। এই আখ্যানাংশেও পরিচালক একজন ভাষ্যকারের মতো ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মানুষের অসহায়তাকে তুলে ধরেছেন। জীবনের অসহনীয় পরিস্থিতিতে তাদের কৃতকর্ম বা নিষিদ্ধ জীবনযাপনের জন্য অনুশোচনা নেই বরং মনের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ অঙ্গারের মতো ঠিকরে বেরিয়ে আসে। পরবর্তী পর্বে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের ইতিহাস, সমাজব্যবস্থাকে তিনি চিত্রিত করেছেন। উনিশশো তিপ্পান্ন সালে প্রকাশিত সমরেশ বসুর 'এস্‌মাল্‌গার' গল্প-আখ্যানের উপর ভিত্তি করে রচিত এই অংশে বহমান সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থায় চোরাচালানদার একদল দারিদ্র্যগ্রস্ত কিশোরের মহাসংগ্রাম ও বিক্ষোভকে তুলে ধরেছেন পরিচালক। পরিবারকে বাঁচাতে সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বে-আইনি নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের বিক্ষোভকে তুলে ধরেছে। যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত এই ক্রোধ ও বিক্ষোভ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে সত্তরের দশকে এসে। এই অংশে একাত্তরের কলকাতার বিলাসবহুল হোটেলের জমকালো পার্টিতে আগত অভিজাত সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণির মুখোশ খুলে দেন পরিচালক। সমাজের উঁচুতলায় অবস্থানকারী তথাকথিত প্রগতিশীল এই সমাজচিন্তকেরা যখন নানা রকম তাত্ত্বিক আলোচনায় বহমান সমাজব্যবস্থার নানা জটিল সমস্যার সমাধানে মশগুল তখন হঠাৎই আলো নিভে যায় এবং আবার সেই কুড়ি বছরের যুবক কোরাসের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে সকলের সামনে এই সুবিধাবাদী শ্রেণির হাজার হাজার বছরের বঞ্চনা ও শোষণের কথা সকলকে বলে এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ডাক দেয়।

আলোচ্য চলচ্চিত্রে পরিচালক একজন প্রাবন্ধিকের মতো তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জির উল্লেখ করে এক অসাধারণ শক্তিশালী আঙ্গিকে বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষের হতাশা, বেদনা, বঞ্চনা ও সংকটকে তুলে ধরেছেন। এর ফলে কাহিনি বর্তমান থেকে অতীতের দিকে যাত্রা করে আবার বর্তমানে ফিরে আসে এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের টুকরো টুকরো চিত্রগুলি পুনরায় ফিরে এসে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে তা বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সমাজের রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে ধরতে নির্বাচিত কাহিনি থেকে তিনি শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যার ফলে কাহিনিতে প্রথাগত আখ্যান বর্ণনার ঐতিহ্য, পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। কাহিনির আশ্রয় নিয়েও এই চলচ্চিত্রে তিনি প্রথাগত কাহিনি বর্ণনার রীতি পরিত্যাগ করেছেন। ফলে কাহিনিটি আগাগোড়াই এলোমেলো, ভাঙাচোরা। মৃণাল সেন বলেছেন—

> "অজিতেশের গল্প মানে ৭১-য়ের Collage-য়ের মত যেটা করা হয়েছে ওটা ঠিক গল্প নয়।... আমি যেটা বলছিলাম, এখানে তিনটে গল্প আছে ৩৩, ৪৩, আর ৫৩, কিন্তু এখানে I have tried to serve as an essayist... এবং last sequence-য়ে ১৯৭১-য়ের সেই sequence-য়ে যখন ফিরে আসছি——তখন আমি physical reality-কে redeem করতে পারিনি এবং চাইনি। redemption of physical reality-ই film-য়ের একমাত্র দায়িত্ব নয়। fragments of physical reality-কে নিয়ে আমি আমার ইচ্ছামত একটা shape দিয়েছি, আমার মানসিকতায় জমে এরকম একটা shape দিয়েছি। অর্থাৎ physical reality থেকে খুচরো উপাদান সংগ্রহ

করেছি, টুকরো টুকরো, অনেক।... টুকরো টুকরো বাস্তব ছবি ও শব্দ যোগাড় করেছি, জুড়েছি নিজের 'ইচ্ছেমতো', নিজের ইচ্ছেমতো একটা পৃথিবী তৈরী করেছি। তারপর, নিজস্ব logic আমদানি করেছি 'পৃথিবী'টাকে বাঁধতে, organise করতে, convincing করে তুলতে, বক্তব্যকে শক্ত করতে। এবং সব শেষে জেনেশুনেই, খানিকটা vengeance নিয়েও narrative style -এর tradition ভাঙতে। এই ব্যাপারটা আমি খানিকটা প্রচলিত form ভাঙার চেষ্টা থেকেও করেছি।"[৯]

সত্তর দশকের অস্থিরতা, নিজেদের সোনালী স্বপ্নকে পদাঘাত করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার তরতাজা প্রাণের কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার সকরুণ মর্মান্তিক ইতিহাসের সৃষ্টির নেপথ্যে এক রূঢ় সত্যকে পরিচালক প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রায় দু'শ বছরের রাজত্বকালে বিজাতীয় বিদেশি শাসকের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারতববর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করলেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ 'colonial legacy' বা 'hangover' থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এই 'লিগাছি' থেকে উদ্ভূত বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানা সমস্যাকে তুলে ধরে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নানা কমেন্টের মাধ্যমে বহমান সমাজব্যবস্থায় সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সর্বত্রই আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বার্তা দিয়েছেন 'ইন্টারভিউ' (১৯৭০ খ্রি.) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। তিনি জানেন, একাত্তরের কলকাতার এই অস্থিরতা, এই প্রচণ্ডতার পেছনে নিশ্চয়ই কিছু কাজ করেছে। তা হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি। তাই একজন চিন্তাশীল সমাজনিষ্ঠ মানবতাবাদীর ভূমিকা নিয়ে অতীতের অধ্যয়ন করে বলেছেন—

"Ours is the history of continuing poverty and exploitation running through ages."[১০]

আর তাই আলোচ্য চলচ্চিত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাস দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের ইতিহাস, এই অস্থির, ডামাডোলপূর্ণ কলকাতার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি অতীতের কাহিনি বর্ণনা করতেই করতেই আবার একাত্তরের অস্থির কলকাতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এরই মাঝে একটি ফ্যান্টাসিকে জুড়ে দেন পরিচালক। পুলিশের গুলিতে নিহত কুড়ি বছরের এক যুবকের খবর সম্প্রচারিত হয় রেডিয়োতে। একটা কাল্পনিক সুন্দরী যুবতী মেয়ের মুখের উপরে কুড়ি বছরের যুবকের কথাগুলি ভেসে ওঠে। এরপর ১৯৩৩, ১৯৪৩ ও ১৯৫৩ সালের তিনটি গল্প শেষে আবার ওই মৃত যুবকের কথাগুলি পর্দায় দেখা যায়। পরিচালক এও বলেছেন, যারা এর জন্য দায়ী, যারা নিজেদের সুবিধার্থে এই বঞ্চনা, দারিদ্র্যকে জিইয়ে রেখেছে— সেই শোষণের কারবারিদের মুখোশকে খুলে দেওয়া দরকার। তাই আলোচ্য চলচ্চিত্রের শেষ অংশে দেখা যায়, তীব্র স্যাটায়ারের মাধ্যমে তিনি সুবিধাবাদী শ্রেণির স্বরূপকে তুলে ধরে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন। পর্দার আলো নিভে গেলে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত যুবক প্রকৃত সত্য সকলের সামনে তুলে ধরে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। আবার ছেলেটি পর্দায় আবির্ভূত হয়ে নিপীড়িত, সর্বহারা শ্রেণির অসহায়তার কথা বলে এবং পর্দায় একের পর এক ১৯৩৩, ১৯৪৩ ও ১৯৫৩ সালের শেষ দৃশ্যগুলি ভেসে ওঠে। দশকের পর দশক জুড়ে অবহেলিত শ্রেণির ক্রোধ জমা হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। যুবকটি যেন ইতিহাস কথকের ভূমিকা নিয়ে ইতিহাসের বিবরণ দিচ্ছে সকলের সামনে। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ১৯৩৩, ১৯৪৩ ও ১৯৫৩ সালে তার কী মনে হয়েছিল তা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং সংযুক্ত হতে হতে কাহিনি একাত্তরের কলকাতায় এসে পৌঁছায়। অস্থির কলকাতায় কুড়ি বছরের যুবকটি সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে অসহায় প্রাণ অকালেই ঝরে পড়ে।

চার দশকের পাঁচটি আখ্যান অবলম্বনে নির্মিত কলকাতা ট্রিলজির অন্যতম এই চলচ্চিত্র-প্রবন্ধে পরিচালক প্রথম থেকেই আখ্যান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিগত শতাব্দীর রূঢ় সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরতে তিনি একাধিক সাহিত্য আখ্যানের যেমন সাহায্য নিয়েছেন তেমনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নানা ঘটনাপঞ্জিকে তুলে ধরেছেন ভিন্ন রূপ ও আঙ্গিকে। কিন্তু আখ্যান বর্ণনার চিরাচরিত ঢং-এ কাহিনি বর্ণনা করেননি। বক্তব্য প্রকাশের জন্য তিনি অনুসৃত আখ্যান থেকে শুধুমাত্র তথ্য আহরণ করে একজন নৈর্ব্যক্তিক ভাষ্যকারের মতো প্রবন্ধের ঢঙে অতীতের সকরুণ চিত্রকে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি চাইতেন না কাহিনির রসে দর্শক মজে থাকুন, তাই কাহিনি নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করে এগিয়ে যায় না। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ভিন্নপথে ধাবিত হয়। বক্তব্য বিষয়কে তুলে ধরতে সাহিত্য আখ্যানকে নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন শিল্প মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, যুগান্তর সম্পাদনা।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., মার্চ ২০০৮, পৃ. ৫৬।
২. সান্যাল, প্রবোধকুমার। অঙ্গার। মিত্র ও ঘোষ,অগ্রহায়ণ ১৩৫০,পৃ. ৬।
৩. তদেব,পৃ. ১৪।
৪. তদেব,পৃ. ৩০।
৫. বসু,সমরেশ। আমি তোমাদেরই লোক। জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স,প্রকাশকাল অজ্ঞাত, পৃ. ৩৫২।
৬. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পাদনা।চলচ্চিত্র চর্চা (পত্রিকা)। সংখ্যা ১৮, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৩।
৭. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পাদনা।প্রসঙ্গ মৃণাল সেন: চলচ্চিত্র সমালোচনা। সংখ্যা ২৪, মে ২০১৭, পৃ. ১১৪।
৮. সেন,মৃণাল। তৃতীয় ভুবন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., আগস্ট ২০১১,পৃ. ১০৩।
৯. সেন, অনিল সম্পাদনা। চিত্রবীক্ষণ (পত্রিকা) ।সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা,এপ্রিল-মে ১৯৯৩, পৃ. ৬৮।
১০. তদেব, পৃ. ৬৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, যুগান্তর সম্পাদনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., মার্চ ২০০৮।
২. সান্যাল, প্রবোধকুমার। অঙ্গার।মিত্র ও ঘোষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫০।
৩. বসু, সমরেশ।আমি তোমাদেরই লোক।জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, প্রকাশকাল অজ্ঞাত।
৪. সেন, মৃণাল।তৃতীয় ভুবন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., আগস্ট ২০১১।

সহায়ক পত্রিকা:

১. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পাদনা।চলচ্চিত্র চর্চা (পত্রিকা),সংখ্যা ১৮, নভেম্বর ২০০৯।
২. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পাদনা।প্রসঙ্গ মৃণাল সেন: চলচ্চিত্র সমালোচনা। সংখ্যা ২৪, মে ২০১৭।
৩. সেন, অনিল সম্পাদনা। চিত্রবীক্ষণ (পত্রিকা) । সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা,এপ্রিল-মে ১৯৯৩।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 204-217
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.197

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আধুনিকতার রূপায়ন

মো: কয়েছ আহমেদ, *সিনিয়র প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ*
ড. কৃষ্ণা ভদ্র, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ*

Received: 26.08.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Novels are the most popular branch of literature in modern times. The reason for this popularity comes from how the various diverse backgrounds of life can be depicted on the canvas of a novel. The life that the novel depicts is not a poetic thriller, not a dramatic scene but is rooted in real life. And, the reflection of the self-realization of novelists is the beginning of the modern novel. In the history of novels, Parichand Mitra to Bankim Chandra Chattopadhyay, RabindranathTagore, SaratChandra Chattopadhyay, Tarashankar Bandopadhyay, Vibhutibhushan Bandopadhyay, Manik Bandopadhyay are renowned novelists. These novelists have brought variety, modernity and reality to novels. The purpose of this article will be to expose the various aspects of modernity.

Keywords: Modernity, Novelist, Novel, Society, Religion, Classification of novels

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। যথা: প্রাচীনযুগ (৬৫০-১২০০) মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০) আধুনিকযুগ (১৮০১-বর্তমানকাল) প্রতিটি যুগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে । প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক আর গতানুগতি সাহিত্যের ধারায় মানবতার বিষয় প্রত্যক্ষভাবে না এলেও পরোক্ষ ভাবে এসেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ জীবনে দেখা যায়, মানুষের নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ বা স্বাধীনসত্তার উপলব্ধি হারিয়ে সমাজের এবং ধর্মের শৃংখলিত নীতিবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের নামে তখন স্বাভাবিক ভাবে প্রচারিত হয়েছে সমাজের নীতিবোধ এবং ধর্মীয় জীবনের মহিমা। মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধ থেকে মানবজীবনের মুক্তিলাভ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধিই মানুষকে আধুনিকযুগের প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে। মানুষ এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনসত্তার অনুসারী। মানুষ তার দোষ-গুণের মধ্যে দিয়ে তার মূল্যবান জীবনকে পরিস্ফুট করতে চায়। এই ব্যক্তিবোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভব হয়। এই বোধ কেবল মাত্র উচ্চ শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রেই নয় বরং সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, দু:খ, দারিদ্র্যের মধ্যে ও জীবনের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে তাই জীবন সম্পর্কে অতি সাধারণ মানুষের সামাজিক, ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক জীবন-প্রণালীর বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রামায়ণ-মহাভারত কিংবা মঙ্গলকাব্যের ধারায় অথবা রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর অলৌকিকতা ও দৈবশক্তির বিকাশের মধ্যে ও কখনো কখনো সমাজচিত্রের ক্ষীণ ছায়া এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দু:খের ঘর কন্যার চিত্র লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে যথা 'কথাসরিৎসাগর', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', দশকুমার রচিত 'কাদম্বরী' ইত্যাদির মধ্যেও উপন্যাসের

কিছুটা উপাদান লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ জাতকে, রামায়ণ, মহাভারতের রচয়িতারা যে রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাও সমকালীন সাহিত্যের অভিনব শিল্প চেতনার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে সুদক্ষ ঔপন্যাসিকের সমস্তগুণই বর্তমান ছিল। মুকুন্দরামের কাব্যে দেবতারা মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। মুকুন্দরামের পাশাপাশি মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যেও মানবতার জয়গান মুখরিত হয়েছে। এছাড়া ও পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় রচনার মধ্যে মানব-মানবীর প্রণয়, আবেগ, বিরহ, যন্ত্রনার চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। আরাকান ও রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের যথার্থ মর্যাদা দান করা হয়েছিল। ঐ সময় মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের হাত ধরে আরবি, উর্দু, ফারসি, হিন্দি ভাষা থেকে অনুবাদিত হয়েছিল 'লাইলী মজনু', 'ইউসুফ-জোলেখা', 'সতী ময়না-লোর-চন্দ্রাণী', 'পদ্মাবতী', 'মধুমালতী', বাংলা সাহিত্যে ধর্ম- সংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম সার্থক নিদর্শন রূপে দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালি মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালি মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার রস আসাদ্বনের পাশাপাশি গদ্যের উৎপত্তি বিকাশ, ফোট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে সংবাদপত্রের আর্বিভাব পাঠকের মনোরঞ্জন করে। পাঠকের মনে বাস্তবজীবনের এইসব সত্য বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল হয়ে ধরা পরে। ''বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের মূলে যে চারটি স্বাধীনধারা কার্যকর হয়েছে সেগুলো হলোঃ (ক) অদ্ভুতরসাত্মক রূপকথা, (খ) ঐতিহাসিক কাহিনী, (গ) অনুবাদ মৌলিক নীতিকাহিনী এবং (ঘ) লোকরঞ্জক নকশা।"[১]

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ শর্ম্মন ছদ্মনামে নববাবু বিলাস প্রকাশ করেন। উপন্যাসের কিছু কিছু রেখাচিত্রে উজ্জ্বল। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স রচিত 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' নামে একটি কাহিনীর সাক্ষাত পাওয়া যায়। খ্রিস্টান ধর্মের বিষয় এর উপজীব্য। পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়। অবশ্য 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র তুলনায় 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বেশি উজ্জ্বল। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টিমাত্র, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে ধারাবাহিক ভাবে কাহিনীর সাক্ষাত পাওয়া যায়। সেই হিসেবে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের শক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস সৃষ্টির ফলে এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, প্রবোধ স্যান্যাল, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবের ফলে বাংলা উপন্যাসের একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হলে এখান থেকে পরিপূর্ণ ভাবে বিস্তার লাভ করে।

আধুনিক যুগে সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে উপন্যাস। এ জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হলো জীবনের বিভিন্ন পটভূমিকা চিত্রিত করা যায় উপন্যাসের ক্যানভাসে। উপন্যাসে যে বিস্তৃত জীবন চিত্রিত করে তা কোন কাব্যিক রোমাঞ্চ নয়, নাটকীয় দৃশ্য নয়, একটি বাস্তব জীবন। আর উপন্যাস যে দিন থেকে বাস্তবতাকে অবলম্বন করলো সেদিন থেকে উপন্যাসের আধুনিকতা শুরু। জীবনের জটিল বাস্তবতাকে অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

জীবনের জটিলতা সর্বকালে ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে এসে যান্ত্রিক মানুষের উগ্রস্বার্থবোধ এবং প্রখর সচেতনা তার মাঝে জাগিয়ে তোলে আত্মোপলব্ধি। এ আত্মোপলব্ধির ফলে মুহূর্তে তার মনোজগত ভাঙ্গন সৃষ্টির খেলা চলে। মুহূর্তে পাল্টে যায় মন, এ মুহূর্তে যা প্রিয়জন, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সে হয়ে উঠে শত্রু। এতো দ্রুত মন পরিবর্তনের ফলে আধুনিক মানুষের হৃদয় দ্বন্ধে বিক্ষত উগ্র মানুষটি ঘটিয়ে বসে অঘটন। চলে আসে আলোচনার শীর্ষবিন্দুতে। আধুনিক উপন্যাসে সে হয়ে যায় নায়ক আবার অনেক উপন্যাসে নায়ক হয় না রক্ত মাংসের মানুষ। সেখানে নায়ক হয় ইতিহাসের ঘটনা, মানুষের মতাদর্শ কিংবা সম্মিলিত চরিত্রগুলো।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা:

এখন প্রশ্ন হলো সাহিত্যের আধুনিকতা বাধা পাচ্ছে কোথায়? তা কি মননে? চিন্তার সংকীর্ণতায়? আধুনিকতা তো কখনো কোন গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। দেশ-কাল-পাত্র ঊর্ধ্বে তার বিচরণ। একটা নির্দিষ্ট পরিবেশ তার পটভূমিকা হলে ও সে পরিবেশ বর্ণনা গুণে পরিচয় লাভ করবে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো জাতি আধুনিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে খুঁজে পায় তার চেনা জগৎ থেকে। উৎকৃষ্ট আধুনিক উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় আত্মসচেতনতা। ধর্ম, সমাজ, প্রগতিশীল চেতনা, সাহস, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অভিনব আঙ্গিক, নিত্য নতুন পরীক্ষণ আধুনিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলেও সেখানে উপন্যাসিককে হতে হয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দার্শনিক। ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষক, জনজীবনের ব্যর্থতার মূলবীজ কোথায় নিহিত তার আবিষ্কারক হলেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাস-শিল্পকে বিকাশের শীর্ষ স্তরে পৌঁছে দেয় এবং মহৎ উপন্যাস পাঠকের মনকে যুক্ত করে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে। উপন্যাসের প্রধান উপাদান মানুষের জীবন তাই উপন্যাসের কাহিনী হয় বিশ্লেষণাত্মাক দীর্ঘ ও সমগ্রতা সন্ধানী। সামাজিক সমস্যার মূল স্রোতের অনুসন্ধিৎসু গবেষক। পাঠক বা সমাজের মানুষকে সমাজ জীবনের চাহিদা, মানুষের ক্রিয়াকলাপ, মানসিক জটিলতা সবকিছু শৈল্পিক দৃষ্টি উপস্থাপন করেন পাঠক সমাজ। সেই চিত্রময়তা ভেতরে সমাজের অসংঙ্গতি বিষয়ক সমাধান ও করে থাকেন। তার-ই বিশ্লেষণ এবং অন্বেষণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

বিষয় পরিধি ব্যাপ্তি আলোকে গবেষণাটি সময় কাল একই ফ্রেমে চিত্রপট উপস্থাপিত করা কষ্টসাধ্য। তবু ও প্রণিধান যোগ্য।

গবেষণার হাইপোথিসি:

সমাজ জীবনের মূল্যবোধের প্রেক্ষাপট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

ঔপন্যাসিকদের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বিশ্লেষণ: প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪- ১৮৮৩) বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে এবং বিবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র উচ্চার্য নাম। উনবিংশ শতাব্দীর জীবন রূপের প্রথম ব্যঙ্গচিত্র রচয়িতা, জীবনানুসারী গদ্যরীতির প্রথম প্রবর্তক। তেমনি তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক হিসেবে ঐতিহাসিক মর্যাদায় স্মর্তব্য। উনিশ শতকের রেনেসাঁসে ভারতবর্ষের সাহিত্য জগতে ও পরিবর্তন এনেছিল। এ সময়ে পরিবেশ ছিল মানবতার জয়গানে মুখরিত। তখনই উচ্চবিত্তের হাত থেকে বিদ্যা ও বিত্ত চলে গিয়েছিল অধিকারীদের হাতে। প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন সেই সময়ে অন্যতম রেনেসাঁসের সংগঠক। তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র। সেই সময়ে ধনীদের আচরণ হয়ে উঠেছিল উচ্ছৃঙ্খলতা আর্বতে নিমজ্জিত। আর সমাজকে অবক্ষয়ী পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ১৮৫৮ সালে তিনি লিখেছিলেন উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'। সেই থেকে সূচিত হলো বাংলা সাহিত্যের সার্থক উপন্যাসের ধারা। তিনি রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের 'হিতকরী' (১৮৫৪) মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এ পত্রিকায় 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার তাঁর কৃতিত্বের জন্য পাদ্রী লঙ তাঁকে 'ডিফেন্স অব বেঙ্গল' অভিধায় ভূষিত করেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৯৫৯) 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১) 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) 'অভেদী' (১৮৭১) 'ডেভিড হেয়ার জীবন চরিত' (১৮৭৮) 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ববস্থায়' (১৮৭৮) 'আধ্যায়িকা' (১৮৮০) ও 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) প্রতিটি উপন্যাসে সংকীর্ণ চিন্তা চেতনার প্রকাশ পেয়েছে। সব উপন্যাসেই অনেকটা বৈচিত্রতা এসেছে।

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের কাহিনি: অতি আদরের ধনীর পুত্র মতিলাল। ধর্ম, নীতিশিক্ষা কখনো পায়নি। সঙ্গদোষে অবনতি শেষ ধাপে। অন্যদিকে মতিলালের ছোট ভাই রামলাল আদর্শ চরিত্র বরদাবাবু সান্নিধ্যে থেকে তাঁর নির্দেশ মান্য করে সবর প্রশংসা অর্জন করেছে। মতিলালের চৈতন্যোদয় এবং আদর্শ জীবনের প্রতি আকর্ষণে গ্রন্থের সমাপ্তি। গ্রন্থের এই প্রধান ঘটনাস্রোত বিচিত্র খণ্ড ক্ষুদ্র পল্লবিত ঘটনাই গ্রন্থটির আশ্চর্য সফলতার কারণ। বস্তুত বরদা বাবুর মত প্রত্যক্ষ নীতিবিদ, বেনীবাবুর মত সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল এরা আলালের অবিস্মরণীয় সাফল্য

এনে দিয়েছে। মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ হলধর, গদাধর ইত্যাদি ধড়িবাজ, মুৎসুদ্দি বাঞ্চারাম, শিক্ষক বক্রেশ্বর বাবু এবং সর্বোপরি একটি অপূর্ব সৃষ্টি ঠকচাচা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কেই তাঁর তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। এ উপন্যাসটিতে কলকাতা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা তথা কথ্যভাষার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ভাষাটি 'আলালী ভাষা' হিসেবে সুপরিচিত। এই ভাষার ব্যাপক পরিমানে আরবি- ফারসি শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো ঠকচাচা, ঠকচাচী, মতিলাল, বাবুরাম বাবু, বাঞ্ছারাম বাবু প্রমুখ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাসের অভিমত:

ক. উপন্যাসের নায়ক আলালের বাস্তবতা রূপটি গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে যে বাস্তবনিষ্ঠতার কারণে বাংলা সাহিত্য তাঁর অবদান অতুলনীয়।

খ. প্যারীচাঁদ মিত্র সমাজচিত্র অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত ।

গ. তিনি একদিকে যেমন রঙ্গ পরিহাসের উত্তরোল ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করে পাঠককে বেসামাল করে তুলেছেন, আবার অন্যদিকে সমাজ ও ব্যক্তির জীবন নীতি, উচ্চতর চরিত্র ধর্ম প্রভৃতি নৈতিক ব্যাপার নিয়েও খুব গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়েছেন।

ঘ. উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার প্রথম সাক্ষাত পাওয়া গেল তাঁর রচনায়।

ঙ. একটি বিস্তৃত দেশজ জীবনপটের, প্রকৃতি এবং মানুষের প্রথম ব্যবহার এখানে পাওয়া গেলো।

চ. ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত সর্বগ্রাহী মনের প্রথম পরিচয় এই রচনায় মিলল।

ছ. সর্বোপরি জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা মানসদৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রথম এই রচনায় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্বদ্যিালযের প্রথম গ্রাজুয়েট। তিনি প্রথমে Rajmohan's wife (1862) ইংরেজি উপন্যাস লিখে তৃপ্ত হয়নি। তিনি বাংলা উপন্যাস লিখায় আত্মোনিয়োগ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন তাঁর মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথের সন্ধান পেলেন। তেমনি বাঙালির মন এক অভিনব সাহিত্য শিল্পের রসস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বাইশ বছরে চৌদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। যথা: 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৬) 'কপাল কুণ্ডলা' (১৮৬৬) 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) 'রাধারাণী' (১৮৭৫) 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) 'রজনী' (১৮৭৭) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) 'রাজসিংহ' (১৮৮১) 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে উড়িষ্যাধিকার নিয়ে মোঘল ও পাঠানদের মধ্যে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তা -ই 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। উপন্যাসে যুদ্ধ বিগ্রহের কলকোলাহলের স্থান দেয়া হলেও এতে প্রেমের সূচনা, বিকাশ, পরিণতি ফুটে উঠেছে। প্রধান চরিত্র হল– বিমলা, আয়েশা, জগৎসিংহ, তিলোত্তমা।

এয়োদশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের কাহিনি 'মৃণালিনী' উপন্যাসের উপজীব্য। তাঁর এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়ে ঔপন্যাসিকের কল্পনাশ্রয়ী মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে বেশি। প্রধান চরিত্র হলো– হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, পশুপতি, মনোরমা। সামাজিক উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'য় সামাজিকতার তুলনায় নায়িকার অন্তপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটনই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধান চরিত্র হলো কপালকুন্ডলা, মতিবিবি, নবকুমার, কাপালিক প্রমুখ। এ উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা এমন এক চরিত্র, যে যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত বনে বড় হয়েছে, লোকালয় বা সমাজ দেখেনি। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'। রাজস্থানের চঞ্চলকুমারীকে মোগল সম্রাট আত্তরঙ্গজেব বিবাহ করেন। এ কারণে রাজসিংহের বিরোধ এবং বিরোধের ফলে রাজসিংহের জয় ও চঞ্চলকুমারী লাভ। এ ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসটি পরিকল্পিত। তাছাড়া জেবুন্নেসা- মবারক-দরিয়া বিবির একটি কাল্পনিক ঘটনাও চিত্রিত হয়েছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পটভূমিকা ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম। এতে সঙ্গে ইতিহাসশ্রয়ী ঘটনার গার্হস্থ্য জীবন কাহিনির সংমিশ্রণ। উপন্যাসের একদিকে যেমন চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনির স্থান পেয়েছে, অন্যদিকে মীর কাসিম-দলনী বেগমের কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। ফলে এ দুটি

কাহিনির একত্র সম্মিলন উপন্যাসটিতে লক্ষণীয়। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হল : একজন সাধারণ মেয়ে প্রফুল্ল কীভাবে অত্যাচারিত হয়ে দেবী চৌধুরানী রূপে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং জমিদার হয়ে প্রজাদের সেবা করেন। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা ও সংগ্রামের চিত্র আছে, তেমনি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীর ক্ষমতায়নের দিকটি ও তুলে ধরা হয়েছে। 'সীতা রাম' উপন্যাসে শুদ্র সামন্ত রাজ্যের উত্থান পতন, পারিবারিক জীবনের সমস্যা এবং বিপর্যস্ত ব্যক্তি চরিত্রের সমাবেশ। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী নামে বাল্যবিধবার প্রতি ধনাঢ্য ভূস্বামী নগেন্দ্রনাথের আর্কষণ ও আত্মসমর্পণ, নগেন্দ্রপত্নী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন এবং অন্তে কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা- এটি এ উপন্যাসের মূল কাহিনি। সমসাময়িক পারিবারিক জীবনের ওপর ভিত্তি করে রচিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে চিত্ত সংযমে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা থেকে স্ত্রী পুরুষের শোচনীয় পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। রোহিনী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' কালে বাঙালি জীবনের বিপর্যয় এবং উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে রচিত 'আনন্দমঠ'। উপন্যাসে বঙ্কিম তাঁর 'বন্দে মাতরম' সংগীতটি সংযোজন করেছেন। এ গ্রন্থটি এবং গানটি উত্তরকালে বিপ্লবী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান প্রণোদনা হয়ে দাঁড়ায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অভিমত।

ক. হিন্দুয়ানী আদর্শ রূপায়ণে উদ্যোগী।

খ. সাম্প্রদায়িক বঙ্কিম মুসলিম চরিত্রকে নিন্দার চোখে দেখেছেন।

গ. শিল্পী বঙ্কিম নীতিবাদী বঙ্কিমের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সাফল্যতা: বঙ্কিম উপন্যাসে তৎসম, তদ্ভব, শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম উপন্যাসের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের জীবন সংঘাত, মহৎ প্রকৃতির তীব্র অর্ন্তদ্বন্ধের মহিমা উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁকে তাঁর সময়কালের আধুনিক ও প্রগতিশীল ঔপন্যাসিক বলা হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৬) অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংকীর্ণ মনোবৃত্তি অতিক্রম করে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোজন করেছেন। তিনি বাঙালির জীবনের উপেক্ষিত বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের প্রধান শক্তি হলো জীবনপ্রেম ও মানবিক অনুভূতি এবং মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা। যা তিনি সহজ রূপে রূপায়িত করেছেন। তাঁর উপন্যাস গুলো চরিত্র প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষদের রক্তধারার মধ্যে বৈরাগ্যভাব বর্তমান ছিল, যার ফলে তার রক্তের মধ্যে সেই ধারা অব্যাহত ছিল। এর ফলে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সন্ন্যাসীবেশে ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন। তাঁর কর্ম জীবনে প্রথমে তিনি বার্মা বর্তমান মায়ানমার যান। সেখানে থাকাকালীন তাঁর প্রথম গল্প 'মন্দির' (১৯০৫) প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে মন্দির গল্পটি কুন্তলীন পুরষ্কারে ভূষিত হয়। তাঁর দ্বিতীয়গল্প 'বড়দিদি' ভারতী নামক সাহিত্য পত্রিকায় ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একের পর এক সাহিত্য বাঙালিদের উপহার দেন। শরৎচন্দ্র স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন "অন্যান্য গ্রন্থকারদের যা নিয়ে বিপদ প্লট পায় না, সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাইবার জন্য যাহা দরকার হয়, তাহা আপনিই আসিয়া পড়ে। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র তাকে ফোটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়।"[২]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ্যযোগ্য উপন্যাস হলো: 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'বৈকন্ঠের উইল' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব ১৯২৭, চতুর্থ পর্ব ১৯৩৩), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'কাশীনাথ' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'স্বামী' (১৯১৮), 'দত্তা' (১৯১৮), 'ছবি' (১৯২০) 'গৃহদাহ' (১৯২২), 'দেনা পাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মৌল সত্তাকে আলোকিত করে নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি প্রেমের বিচিত্র রহস্য উদঘাটনে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর লেখনীতে নারী হৃদয়ের দুর্বার ভালবাসা, প্রত্যাখান - দুই দিক ই তাঁর উপন্যাসে বর্তমান। 'দেবদাস' উপন্যাসে পার্বতী, 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে ষোড়শী, 'বড়দিদি'র মাধবী– প্রভৃতি চরিত্র নারী হৃদয়ের প্রবৃত্তির সঙ্গে সমাজ ও প্রচলিত সংস্কারের দ্বন্ধই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম সতীত্বের চেয়ে ও মহত্তর তা বিশ্বাস করতেন। সমাজ জীবনে কত বিপুল রহস্য যে লুকিয়ে ছিল শরৎচন্দ্র তাঁর চরিত্রচিত্রণে উপভোগ্য রূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস– 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' 'গৃহদাহ'। আবার অন্যদিকে তাঁর উপন্যাসে প্রেমবর্জিত পারিবারিক বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি', 'মামলার ফল', 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুন্ঠের উইল', 'একাদশী বৈরাগী' ইত্যাদি। স্বাভাবিক নর-নারীর প্রেমের চিত্র, সামাজিক বিধিনিষেধ অনুবর্তী শরৎচন্দ্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। 'চন্দ্রনাথ', 'পণ্ডিতমশাই', 'স্বামী', 'শুভদা' উপন্যাসে তা পরিলক্ষিত হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সীমাবদ্ধতা:

১. রচনারীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও তাঁর স্বকীয়তা সহজে স্বীকার্য।
২. কখনো কখনো রচিত উপন্যাস আত্ম কাহিনির মতো মনে হয়।
৩. শরৎচন্দ্র এমন এক প্রকারে প্রেমের বৈশিষ্ট্য যা বাঙালি সমাজে অননুমোদিত বলা চলে।
৪. প্রাঞ্জলতা, সহজবোধ্যতা ও মাধুর্য শরৎচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসগুলো পাঠক উপভোগ্য।
৫.নারী জাতির দু:খ দুর্দশা শরৎচন্দ্রের মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। সাহিত্যের বৈচিত্র্যধর্মী শাখা-প্রশাখায় তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র উপন্যাসে আমরা প্রথম পেলাম জীবনের আধুনিক প্রকাশভঙ্গি। তাঁর চরিত্র সৃষ্টি বঙ্কিম থেকে ব্যতিক্রম। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব আছে বলেই নিজেরা চলতে পারে। চরিত্রগুলির কবিত্বময় কথার ঢংঙে জীবন জটিলতার বিচ্ছুরণ ঘটে। চরিত্রগুলোর অধিকার সচেতন। কিন্তু আধুনিকতার সামগ্রিকতা রবীন্দ্র উপন্যাসেও অনুপস্থিত। "যদিও বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার সূত্রপাত ও তাঁরই হাতে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছতে গেলে রবীন্দ্রনাথকেই যাত্রারম্ভের চিহ্ন হিসাবে ধরে নিতে হয়।"[৩] রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসের সংখ্যা মোট ১২টি। সেগুলো হলো: 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'গোরা' (১৯০৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৩), ' চার অধ্যায়' (১৯৩৪) । রবীন্দ্র-পরবর্তী উপন্যাস ঘটনা সর্বস্য ছিল। গল্প প্রধান উপন্যাস হিসেবে 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ' ও রাজর্ষি তার প্রমাণ মিলে। 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট'-এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাস দু'টির ঘটনা যেমন প্রথাবদ্ধ নিয়মের অনুসরণ, তেমনি চরিত্রগুলোও নিছক একটি তত্ত্ব বা ভাবের বাহন মাত্র, ফলে বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ নয়। দু'টি উপন্যাসই ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত। কিন্তু ঘটনা কিংবা চরিত্রের উপর ইতিহাস তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। প্রতাপাদিত্য কিংবা বসন্ত রায়, গোবিন্দমাণিক্য কিংবা রঘুপতি এরা প্রত্যেকেই একএকটা তত্ত্বের বাহন হিসেবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-সমস্যা-প্রধান উপন্যাস হিসেবে 'চোখের বালি' (১৯০৩) এবং 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে 'চোখের বালি'র সৃষ্টি একটি নতুন দিকের সূচনা করে। 'চোখের বালি' উপন্যাসে চারটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, ও আশা-এদের জীবনকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা আর্বত সৃষ্টি হয়েছে, তার সমস্যা এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। মহেন্দ্র এবং বিনোদিনীর চিত্তের দ্বন্দ্বেই উপন্যাসের ঘটনা স্রোতকে জটিলতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এই সমস্যাকে জটিলতর করেছে আশা ও বিহারীর উপস্থাপনা। চারজনের এই জটিল ঘটনা সমস্যার মধ্যে জড়িত হয় রাজলক্ষী এবং অন্নপূর্ণা। বিধবা বিনোদিনী যেভাবে মহেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং প্রেমের একটি আর্দশ রক্ষা করবার প্রয়াস পায়। পুত্রবধূর প্রতি বিদ্বেষবশত রাজলক্ষী মহেন্দ্র

এবং বিনোদিনীর অবৈধ প্রণয়কে প্রশ্রয় দেয়। এইভাবে উপন্যাসে চারজনের মনের জটিল প্রক্রিয়া নিজেদের চরিত্রসৃষ্টিতে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি ঘটনার অগ্রগতিতেও কার্যকর হয়েছে।

কাল গণনায় 'নৌকাডুবি' খাপ ছাড়া কাহিনি নির্ভর। তাতে আছে রমেশ কমলার জটিল সম্বন্ধ। আকস্মিকতা হলো রমেশের বউ বদল। মালা ও নলিনাক্ষের পুর্নমিলনও প্রায় দেবঘটনা। কোথাও কোন গভীর ও জটিল আলোড়ন নেই। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোমান্টি মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসখানি প্রসার ও পরিধির দিক দিয়েই শুধু নয়, বিবিধ বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। গোরা নিজের পরিচয় অবগত হয়ে না হয়ে হিন্দু হিসেবে নিজেকে মনে করে এবং হিন্দুসমাজ রক্ষণে আত্মনিয়োগ করে। তার সামাজিকতা হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত মহাকল্যাণের ওপর নয়। পরে নিজের প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়ে মতের পরিবর্তন ঘটালে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি তাঁর আপন হয়ে ওঠে। ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। গোরা বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস যা শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের রূপ গ্রহণ করেছে। এ উপন্যাসে বৃহত্তর অর্থে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আদর্শের সাথে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যক্তিগত সংযোগের অবস্থান নিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসটি বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধ মুক্তিলাভ করেছিল। উচ্চ মধ্যবিত্ত এই দেশাত্মবোধের নাম করে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের যে ঘৃণ্য প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল, তারই বৃত্তান্ত উপন্যাসটিতে। রাজনীতি ও সমাজনীতি এই দুই মিলে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি রচিত। বিমলা, নিখিলেশ, সন্দ্বীপ, প্রমুখ চরিত্রের সমন্বয়ে লিখিত হয়েছে উপন্যাসটি।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিতে জ্যাঠা মহাশয়, শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারটি চরিত্রের গল্প মিলে উপন্যাসটি। এ উপন্যাস রসোপলদ্ধি বুদ্ধি সাধন উপন্যাস।'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের মতবাদ প্রধান উপন্যাস। এতে শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাশ, ও নাস্তিক জ্যাঠামশায় এই ক'টি চরিত্র উল্লেখ যোগ্য। শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাশের প্রণয় কাহিনী কিছুটা অস্পষ্ট। দামিনী শচীশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, কিন্তু শচীশের দেয়া প্রেমের ঐশ্বর্য ও যৌতুক নিয়ে অবশেষে শ্রীবিলাশকে বিয়ে করে, ঘটনা-বিন্যাস ও যুক্তি পারস্পর্যের ভিতর দিয়ে তা বর্ণিত হওয়ার অবকাশ পায় না।

'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য-জীবনের নানা সংঘাতময় ঘটনা। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র দাসী শ্যামা, সে স্থুল ভোগবাসনার মধ্যেই নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে মধুসূন-কুমুদিনী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র খুবই সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। তারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী, হলেও তাদের চরিত্রের বৈপরীত্য ঘটনার স্তরগুলো অতি নিপুণভাবে সাধিত হয়েছে।

'শেষের কবিতা' (১৯৩০) উপন্যাসটি তিরিশের যুগের তরুণ সাহিত্যিকদের, যাঁরা একসময় কোমর বেঁধে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরোধিতায় লেগেছিলেন তাঁদেরকে আকস্মিকভাবে আঘাত করেও বিস্মিত, চকিত ও প্রভাবিত করেছিল। 'শেষের কবিতা'য় অমিত-লাবণ্য-শোভনলাল-কেটি চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে প্রেমের বিশেষ তত্ত্ব প্রচার করেছেন। 'শেষের কবিতা'র বিষয়বস্তু উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের চারটি শিক্ষিত নরনারী প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত। অমিত লাবণ্যের প্রণয় আকাশবিহারী, কিন্তু পরিণামে তারা বুঝেছে তাদের কল্পলোকের প্রণয় ধুলোমলিন পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবার অনিবার্য ক্ষণটুকুর জন্য অপেক্ষা করছে, তাই তারা তাদের এই রোমান্টিক প্রণয়কে বাস্তব জগতের ধুলোর স্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্য 'কবিতার মাধ্যমে পরস্পরের কাছে বিদায়-লিপি পাঠিয়েছে।

'দুইবোন', 'মালঞ্চ' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় দুইবোন। উপন্যাসটিতে ত্রিভুজ প্রণয়। অসুস্থ বোন শর্মিলা ও সেবা করতে এসে উর্মি ভগ্নিপতি শশাঙ্কের প্রেমে পড়ে। মৃত্যু পথযাত্রী শর্মি তার স্বামীর হাতে উর্মিকে তুলে দেয়। আর মালঞ্চ উপন্যাসে যৌবন- উত্তীর্ণ বয়স্ক পুরুষের চিত্তে বিয়ে বহির্ভূত সরল প্রণয়লীলা এবং বিচিত্র উদ্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। জীবনের যে একটা স্বভাব-নিষ্ঠুর দিক আছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে 'দুইবোন' এবং 'মালঞ্চ' উপন্যাসে।

'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসেও প্রেমের সঙ্গে বিপ্লববাদের একটা সম্বন্ধ রক্ষা করা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক অতীন যে বিপ্লববাদের দিকে প্রলুব্ধ হয়েছে তাকে ভারতের মুক্তি কামনায় বলা ঠিক হবে না, বরং এলার প্রতি তার আকর্ষণই তার উপজীব্য। ইন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে এলা বিপ্লববাদে দীক্ষা নেয়, কিন্তু ইন্দ্রনাথ অতীনের তুলনায় অনেক দুর্বল। অতীনের নেতৃত্বই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে, সেই তুলনায় তার ব্যক্তিমনের পরিচয় প্রায় নেই বলেই চলে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাস জগতে অনন্য ও বৈশিষ্ট্য শিল্পকর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা: "রবীন্দ্র উপন্যাসের জনপ্রিয়তা মাঝামাঝি। কিন্তু অন্ততপক্ষে একটি 'চতুরঙ্গ' সর্বাঙ্গীন সুন্দর আধুনিক উপন্যাস হিসাবে সমালোচকের দৃষ্টি কাড়ে। এ উপন্যাসের রবীন্দ্র বয়সকে স্বীকার করে এগিয়ে যান অনেকদূর। কিন্তু আধুনিকতায় রবীন্দ্র উপন্যাসের কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এ সীমাবদ্ধতার হলো সমাজের বৃহৎগোষ্ঠী অর্থাৎ মেহনতী, নির্যাতিত, জীবন যুদ্ধে সম্ভব সংগ্রামী মানুষ, বস্তির নোংরা পরিবেশ, দেহ-পসারিণী, সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণ, অর্থনৈতিক নির্মম বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয় অভিজাত শ্রেণী কিংবা তাঁর এক ধাপ নিচের মধ্যবিত্ত। তৎকালীন সমাজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রবীন্দ্র উপন্যাসে স্থান করে নিতে পারেন নি।[৪]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সফলতা: বিষয়ের অভিনবত্ব, বক্তব্যের তির্যকতা, চারিত্রিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সফল শিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা:

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৪- ১৯৫০) মানুষের সুখ-দু:খ এবং প্রকৃতির রঙ-রূপ চিত্রণে তাঁর উপন্যাসের বিশেষত্ব। তাঁর উপন্যাস হলো- 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিতা' (১৯৩২) 'দৃষ্টি প্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৮), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'ইছামতী' (১৯৫০)। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জীবনের যথার্থ এপিক 'পথের পাঁচালী'। অপু , দূর্গা, হরিহর, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকুরুণ। অপু চরিত্রের ক্রম বিকাশ ও পরিণতি এবং নিশ্চিন্তপুর গ্রামে তার শৈশব আর কৈশোর জীবন বয়ে চলা- জীবনের চিরন্তন এ রীতিই ঔপন্যাসিক সাধারণ শিল্পরূপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।

অশনি সংকেত:

এ উপন্যাসটি ১৯৪৪-১৯৪৬ এর মধ্যে লেখা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তারই নিঁখুত বর্ণনা রয়েছে অশনি সংকেত উপন্যাসে। অতিরিক্ত মুনাফা লোভে বাঙালি কৃষিজীবীরা কেমন হন্যে হয়ে উঠেছিল তারও জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন।আরণ্যক উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক 'অপরাজিতা' ও 'আরণ্যক' বাংলা সাহিত্যে অনন্য অবদান।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৭১) মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সমসাময়িক অন্য একজন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে তারাশঙ্কর সভাপতির ভাষণে বলেন, "… The sprit of writer is th song of freedom, we have faught against imperialism and colonialism and will continue tofight aganst all injustice and wong to humanity social and political, against all aggression of lifein any form."[৫]

মানিকের সাথে তারাশঙ্করের ব্যতিক্রম এখানে, তারাশঙ্করের বেশী ভাগ রচনায় গোষ্ঠী বা দল চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে। তিনি রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে সামনতান্ত্রিক ব্যক্তির জীবন ও সমাজের ছবিটি অপূর্ব করুণায় ও মমতায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো: 'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯) 'গণ দেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩) 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪০) 'কবি' (১৯৪৪) 'রাইকমল'(১৯৩৪) 'কালিন্দী' (১৯৪০) তারাশঙ্করের উপন্যাস বিজ্ঞানীয় তত্ত্ব সম্পর্কীয়। তাতে ধনতন্ত্র উদ্ভব হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিলীন-পরিণতি, জমিদারতন্ত্রের ভগ্নদশা, ঈশ্বরে অস্তিত্ববোধে প্রগাঢ় বিশ্বাস, মার্কসীয় সাম্যবাদের সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলিম ধর্মের আলোকে

প্রেম ও সমাজ জীবন, ফ্রয়ডীয় দর্শন, বর্ণবাদ, অন্ত্যজশ্রেণীর জীবন-বীক্ষণ, অরণ্য- আকীর্ণ অঞ্চলের জন জাতির জীবন যাপন পদ্ধতি, শহর কলকাতার নাগরিক জীবন-সংকট ইত্যাদি বহুমুখী বিষয়ে তারাশঙ্করের জীবন দর্শন নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সত্যিকার উৎকর্ষ ও বিকাশ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের (১৯০৮- ১৯৫৬) হাত ধরে। তিনি একজন ভারতীয় বাঙালি কথা সাহিত্যিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের সংকটময় মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্য জগতে বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয়েছিল মানিক বন্দোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তি ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যা তার রচনায় ফুটে উঠেছে। তিনি চল্লিশটি উপন্যাস ও তিনশত ছোট গল্প রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবা রাত্রির কাব্য' উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছেঃ 'জননী', 'শহরতলী', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'চতুষ্কোণ', 'অহিংসা', 'সোনার চেয়ে ও দামী', 'হরফ', 'ইতিকথার পরের কথা', 'পরাধীন প্রেম', 'হলুদ নদী সবুজ বন' ইত্যাদি।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষিত। তবুও ভাববাদের মোহ মুক্ত হতে পারেনি। গাওদিয়া গ্রামের গোপালের একমাত্র ছেলে শশী কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করেছে। শহর থেকে গ্রামে ফেরার পথে বজ্রপাতে নিহত হারুকে নৌকায় করে নিয়ে এসে সে সৎকারের ব্যবস্থা করে। পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে এভাবে একজন ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটে। এ উপন্যাসটি লাশ সৎকারের মতো কর্তব্য কাজ ও মানবিকতার উজ্জ্বল পটভূমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই মানিক বন্দোপাধ্যায় শশীর দুই বিপরীত স্বরূপের কথা আমাদের জানিয়ে দেন: "শশীর চরিত্রে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসরিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতা ও তাহার যথেষ্ট। তার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সাথে না মিশিলে এ কথা কেহ টের পাইবে না যে, তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে। তাহার বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবই প্রকৃতির পরিচয় মানুষ সাধারণত পায়। সংসারে টিকিবার জন্য দরকারি এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে। উপন্যাসটি গ্রামের ডাক্তার শশী, শশীর পিতা ও কুসুম। তাদের অন্ত:দ্বন্দ্বও প্রেমই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।"[৬]

'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) কুবের, কপিলা ও হোসেন মাঝি নিঃসন্দেহে উপন্যাসের তিন শক্তিশালী চরিত্র এবং এদেরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের পাঠ। 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে নদীপথের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেই জনপদের আর্থ- সামাজিক পরিস্থিতি ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করে দারিদ্র্যের চরমসীমা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে কুবের, কপিলা ও হোসেন মিয়া এই উপন্যাসের বিস্তৃত জায়গা দখল করে নিলেও রাসু, যুগল, যুগী, গোপী, শীতল, পীতম, নকুল, সিধু, ধনঞ্জয়, হীরু, আমিনুদ্দি, শ্যামাদাস, এনায়েত এবং অপ্রত্যক্ষ মেজকর্তা উপন্যাসের জীবন- বাস্তবতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে উপস্থিত। মেজকর্তা যুগল ও শ্যামাদাস ছাড়া অন্যান্যরা জেলে পাড়ার বাসিন্দা। জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একেবারে মিলন- সীমান্তে এদের বসবাস। কুবের ও মালার দাম্পত্য কতটুকু নিষ্ঠুরতায় চলে তার বর্ণনা দিয়েছেন মানিক বন্দোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে - "ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কলহ বে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যে থাইকা আইলাম, এউককা লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান? 'যা বেড়া গিয়া মাইজ কত্তার লগে– হারামজাদী, বদ।"[৭] তারপর দাম্পত্য কলহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। পাশবিক আচরণ উপন্যাসটি নতুন আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে "যদিও আধুনিকতা এবং বাস্তবতার রূপায়নকারী এই ঔপন্যাসিক। অরূপ কুমার ভট্টাচার্যের সাথে এক মত পোষণ করে বলতে হয়– "বাংলা সাহিত্যের মানিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় এই যে, তিনিই বাংলা কথাসাহিত্যে যথার্থ অর্থে বাস্তবতার প্রবর্তন করেন।"[৮]

পর্যালোচনাঃ

"আমাদের দুই বাংলার সাহিত্যে এখন পর্যন্ত আলোচিত আলোড়িত উপন্যাসগুলির মূল বিষয়বস্তু নিম্নের চারটির ১. পরকীয়া প্রেম। ২. আঞ্চলিক জীবন চিত্রণ। ৩. রাজনৈতিক আন্দোলন। ৪. সামাজিক শোষণ এবং সংগ্রাম। পরকীয়া প্রেম নির্ভর উপন্যাস বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে শুরু। জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছে পরকীয়া প্রেম নির্ভর বেশীর ভাগ উপন্যাস। উদাহরণ স্বরূপ 'গৃহদাহ', ঘরে বাইরে', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'প্রজাপতি' প্রভৃতি উপন্যাস। আমাদের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির মধ্যে এখনো শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'কর্ণফুলী', 'মহুয়ার দেশে', 'সারেং বউ' প্রভৃতি। রাজনৈতিক আন্দোলন নির্ভর উপন্যাস 'আনন্দ মঠ', 'গোরা', 'চরিত্রহীন', 'গণ- দেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'পথের দাবী', 'চিলে কোঠার সেপাই', 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড', 'রাইফেল রোটি আওরাত' প্রভৃতি । সামাজিক শোষণ এবং সংগ্রাম নির্ভর উপন্যাস পাচ্ছি- 'পল্লীসমাজ', 'লালসালু', 'সূর্যদীঘল বাড়ী', 'জননী', 'সংশপ্তক' প্রভৃতি।[৯]

> "এক সময় উপন্যাসে পরকীয়া প্রেমকে বিষয়বস্তু করা, ঔপন্যাসিকের কাছে ছিল আধুনিকতার সোপান। ফলে উপন্যাসে পরকীয়া প্রেম কম বেশী সব ঔপন্যাসিক গ্রহণ করেছেন। এখানে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যারের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। নিষিদ্ধ ভালোবাসার বিষয় ঔপন্যাসিকের একটি এমন পরীক্ষাগার যেখানে সারা জীবনে তাদের একবার না একবার যেতেই হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অগুণিত এবং ও রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু সৃষ্টিকে এর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা চলে। আনা কারেলিনা বা মাদাম বোভারি, চন্দ্রশেখর বা নষ্টনীড়- নিষিদ্ধ প্রেমই যেন ঔপন্যাসিকের বীক্ষণাগার - সত্যই বীক্ষণাগার, কেননা নিষিদ্ধ প্রেম বিষয়টির সঙ্গে উপন্যাসের মর্মসূত্রের একটি নিবিড় যোগ বিদ্যমান।"[১০]

দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ওলট-পালট করে দেয় পৃথিবী ব্যাপী অনেক কিছু। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন দর্শন নতুন মাত্রা লাভ করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, তার ছোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষেও। পুরানো রীতিনীতি বিশ্বাসের সাথে নতুন বিশ্বাস সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বের। এই সময়ের লেখক তারাশঙ্কর।"বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী এবং বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালের মতাদর্শ নিয়ে এক যুগসন্ধির সেতু নির্মাণ করেছেন। ধনতন্ত্র উদ্ভব হচ্ছে, সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের বিলীন-পরিণতি, জমিদারতন্ত্রের ভগ্নদশা, ঈশ্বরে আস্তিক্যবোধে প্রগাঢ় বিশ্বাস, মার্কসীয় সাম্যবাদের সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলিম ধর্মের আলোকে প্রেম ও সমাজ জীবন, ফ্রয়ডীয় দর্শন, বর্ণবাদ, অন্তজশ্রেণীর জীবন-বীক্ষণ, অরণ্য-আকীর্ণ অঞ্চলের জনজাতির জীবন যাপন পদ্ধতি, শহর কলকাতার নাগরিক জীবন-সংকট ইত্যাদি বহুমুখী বিষয়ে তারাশঙ্করের জীবন-দর্শন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তারাশঙ্করের এই দর্শনগুলি বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন বিজ্ঞানীর তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কখনো বা তারাশঙ্কর সচেতনভাবে কখনো বা অবচেতন মনে গ্রহণ করেছেন তাদের মতবাদ। সিগমান্ড ফ্রয়েড, মার্কস মহাত্মাগান্ধী, ডারউইন, প্রচুর বিজ্ঞানীর তত্ত্ব, জিবাদ, জাতীয়তাবাদ, যোগ্যতমের বেচে হক। প্রস্তুতি মতবাদের উপস্থিতি ঘটেছে তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে। কখনো কখনো পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি মতবাদের উপস্থিতি ঘটিয়ে বিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ সমস্ত মতবাদের অনেকগুলিই তারাশঙ্করের পঠিত বা মতবাদের জনক দ্বারা তারাশঙ্কর প্রভাবিত নয়। শুধুমাত্র মহাত্মাগান্ধীর জাতীয়তাবাদ বাদ দিলে আর কোনটারই প্রতি ব্যক্তি তারাশঙ্করের দুর্বলতা নেই বা তার প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি তারাশঙ্কর। পাশ্চাত্য বিভিন্ন মতবাদ তারাশঙ্করকে কখনো প্রভাবিত করে বিশ্বজনীন করে নিতে পারেনি বরং ভারতীয় ধর্ম, দর্শন দিয়ে তারাশঙ্কর বিশ্বকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।[১১]

"তারাশঙ্করের উপন্যাসে কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন চরিত্রসমূহ হচ্ছে চৈতালী ঘূর্ণী'র নায়ক গোষ্ঠ মণ্ডল, 'কালিন্দী' উপন্যাসের নায়ক অহীন্দ্র, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ, 'মন্বন্তর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সমূহ কানাই, নীলা সেন, বিজয়দা, নেপা প্রভৃতি। তারাশঙ্করের উপরোক্ত উপন্যাসগুলি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। 'চৈতালী ঘূর্ণী' তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস। 'কালিন্দী' তারাশঙ্করের প্রথম আলোড়িত উপন্যাস, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম, 'মন্বন্তর' তারাশঙ্কর সৃষ্ট সাহিত্যে

একটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। মাকর্সবাদের নাস্তিক্যতত্ত্ব ব্যক্তি তারাশঙ্করকে সুচের মতো বিদ্ধ করত। কিন্তু তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণির' নায়ক সর্বহারা চাষী গোষ্ঠর মুখে শুনি, 'কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমায় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?' গ্রামের সদগোপ চাষী গোষ্ঠ মণ্ডল জমিদার এবং মহাজনের শোষণ অত্যাচারে জমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরে আশ্রয় নেয়। সেখানে ধান কলে মজুর হয়। কলে ওভারটাইম আর মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে মজুররা। মজুররা ইউনিয়ন বানায়, গোষ্ঠও ইউনিয়নে যোগ দেয়। উনিশ দিন পর পেটের জ্বালায় কিছু শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙ্গার উপক্রম করলে দুই দলে দাঙ্গা লাগে। আহত হয় গোষ্ঠ, পরে হাসপাতালে মারা যায়-এ হচ্ছে 'চৈতালী ঘূর্ণী'র কাহিনী। প্রায় একযুগ পরে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' উপন্যাসেও দেখানো হয় কিভাবে কৃষক পেশা থেকে উৎখাত হয়ে কারখানায় মজুর হয়ে যাচ্ছে। বামপন্থীরা তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী'তে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩০ সালের এপ্রিল (চৈত্র ১৩৩৬) এই ছয় মাসে 'চৈতালী ঘূর্ণী' উপন্যাস পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষ শ্রমিক আন্দোলনে তোলপাড় হয়। এই ধর্মঘটে যোগ দেয় শুধু বাংলাদেশের ১,২৬,৫৭৫ জন শ্রমিক, 'চৈতালী ঘূর্ণী, শ্রমিক জাগরণ মূলক উপন্যাস। 'চৈতালী ঘূর্ণী'র শ্রমিক আন্দোলন ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' (১৯০৬) উপন্যাসের কথা স্মরণ করায়। এ উপন্যাসে যে সমাজনিরীক্ষণ তার সঙ্গে মার্কসবাদের অনেক বেশী সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালে এসে তারাশঙ্কর বলেছেন, "এ নিয়ে (চৈতালী ঘূর্ণীর সূত্রে) অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসবাদের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনও বই আমি পড়িনি।... আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধি সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।"[১২]

'মন্বন্তর' (১৯৪৪) তারাশঙ্করের বিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক কানাই সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। নায়িকা নীলা ও তার ভাই নেপী সাম্যবাদী কর্মী। তাদের বিজয়দাও কমিউনিস্ট। এরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্যোগময় প্রেক্ষাপটে মানুষের সেবায় লিপ্ত হয়। এই চরিত্রগুলি মহৎ। এ উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে আমরা তারাশঙ্করের বক্তব্য শুনি- "মন্বন্তর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার আছে।... ১৯৪২ সনের মার্চ বা এপ্রিলের একদিন সজনীকান্তের মোহন বাগানের আপিসে সন্ধ্যার মুখে আড্ডা জমেছে। বসে আছি, এমন সময় এলেন শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্য সমিতির স্নেহাস্পদ শ্রীঅমিয় গঙ্গোপাধ্যায়। অমিয় তখন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টে কাজ করতেন। তিনি সজনীকে বললেন, চলুন, শুনলাম গণেশ আভিন্যুতে 'পূর্বাশা' আপিসে একটি সাহিত্যিক আলোচনা সভা আছে। আলোচনার বিষয়- যুদ্ধকালীন সাহিত্য, শুনলাম প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, মানিক, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ সকলেই আসবেন। আমার নিমন্ত্রণ ছিল না সজনীর অনুরোধে এবং অনেকের সঙ্গে দেখা হবে এই আকর্ষণে বিনা নিমন্ত্রণেও গেলাম।... সেখানে সত্য বলতে আলোচনা খুব সরল বা প্রাঞ্জল হল না। শুধু সজনীকান্ত সোজা ভাষায় বললেন, যুদ্ধকালীন সাহিত্য মানে ইংরেজ সরকারের বরাতী সাহিত্য; সোজা কথায় কিছু অধার্গম, অর্থাৎ এককথায় বাতিল করে দিলেন। কথাটার মূলে ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্ট সম্পর্কে ইঙ্গিত ছিল। তখন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্ট থেকে কতগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের রচনা ছিল। কথাটা আমার অসঙ্গত মনে হল। কয়েকজন স্বেচ্ছায় প্রচারকার্য করেছেন বলে এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে দেশের এই নিদারণ অবস্থা নিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না। এ কেমন কথা, সর্বশেষে সেই কথাই বললাম। ফেরার পথে মনের মধ্যে 'মন্বন্তর' রচনার বীজটি নিষিক্ত হয়ে গেল। লিখতে শুরু করে দিলাম।...যুদ্ধের প্রভাবে সমাজে বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে যে সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা কুম্ভকর্ণের রূপ নিয়ে উঠেছে এবং অন্য দিকে দরিদ্র মানুষ ক্ষুধার দায়ে অসহায় ভাবে যে আত্ম বিক্রয় করছে সেই কথাটাই বলবার কথা ছিল। এই পটভূমিতে পড়ন্ত ধনী ঘরের বিকৃত রূপ যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চিত হতে চলেছে একদিকে, অন্যদিকে বাঁচবার চেষ্টায় একাংশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে, ছেলেটি ছিল কম্যুনিস্ট, স্বাভাবিকভাবে তখন প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা সবই ছিল কম্যুনিস্টদের হাতে। এইটাই চোখে সেদিন দেখেছি। তারা সেদিন যে তৎপরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন তার প্রশংসা শ্রীযোশীর কাছে লেখা পত্রে করেছি, আজও করছি। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এদের কর্মীরা। সে সময় সেটাই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"[১৩]

'আরণ্যক' উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলি কতটা দরিদ্র তার দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক লেখকের বর্ণনা থেকে। সত্যচরণের ভাষায় "পাটোয়ারী বলিলাম- এ সব লোকেই কি ইজারা ডাকবে? পাটোয়ারী বলিল-না হুজুর এর খবর লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ পুলিশ করে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের এই রকম অভ্যেস। আরো অনেকে বোধ হয় কাল আসবে। এমন কথা কখনো শুনি নাই। বলিস কি! আমি তো নিমন্ত্রণ করিনি এদের? ওজুর এরা বড় গরিব; ভাত জিনিসটা খেতে পার না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাত্র এই এরা বারো মাস খায়।" এই রকম আরো বর্ণনা যেমন- "এখানে এত লোক এসেছে কেন তেওয়ারীজি? -হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম। -ভাত এখানকার লোকে কি খেতে পায় না? -কোথায় পাবে হুজুর। নউগচ্ছিয়ার মাড়োয়ারীরা রোজ ভাত খায়, আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক ভাত খাইয়েছিল। তারপর আর খাইনি। যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারো গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়। শেষরাত্রে শীত যখন বেশি পড়ে, আর ঘুম হয় না শীতের চোটে-আগুনের খুব কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে ভোর পর্যন্ত।"[১৪]

"আরণ্যকের সমাজ সময়ের তুলনায় হাজার বৎসর পিছিয়ে আছে, কিন্তু এত পিছনে পড়ে থাকা সমাজের চিত্র তৈরিতে ঔপন্যাসিক কোথাও অসংগতি তৈরি করেননি। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন 'ভোলগা থেকে গঙ্গায় (১৯৪৪) খ্রিস্টপূর্ব সময়ে মধ্য এশিয়া বা উত্তর ভারতের মানুষের খাদ্য সংগ্রহে যে দূরহ সংগ্রাম চিত্র তৈরি করেছেন, বিভূতিভূষণ অনেকটা কাছাকাছি চিত্র তৈরি করেছেন দুই সহস্রাধিক বছর পরের ব্রিটিশ রাজের সাম্রাজ্যে। বাংলা উপন্যাসে প্রকৃতির সীমাহীন প্রাধান্য দিয়েছেন বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'হে অরণ্য কথা কও', 'বনে পাহাড়ে' প্রভৃতি গ্রন্থে। এসব গ্রন্থে তো বটেই, বিভূতিভূষণের অন্য উপন্যাসগুলিতেও প্রকৃতি তার অবস্থান জানিয়ে দেয়। ব্যক্তিজীবনেও বিভূতিভূষণ ছিলেন অরণ্যপ্রেমী। ব্যক্তি বিভূতিভূষণ তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন-"আমি বোধ হয় পূর্ব জন্মে ছিলাম উষ্ণ অরণ্য-প্রদেশের একটি ম্যাকাও পাখি হয়ে। মানুষের বাস যেখানে ঘিঞ্জি সেখানে আদৌ মন টেকে না কেন কি জানি। 'I am most happy. When I am in a lonely primeval forest' 'আরণ্যক' বিভূতিভূষণের বহুল আলোচিত উপন্যাস এই আলোচনা সমালোচক ভেদে সমান গুরুত্ব পায়নি। এমনও প্রশ্ন উঠেছে আরণ্যক আদৌ উপন্যাস কিনা? সামসুনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয় 'হাঙ্গার' এবং 'প্যান'কে। হাসনের 'গ্রীন লেসন'কে বলা হয় ওয়ার্ল্ড পপুলার ক্লাসিক। হেনরী, থোরো'র 'ওয়াল্ডেন' ও অসাধারণ সমাদৃত। কিন্তু আমরা কোনো মতেই 'আরণ্যক'কে খাটো দেখতে পারি না। মূলত প্রকৃতি- সচেতন শিল্পী বিভূতিভূষণের গন্তব্যস্থল 'আরণ্যক' আর তার যাত্রা শুরু 'পথের পাঁচালী'র মাধ্যমে। মধ্যে যাত্রা পথে পেরিয়েছেন 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বন জঙ্গল, পাহাড় টিলা, গাছপালা, বনের প্রাণী, সঞ্জ, বনজ ফুল, নিস্তব্ধ রাত্রি, জ্যোৎস্নালোক, ঝরনা, ধূ- মাঠ, এসব বিভূতিভূষণের নিজের জগৎ, স্বক্ষেত্র, ঠিকানা। 'আরণ্যক' উপন্যাসে তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছান, লাভ করেন পরিপূর্ণতা।"[১৫]

"বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০) 'আরণ্যক' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। এর আগে অরণ্য নিয়ে 'আরণ্যক'-এর সমতুল্য আর একটি উপন্যাসও বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়নি। এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যে অরণ্য নিয়ে শিল্প-সফল উপন্যাস ছিল মাত্র তিনটি। নরওয়েজীয় লেখক নাট হামসন (১৮৫৯- ১৯৫২)। উইলিয়াম হেনরী হাডসন (১৮৪১- ১৯২২) 'Green Mansions' এবং মার্কিন লেখক হেনরি ডেভিড থরো(১৮১৭-১৮৬২) 'Walden'। হেনরি ডি. থরো ১৮১৭ সালের জুলাইতে ম্যাসাচুয়েটস এর কনকর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকার কনকর্ড একটি আকর্ষণীয় স্থান এবং স্বভাবতই এর প্রভাব হেনরি এড়াতে পারেননি। শহুরে যান্ত্রিক জীবন থেকে পালিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপক তৃষ্ণা ছিল তাঁর। 'Walden' (ওয়ালডেন)-এ এরই প্রমাণ মেলে"[১৬] "হেনরি থরো ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ, যা অন্যের নজর কাড়ার মতো নয়। তিনি খ্যাতিমান, জনপ্রিয় কিংবা আকর্ষণীয় ছিলেন না। অথচ তাঁর চিন্তাশক্তি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠত। জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে তিনি ছিলেন তৎপর। তিনি ভাবতেন, মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি বিলাসিতাকেও অপরিহার্য মনে করে কেবল অর্থের পিছনে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতই তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। দীর্ঘসময় ধরে

জীবিকার চাকায় তেল ঢালতে ঢালতে তারা নিজেরাই যন্ত্র হয়ে যায়। হেনরি তাঁর জীবনকে ভোগ করেছেন পুরোপুরি। জীবনের দাসত্ব তিনি কখনো মেনে নেননি। দীর্ঘপথ হাঁটতে হাঁটতে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের নিত্যমেলা, পাখির কলতান, বাতাসের ধ্বনি আর প্রকৃতির স্বাধীনতায় তন্ময় হতে হতে তাঁর দিন কেটেছে। তিনি খুব দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, শহুরে জীবন বোকাদের স্বর্গবাসের মতো। সম্ভবত তাঁর এই আত্মজিজ্ঞাসা তাঁকে পরবর্তীকালে খ্যাতিমান করে তোলে। হাডসনের সাহিত্য থেকে বিভূতিভূষণ কতটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বোঝা যায়, আরণ্যক উপন্যাসে অরণ্যের সৌন্দর্যমুগ্ধ ঔপন্যাসিক যখন বলেন- "চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই বিজন রূপলীলার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম--ভারতবর্ষে এমন জায়গা আছে জানিতাম না তো! এ যেন ফিল্মে দেখা দক্ষিণ আমেরিকার আরিজোনা বা নাভাজো মরুভূমি কিংবা হাডসনের পুস্তকে বর্ণিত গিলা নদীর অববাহিকা অঞ্চল।"[১৭]

কালোত্তীর্ণ হলে সগৌরবে পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছে যে বাংলা সাহিত্যে বিদূষী সাহিত্যিকগণ। তাঁদের মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' সৃষ্টি কর্মের দিক থেকে অনন্য দর্শন। পাঠক সমাজে বিস্ময় তৈরি করে। মুসলিম ঔপন্যাসিকদের আগমন বিলম্বিত হলেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মীরমশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯২০) এর 'বিষাদ সিন্ধু', যুগ যুগ ধরে পাঠকের হৃদয়ে বেদনার উৎস হয়ে আছে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) উপন্যাস রচনা করে স্বীয় বৈশিষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। 'বাঁধন হারা', 'কুহেলিকা' ও 'মৃত্যুক্ষুধা' সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রের মধ্যে অসাধারণ বিপ্লবীদের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫- ১৯৭৪) 'অবিশ্বাস্য', 'শবনম', সহজ, মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্য ধারার পরিচায়ক। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের রূপান্তর চলছে।

উপসংহার:

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের উপন্যাস যখন গদ্যের গর্বে তখন ইউরোপ জুড়ে আলোচিত হচ্ছে "Art for arts sake" থিওফিল গতিয়ে, গাই দে মোঁপাসা (১৮৩৫) উপন্যাসের মুখবন্ধে এ কথা বলেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন কি ফারসী, কি ইংরেজী সাহিত্যে "Art for arts sake" এ কথা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সামাজিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক শিক্ষার জন্য শিল্প নয়, শিল্প একান্ত সৌন্দর্যের বিষয়, শিল্পের খাতিয়ে শিল্প, গতিয়ের এই মতবাদ প্রভাবিত করে বোদলেয়ার, ফ্লোবেয়ার, অস্কার ওয়াইলড প্রমুখ সাহিত্যিকদের। আধুনিক উপন্যাসে বিশ্লেষকদের দাবী জীবন দর্শন। দস্তইয়েভস্কি 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' শেষ সিদ্ধান্ত দেয় পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। কিংবা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ডম্যান অ্যন্ড দ্য সি' পাঠকের কানে চুপি চুপি বলে 'মানুষকে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু পরাজিত করা যায় না। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' বর্ণনা করে যুদ্ধ এবং শান্তি। বিশ্ব সাহিত্যের আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গির এসব সার্থক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রজন্মের আকৃষ্ট করলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শামিল হওয়ার উপন্যাস চোখে পড়ে না। দুই বাংলার ঔপন্যাসিকরা আঙ্গিক নিয়ে বৈচিত্র্যের জোয়ার তুললেও ব্যতিক্রমী বিষয়কে উপন্যাসের কাঁচামাল করতে পারেন নি। মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যান্ত্রিক সভ্যতা অনেক বিষয়ই পরবর্তীকালের উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। কিন্তু বিষয়গুলির উপস্থাপন খুব সরল বলে আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হয়। গভীর জীবনদর্শন অনুপস্থিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আধুনিকতায়, আমাদের উপন্যাসে এখনও পিছিয়ে রয়েছে। উপন্যাস গবেষকদের ইদানিং দাবী 'ঘটনা নয়, জীবনকে চাই, বস্তু নয় লেখকের মনকে চাই, গল্প নয়, জীবন রহস্যকে জানতে চাই"[১৮]। তাই জীবনের মূল্যবোধকে অনুশীলন করে উপন্যাস সমৃদ্ধি করলেই পাঠককে প্রাপ্যতা আশানুরূপ হবে।

তথ্যসূত্র:

১। ইসলাম, আজহার। বাংলা সাত্যিের ইতিহাস আধুনিক যুগ। অন্যান্য, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ পৃ. ১৪৮।

২। চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ। কলিকাতা: এম সি সরকার এন্ড প্রাইভেট লিমিটেড, দশম সম্ভার ২০০০, পৃ. ৩৭০।

৩। সিকদার, অশ্রু কুমার। আধুনিকতা ও বাঙলা উপন্যাস। কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ১।
৪। বন্দোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। কলকাতা: দে'জ, নভেম্বর ১৯৯৫ খ্রি, পৃ. ১৮৫।
৫। বন্দোপাধ্যায়, মানিক। পুতুল নাচের ইতিকথাঃ এক বৃহদায়তন উপন্যাসের জৈবনিক বিস্তার। ঢাকা: অধিকার, আফসার ব্রাদার্স সংস্করণ, ২০২০, পৃ. ১০।
৬। সরকার, আবদুল মান্নান। উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ২৫৫।
৭। মামুদ, হায়াৎ সম্পাদিত। মানিক বন্দোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১৮৯।
৮। সরকার, আবদুল মান্নান। উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ. ৩৯২।
৯। ভট্টাচার্য, অরূপ কুমার। আঞ্চলিকতা ও বাংলা উপন্যাস। কলকাতা: পুস্তক বিপনী, বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬।
১০। বন্দোপাধ্যায়, সরিৎ। আমার পিতা তারাশঙ্কর। কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী, কার্তিক ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১২০-১২১।
১১। ডালিম, শফিউল আযম। আধুনিক উপন্যাসঃ উপন্যাসের আধুনিকতা। পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৫।
১২। পূর্বোক্ত, উপন্যাসের আধুনিকতা পান্ডুলিপি, পৃ. ৭৩।
১৩। শফিউল আযম ডালিম, বিজ্ঞানীর তত্ত্বঃ তারাশঙ্করের উপন্যাস, পাণ্ডুলিপি, বিংশ খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭।
১৪। ডালিম, শফিউল আযম। তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাম্যবাদী চরিত্র। কলিকাতাঃ কথাসাহিত্য, আশ্বিন ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮-৩৯।
১৫। পূর্বোক্ত, তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাম্যবাদী চরিত্র পৃ. ৩১।
১৬। পূর্বোক্ত, তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাম্যবাদী চরিত্র, পৃ. ৪০-৪১।
১৭। বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ সম্পাদিত। আমার লেখা। প্রবন্ধ অভিভাষন ও পত্র সংকলন, কলকাতা কথাসাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৫ খ্রি, পৃ. ৩০।
১৮। আহমদ, ড. শফিউদ্দিন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সমগ্র। ঢাকাঃ বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯২ খ্রি, পৃ. ৯।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 218- 224
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.198

সাদা-কালোর বাইরে: নন-বাইনারি পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

বসুন্ধরা গাঙ্গুলি, *সহকারী অধ্যাপক, সুভাষচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.08.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025

©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper explores the historical context of non-binary identities and examines their relationship with society and the world. It seeks to understand why societies tend to prioritize binary thinking and how this tendency leads to various forms of gender-based discrimination. The central focus of the paper is to understand the struggle of the individuals from the LGBTQIA+ community.

Ancient Indian society often emphasized hetero-normative, reproduction-centered relationships. But if we look deeper, we can find that there are plenty of references also in texts like the *Ramayana* and *Mahabharata* where diverse sexual orientations, same-sex relationships, and gender fluidity have been mentioned. This paper attempts to address objections raised against such identities and try to defend them by providing textual evidence from Ancient Indian literature.

Keywords: LGBTQIA+ identities, Gender discrimination, Contemporary queer perspectives, Ancient India texts, Gender fluidity

সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষ মানুষের সাথে বিভিন্ন কারনে বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। সে উন্নত দেশই হোক বা উন্নয়নশীল দেশ, বৈষম্যের মতো সামাজিক ব্যাধি সবদেশেই বর্তমান। এ আমাদের সমাজের এমন এক অসুখ যার বিরুদ্ধে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, অর্থ, দেশ ইত্যাদি নানা কারণকে উপলক্ষ্য করে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে।

বৈষম্য কি? বৈষম্য একধরনের আচরণ। নেতিবাচক ও অযৌক্তিক এক আচরণ। একটা বিশেষ আচরণ মানুষ হঠাৎ করে একদিন করে বসে না। আমাদের প্রত্যেকটা আচরণের পিছনে কিছু কারণ থাকে, কিছু বিশ্বাস, মনোভাব কাজ করে। তাই বৈষম্যকে বুঝতে গেলে আমাদের আগে স্টিরিওটাইপ বা বাঁধাধরা ধারণা ও প্রেজুডিস বা পূর্বধারণাকে বুঝতে হবে। এগুলোই বৈষম্যমূলক আচরণের পথ তৈরি করে দেয়। স্টিরিওটাইপ হচ্ছে কিছু বাঁধাধরা ধারণা যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকে। কিভাবে তৈরি হয় এই স্টিরিওটাইপ? মানুষ যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তার আশেপাশের পরিবেশ, সমাজই তার মধ্যে এই ধারণাগুলি গেঁথে দেয়। মানুষ এগুলো গ্রহণ করে এবং সেই গ্রহণ করাটি খুব একটা বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে হয় না। স্টিরিওটাইপ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটোই হতে পারে। কয়েকটা উদাহরণ নিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। যেমন পশ্চিম বাংলার বাইরে বেশিরভাগ বাঙালিরা একটি ধারণা পোষণ করে যে বাঙালি মাত্রই মাছ খায় ও সংস্কৃতিমনস্ক হয়। এখন এই ধারণা তারা সকল বাঙালির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে অর্থাৎ এখানে সাধারণীকরণের ফলে যা হয় তা হল ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলো এখানে আর ধরা পড়ে না। এমন তো নয় যে আপামর বাঙালি জনগণ সবাই মাছ খেতে দারুণ ভালোবাসে কিন্তু সব বাঙালির ক্ষেত্রেই এই ধারণাটি তখন প্রযোজ্য হয়ে যায়। স্টিরিওটাইপ নেতিবাচকও হয়। নেতিবাচক স্টিরিওটাইপ এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-এমন

ধারণা আছে যে বয়স হয়ে গেলে মানুষ দুর্বল ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। এখন সকল বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেই এই ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়। স্টিরিওটাইপ প্রেজুডিসে পরিণত হয় যখন মানুষের মনের মধ্যে থাকা ধারণা বা বিশ্বাসগুলো তার মনের মধ্যে এক রকমের নেতিবাচক মনোভাবের জন্ম দেয়। আগের উদাহরণটির সূত্র ধরেই বলা যাক। কারো এটা ধারণা বা বিশ্বাস যে বয়স হলে মানুষ দুর্বল ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। এখন এমন একটা সময় আসে যখন এই ধারণাটাই তার মধ্যে এক বিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে। বয়স্ক মানুষকে কাজ করতে দেখলেই সেই ব্যক্তির মনে হতে পারে যে কাজটি ঠিকঠাক হবে না বা এই কাজের জন্য বয়স্ক ব্যক্তিটিকে ভরসা করা যায় না। অর্থাৎ বয়স্ক মানুষের কাজ করাটাকে সে ভালোভাবে নিতে পারে না। এখানে কোনোরকম বিচার ছাড়াই মানুষটি এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। এরপর যদি এরকম কোন অবস্থা তৈরি হয় যেখানে বয়স্ক মানুষের প্রতি এই যেখানে নেতিবাচক মনোভাব এর বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিটি কোন বয়স্ক মানুষকে তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে তখন সেটা হয়ে যাবে বৈষম্য। এখানে বয়স্ক মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হল শুধুমাত্র এই কারনে যে তিনি বয়স্ক। অন্য আর কোনো কিছুই এখানে বিবেচ্য হল না। প্রেজুডিস বৈষম্য এ পরিণত হল তখনই যখন তা মনোভাব থেকে আচরণে রুপান্তরিত হল এবং যা সরাসরি অন্য মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলল। আমার মতামত বা নেতিবাচক মনোভাব আমার মনের মধ্যে আছে এবং কোনোভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে না তখন তা বাইরের মানুষ এর ক্ষতি করছে না। কিন্তু যখন তা আচরণে বদলে যাচ্ছে তখনই তা বৈষম্য হয়ে উঠছে ও মানুষকে প্রভাবিত করছে।

বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য অন্যতম। লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় না। এটি সমাজে পুরুষদের, মহিলাদের ও যারা পুরুষ ও মহিলা এই বিভাজনের নিজেদেরকে চিহ্নিত করতে পারেন না সেই মানুষগুলোর প্রতি ভিন্ন আচরণ করে এবং সকলকে সমমর্যাদা প্রদান করে না। বৈষম্যের শিকার ক্ষেত্র বিশেষে একজন পুরুষ ও নারী যেমন হয়ে থাকেন, তেমনই সেই সব মানুষ যারা নারী পুরুষ এই তথাকথিত বিভাজনের মধ্যে পরেন না তারাও খুব বেশি রকম ভাবেই হয়ে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এই মানুষগুলোকে আজ এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা হয়। অনেকে এক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গ ভুক্ত মানুষ বলে থাকেন। কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত মানুষ বললে যেন একপ্রকারের ক্রমবিন্যাস চলে আসে এবং প্রশ্ন ওঠে প্রথম ও দ্বিতীয় তাহলে কারা? তাই তৃতীয় লিঙ্গ কথাটি ব্যবহার না করে আমরা তাদের এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায় হিসাবেই অভিহিত করব।

এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায় কারা?

এখানে ‘এল’ দ্বারা বোঝানো হয় লেসবিয়ান। লেসবিয়ান হলেন সেই নারী যিনি অন্যান্য নারীদের প্রতি আবেগগত বা যৌনভাবে আকৃষ্ট হন। ‘জি’ দ্বারা বোঝানো হয় গে একজন পুরুষকে যিনি একই লিঙ্গের পুরুষের প্রতি আবেগগত বা যৌনভাবে আকৃষ্ট হন। ‘বি’ শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয় সেই ব্যক্তিদের যারা বাইসেক্সুয়াল অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যিনি পুরুষ এবং নারী উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ‘টি’ শব্দটি প্রতিনিধিত্ব করে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের যেখানে একজন ব্যক্তি যার লিঙ্গ পরিচয় জন্মের সময় নির্ধারিত যে লিঙ্গ তার সাথে মেলে না। ‘কিউ’ বা ‘ক্যুইর’ একটি শব্দ যা সেই সব লিঙ্গ পরিচয়গুলির জন্য ব্যবহার করা হয় যেগুলি প্রচলিত লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে মেলে না। ‘ইন্টারসেক্স’ বলতে বোঝানো হয় সেই সব ব্যক্তিদের যারা যে শারীরিক লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যে জন্মগ্রহণ করেন, যা পুরুষ বা নারীর তথাকথিত সাধারণ সংজ্ঞার সাথে মেলে না। ‘এ’ হল এসেক্সুয়াল হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন না। এর পরে ‘+’ - প্লাস চিহ্নটি দেওয়া হয়েছে অন্যান্য যৌন লিঙ্গ পরিচয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে যা বিশেষভাবে এই সংজ্ঞার মধ্যে আসছে না।

এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকেই নন-বাইনারী মানুষ হিসাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে থাকেন ও জগতকেও সেই দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেন। আসলে মানুষ তার আশেপাশের জগতকে বিভিন্ন ভাবে বোঝার চেষ্টা করে, এই বিপুল সৃষ্টির অর্থ খোঁজার চেষ্টায় নানান ব্যাখ্যা প্রদান করে। সেই আদিমকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের সেই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই জগতকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাই বেশির ভাগ মানুষ যে পদ্ধতিটির আশ্রয় নিয়ে চলে তা হল বাইনারি দৃষ্টিভঙ্গি বা দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে জগতটা সাদা-কালো, ভাল-মন্দ, গরীব-বড়লোক, সমকামী-বিষমকামী এইরকম দ্বিধা বিভক্ত। মানুষের এই দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বেছে নেবার পিছনে কারণ হল এখানে বিশেষ বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় না। জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় না। সাদা কালোর মাঝে

যে একটা গ্রে শেড আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয় না। এটার সুবিধা এই যে, এটা মানুষকে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল স্প্লিটিং বা বিভাজন করে ফেলা। এটি হলো মানুষের একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা যার মাধ্যমে মানুষ অজান্তেই কোনো ব্যক্তি, ধারণা বা গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ ভালো বা সম্পূর্ণ খারাপ এই দ্বিবিভাজনের মধ্যে ফেলে বিচার করে থাকে। এর পরেই যে প্রশ্নটা আসে তা হল মানুষ কেন বিভাজন করে? এর উত্তরে বলা যায় মানুষ 'অ্যাম্বিভ্যালেন্স' বা দ্বিমুখী অনুভূতির অভিজ্ঞতা পছন্দ করে না। মনোবিজ্ঞানে অ্যাম্বিভ্যালেন্স বলতে বোঝায় এমন এক মানসিক অবস্থাকে যেখানে একজন ব্যক্তি একই সময়ে একই বিষয়ের প্রতি দুরকম বিরোধী অনুভূতি অনুভব করে। যেমন ধরা যাক একজন মানুষের কর্মক্ষেত্রে তার এক সহকর্মীর সাথে তার ঝামেলা হল। এখন এটা সেই মানুষটার জন্য সুবিধাজনক যে যার সাথে ঝামেলা হল তাকে একজন খারাপ মানুষ বলে দেগে দেওয়া। এখন যদি সেই মানুষটা তাঁর অন্য দিক গুলো বিবেচনা করতে যান তাহলে দেখবেন তিনি যতটা খারাপ মানুষ বলে তাকে দেগে দিচ্ছিলেন তিনি হয়ত ততটাও নয়। এই বিবেচনার ফলে যা হবে তা হল তার মধ্যে এক দন্ধের সৃষ্টি করবে যে লোকটা তাহলে আদতে ভাল না খারাপ? একই বিষয়ে যদি দুরকম জিনিস মনে হয় তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে তা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এই জটিলতা মানুষ এড়াতে চায়। তাই তার কাছে খোলা থেকে বিভাজনের পথই। কিন্তু এই বিভাজন এবং দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে যেটা হয় তা হল জগতটাকে খুব একপেশে দৃষ্টিতে দেখা হয়ে যায়। অনেক সূক্ষ্ম জায়গা থাকে যা হয়তো আমাদের বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন ছিল সেগুলো বাদ পড়ে যায়। পুরো ছবিটা দেখা হয়ে ওঠে না। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলো যারা নিজেদের নন বাইনারী বলে চিহ্নিত করে থাকে তাদের খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

এই মানুষগুলির সংগ্রামকে বোঝার আগে আমাদের দুটি বিষয়কে একটু ভালো ভাবে বুঝতে হবে তা হল সেক্স ও জেন্ডার এর মধ্যে পার্থক্য। প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি জৈবিক লিঙ্গ ও পরের টিকে সামাজিক লিঙ্গ। সেক্স বলতে সাধারণত বোঝানো হয় যা প্রকৃতি প্রদত্ত, জৈবিক একটা বিষয়। আমাদের সমাজে একজন ব্যক্তি পুরুষ না নারী তা ঠিক করা হয় তাদের মধ্যে থাকা কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। অপরদিকে, জেন্ডার এর ধারনা অনেকটাই সমাজের গড়ে দেওয়া। এক শিশু জন্মানোর পরে সেখানকার সমাজ, সংস্কৃতি ঠিক করে দেয় সে কীভাবে আচরণ করবে, কি ভূমিকা পালন করবে, কি করবে না ইত্যাদি এবং তার মধ্যে থেকেই সে নারী, পুরুষ হয়ে ওঠে।

সেক্স ও জেন্ডার যে এক বিষয় নয়, সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু প্রশ্ন হল সমস্যাটা তাহলে ঠিক কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? সমস্যাটা হচ্ছে এই দুটো যে আলাদা এটা সমাজের বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পারেন না এবং তারা মনে করেন একজন মানুষের জৈবিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গ একেবারে মিলে যাবে অর্থাৎ একজন নারী শরীরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সে নারীসুলভ আচরণ করবে এবং যে পুরুষ শরীরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সে পুরুষসুলভ আচরণ করবে। নারী ও পুরুষের এই দ্বৈত বিভাজনে পৃথিবীর সকল মানুষই সুন্দরভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, জটিলতা কিছু তৈরি হবে না। কিন্তু বাস্তব চিত্র তা নয়। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা এই দ্বৈত বিভাজনে পড়েন না। এমন দেখা যায় যে, হয়তো নারী শরীরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু মানসিক দিক থেকে তিনি পুরুষসত্তার সাথে নিজেকে একাত্মবোধ করেন এবং এর উল্টোটাও হয়ে থাকে। এখান থেকেই শুরু হয় সমস্যা। সমাজের দ্বৈত বিভাজনের মধ্যে খাপ খাওয়াতে না পারা মানুষগুলোর জীবন নেমে আসে অন্ধকার। তাদের অস্তিত্বই গভীর সঙ্কটের মুখে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে জুডিথ বাটলারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তার 'জেন্ডার ট্রাবল' বই তে বলেন, শুধু জেন্ডার নয়, সেক্স এর ধারনাও সমাজই তৈরি করে দেয়। নারী-পুরুষের যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য সেগুলোকে সমাজ একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি থেকেই মূল্যায়ন করে। আমরা জৈবিক লিঙ্গের কথা বলি, দাবী করি এটা প্রকৃতি প্রদত্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে বোঝা যায় এগুলোও তৈরি হয় সংস্কৃতির প্রভাবে, ভাষার ব্যবহারে আর ক্ষমতার নিয়মে। যেমন ধরা যাক একটি ছেলে বা মেয়ে জন্মেছে। যে মুহূর্ত থেকে সে জন্মালো সেই মুহূর্ত থেকে তার জন্য কিছু কিছু বিষয় স্হির হয়ে গেল। ছেলে বাচ্চা হলে তার জন্য মানুষজন নীল রঙের জিনিস নিয়ে যেতে শুরু করলেন, মেয়েদের জন্য পিঙ্ক। কেননা নীল ছেলেদের রঙ আর পিঙ্ক মেয়েদের। মেয়েদের জন্য খেলনাবাটি, পুতুল আর ছেলেদের জন্য গাড়ি, রোবট ইত্যাদি উপহার দেওয়া শুরু হল। একটি মেয়ে যে রোবট নিয়ে খেলতে পচ্ছন্দ করবে না বা ছেলেটি রান্নাবাটি খেলবে না এটা আমরাই ঠিক করে দিই। তারা ছোটবেলা থেকে কি খেলবে কেমন আচরণ করবে, কেমন আচরণ করবে না সবটাই

সমাজ ঠিক করে দেয়। এই ঠিক করে দেবার আদলেই তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে উঠতে থাকে। এই বিভাজনের পিছনে কোনো অন্তর্নিহিত সত্য নেই। বাটলার এর মতে সেক্স ও জেন্ডার আমাদের মধ্যে থাকা কোনো অন্তর্নিহিত সত্য নয়। যে আচরণগুলো আমরা প্রতিদিন করি, যে ভাবে হাঁটি, কথা বলি, কাজ করি এই গুলোর মধ্যে দিয়েই নারী পুরুষ হয়ে উঠি। বাটলার এর এই মত সেক্স ও জেন্ডার বিভাজনের যে প্রথাগত কাঠামো তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং নতুন করে, নতুন আলোকে আমাদের ভাবতে শেখায়।

সমাজে এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে অনেক ধরণের অভিযোগ উঠে থাকে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল যে প্রকৃতি বাইনারি নিয়ম অনুসরণ করে এবং বিপরীত লিঙ্গের সম্পর্কই একমাত্র স্বাভাবিক বিষয় কেন না তাতে প্রজনন সম্ভব হয় ও মানব জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকে। যারা পুরুষ ও নারীদের মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারছেন না তাদের এই বিষয়টাই অস্বাভাবিক। কুইয়ার ইকোলজির মতো শাস্ত্র সমাজ ও পরিবেশ এর বিভিন্ন ঘটনা কে তুলে ধরে এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায় ও এই ন্যারাটিভকে খণ্ডন করেন। তারা প্রশ্ন তোলেন স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দ্বৈত বিভাজনের ভিত্তিটা ঠিক কি? কোনটাকে আমরা স্বাভাবিক ও কোনটা কে অস্বাভাবিক বলব? কোনটা স্বাভাবিক ও কোনটা অস্বাভাবিক এই নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যেও বহু মতভেদ রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে যেটা বোঝা হয় যে প্রাকৃতিক হল যা প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ থাকে না। অপ্রাকৃতিক হল যা যেটা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয় এবং যেখানে মানুষ হস্তক্ষেপ করে। অ্যারিস্টটলের মতে প্রত্যেক বস্তুর কিছু স্বরূপ থাকে। যে জিনিসটা সেই স্বরূপ কে বজায় রাখেটাই প্রাকৃতিক। যেমন একটা পাখি তার ক্ষেত্রে ওড়াটাই স্বাভাবিক আর প্রাকৃতিক। একটি পাখির যদি ডানা ছেঁটে দিয়ে তার ওড়া থেকে আটকানো হয় তবে সেটাই হবে অপ্রাকৃতিক। অনেক সময়ই আবার স্বাভাবিক অস্বাভাবিক এর সাথে ভাল--মন্দ এই বিষয়গুলো অদ্ভুত ভাবে যুক্ত হয়ে যায়। প্রায়শই দেখা যায় যা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির সাথে কিছু খাপ না খেলেই তা খারাপ, অদ্ভুত, ট্যাবু, অপ্রাকৃতিক বলে ধরা হয়। কি প্রাকৃতিক আর কি নয় তা বেশির ভাগ সময়ই সংস্কৃতি, সমাজ ও সময় ঠিক করে দেয়।

এই ক্ষেত্রে কুইয়ার ইকোলজি বলে সমকামিতা সত্যি প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিনা তা বিচার করতে গেলে আমাদের তাকানো উচিত প্রকৃতির দিকেই। কুইয়ার ইকোলজি দেখায় প্রাণিজগতের বহু প্রজাতি এমন আছে যাদের মধ্যে সমকামী আচরণ দেখা যায় যেমন- বোনোবো, ডলফিন, সিংহ, পেঙ্গুইন, কালো রাজহাঁস, অক্টোপাস ইত্যাদি। এড ওয়াটকিনস তার 'কুইয়ার প্ল্যানেট' ডকুমেন্টারিতে প্রাণিজগৎ এর এমন অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন যার থেকে প্রমাণ হয় যে প্রকৃতির মধ্যে সমকামিতা এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।

সমলিঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর একটা যে আপত্তি তোলা হয় তা হল সমলিঙ্গ সম্পর্কের প্রবনতা যদি বাড়তে তাহলে সকল মানুষই একসময় সমলিঙ্গভুক্ত হয়ে যাবে ও মানব জাতি এক সময় অস্তিত্ব সঙ্কটে পরে যাবে। এখন দেখে নেওয়া যাক এই আপত্তি কতটা যুক্তিযুক্ত? প্রথম কথা এটা কোনো ছোঁয়াচে অসুখ নয় যে একজন মানুষ থেকে আর একজন মানুষে তা ছড়িয়ে পড়বে বা বলা ভালো একজন সমলিঙ্গভুক্ত মানুষের সাথে মিশে একজন বিপরীতলিঙ্গ ভুক্ত মানুষ সমলিঙ্গে পরিনত হবেন। এই ধরনের চিন্তন সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। একজন মানুষ সমকামী বা বিষমকামী হবেন তা নির্ভর করে কিছু জিনগত ও হরমন-এর বৈশিষ্ট্যের ওপর। এটা এমন ব্যাপার নয় যে কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর যৌন অভিমুখ পরিবর্তন করে ফেলবে। আর আমরা যদি অতীতের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব অতীতেও পৃথিবী জুড়ে একই রকম ভাবে সমলিঙ্গভুক্ত মানুষেরা ছিলেন এবং তার ফলে মানবজাতি বিলুপ্ত হবার পথে হাঁটে নি বরং পৃথিবীর জনসংখ্যা দিন কে দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন আমরা যদি আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকে তাকাই তাহলে এরকম বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতে দুই মহাকাব্য- রামায়ণ ও মহাভারতে এরকম বহু উদাহরন আমরা পাই। রামায়ণের একটি পর্বে যখন রাম, লক্ষণ ও সীতার সাথে ১৪ বছরের জন্য বনবাসে যাচ্ছিলেন তখন তাকে এগিয়ে দিতে নগরের বহু মানুষ এসেছিলেন। রাম বনে যাবার আগে তাদের বলে গিয়েছিলেন- হে পুরুষ ও নারীগন আপনারা দয়া করে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান ও নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করুণ। এর পর রাম যখন ১৪ বছর বনবাসের পর যখন ফিরে এলেন তখন দেখলেন কিছু মানুষ তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। রাম অবাক হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা তখনো ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন? তখন সেই মানুষ গুলো বললেন- রাম বলেছিলেন নারী ও পুরুষদের ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু সেই ভিড়ে কিছু মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের নারী ও পুরুষ এই দুই এর মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারেননি। তাই কি করবেন বুঝতে না পেরে তারা সেখানেই থেকে

গিয়েছিলেন। এই কথা শোনার পর রাম তাদের অস্তিত্বকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে তাদের কে নিজের ঘরে ফিরে যেতে বলেন। এই গল্পটি তে বেশ কিছু বিষয় আছে যা লক্ষ্য করার মত। প্রথমত সমলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ মানুষের উপস্থিতি তখনও ছিল, ছিল বলেই তাদের কথা প্রাচীন সাহিত্যে স্থান পেয়েছে এবং তাদের উপস্থিতির ফলে মানব জাতি কোনরূপ সঙ্কটে পড়েনি। দ্বিতীয়ত সেই সময়েও মানুষ গুলো নিজ অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগতেন। সমাজের তথাকথিত দ্বিবিভাজন ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করতে না পারার যে যন্ত্রণাটা তখনো ছিল এখনো আছে।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যগুলো তে এরকম আরো অনেক উদাহরন আছে যা প্রাচীন ভারতে সমলিঙ্গ বা লিঙ্গ তরলতার উপস্থিতির কথা বলে। বেশিরভাগ সময়ই পুনর্জন্মের কাহিনি, বিভিন্ন গল্প, ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই কথাগুলিকে বলা হয়েছে। যেমন মহাভারতে শিখণ্ডী চরিত্রটির কথাই ধরা যাক। মহাভারতে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ এর কন্যা ছিলেন শিখণ্ডি বা বলা ভাল শিখণ্ডিনী। তিনি একজন নারী হিসাবেই জন্মেছিলেন। শিখণ্ডিনীর আবার পূর্ব জন্মে নাম ছিল অম্বা। অম্বা কাশীর রাজা কাশ্যর জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তার স্বয়ম্ভর সভায় তাকে ও তার বোন অম্বালিকা কে জোর অপহরণ করে নিয়ে যান ভীষ্ম তার ভাই বিচিত্রবীর্যের সাথে বিয়ে দেবার জন্য। ভীষ্ম এই কাজটি হস্তিনাপুরের জন্য রাজনৈতিক বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু অম্বা জানিয়েছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই শাল্বকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটি জানার পর, ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বর কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। তবে শাল্ব তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কোনো উপায় না পেয়ে অম্বা তখন ভীষ্মের কাছে ফিরে গিয়ে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে বিয়ে করার দাবি জানান। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর ব্রহ্মচর্যের শপথের কারণে অম্বাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। অপমানিত হয়ে অম্বা দীর্ঘ তপস্যা করেন এবং প্রতিশোধ নেবেন বলে পরবর্তীকালে শিখণ্ডীনি নামে পুনর্জন্মগ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দশম দিনে ভীষ্মকে কেউই তাকে পরাজিত করতে পারছিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ, শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সামনে নিয়ে আসতে বলেন। ভীষ্ম এক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি কখনো কোনও নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। শিখণ্ডী জন্মগ্রহণ করেছিলেন নারী হিসেবে, কিন্তু পরে তিনি পুরুষ হিসাবে পরিচিত হন। এই কারণে ভীষ্ম তাকে এখনও নারী বলেই বিবেচনা করতেন। এই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে অর্জুন শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সামনে রাখেন ও ভীষ্মের দিকে অসংখ্য তীর ছোড়েন, যার ফলে ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে যান এবং শরশয্যায় থাকেন। এই গল্পে শিখণ্ডীর নারী থেকে পুরুষ হয়ে ওঠার কাহিনিটি বিশেষ অর্থবহ আমাদের এই আলোচনায়। শিখণ্ডিনীর বাবা, পাঞ্চাল রাজা দ্রুপদ, অম্বা তথা শিখণ্ডীর ভীষ্মের প্রাতি প্রতিশোধের কথা জানতেন এবং তাই তিনি শিখণ্ডিনীকে পুত্রসন্তান হিসেবে প্রতিপালন করেন। যখন শিখণ্ডিনী বড় হলেন, তার বিয়ে একটি রাজকন্যার সঙ্গে হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই রাজকন্যা জানতে পারেন যে শিখণ্ডিনী প্রকৃতপক্ষে একজন নারী। অপমানিত হয়ে রাজকন্যার পিতা দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেন। শিখণ্ডিনী চরম বিপদে পড়ে এবং লজ্জিত হয়ে বনে পালিয়ে যান। শিখণ্ডীর সাথে দেখা হয় এক যক্ষ স্থূণকর্ণ-এর। শিখণ্ডিনীর দুর্দশা দেখে স্থূণকর্ণ দয়া পরবশ হয়ে তাকে সাহায্য করতে রাজি হন। তিনি জাদুশক্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে শিখণ্ডিনীকে পুরুষ এবং নিজেকে নারী রূপে রূপান্তরিত করেন। শিখণ্ডিনী তখন একজন পুরুষ রূপে রাজ্যে ফিরে আসেন এবং তার বিবাহিত জীবন পুনরায় গৃহীত হয়। এরপর থেকে তিনি শিখণ্ডী নামে পরিচিত হন। পরে স্থূণকর্ণ নিজের পুরুষ রূপ ফিরে পেতে চাইলে, যক্ষরাজ কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দেন এবং তার নারীরূপ চিরস্থায়ী করে দেন। ফলে শিখণ্ডী সারা জীবন পুরুষ রূপেই থেকে যান। এই রূপান্তরের মাধ্যমেই শিখণ্ডী তার প্রতিশোধের লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহাভারতের এই শিখণ্ডী চরিত্রের মধ্যে আমরা অদ্ভুত ভাবে নারী ও পুরুষ উভয় শক্তিরই এক মিশেল দেখতে পাই। শিখণ্ডী জন্মেছিলেন মেয়ে হিসাবে অর্থাৎ শারীরিক গঠনগত দিক থেকে তিনি ছিলেন নারী সুলভ, কিন্তু মানসিক দিক থেকে তিনি একজন পুরুষ সত্তা হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারতেন। তার এই ব্যবহার লক্ষ্য করেই হয়ত তার বাবা তাকে একজন ছেলে হিসাবেই গড়ে তুলেছিলেন। পড়ে যখন তার সুযোগ আসে তখন তিনি তার পুরুষ সত্তার দিকটাকেই বেছে নেন। এরকম ঘটনা আমাদের আসে পাশে আমরা দেখেই থাকি। পুরো ঘটনাটাই বর্ণিত হয় পুনর্জন্ম, প্রতিশোধের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বার্তা খুব গভীর। শিখণ্ডীর এই গল্প আমাদের এটাই শিক্ষা দেয় যে সেক্স ও জেন্ডার দুটো এক জিনিস নয়। সেক্স একজন ব্যক্তির জৈবিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে, যেমন- ক্রোমোজোম, হরমোন, প্রজনন অঙ্গ এবং শারীরিক গঠন ইত্যাদি। এই জন্ম থেকেই ব্যক্তি নিয়ে বড় হয় এবং এক্ষেত্রে তার বেছে নেবার কোন জায়গা থেকে না। জেন্ডার ওপর দিকে সমাজ এবং সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত একটি পরিচয়। নারী, পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার, নন-

বাইনারি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম হতে পারে। একজন ব্যক্তি কেমন ব্যবহার করেন, পোশাক পরেন বা নিজেকে প্রকাশ করেন, তা লিঙ্গ পরিচয়ের অংশ। এটি পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তি নিজে এটি বেছে নিতে পারেন। তাই এটা খুব স্বাভাবিক যে একজন হয়ত একটি পুরুষ দেহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহন করেছেন কিন্তু অন্তরে তিনি নারী। এক্ষেত্রে তার মধ্যে নারী ও পুরুষ সত্তা উভয়ই বর্তমান। শিখণ্ডী চরিত্র ক্ষেত্রেও আমরা একই বিষয় দেখতে পাই। তবে এই বিষয়ে যে সবাই এক মত নন তা আমরা আগেই দেখেছি। জুডিথ বাটলার এর মতে যেমন সেক্স ও জেন্ডার উভয়ই সামাজিকভাবে নির্মিত। কিছু জৈবিক মৌলবাদীদের আছেন যাদের মতে আবার সেক্স ও জেন্ডার উভয়ই জৈবিক। যেমন- স্টিভেন পিংকার, সাইমন ব্যারন-কোহেন, যারা মনে করেন জেন্ডার ভূমিকা মূলত জৈবিক পার্থক্য থেকে উদ্ভূত। কোহেন তাঁর বই 'দ্য এসেনশিয়াল ডিফারেন্স'-এ বলেন নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্য থেকেই তাদের আচরণের পার্থক্য আসে। নারীর ও পুরুষের আচরণগত পার্থক্য নিউরোলজিক্যাল বা হরমোনগত কারণে হয়। অনেক আধুনিক গবেষক আবার একটি মধ্যমপন্থা গ্রহণ করতে পছন্দ করেন এই ক্ষেত্রে। তাঁরা বলেন সেক্স জৈবিক ভিত্তি রাখে, তবে সমাজ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে এর অর্থ প্রদান ও ব্যাখ্যা করা হয়। একজন মানুষের জেন্ডার গঠনের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রভাব থাকলেও তার পাশাপাশি সমাজ, সংস্কৃতি, তাঁর বেড়ে ওঠা, তাঁর নিজস্ব ব্যাক্তি চেতনা এগুলো খুব গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। একজন শিশুর জন্ম হতে পারে পুরুষ থাকে বা নারী শরীর নিয়ে, কিন্তু সে সমাজে কীভাবে মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে তা ভিন্ন হতে পারে। এই ভিন্নতাকেই আমাদের সম্মান জানানোটা জরুরি।

ভারতবর্ষের এর ক্ষেত্রে বিষয়টা হল সমকামিতা ভারতের ইতিহাসে বরাবরই ছিল। খাজুরাহো, কোণার্ক, ভুবনেশ্বর—এই মন্দিরগুলিতে বিভিন্ন যৌন সম্পর্ক, সমকামী সম্পর্ক, লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রকাশ দেখা যায়। বিভিন্ন গল্প, মহাকাব্যে এর উল্লেখ আছে। তবে এমন নয় যে এই সময় এই মানুষগুলোর কোনো সংগ্রাম ছিল না। যেমন মনুস্মৃতিতে সমকামী যৌন আচরণকে অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি শ্লোকে বলা হয়, যদি একজন কুমারী নারী আরেক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে, তাহলে তার শরীরকে শুদ্ধ করতে নির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশোচনা করতে হবে। সমকামিতাকে দোষ, অপরাধ হিসাবে দেখার বিষয়টা প্রাচীন ভারতেও ছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের সময় ১৮৬১ সালে সেকশন ৩৭৭ অনুসারে প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনাচার কে আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। তবে সারা পৃথিবী জুড়েই অবস্থা এখন বদলাছে। ২০০৯ দিল্লি হাইকোর্ট, ২০১৩ তে সুপ্রিম কোর্ট এবং ২০১৮ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সেকশন ৩৭৭ ধারাকে অবৈধ ঘোষণা করে। পৃথিবীর বহু দেশে সমকামিতা এখন স্বীকৃত। মানুষ আস্তে আস্তে তার বাইনারি চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নন বাইনারি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করছে।

যদিও এই পথ খুব সোজা নয়। বাইনারি চিন্তাধারা নিয়ে বেড়ে ওঠা একজন মানুষের পক্ষে নন বাইনারি ওয়ার্ল্ড ভিউ কে রাতারাতি গ্রহন করা সহজ না। সাদা কালোর মাঝে গ্রে শেডটাকে ধরতে অনেক সময় লাগে এবং তা নিরন্তর মানসিক অনুশীলনেরও বিষয়। আমরা যেখান থেকে শুরু করতে পারি তা হল নিজেরা সচেতন হবার মধ্যে দিয়ে। আমরা যখন বড় হয়ে উঠি আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের পক্ষপাত ও পূর্বধারণা নিয়ে বড় হয়ে উঠি যা সমাজ আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত নিজেদের এই পক্ষপাত গুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা। প্রকাশ্য পক্ষপাত সম্পর্কে মানুষ সচেতন হলেও মানুষের অবচেতনে এমন কিছু গোপন পক্ষপাত থাকে যেগুলো সম্পর্কে সে নিজেই জানে না। এই পক্ষপাত গুলি নিয়ে নিজের মধ্যে সচেতনতা আনা প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় সবাই কোনো না কোনো রকমের গোপন (ইমপ্লিসিট) পক্ষপাত নিয়ে বড় হয়। ইমপ্লিসিট বায়াস টেস্ট করার জন্য কেউ ইমপ্লিসিট অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট দিতে পারেন যা আমাদের অচেতন পক্ষপাত ধরতে সাহায্য করে। যদি কেউ স্বীকার করতে পারে হ্যাঁ, আমার এই জায়গায় সমস্যা আছে, আমার পক্ষপাত আছে কিছু জায়গায়, তাহলে তার অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। নিজেকে পরিবর্তনের পথটা খুলে যায়। এর সাথে সাথে যা করতে হবে তা হল বিপরীত চিত্রগুলোর সংস্পর্শে থাকতে হবে। আমাদের মস্তিষ্ক যা বারবার দেখে, সেটাই স্বাভাবিক ভাবে ধরে নেয়। যদি মস্তিষ্ক বারবার দেখে যে সমকামী মানুষরাও সাধারণ জীবন যাপন করে, তখন অন্যরকম ভাবাটা কমে যায়। এই পদ্ধতিকে বলে কাউন্টার স্টিরিটাইপ ট্রেনিং। পক্ষপাত কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সেই গোষ্ঠীর মানুষদের সাথে অর্থবহ, আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। শুধু চেনা নয়, গভীরভাবে জানা। তখনই আমরা বনাম তারা ভাবটা ভেঙে গিয়ে মানবতাবোধ টাই বড়ো হয়ে দাড়ায়। পক্ষপাতমুক্ত অভ্যাস গড়তে হলে নিজের চারপাশও পরিবর্তন করতে হবে এবং এটা একদিনের বিষয় নয়। আমরা নিজেদের মধ্যে এই

পরিবর্তন আনতে পারলে তবেই পরবর্তী প্রজন্মকে সেই শিক্ষা দিতে পারব। তারা এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলবে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও তাদের মধ্যের পার্থক্যগুলো দমন করা হয় না। বরং তাকে গৌরবের সাথে গ্রহণ ও উদযাপন করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১. বোরাল, সৌরভ ও বসিষ্ঠ, দিব্যা। ডিলিনিয়েশন অফ থার্ড জেন্ডার আইডেন্টিটি ইন দ্য ইন্ডিয়ান এপিকস অ্যান্ড আদার এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেক্সটস। আইআইএস ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ২০২৩।

২. বাটলার, জুডিথ। জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভার্শন অব আইডেন্টিটি। রউটলেজ, ১৯৯০।

৩. ফুকো, মিশেল। দ্য হিস্টরি অব সেক্সুয়ালিটি। পেঙ্গুইন ইউ কে, ১৯৯৮।

৪. ফিউচারচার্চনাও। “দ্য বাইবেল অ্যান্ড সেম সেক্স রিলেশনশিপস- পার্ট ৬: লেভিতিকাস- দ্য হোলিনেস কোড, এন্সিয়েন্ট সেক্স এথিক্স অ্যান্ড আবমিনেশনস”। ২০১৫, অগাস্ট ১৮ https://www.futurechurchnow.com/2015/08/18/the-bible-and-same-sex-relationships-part-6-leviticus-the-holiness-code-ancient-sex-ethics-and-abominations/

৫. হালবারস্ট্যাম, জ্যাক। ইন আ কুইয়ার টাইম অ্যান্ড প্লেস: ট্রান্সজেন্ডার বডিজ, সাবকালচারাল লাইভস। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫।

৬. নন্দা, সেরেন। নাইদার ম্যান নর ওম্যান: দ্য হিজড়াস অব ইন্ডিয়া। ওয়াডসওয়ার্থ পাবলিশিং, ১৯৯০।

৭. সেডউইক, ইভ কোসোফস্কি। এপিস্টেমোলজি অব দ্য ক্লোজেট। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯০।

৮. শ্রীনিবাসন, এস. পি. “ট্রান্সসেক্সুয়ালিজম ইন হিন্দু মিথলজি” কারেন্ট মেডিসিন অ্যান্ডবায়োলজি, ২০২০ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC753902/

৯. ভানিতা, রূথ। কুইয়ারিং ইন্ডিয়া: সেম-সেক্স লাভ অ্যান্ড ইরোটিসিজম ইন ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ডসোসাইটি। রউটলেজ, ২০০২।

১০. ওয়াটকিন, এলিসন। কুইয়ার প্ল্যানেট ডকুমেন্টারি। বিবিসি স্টুডিওস, ২০১৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 225-230
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.199

বাড়ি থেকে পালিয়ে: স্রষ্টার দ্বন্দ্ব, সৃষ্টির দ্বন্দ্ব

অগ্নিভ সান্যাল, *গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The relationship between literature and cinema is centuries-old. In the Bengali language too, many legendary directors have taken narratives from literature and adapted them into films. Ritwik Ghatak made the film 'Bari Theke Paliye' in 1959 based on the novel by Shibram Chakraborty. Shibram's novel was simple plot-driven narrative written for children. It also featured autobiographical elements and contemporary imagery. But when Ghatak made the film, it created a deeper resonance. In this film, Ritwik Ghatak, through the eyes of Kanchan, portrays the reality of post-partition Kolkata, while also using the multidimensional connotation of 'home' showing numerous homeless characters. This article attempts to explore the relationship between literature and cinema through an analysis of the works of Shibram and Ritwik.

Keywords: Film, Literature, Partition, Kolkata, Children Literature

চলচ্চিত্রের জন্ম বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ বর্ণিত "And God said, 'Let there be light', and there was light" এর মতো কোনো আকস্মিক সংঘটন নয়। বরং ইতিহাসের সুদূর ছায়াময় গুহাতীত আলো-আঁধারি সময়ে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ যখন সরল যাদুবিশ্বাসে দেওয়ালে আঁচর কেটে জন্ম দিল সিং উচিয়ে তেড়ে আসা আপাত স্থির বাইসনের, তখনই বলা যায় জন্ম নিয়েছিল চলচ্চিত্রের আনুবীক্ষণিক ভ্রূণ। তারপর সেই গোপন ভ্রূণ ক্রমশ সময়ের ধূসর-সুড়ঙ্গ-লালিত অন্ধকারের পিচ্ছিল পথ বেয়ে ক্রমশ পরিপুষ্ট হতে হতে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে লুমিয়ের ব্রাদার্সের হাত ধরে সমগ্র পৃথিবী শুনতে পায় নবজাতকের বিস্ময়ক্রন্দনধ্বনি। তারপর বহু যুগ কেটে গেছে। প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারদের হাতে চলচ্চিত্র ক্রমশ পা বাড়িয়েছে সাবালকত্বের পথে। অন্যান্য শিল্পমাধ্যম থেকে সে যেমন গ্রহণ করেছে রূপসজ্জার নব নব অলঙ্কার, তেমনি প্রতিদানে সমৃদ্ধ করেছে অন্যান্য শিল্পকে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলার পাশাপাশি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চলচ্চিত্রের আদি ইতিহাসের দিকে তাকালে তাই লক্ষ্য করা যায় সাহিত্য নির্ভরতা এবং সাহিত্য নিরপেক্ষতা-উভয় প্রবণতাই। এ প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন-

> "অন্বেষণ অথবা উন্মোচনের এই দ্বিমুখিতা থেকেই চলচ্চিত্র কখনও নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছে নিজের বিষয়, কখনও সাহিত্যের কাছে ছুটে এসেছে নির্মাণযোগ্য উপকরণের সন্ধানে।"[১]

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলেও আমরা দেখব সাহিত্যের হাত ধরেই চলচ্চিত্র খুঁজে নিয়েছে তার পায়ে চলা পথের সন্ধান এবং বহু ব্যবহৃত সেই পথেই শেষ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে 'পথের পাঁচালী', সাহিত্য থেকে আখ্যান সংগ্রহ করে সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন চলচ্চিত্রের অনন্যসাধারণ চলন। তারপরে সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত', 'জলসাঘর', 'চারুলতা', 'ঘরে বাইরে', ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'তিতাস একটি নদীর নাম', মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম', 'কলকাতা ৭১', 'খারিজ' প্রভৃতি চলচ্চিত্র বাংলা সাহিত্য

থেকে নিজস্ব আখ্যান গ্রহণ করে তাকে আপন শিল্পগুণের সমন্বয়ে পৌঁছে দিয়েছে এক অনন্য উৎকর্ষে। বর্তমান প্রবন্ধে ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চলচ্চিত্রটিকে শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা উপন্যাসের সাপেক্ষে আলোচনা করব।

স্রষ্টার দ্বন্দ্ব: শিবরাম বনাম ঋত্বিক:

বাংলা সরস সাহিত্যধারায় এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের নাম- শিবরাম চক্রবর্তী। এই হাস্যরসসম্রাটের অন্তর্দর্শন এবং জীবনবোধ পাঠকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে বড়দের সিরিয়াস কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করলেও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ হাস্যরসের ধারায় তাঁর আত্মপ্রকাশ বিশ শতকের বিশের দশক থেকে। গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটলের কমেডি ভাবনায় জীবন ও আচরণের হাস্যকর অসংগতি এবং নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের অনুকরণের প্রসঙ্গ রয়েছে। শিবরাম যেমন একদিক থেকে তাঁর রচনায় মানুষের জীবনের নানান অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত হাস্যরসের অবতারণা করেন, তেমনি সামাজিক বা রাজনৈতিক অসঙ্গতি ব্যঙ্গের ছলে চিহ্নিত করে দেন। তিনি লিখেছেন-

> "নিজের জীবন নিয়েই আমার যত গল্প লেখা, বুঝলেন কিনা, আমার জীবনটা অনেকটা গল্পের মতই। জীবন দেখে, জীবন থেকেই তো সাহিত্য ছেকে নিতে হয়। আমার জীবনে আমার নিজের জীবনটাই ঘুরে ফিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি কেবল, সীমিত ক্ষমতা নিয়ে তার বাইরে আর যেতে পারিনি, তাই ঘুরে ফিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই জীবনটাকেই দেখিয়েছি আমার রচনায়।"[২]

মানুষের নানান দুর্বলতা আর অসঙ্গতিকে তিনি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই দেখেছেন। শিশুর সারল্য নিয়ে মানবজীবনের বিচিত্র কান্ডকারখানা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর লেখায়। তাই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে স্পষ্টবাদিতা ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি।

> "সময়ের ছাই সরে গেলে দেখা যায় ইতিহাসে দাঁড়িয়ে আছেন এক অগ্নিপুরুষ: তাঁর নাম ঋত্বিককুমার ঘটক।"[৩]

ঋত্বিক ঘটক শুদ্ধতম বাঙালি পরিচালক, যাঁর মজ্জায় মিশে ছিল ভাঙা বাংলার পাঁজরফাটা দীর্ঘশ্বাসের করুণ রাগিণী। হলিউডি কেতাদুরস্ত কৃত্রিম সাংস্কৃতিক প্রতিগ্রহণের যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি ধারণ করেছিলেন নিজের জীবন ও চলচ্চিত্রকর্মে। আর শুধুমাত্র সেই অপরাধেই তাঁকে হতে হয়েছিল নীলকণ্ঠ। সমাজ নিজের হাতে যত্ন করে তাঁর গলায় ঢেলে দিয়েছিল আপাত ব্যর্থতার বিষমদ।

শুধুমাত্র সমসময়ের যুগযন্ত্রণার নিদারুণ প্রতিচ্ছবিই নয়, যৌথ অবচেতনা (Collective unconscious) থেকে উৎসারিত পুরাণপ্রতিমা নির্মাণে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দখিন খোলা জানলা। একদিকে মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ব, শ্রেণীচৈতন্য, রাজনৈতিক দর্শন যেমন ফুটিয়ে তোলে সভ্যতার সংকট, অন্যদিকে উপনিষদের প্রভাবে এবং রাবীন্দ্রিক মঙ্গলচিন্তায় ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে শাশ্বত মানবের জয়ধ্বনি শোনা যায়। সে কারণেই তিনি বলেছেন-

> "'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', রবিবাবুর এই কথাটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।"[৪]

সৃষ্টির দ্বন্দ্ব: উপন্যাস বনাম চলচ্চিত্র:

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসটি এক অর্থে শিবরাম চক্রবর্তীর আত্মজৈবনিক স্মৃতির পুনর্নির্মাণ। তাঁর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' এবং 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' বইদুটিতে ছড়িয়ে থাকা ঘটনাবলীর সঙ্গে তাই 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাসের অনেক ঘটনার হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিবরামের জীবন ঘটনার বিন্যাসে হাসি মশকরায় টইটম্বুর। জন্মস্থান চাঁচল থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসার ঘটনা অথবা দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি থেকে তিনি লিখেছিলেন 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাসটি। উপন্যাসটির প্লট শিশুসাহিত্যের উপযোগী সরল। কাহিনীর প্রধান চরিত্র কাঞ্চন বাবার শাসনের ভয়ে বাড়ি থেকে পালায় এবং কলকাতায় গিয়ে পৌঁছায়। বিরাট 'মহানগর'-এ নানান ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কাঞ্চনের চোখ দিয়ে লেখক কলকাতার সময়নিষ্ঠ সংগতি ও অসংগতিতে ভরা দৃশ্যপট অঙ্কন করেন। শেষ পর্যন্ত নানান আকস্মিকতায় ভর করে এক আশ্চর্য, প্রায় অবিশ্বাস্য সমাপতনে কাহিনী পৌঁছায় এবং কপর্দকহীন অবস্থায় বাড়ি থেকে পালানো কাঞ্চন বিপুল অর্থ ও সম্পদ নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

আপাতভাবে কাহিনীটিকে একমাত্রিক মনে হলেও ঘটনার আড়ালে অসংগতি, কৌতুক এবং সময়চিত্র উপন্যাসটিকে অনন্য মাত্রা দান করেছে। উপন্যাসের একদম শুরুতে বাড়ির ঠাকুরের পূজার ভোগ চুরি করে খাওয়ার মধ্য দিয়ে কাঞ্চনের কৈশোরের চপলতা শুধু নয়, সেইসঙ্গে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানবিরোধিতারও ছবি ফুটে উঠেছে। বাড়ির পুরুতের ছেলে বিনোদের পৈতে ছিঁড়ে যাওয়া, অভিশাপ দেওয়া এবং কাঞ্চনের প্রতিশোধ নেওয়ার অংশে ফুটে ওঠা ব্রাহ্মণতন্ত্রের প্রতি কৌতুক হাস্যরসের অবতারণা করেছে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই কাঞ্চনের বাবা খুব কড়া শাসনে তাকে বেঁধে রাখতে চান, যদিও মা তার প্রতি অনেক সংবেদনশীল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে হঠাৎ কাঞ্চনের বাড়ি থেকে পালানোর ঘটনা অত্যন্ত আকস্মিক এবং দুর্বল। বাড়ি থেকে কলকাতায় পালিয়ে যাওয়ার অংশে কাহিনীতে উপস্থিত হওয়া চরিত্রগুলির কাঞ্চনের প্রতি সহানুভূতি ও ঔদার্য অতিরিক্ত এবং অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছে।

কলকাতায় পৌঁছানোর পর গ্রাম্য কিশোরের মহানগর-অভিজ্ঞতা উপন্যাসের প্রধান অংশ। কাঞ্চনের চোখ দিয়ে একদিক থেকে যেমন শিবরাম গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন- গাড়ি, ফেরিওলা প্রভৃতি অংশে, তেমনি কাঞ্চনের মধ্যে তিনি আরোপ করেছেন বয়সাতিরিক্ত পরিণতমনস্কতা। বিয়েবাড়ির অংশে একদিক থেকে কৈশোরের অস্ফুট প্রেমানুভূতি যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি গ্রাম্য কিশোর ও নাগরিক বালিকার শিক্ষার পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে চমৎকারভাবে শিবরাম হাস্যরসের আবহকে নির্মাণ করেছেন। যদিও তার পরেই বিয়েবাড়ির ডাস্টবিনে খাবার নিয়ে ভিখারী ও কুকুরদের কাড়াকাড়ি একদিক থেকে যেমন মহানগরের আর্থিক বৈষম্যের কথা সূচিত করে, তেমনি অন্যদিকে এই দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় কাঞ্চনের সরল সহানুভূতিশীল চিন্তাও ফুটে ওঠে-

> "শেষে এই স্থির করল, সে বড় হলে কলকাতার সমস্ত ভিখারীদের একটা বড়ো রকমের ভোজ দেবে।"[৫]

'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একটি বিশেষ সময়ের উপস্থাপন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের যে উল্লেখযোগ্য কালপর্ব এই উপন্যাসে বিধৃত রয়েছে, তা হল অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাংশ। কাঞ্চন একটি খবরের কাগজে দেখেছিল লেখা আছে- "মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন - ১৯২১ সনের মধ্যেই স্বরাজ দিব।"[৬] 'India's Struggle for Independence' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে-

> "Gandhiji promised that if the programme was fully implemented, Swaraj would be ushered in within a year."[৭]

এছাড়াও চিত্তরঞ্জন দাশের ভলান্টিয়ার্সদের প্রসঙ্গ, তাদের গ্রেপ্তার, স্কুল-কলেজ বয়কট, চিত্তরঞ্জন দাশের দেশের জন্য সর্বস্ব সমর্পণের কথাও এই উপন্যাসে নানা ঘটনাপ্রসঙ্গে এসেছে। 'স্বরাজ' সম্পর্কে কাঞ্চনের জিজ্ঞাসা-

> "আচ্ছা, গরীব মানুষদেরও স্বরাজ হবে তো? স্বরাজ হ'লে তারা ভালো খেতে পাবে, পরতে পাবে?"[৮]

তার সংবেদনশীল মনের পরিচয় দেয়।

এই উপন্যাসে বারবার কাঞ্চনের বাবা এবং মায়ের প্রসঙ্গ এসেছে। বাবার চাণক্যবাদী শাসনে শুধু কাঞ্চন নয়, কাঞ্চনের মনে হয়েছে তার মা-ও জর্জরিত। তাই একটি অংশে কাঞ্চন তার বাড়ি থেকে পালানোর কারণ হিসেবে মায়ের দুঃখ ঘোচানোর সংকল্পে রোজগারের চেষ্টার কথা জানায় এবং শৌখিন বিলাসদ্রব্যের ফেরিওলার সাক্ষাতে সেই ইচ্ছা আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে।

উপন্যাসের একদম শেষে কাঞ্চন এক অপরিচিত ধনী ভদ্রলোককে তার রেসের মাঠে পয়সা জেতায় সহযোগিতা করে প্রভূত অর্থের মালিক হয়ে যায় এবং নানান শৌখিন দ্রব্য সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে যায়। এখানে প্রচুর অর্থ সত্ত্বেও খদ্দরের বস্ত্র পরা এবং গরীবদের খাওয়ানোর জন্য বড়ো অঙ্কের অর্থ দিয়ে আসার মধ্যে কাঞ্চনের অনুভূতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও উপন্যাসের শেষ অংশের এই আকস্মিক সমাপতন কাহিনীর দুর্বলতম অংশ। বাড়ি ফিরে কাঞ্চনের সঙ্গে মায়ের কথোপকথনকেও অনেকাংশে আরোপিত বলে মনে হয়েছে।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায় ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চলচ্চিত্রটি। ঋত্বিক সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রের আখ্যান গ্রহণের প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "...কোনো সাহিত্যকর্মের ভেতরে সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়ে তাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্যান করে আমার মনের মধ্যে যে আবেগ এবং যে প্রকাশবাঞ্ছা সতত সঞ্চারমান হতে থাকত- তাকে আমার চিত্রকর্মে প্রকাশ দিতে গিয়ে সেটা আমার নিজস্ব শিল্পকর্ম হয়ে উঠত।"[৭]

চলচ্চিত্রের শুরুতেই মা এবং বাবার সঙ্গে কাঞ্চনের সম্পর্ক খুবই নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। এলডোরাডোর বই পড়া এবং অনেক দূরে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ চলচ্চিত্রের শুরুতেই কাঞ্চনের কল্পনায় লালন করা নিরুদ্দেশ যাত্রার বীজটিকে চিহ্নিত করে দেয়। 'কাজলদীঘি হাইস্কুলের হেডমাস্টার' কাঞ্চনের বাবার পুরুষতান্ত্রিক শাসন এবং আধুনিক শহুরে জীবনযাত্রার প্রতি কঠোর মনোভাব চলচ্চিত্রে চমৎকারভাবে রূপায়িত। কাঞ্চনের মা-ও স্নেহ-ভালোবাসা-করুণার প্রতিমূর্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে বাড়ির চাকর যে কিনা শিবরামের উপন্যাসে ছিল নামগোত্রহীন, সেই 'নন্দ'কে ঋত্বিক কাঞ্চনদের বাড়ির একজন সদস্য হিসেবেই নির্মিত করেছেন। উপন্যাসের উদ্ধত, বয়সাতিরিক্ত পরিণতমনস্ক কাঞ্চন চলচ্চিত্রে কল্পনাপ্রবণ কিশোর। তাই বাংলার নদী তার কাছে পরিণত হয় দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনাকো নদীতে, যে নদীর তীরে লুকিয়ে আছে আদিম অধিবাসীগণ। এই অংশে কাঞ্চন ঋত্বিকেরই শিশুসত্ত্বায় রূপান্তরিত হয়েছে। শৈশবে পদ্মার চরে ঋত্বিকের ভাইবোনদের সঙ্গে খেলতে যাওয়া, তাদের আদিম অধিবাসীদের গল্প শোনানোর মধুর কাহিনীর কথা জানা যায় সংহিতা ঘটকের 'ঋত্বিক এক নদীর নাম' বইটি থেকে।

বাবার শাস্তির ভয়ে কাঞ্চন বাড়ি থেকে পালায় এবং ট্রেনে চেপে সরাসরি কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হয়। মহানগরে নিষ্পাপ কিশোরের অনির্দেশ্য অভিযাত্রার সূচনায় হাওড়া ব্রিজের লৌহশরীরের আড়ালে গান গাওয়া পাখিটির ছবি অসাধারণ ব্যঞ্জনাবহ। কলকাতার গগনচুম্বী অট্টালিকার বিস্ময়দর্শন করতে দিয়ে অতর্কিতে গাড়ি চাপা পরা থেকে কাঞ্চনকে বাঁচায় হরিদাস। প্রিন্সেপ ঘাটের পাশে এই দৃশ্যে পত্রহীন একটি গাছের ছবি আমরা দেখতে পাই, যে গাছটি চলচ্চিত্রের শেষাংশে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। হরিদাসের 'বুলবুলভাজা' গানটির দৃশ্যের মধ্য দিয়ে মহানগরের অন্তরে লুকিয়ে থাকা সরল শিশুতীর্থের ছবি ফুটে উঠেছে। এছাড়াও হরিদাসের সংলাপে দেশভাগ এবং মৃত মায়ের প্রসঙ্গ এসেছে। 'তারপর আমি তাকে দেখেছি কত পাড়ায়, কত গলিতে' -তাঁর এই সংলাপে মাতৃভাবনার বিশেষ থেকে নির্বিশেষে বিবর্তনের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

চলচ্চিত্রে রেস্টুরেন্টের দৃশ্যটিও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত কৌতুকময় কার্টুনচরিত্রের মতো হাস্যকর প্রৌঢ়ের খাওয়ার দৃশ্য কৌতুকের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে জনৈক আড্ডাবাজ যুবক যখন বলে- "কলকাতা মৃতনগরী", তখন আগের হাস্যকর দৃশ্যটি ম্লান হয়ে সমসময়ের দুর্দশা-বিক্ষোভ ফুটে ওঠে। অপর একজন যুবকের বহুদিন আগে বাড়ি থেকে পালানো এবং সেই সময়ের ছন্দময়-যাদুভরা কলকাতা শহরের কথা শিবরামের উপন্যাসের অন্তর্বয়নরূপে ব্যবহৃত। উপন্যাসে কপর্দকশূন্য কাঞ্চনের প্রতি জনৈক ভদ্রলোকের সহানুভূতির হাত এগিয়ে আসে, কিন্তু চলচ্চিত্রে সরল বিশ্বাসে বিনা পয়সায় খাওয়ার অপরাধে কাঞ্চনের জোটে কানমলা ও ঘাড়ধাক্কা।

চলচ্চিত্রে একটি দীর্ঘ গানের দৃশ্য রয়েছে। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে একজন বাউলের সেই গানের কথায় ফুটে উঠেছে সমসময়ের যুগসংকট এবং কলকাতার বাস্তবনিষ্ঠ সমাজচিত্র –

"(ওই) পদ্মাপারের চরে আমার ছিল রে ঘরবাড়ি
আর ছিল মা জননী বিঘা দু খেতি বাড়ি
(আমি) কী দোষে হারালাম মাগো আইলাম সবই ছাড়ি
(এখন) যেইখানে হক কথা কই মা পিঠে পরে জুতা
(আমি) অনেক ঘুরিয়া শ্যাষে আইলাম রে কলকাতা।"

কাঞ্চনের চোখ দিয়ে ঋত্বিক দেখিয়েছেন বাস্তুহারাদের অস্থায়ী তাঁবুর সারি, ধূসর কারখানা, মৃত্যুর প্রতীক্ষারত শকুন, ব্যস্ত যানবাহন, গগনচুম্বী অট্টালিকা, ম্যানহোলে নোংরা পরিষ্কার করা শিশু, বাস্তুহারা সংগঠনের মিছিল এবং শ্রেণীবিভক্ত মানুষের সম্মিলিত বিচিত্র চিত্রমালা। ঋত্বিকের কাঞ্চন নিষ্ক্রিয়ভাবে পথে হাঁটে না, সেও মিছিলের একজন হয়ে কিশোরসুলভ ঔৎসুক্যে 'ইনকিলাব'এর পরেই বলে ওঠে 'জিন্দাবাদ'।

বিয়েবাড়ির দৃশ্য উপন্যাস থেকেই সম্পূর্ণ গৃহীত। কিন্তু তারপরেই ভিখারি ও কুকুরের ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ির দৃশ্যে ভিখারির সংলাপে দুর্ভিক্ষের কথা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চলচ্চিত্রে একজন সন্তানহারা মায়ের প্রসঙ্গ আসে, যিনি কলকাতার অলিতে গলিতে কিশোর ছেলেদের মধ্যে নিজের নিরুদ্দিষ্ট ছেলেকে খুঁজে বেড়ান। এই মহিলাটির মধ্যে স্নেহশীলা সম্পূর্ণ মাতৃমূর্তি ফুটে উঠেছে। পরবর্তীতে একটি অংশে তাই দেখা যায় জনতা কর্তৃক ছেলেধরা সন্দেহে প্রহৃত রক্তাক্ত প্রৌঢ়াটিকে দেখে ভিড়ের মধ্য থেকে কাঞ্চন 'ওটা আমার মা' বলে ডেকে ওঠে। তার এই স্বতঃস্ফূর্ত আকুতিতে সমীকৃত হয়ে যায় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অংশে ঘুরেফিরে আসা নির্বিশেষ মাতৃচেতনা।

ঋত্বিক চলচ্চিত্রে রাতের কলকাতার বৈভবময় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যে কলকাতায় রাতে বিজ্ঞাপনের আলো ঝলমল করে, সেখানেই আবার চোর এসে ফুটপাতে ঘুমের সুযোগ নিয়ে কাঞ্চনের জুতো নিয়ে পালায়।

চলচ্চিত্রে অন্যতম সংযোজন মিনি এবং তার বাবা-মায়ের প্রসঙ্গ। মিনির মায়ের সঙ্গে কাঞ্চনের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যদিও রোজগারের নেশায় কাঞ্চন অজান্তেই তার অসুস্থ 'মাসি'র মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুরুতে এক ঝলক দেখানো সেই পত্রহীন গাছটির নীচেই ঘটনাটি সংঘটিত হয়, কাঞ্চনের অভিযাত্রার শুরু এবং শেষের বিন্দুটি এক হয়ে যায়।

শেষাংশে হরিদাস প্রকাশিত হয় নির্দয় মহানগরের অন্তরে লুকিয়ে থাকা কোমল সত্তারূপে। কাঞ্চন বাড়ি ফেরে। তবে বিপুল অর্থ নিয়ে আপাত জয়ীর মতো নয়; তার 'রোজগার' হরিদাসের দাড়ি-ঝোলা এবং অপরিসীম অভিজ্ঞতা। কলকাতায় সে দেখেছে জীবন সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, প্রত্যক্ষ করেছে অপরাধজগতের খণ্ডচিত্র, সেইসঙ্গে সে পেয়েছে সহানুভূতিশীল হরিদাস, মা, মিনি, মাসি, ট্রামের অজ্ঞাত পরিচয় কন্ডাক্টর এবং সেই কুলিটিকেও যে তাকে মহানগরের স্বরূপ চিনিয়েছিল। দুরন্ত কল্পনাপ্রবণ কিশোর কাঞ্চন তাই বাড়ি ফেরে পরিণতবয়স্কের সাজসজ্জা নিয়ে। গ্রামবাংলার নৈসর্গিক দৃশ্যপট চলচ্চিত্রের শেষাংশটিকে বড়ো মায়াময় করে তুলেছে। 'চাণক্য আওড়ানো রাগী শাসনকর্তা' থেকে 'স্নেহময় কৌতূহলী' বাবাকে তাই সে বলে- "বাড়িই সবচেয়ে ভালো বাবা।"

কাঞ্চন স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ফের বাড়িতে ফিরতে পারে। কিন্তু সব 'বাস্তুহারা' কি ফিরে পায় তার ভালোবাসার আশ্রয়ভূমিটিকে? আমরা 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চলচ্চিত্রে দেখি কাঞ্চন একাই 'বাড়ি' থেকে চ্যুত নয়। হরিদাস, বাউল, উদ্বাস্তু মানুষের দল, ডাস্টবিনের খাবার খাওয়া ভিখারি, বোবার ভান করে ছবি আঁকা ছেলেটি, মিনির মা, গগনচ্যুত চিল – অসংখ্য 'বাস্তুহারা' চরিত্রের সমন্বয়ে চলচ্চিত্রটি এক গভীরতম ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ঋত্বিক তাঁর 'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে' পরবন্ধটিতে লিখেছিলেন-

> "... 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' বলতে এ-ছবিতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না-... আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি – এটাও আমার বক্তব্য। 'বাস্তুহারা' কথাটিকে এইভাবে বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নীত করাই আমার অন্বিষ্ট।"[১০]

আমাদের মনে রাখতে হবে এই চলচ্চিত্রে 'বাড়ি' কেবলমাত্র ইট-কাঠ-পাথরের স্থাবর আবাসভূমি নয়। অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর 'এ তনু ভরিয়া: দর্শন আপাদমস্তক' গ্রন্থে বাড়ি তথা ঘরের এগারোটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো-

> "অতীতের সঙ্গে পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার ঐতিহ্যের সুতো ধরে রাখার জায়গা।"[১১]

'নাগরিক'-এ নায়কের নদীর ধারে সুন্দর বাড়ির স্বপ্ন, 'অযান্ত্রিক'-এ মানুষের একান্ত ভালোবাসার আশ্রয়ভূমির ধ্বংস, 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় উদ্বাস্তু কলোনির ছবি, 'কোমল গান্ধার'-এ স্থানিক এবং সাংস্কৃতিক আশ্রয়চ্যুতির ক্ষত, 'সুবর্ণরেখা'-য় ছোট্ট বিনুর সংলাপে ধ্রুবপদের মতো ফিরে আসা 'নতুন বাড়ি'র কথা, 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ নদীকেন্দ্রিক একটি জাতির অস্তিত্বের সঙ্কট এবং 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-তে ঘর ছেড়ে অন্তহীন অনির্দেশ যাত্রা- ঋত্বিকের সমস্ত চলচ্চিত্রেই ঘুরেফিরে এই 'বাড়ি'র প্রসঙ্গ এসেছে। আসলে ঋত্বিক গোটা জীবন ধরে ছিন্নমূল চেতনায় হারানো সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করে গেছেন। তাই তাঁর চলচ্চিত্রে সময় এত করুণ, এত বিষণ্ন, এত নির্মম!

অ-শেষ কথা:

শিবরাম তাঁর শিশুসুলভ মন নিয়ে কাঞ্চনের অভিযাত্রাকে চিহ্নিত করেছিলেন নানা অসংগতি থেকে উদ্ভূত কৌতুক ও হাস্যরসের আবহে এবং তাঁর শিশুদের জন্য লেখা এই উপন্যাসে অপরাধজগতের কোনো আঁধার আখ্যানকে তিনি নির্মিত করতে চাননি। তাই কাঞ্চনের কাছে কলকাতার কয়েকটি কঠোর বাস্তবচিত্র উন্মোচিত হয়ে পড়লেও সেগুলো পরিহাসনীয় উপেক্ষা বা সরল আপাত সমাধানে দূরীভূত হয়েছে। একারণেই শেষ অবধি মহানগরে অনাহূত কিশোর কাঞ্চনের ক্ষুধা-আশ্রয়হীনতার সাময়িক যন্ত্রণা থেকে ভাগ্যের সহায়তায় মুক্তি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' রূপেই চিহ্নিত হয়। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক সময়ের কালকূট পান করে হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। তাঁর রোগা পিঠে দগদগে হয়ে ফুটে ছিল কাঁটাতারের সুগভীর ক্ষত। সময়, মানুষ এবং পৃথিবীকে তিনি শিবরামীয় কৌতুকে নয়, বরং প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাস্তবের কঠোরতা এবং অকৃত্রিম সংবেদনশীলতার মিশ্রণে। তাই হাস্যরসকে ছাপিয়ে এই চলচ্চিত্রে এক বিষণ্ণ সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা 'সুখী রাজপুত্রের গল্প'-এর প্রসঙ্গ হরিদাসের সংলাপে বসিয়ে তিনি গল্পের 'নীল নদের পাখিটি'র প্রত্যক্ষ করা দুঃখ-কষ্টের ছবিকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সমীকৃত করে তুলেছেন। সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত পার্থক্য অনেক, কিন্তু ভাবগত দিক দিয়ে উভয়েই আখ্যানধর্মী শিল্প। আখ্যানগত দিক দিয়ে, শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' উপন্যাস শিশুসাহিত্য উপযোগী সার্থকতা লাভ করলেও, ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' চলচ্চিত্র উপন্যাসটিকে অতিক্রম করে এক বিশেষ শিল্পগুণ লাভ করেছে, যা একে দান করেছে নির্বিশেষ সর্বকালীন এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা।

তথ্যসূত্র:

১। পত্রী, পূর্ণেন্দু। সিনেমা সংক্রান্ত। দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১০।
২। চক্রবর্তী, শিবরাম। ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা। বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃ. ১০।
৩। ঘটক, ঋত্বিক। চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু। দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৮, কলকাতা, ভূমিকা।
৪। তদেব, পৃ. ৮৯।
৫। চক্রবর্তী, শিবরাম। বাড়ি থেকে পালিয়ে। দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৫৩, কলকাতা, পৃ. ৪০।
৬। তদেব, পৃ. ৪৫।
৭। Chandra, Bipan edited. India's Struggle for Independence. Penguin Books, 1989, Page no– 186.
৮। চক্রবর্তী, শিবরাম। বাড়ি থেকে পালিয়ে। দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৫৩, কলকাতা, পৃ. ৪৬।
৯। ঘটক, ঋত্বিক। চলচ্চিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু। দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৮, পৃ. ৮৬।
১০। তদেব, পৃ. ১৫৩।
১১। চক্রবর্তী, অরিন্দম। এ তনু ভরিয়া: দর্শন আপাদমস্তক। অনুস্টুপ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৭৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 231-237
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.200

ভেষজ চিকিৎসায় পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি গ্রাম কর্ণগড়ের একটি সমীক্ষা

অনন্যা মুখার্জ্জী, *সহশিক্ষিকা, ইতিহাস, খড়গপুর অতুলমণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.09.2025; Accepted: 23.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the era of scientific advancement, in Karnagarh, a remote village in West Midnapore, diseases are cured through traditional herbal medicine. It's done by utilizing the properties of various herbs and plants. The people of this village put faith in their local herbalist. The purpose of my research work is to analyse the extent of effectiveness these herbal medicines are capable of delivering hence curing said diseases of the people and how they trust the herbalist.

Keywords: Karnagarh, Traditional herbal medicine, Herbs, Curing diseases, Herbalist

ভেষজ চিকিৎসা হলো প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদ অর্থাৎ উদ্ভিজ বস্তুজাত দ্রব্যকে পথ্য বা নির্যাস হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তির চিকিৎসা সাধন। আদিম মানুষ পশুর আক্রমণের ক্ষত হলেও বাপ প্রাকৃতিক কারণে অসুস্থ হলেও পরিবেশ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজেদের সুস্থ করে তুলতো। বংশ পরম্পরায় তাদের উদ্ভিজ জ্ঞান তারা পরবর্তী প্রজন্মকে দান করে থাকে। অতএব বৈদিক আমলেও পথ্য ব্যবহারে খল- নুড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। বানভট্টের লেখা হর্ষচরিতম্ গ্রন্থে পুষ্যভূতিবংশের থানেশ্বর রাজ প্রভাকর বর্ধনের চিকিৎসা কার্যে ভেষজ ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকার চরক সংহিতা গ্রন্থে বিভিন্ন ভেষজের ব্যবহার জানা যায়। ভেষজ উদ্ভিদের ছাল ডাল পাতা ফল মূল কখনো ফুটিয়ে সেদ্ধ করে কখনো রোদে শুকনো করে কখনো পিষে রস করে কখনো শরবত করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিয়মে এবং বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায় ব্যবহার করা হয়। সর্দি কাশি পেটের সমস্যা চর্মরোগ যকৃতের সমস্যা ক্ষতের সমস্যা কাটা পোড়া প্রভৃতি দুটো নিরাময়ে ভেষজ চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভেষজ চিকিৎসা বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বরং রোগ নিরাময়ের ক্ষতিকারক অ্যালোপ্যাথিক থেকে বহু গুণ উপকারী।

বর্তমান গবেষণায় পশ্চিম মেদিনীপুর একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। স্বাধীনতা সংগ্রামে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হওয়া স্থান মেদিনীপুর। মেদিনীপুর সদরের ১০কি.মি. দূরবর্তী স্থানে শালবনী ব্লকের একটি গ্রাম কর্নগড়। বর্ধিষ্ণু গ্রামের অধিবাসীরা বেশিরভাগ আদিবাসী এবং বর্তমানে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। বেশির ভাগ বাড়ি মাটির তৈরী। একতল, দ্বিতল, কখনও ত্রিতল বাড়ি আভিজাত্যের প্রমাণ বহন করে। খড়, টিন দ্বারা আচ্ছাদিত, মাটি দ্বারা লেপা-মোছা। প্রতিটি গৃহে গৃহপালিত পশুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বেড়ার ধারে আনাজের বাগান পরিলক্ষিত হয়। এই কর্ণগড় গ্রামেই হঠাৎ করে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একাশি বছর বয়সী তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ ও পেশায় পুরোহিত। পূজার সাথে সাথে পিতার কাছ থেকে তিনি অসামান্য গুণের অধিকার লাভ করেছেন। তিনি বিভিন্ন রোগের লক্ষণ দেখে রোগ নির্নয় করতে পারেন এবং তিনি বিভিন্ন মূল, পাতা, ফল প্রভৃতি নিয়ম করে প্রয়োগ করে রোগ নিরাময় করে থাকেন।

গবেষণা পদ্ধতি ও এলাকা নির্বাচন: পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণা কাজটি সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ১০ কি.মি. দূরবর্তী শালবনী ব্লকের অন্তর্গত কর্ণগড় গ্রামটি আমার গবেষণার কেন্দ্রীয় অঞ্চল।

পূর্ববর্তী গবেষণাপত্রের পর্যালোচনা: Kumar, Rawat, Nagar, Kumar Pala, Bhat, Kunwar(2021) এর গবেষণা পত্রিকার মতে ধারাবাহিকভাবে বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত হওয়া ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার পরবর্তী প্রজন্ম বর্তমানে ভুলতে বসেছে কেবলমাত্র হিমালয়ের কিছু প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসীরা এখনো ধারাবাহিকভাবে ভেষজ চিকিৎসায় চিকিৎসা করে চলেছে।

Mandal, Adhikari, Chakraborty, Roy, Saha, Barman, Saha (2020) আলিপুরদুয়ারের ৪৫টি পরিবার ৩৮ রকম বিভিন্ন রোগের উপর সাঁওতাল কবিরাজের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা পত্রিকাটি চালান। বর্তমানে বহু আধুনিক ওষুধ ওই সব ভেষজের প্রভাবে তৈরি।

Pal, Jain (1989) গবেষণাপত্রে মেদিনীপুরের ১৯৭৭ এবং ১৯৮২ মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে কিভাবে লোধা সম্প্রদায় ভেষজ উদ্ভিদ চিকিৎসায় ব্যবহার করে তার সাথে ওরাং ও সাঁওতাল সম্প্রদায় এর তুলনামূলক ভেষজ ব্যবহার এর আলোচনা করা।

Ghosh, Sarkhel (2013) মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার ১৯ টি পরিবারের ২২ ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

Mandal, Sau, Das, Karmakar (2025) পত্রিকায় বলেছেন, জঙ্গলমহলে আদিবাসী মহিলাদের ভেষজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত জ্ঞান থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবে তা চাপা পড়ে থাকে। কিন্তু গৃহাদি চিকিৎসা কর্মে নারীরা তাদের সেই ভেষজ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

Bodding (2017) স্বনামধন্য লেখক ভেষজ উদ্ভিদ বিদ্যার ক্ষেত্রে তার গবেষণাপত্র অনুসারে সাঁওতালদের ভেষজ ওষুধের ব্যবহারের কার্যাবলী অনুসন্ধান করেন। বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করেন এবং ইউরোপের বর্তমানে ভেষজ উদ্ভিদ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কিভাবে নির্যাস আকারে নব রূপে ব্যবহৃত হয় তার একটি রূপরেখা তার গবেষণা পত্রে চিত্রন করে দিয়ে যান।

পূর্ববতী গবেষণা কাজের অসম্পূর্ণতা: সাঁওতাল প্রবণ অঞ্চল, হিমালয় অঞ্চল প্রভৃতি বিশেষ কিছু অঞ্চলের উপর গবেষণাকার্য সম্পন্ন হলেও আধুনিক মানসিকতা এবং আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় বিশ্বাসী মানুষেরা নিজেরাই ভেষজ চিকিৎসার প্রতি আস্থাশীল নয় তাই এই বিষয় আদিবাসী অঞ্চলের উপরই কেবলমাত্র গবেষণা কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বাংলা তথা ভারতের মধ্যবিত্ত ব্যাপক মানুষের কিয়দাংশ এখনো ভেষজ চিকিৎসা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সে বিষয়ে গবেষকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নীরব থেকেছেন।

বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা: কর্ণগড় গ্রামের প্রবীণ নিবাসী (৮১বছর বয়সী) তপন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘদিন গ্রামের বাসিন্দা। ঘরের সামনের বারান্দায় গ্রামের লোকেদের তথা রোগে আক্রান্তদের আগমন ঘটে। তিনি খাটিয়াতে বসে সবার মন্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনে তাদের রোগ নিরাময়ের প্রতিকার দেন। তার পুত্র জমির কাজ ও গোয়ালের কাজ করে। নাতনি পাশের বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। ঘরের পিছনে প্রয়োজনীয় গাছ-গাছালির একটি বাগান আছে। ভেষজ চিকিৎসার দিকে নাতনির আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। দাদুর অনুপস্থিতিতে অনেক সময় সেও দাদুর দেখানো ভেষজ পথ্য রোগীকে দিয়ে থাকে।

ভেষজ চিকিৎসা ভারতে আজকের চিকিৎসা নয়। প্রাচীনকাল থেকে ভারত আয়ুর্বেদ জগৎ খ্যাত ছিল। চরকের লেখা 'চরক সংহিতা' আয়ুর্বেদের এক অনন্য গ্রন্থ। বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক শুশ্রুতের লেখা 'শুশ্রুত সংহিতা' শল্য চিকিৎসার অনবদ্য গ্রন্থ বিশেষ। 'চরক সংহিতা' থেকে বিভিন্ন গাছ-গাছালির গুণ বিশেষ জানা সম্ভব হয়। বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন- ছাল, শিকড়, ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। প্রাচীন ভারতে এই ভাবেই আয়ুর্বেদ চর্চা ও কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবস্থা এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়।

ভারতে মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইউনানী চিকিৎসার সূত্রপাত হয়, ভেষজ ও ইউনানী দুই চিকিৎসা ব্যবস্থা একই সাথে সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। ইউরোপীয় আগমনে বিশেষতঃ ব্রিটিশদের আগমনে ভারতের আবহাওয়া

তারা সহ্য করতে পারল না। এদিকে ভারতে প্রচলিত ভেষজ ও ইউনানী চিকিৎসার প্রতি তাদের আস্থা ছিল না। ইউরোপীয়রা তখন প্রতিকার মূলক প্রতিষেধক আবিষ্কারের উপর জোর দেয় এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা কার্যকে উৎসাহিত করে। ফলে ভারতে ট্রপিকাল মেডিসিন চর্চা শুরু হয়। তারপর দ্রুত গতিতে চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে এ্যালোপ্যাথি এর চর্চা শুরু হয়ে যায়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এ্যালোপ্যাথি গ্রাস করে নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়! এ্যালোপ্যাথি ওষুধের পরবর্তীকালে বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা শোনা যেতে থাকে। ফলে প্রাচীন সনাতন ভেষজ চিকিৎসার প্রতি মানুষ আবার আস্থাশীল হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ গ্রাম্য এলাকা এখানে কর্ণগড়ের মানুষ ভেষজ চিকিৎসার প্রতি দীর্ঘদিন আস্থা রাখেন।

তপন বাবু গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা। গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন নর-নারী বিভিন্ন রোগের লক্ষণ নিয়ে তার কাছে এসে থাকেন। তাদের কারো ঠান্ডা লেগেছে, কেউ রক্তাল্পতার শিকার, কেউ বদহজমে পীড়িত। গ্রামের মানুষের তার উপর অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের মর্যাদাও তিনি দিয়ে থাকেন তাদের যথাযথ ভেষজ প্রয়োগ করে।

এমনকি তার একমাত্র নাতনিও কোন রকম শারিরীক সমস্যায় দাদুর কাছ থেকেই ভেষজ গ্রহণ করে, এবং নাতনির বক্তব্য অনুসারে খুব কম সময়ের মধ্যেই রোগের উপশম হয়।

বিভিন্ন রোগ ও লক্ষণ অনুসারে তপন বাবু বিভিন্ন ভেষজ দিয়ে থাকেন-

লজ্জাবতী: লিউকোমিয়া হলে বা কিডনির সমস্যা দেখা দিলে তপনবাবু লজ্জাবতীর পাতা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। লজ্জাবতীর মূল মাড়ি সমস্যার প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়।

আপাং: বদহজম, গ্যাস, অম্বলে দীর্ঘদিন ভুগলে আপাং এর একটি টুকরো সকালে প্রত্যহ বেলপাতা দিয়ে শরবৎ করে খাওয়ার উপদেশ দেন। তৎসহ বিকালে ধনে খাওয়ার উপদেশ দেন। এইরূপে ১৫ দিন চললে গ্যাসাদি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

লাল বাসব: পুরাতন কফ, সর্দি, কাশিতে গোলমরিচ দিয়ে লাল বাসবের রস চায়ের মতো গরম করে একটি কাপ খেলেই উপকার পাওয়া যায়।

দইপাতা: ছয়টি দইপাতা এবং একটি আপাং শিকড় কেটে খেলে নার্ভের রোগ, ধাতুক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

থানকুনি: থানকুনি পাতা পেটের রোগ, আমাশয়ের জন্যে উপকার পাওয়া যায়।

কুলেখাঁড়া: রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাব পূরণের জন্য কুলেখাঁড়া পাতা ব্যবহারের প্রস্তাব দেন।

তুলসীপাতা: প্রত্যহ মধু দিয়ে তুলসী পাতার সেবন করলে ঠাণ্ডার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

হলুদ: কাটা বা পোড়া বা ফোলাতে হলুদের ব্যবহার উপকার দেয়। ফোলাতে চুন ও হলুদ গরম করে দিলে ফলা কমে। শরীরের ব্যথা কমাতে দুধে হালকা হলুদের ব্যবহার অতীব ভাল।

কালমেঘ: এটা কৃমি হলে তা দূর করার জন্য কালমেঘ পাতার রস গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতেন তপন বাবু। সকালবেলা খালি পেটে কালমেঘ পাতা বেটে তার রস দুচামচ গ্রহণ করার তিনদিন আবশ্যক।

চিরতা: চিরতা রাতে ভিজিয়ে সকালে উঠে সেই জল পান করলে পিত্ত নাশ হয় বলে তপন বাবু পরামর্শ দান করেন।

নিম: একাধিক ভাবে নিমের ব্যবহারের কথা তপন বাবু বলেছেন নিমের পাতা ভেজে ভাতের পাতে খেলে ডায়াবেটিস কমে যায়। নিমপাতা ফুটানো জলে স্নান করলে চর্মরোগ নাশ হয়। নিম পাতার বাতাস এবং ছোঁয়া হাম এবং বসন্তের সময় উপকারে লাগে। রক্ত শুদ্ধ করতেও তেতো হিসেবে নিম উপকারী। নিম গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত পরিষ্কার এবং শক্ত হয়।

ধনে: রাতের বেলা শোয়ার আগে কাঁচা ধনে খেলে খাবার হজমের সুবিধা হয়।

জোয়ান: জোয়ানের সাথে বিট নুন মিশিয়ে খেলে খাবার পরিপাক ভালো হয়।

আদা: আদার রস সকালবেলা খেলে ঠান্ডা লাগে না। এছাড়াও হজমে আদা উপকারী। আদার সাথে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায় বলে তপন বাবু বিধান দিয়েছেন।

খুব বেশি ঠান্ডা লাগবে বিশেষত করোনার সময় তপনবাবু পরামর্শ দিতেন আদা গোলমরিচ লবঙ্গ তেজপাতা ধনে জোয়ান চায়ের পাতা দারচিনি মিশিয়ে গরম এক পানীয় তৈরি করে দুই বেলা পান করতে। ঠান্ডা লাগলেও যেমন এটা

পান করা যায় তেমনি ঠান্ডা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রতিকার হিসেবে এটিকে গ্রহণ করলে পরবর্তীকালে আর করোনার মত ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকানো সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। সকালে পূজা সারার পর তিনি চিকিৎসা করতে বসেন। দুপুর বেলার খাওয়া পর্যন্ত এবং রাত্রিকালে নিয়ম করে রোগী দেখেন। যে সকল রোগী তার ঘর পর্যন্ত আসতে পারেন না, একটি দ্বি চক্রযান ব্যবহার করে তাদের বাড়িতে গিয়ে তিনি রোগী দেখে আসেন। গ্রামবাসীদের থেকে তিনি জোর করে কিছু আদায় করেন না। গ্রামবাসীরা ভালোবেসে তাকে যে টুকু দেয় তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি যেভাবে গ্রামবাসীদের স্নেহ করেন, গ্রামবাসীরাও তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে। কর্ণগড়ে ভেষজ চিকিৎসা, ভেষজ বিদ্যার গুণাগুণ, ভেষজ উদ্ভিদ ও গ্রাম্য মানুষের অগাধ সরল বিশ্বাস দেখে মন ভরে গেল। শুধু বিশ্বাস নয়, তাদের কথা শুনে বোঝাও গেল এই ভেষজ চিকিৎসায় তারা কতটা উপকৃত হচ্ছে।

নিম্নলিখিত ভেষজ উদ্ভিদের কার্যাবলী ক্রমান্বয়ে দেওয়া হলো —

ভেষজ উদ্ভিদ	বিজ্ঞানসম্মত নাম	বংশ	ব্যবহার	ব্যবহারগত অংশ
লজ্জাবতী	Mimosa pudica	Fabaceae	লিউকোমিয়া বা কিডনী, মাড়ি	পাতা, মূল
আপাং	Achyranthes aspera	Amaranthaceae	গ্যাস, অম্বল, বদ হজম	মূল
লাল বাসব	Justicia adhatoda	Acanthaceae	কফ, সর্দি, কাশি	পাতা
দই পাতা	Justicia adhatoda	Acanthaceae	নার্ভের রোগ	পাতা
থানকুনি	Centella asiatica	Apiaceae	পেটের রোগ,আমাশয়	পাতা
কুলেখাঁড়া	Hygrophila auriculata	Acauthaceae	রক্তে হিমোগ্লবিন বৃদ্ধি	পাতা
তুলসিপাতা	Ocimum tenuiflorum	Lamiaceae	ঠাণ্ডা থেকে মুক্তি দেয়	পাতা
হলুদ	Curcuma aromatica	Zingiberaceae	কাটা, ফোলা,ব্যথা, যকৃতের প্রদাহ, চর্ম রোগ	মূল
জবা	Hibiscusrosa-sinensis	Malva ceae	আমাশয়, পেটের গোলযোগ	পাতা
গাঁদা	Tagetes	Astera ceae	রক্তপাত বন্ধ করে	পাতা
পেয়ারা	Psidiumguajava	Myrta ceae	দাঁতের রোগ কমে	পাতা
নিম	Azadirachta indica	Melia ceae	চর্মরোগ দাঁতের সমস্যা দূর করে	পাতা ডাল
ব্রাহ্মী	Bacopanonnieri	Planta ginaceae	স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে	পাতা
জোয়ান	Trachyspermummammi	Apiaceae	বদহজমে ব্যবহার হয়	বীজ
মৌড়ী	Foeniculum vulgare	Apiaceae	পেট ঠাণ্ডা করে	বীজ
জাম	Syzygiumcumini	Myrtaceae	পেটের সমস্যা	পাতা

মোট দিন সংখ্যা:৫

১নং পরিসংখ্যান

দিন	স্ত্রী(%)	পুং(%)	শি:(%)	সর্দি,কাশি(%)	পেটের সমস্যা (%)	অন্যান্য সমস্যা(%)
১ম	৪(৪০%)	২(২০%)	৪(৪০%)	২(২০%)	৬(৬০%)	২(২০%)
২য়	৩(৩০%)	৩(৩০%)	৪(৪০%)	৩(৩০%)	৫(৫০%)	২(২০%)
৩য়	২(২০%)	২(২০%)	৬(৬০%)	২(২০%)	৪(৪০%)	৪(৪০%)
৪র্থ	৩(৩০%)	২(২০%)	৫(৫০%)	৩(৩০%)	৩(৩০%)	৪(৪০%)
৫ম	৪(৪০%)	১(১০%)	৫(৫০%)	৪(৪০%)	৪(৪০%)	২(২০%)

২ নং পরিসংখ্যান: পাঁচ দিনব্যাপী তপনবাবুর কাছে আগত রোগীদের সুস্থ হওয়ার পরিসংখ্যানর তালিকা

প্রথম দিন চার জন মহিলা দুজন পুরুষ চারজন শিশু তাদের মধ্যে দুজনের সর্দি কাশি ছয়জনের পেটের সমস্যা এবং দুজনের অন্যান্য সমস্যা জন্য তপন বাবুর কাছে আসা। দ্বিতীয় দিন তিনজন স্ত্রী তিন জন পুরুষ আর চারজন শিশু তার মধ্যে তিনজন সর্দি কাশি পাঁচজন পেটের সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যা দু'জন এসেছে। তৃতীয় দিন দুজন স্ত্রীলোক দুজন পুরুষ ছজন শিশু তার মধ্যে দুজন সর্দি কাশিতে চারজন পেটের সমস্যা চারজন অন্যান্য সমস্যায়। চতুর্থ দিন তিনজন স্ত্রীলোক দুজন পুরুষ পাঁচজন শিশু তার মধ্যে তিনজন সর্দি কাশিতে তিনজন পেটের সমস্যা চারজন অন্যান্য সমস্যা। পঞ্চম দিন চারজন স্ত্রী একজন পুরুষ এবং পাঁচজন শিশু। তার মধ্যে চারজন সর্দি কাশিতে চারজন পেটের সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যা দুজন। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে তৃতীয় দিনে ৬ জন শিশু অর্থাৎ ৬০% শিশু সবচেয়ে বেশি শিশু রোগী তপন বাবুর কাছে এসেছে এবং প্রথম দিন পেটের রোগের সমস্যায় ছজন অর্থাৎ 60% রোগী তপনবাবুর কাছে এসেছে। পাঁচ দিনব্যাপী তপন বাবুর নিকট আগত রোগীর পরিসংখ্যান।

দিন	সর্দি কাশি (%)	ভেষজ ওষুধের প্রয়োগ(%)	পেটের সমস্যা (%)	ভেষজ ওষুধের প্রয়োগ (%)	অন্যান্য সমস্যা	ভেষজ ওষুধের প্রয়োগ (%)
১ম	২(২০%)	১(৫০%)	৬(৬০%)	৪(৬৭%)	২(২০%)	১(৫০%)
২য়	৩(৩০%)	২(৬৭%)	৫(৫০%)	৪(৪০%)	২(২০%)	১(৫০%)
৩য়	২(২০%)	১(৫০%)	৬(৬০%)	৩(৭৫%)	৪(৪০%)	৩(৭৫%)
৪র্থ	৩(৩০%)	২(৬৭%)	৩(৩০%)	২(৬৭%)	৪(৪০%)	৩(৭৫%)
৫ম	৪(৪০%)	৪(১০০%)	৪(৪০%)	৪(১০০%)	২(২০%)	১(৫০%)

৫ দিনব্যাপী ভেষজ ওষুধের প্রয়োগের ফলাফলের পরিসংখ্যান। দ্বিতীয় পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রথম দিনে সর্দি কাশিতে আক্রান্ত রোগী দুজন। তার মধ্যে একজন 50 শতাংশ তখন বাবুর ভেষজ প্রয়োগে সুস্থ পেটের রোগে আক্রান্ত ৬ জন তার মধ্যে চারজন ৬৭ শতাংশ ভেষজ ওষুধ প্রয়োগে সুস্থ। দ্বিতীয় দিনে সর্দি-কাশিতে আক্রান্তের সংখ্যা তিনজন এবং দুজন ৬৭ শতাংশ ভেষজ ওষুধ প্রয়োগে সুস্থ পেটের সমস্যা তে আগত পাঁচজন তারমধ্যে চারজন ৮০ শতাংশ

শ্রদ্ধেয় অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত দুজন সুস্থ হয়েছে একজন পঞ্চাশ শতাংশ। তৃতীয় দিন সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত দুজন সুস্থ একজন 50 শতাংশ পেটের সমস্যা তে আক্রান্ত চারজন সুস্থ তিনজন ৭৫ শতাংশ অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত চারজন তিনজন ৭৫ শতাংশ সুস্থ। চতুর্থ দিন সর্দি কাশিতে তিনজন আক্রান্ত সুস্থ দুইজন ৬৭ শতাংশ পেটের সমস্যায় তিনজন সুস্থ দুইজন ৬৭ শতাংশ অন্যান্য সমস্যায় চারজন সুস্থ তিনজন ৭৫ শতাংশ। পঞ্চম দিনে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত চারজন সুস্থ চারজন একশ শতাংশ পেটের সমস্যায় আক্রান্ত চারজন সুস্থ চারজন ১০০ শতাংশ অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত দুজন সুস্থ একজন 50 শতাংশ। উপরিউক্ত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ভেষজ ওষুধ যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভেষজ ওষুধ রোগের কিনারায় সাফল্য অর্জন করেছে। পঞ্চম দিনে সর্দি কাশি মোকাবেলা পেটের সমস্যা দূরীকরণে তপন বাবু প্রয়োগ করা অব্যর্থ ভেষজ ওষুধ রোগীর রোগের প্রতিবিধান করতে সক্ষম হয়েছে। এলোপ্যাথির কুপ্রভাব মুক্ত উদ্ভিদজাত ঘরোয়া টোটকা এবং ভেষজ ওষুধ কর্নগড়ের মানুষের মনে আশার আলো সঞ্চার করতে পেরেছে। এটা শুধু একটা গ্রাম নয়। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ভেষজ ওষুধের গুনাগুনকে নিয়ে গবেষণা কার্য চালানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন ভেষজ পদ্ধতি আধুনিক মেডিসিনে ব্যবহার করা হচ্ছে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য। ক্যান্সারের ক্যান্সারের ন্যায় মারণ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে এবং আরো বহু জটিল রোগের সমাধানের চেষ্টায় রক্তে হিমোগ্লোবিনের বিভিন্ন ভাইরাস থেকে মুক্তি ফোটাতে দেহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক চিকিৎসা ও ওষুধের মধ্যে ভেষজের ব্যবহারে বৃদ্ধি ঘটনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় বিশ্বাসীদের কাছে ভেষজ চিরকালই উপেক্ষিত। হয়তো এ কারণে ভেষজ চিকিৎসা সংক্রান্ত ধারণা ক্ষীণ, বা এটাও হতে পারে ইউরোপীয়দের প্রভাবে এত বেশি সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা তুচ্ছ হয়ে গেছে। তারজন্য অজ্ঞতা অবশ্যই দায়ী। তার থেকেও বেশি দায়ী চিরন্তনী চিকিৎসার প্রতি অনাস্থা। বর্তমানে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় একথা প্রমাণিত সত্য দ্রুত ফলদায়ক এ্যালোপ্যাথির শরীরের পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হানিকর। কিন্তু এই দ্রুতগামী জীবন প্রবাহে হানিকর জেনেও এ্যালোপ্যাথি ওষুধ গ্রহণ করতে বাধ্য। যদি এমন হয় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নবরূপে নবভাবে ফিরিয়ে এনে ত্রুটিমুক্ত ভেষজ চিকিৎসাকে আবার গ্রহণ করা যায় তাহলে সত্যি মানবসমাজ উপকৃত হবে।এই গবেষণা কাজ শুধুমাত্র একটি গ্রাম কর্ণগড়ের ভেষজ চিকিৎসার অনুসন্ধানে রত হয়নি। এই গবেষণা আশা রেখেছে ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন অঞ্চলে বেশি সংখ্যায় ত্রুটিমুক্ত ভেষজ চিকিৎসা এ্যালোপ্যাথির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: পাঠক-পাঠিকা এবং আমার সকল শিক্ষিকা-শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাই। আমার পথ প্রদর্শক ড. তমাল দত্ত মহাশয়ের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। সবশেষে আমার পরিবার আমার পাশে না থাকলে আমার এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। লেখনীর যাবতীয় ত্রুটি কেবলমাত্র আমার, ত্রুটি মার্জনীয়।

তথ্যসূত্র:

1. Mandal, Aninda, Adhikary, Tamalika, Chakraborty, Debarun, Roy, Priti, Saha, Joy, Barman, Anushree, Barman, Saha, Poulami. Ethnomedicinal uses of plants by Santal Tribe of Alipurduar district, West Bengal, India. Indian Journal of Science and Technology, 2020, Vol-13, issue: 20 pp 2021-2029.
2. Pal, D.C, Jain, SK. Notes on Lodha Medicine in Midnapore District, West Bengal. India Economic Botany 1989, 43(4): 464-470.
3. Ghosh, A. Herbal folk remedies of Bankura and Medinipur districts W.B. Indian Journal of Traditional knowledge 2003, 2(4): 393-396.
4. Ghosh, R, Sarkhel, S. Ethnomedicinal practices of the tribal communities in Paschim Medinipur District West Bengal. Asian Journal of Experimental Biological Science 2013; (4): 555-560.
5. Mondal, Manishree, Sau, Arup Kumar, Das, Swastik, Karmakar, Puja. Quantitative analysis and documentation of Women’s Ethnomedicinal knowledge in Western West Bengal. India Ethnobotany Research and Applications, 2025, Vol (30) pp 01-31.

দই পাতা

কুলেখাঁড়া পাতা

লাল বাসব পাতা

লজ্জাবতী মূল

আপাং শিকড়

তপনবাবুর বাড়ির বেড়ায় ভেষজ উদ্ভিদ

তপন বাবুর বাড়ির ভিতরের ভেষজ উদ্ভিদের বাগান

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 238-248
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.202

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জনমত গঠনে সোশ্যাল মিডিইয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ভূমিকা

শুভেন্দু বোস, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সাংবাদিকতা ও গন জ্ঞাপন বিভাগ, ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.09.2024; Accepted: 28.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

A political campaign is an organized effort by political parties to win the trust of common people. In the present political campaigning system social media has been playing the role of important weapon for political parties. They used to talk to common people and voters, convey messages and even rally people on social media platforms. Political campaigns through social media have become a compulsory part for modern-day politics.

Over the last decade, significant changes have arrived in the world of digital campaigning. A new class of marketers has emerged. These are social media influencers. They engage directly with their audiences through comments, live sessions, and interactive content and this helps to create a sense of community and loyalty. Indian political campaigning has transformed, with politicians embracing digital platforms and influencer campaigning as opinion leaders. Social media influencers and content creators play crucial roles in reshaping the audience.

The influencers play an important role in shaping political discourse and driving voter as well as common people engagement on digital platforms. The influencers including comedians, news commentators, satirists and meme-makers, use satire, humour, and creativity to campaign political issues, hold leaders accountable and influence public opinion.

Influencer campaigning is now vital for every political parties particularly among youth, utilizing social media platforms. It humanizes political figures, enhancing relatability. Campaigns through the influencers allows politicians to connect directly with common people to shaping public opinion effectively. Influencers have a greater capacity to push boundaries compared to traditional media. There are many influencers who are collaborating with the political parties or individuals for campaigning. By approaching through the influencers politicians are trying to influence the major population of India.

In conclusion, the fusion of influencer marketing and content creators in political campaigns is now a trade mark of Indian politics in the digital era. This article contains how social media influencers are revolutionizing political campaigning, what new opportunities it gives, and the challenges that one must face in return.

Keywords: Political campaign, Social media, Influencers, Opinion leader, Reshaping, Trade mark

জনসাধারণের মতই হলো জনমত। জনগণ যখন কোন একটি সাধারণ বা বিশেষ বিষয়ে মত পোষণ করে তখন তাকে জনমত বলে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মতামত অত্যন্ত মূল্যবান। রাজনৈতিক ব্যক্তি বর্গ তথা রাজনৈতিক দল সবসময় জনমতকে তাদের অনুকূলে আনতে চায়। এই লক্ষ্য পূরণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল গণনাধ্যাম। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতিতে গণমাধ্যম অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতন্ত্র হল জনগণের

দ্বারা পরিচালিত উদার ও মুক্ত শাসন ব্যবস্থা। একমাত্র গণতন্ত্রেই গণমাধ্যম সক্রিয়ভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে পারে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যম জনগণের সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ সেতু হিসাবে কাজ করে। আধুনিক কালের রাজনীতিতে গণ-মাধ্যমগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত ও প্রতিফলিত তথ্য ও ঘটনা-সাক্ষ্যের দ্বারাই আজকের দিনের রাষ্ট্রীয় রাজনীতি পরিচালিত হয়ে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্যাদিই রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই রাজনীতিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গত কয়েক দশকে বিশ্ব রাজনীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। রাজনৈতিক দল তথা ব্যক্তিত্বের প্রচারে এসেছে এক বিপুল পরিবর্তন। রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রের মতো ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যমের তুলনায় সোশ্যাল মিডিয়া প্রধান গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া; বিশেষ করে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব সহ আরো কয়েকটি গ্রহণযোগ্য শক্তিশালী সোশ্যাল সাইটের দৌলতে গত কয়েক বছরে প্রচারের এই বৈচিত্র এত বেড়েছে যে, একসময়ের সোশ্যাল মিডিয়া বিমুখ রাজনৈতিক দলগুলোও বর্তমানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ইন্টারনেটের কল্যাণে এগিয়ে যাওয়া এসব মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার পেতে।

বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দল, প্রার্থীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেখান থেকে নিয়মিত ব্যক্তি এবং দলীয় মতামত, কর্মকাণ্ড গুলো প্রচার করা হয়, লক্ষ লক্ষ সমর্থক তথা ভোটারদের সাথে সরাসরি মতামত আদান-প্রদান করা হয়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো থেকে শুরু করে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে নিয়মিত সেতু বন্ধন করছেন সাধারণ মানুষের সাথে।

সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক প্রচার মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ইন্টারনেট দুনিয়ায় এক নতুন পেশার উদ্ভব ঘটেছে যার পোশাকি নাম ইনফ্লুয়েন্সিং। আর এই নবতম পেশার সাথে যুক্ত মানুষদের বলা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার। যত দিন এগোচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্সার প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। জনমত তৈরিতে এঁদের (ইনফ্লুয়েন্সারদের) যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং তাঁরা যথেষ্ট জনপ্রিয়ও। তবে সমাজে সুষ্ঠ রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করা, রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলার সাথে সাথে রাজনৈতিক আঙিনায় ইনফ্লুয়েন্সারদের নেতিবাচক অবদানও যথেষ্ট বিদ্যমান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইনফ্লুয়েন্সাররা ভিউ ও লাইকের দিকে ছুটে চলেন ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামাজিক–রাজনৈতিক নীতি-নৈতিকতা বা বিষয় প্রচারের নিরপেক্ষতা তথা গুণগত মান।

এই নিবন্ধটি রাজনৈতিক প্রচারনার আঙিনায় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং তাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে, এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অন্বেষণ করার লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও প্রচারণা:

গ্রীক শব্দ 'polis' থেকে উদ্ভুত রাজনীতি শব্দটি কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের একটি স্ব-শাসিত সম্প্রদায়কে বোঝায়। রাজনীতি একটি বহুমুখী এবং গতিশীল ধারণা যা মানব সমাজে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। রাজনীতি সরকারী কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক নীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তি অধিকার সবকিছুকে প্রভাবিত করে (তথ্য সূত্র- উইকিপিডিয়া)। পাশাপাশি, রাজনৈতিক প্রচারণা হলো ভোটার তথা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির একটি সংগঠিত প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক প্রচারণা সমাজের মানুষদের রাজনৈতিক দল, তাদের মূল এজেন্ডা এবং নীতি- মতাদর্শ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়। এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটারদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ করে দেয়। রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনী সভায় ভাষণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনের খবর হিসাবে প্রকাশের সাথে সাথে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইনফ্লুয়েন্সসারদের আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমেও ঘটে চলেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ধারণা ও ইতিহাস:

ইংরেজি শব্দ সোশ্যাল মিডিয়ার অর্থ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। মূলত ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, মিডিয়া প্লাটফর্ম, অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মানুষ বিশ্ব সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে ও ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্টের মাধ্যমে নিজের সৃষ্টি, চিন্তা ভাবনা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের সাথে শেয়ার করে, তাকে সোশ্যাল মিডিয়া বলা হয়। বর্তমান সময়ে মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে এই সোশ্যাল মিডিয়া।

১৮৪৪ সালে স্যামুয়েল মোর্স বাল্টিমোর থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রথম টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। প্রথম টেলিগ্রাম প্রেরণের প্রায় ১৮০ বছরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বর্তমান জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমগ্র পৃথিবী আজ মাত্র পাঁচ-ছয় ইঞ্চির পর্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে স্থান পেয়েছে মানুষের পকেটে।

প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে হল জিওসিটি ও সিক্সডিগ্রি। অনেকেই ১৯৯৭ সালে তৈরি করা সিক্সডিগ্রিস ডটকম-কেই অধিকাংশ মানুষ প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে ২০০১ সালে ফ্রেন্ডস্টার একটি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। লিংকডিন প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। এরপরে ২০০৩ সালে মাইস্পেসের আবির্ভাব হওয়ার ৩ বছরের মধ্যে এটি হয়ে ওঠে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া সাইট। কিন্তু জনপ্রিয়তার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় যুগান্তকারী বিপ্লব নিয়ে আসে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা পাওয়া ফেসবুক।

সোশ্যাল মিডিয়া যখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার উপায়:

বর্তমান বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাপক বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা রুচি-পছন্দ-প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব গ্রুপ ও কমিউনিটি তৈরি করে সেখানে তাদেরকে সম বিশ্বাস-চিন্তা ধারার মানুষের কাছে নিজস্ব আইডিয়া ও তথ্য শেয়ার করতে পারবেন। নতুন নতুন তথ্য জানতে ও জানাতে, নিজের বিশ্বাস-ভাবধারা র সমর্থনে মত, যুক্তি প্রকাশ করে নিজের বিশ্বাস কে গণ বিশ্বাস করে তোলার লক্ষে এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার হয়ে থাকে। তথ্য আদান প্রদানের পাশাপাশি এই মাধ্যমে পছন্দ মতো গ্রুপ তৈরি করা, ফাইল আদান-প্রদানের মতো বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব। কোনো ভিডিও, ছবি, রীলস, অডিও, মিম, গান প্রভৃতি শেয়ার করতে হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, উইচ্যাট, ভাইভার, টেলিগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট উপস্থাপনার উপর নির্ভর করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বর্তমান ঘটনাবহুল বিশ্বে প্রতিদিন ঘটে চলা বিভিন্ন সামাজিক - রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পিছনে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ থাকে। এভাবেই আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি নানা ধরনের কনটেন্ট শেয়ার করার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে একটি কমিউনিটি।

বর্তমানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা ব্যাপভাবে প্রভাবিত। মানুষ দিনের অনেকটা সময় সোশ্যাল মিডিয়াতে সময় কাটাতো স্ক্রল করে আর এখন এই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মানুষ নিজের ক্যারিয়ার গড়ে নিতে এবং ভাল পরিমানে আয় উপার্জন করতে সক্ষম। এই সমস্ত মানুষরা সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয় ও স্বাধীন পেশার সাথে যুক্ত হয়েছেন তারাই ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার নামে পরিচিত। ফ্যাশন, সৌন্দর্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে শিল্পকলা, ভিডিও, সংগীত, ভ্রমণ, খাবার, রাজনীতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা বিরাজমান।

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো যে শুধুমাত্র বিনোদনের বা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলো হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা শুনিশ্চিত করার অন্যতম উপায়। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর হলেন একজন প্রচারক যিনি কোনো একটি নির্দিষ্ট বা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার নিজস্ব মত, চিন্তা-ভাবনা ছবি, ভিডিও, রীলস, গান, নাটক প্রভৃতি সৃজনশীল পরিবেশনা তার নিজস্ব উপস্থাপনা শৈলীর মাধ্যমে তার নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া পেজ বা চ্যানেলে প্রচারের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরে প্রচার তথা অর্থ উপার্জন করেন। একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকের মতো বিভিন্ন

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করে তাদের সেই কনটেন্ট শেয়ারের জন্য অর্থ ও প্রচার পায় সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে।

সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ধারণা:

একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হলো সেই সমস্ত ব্যক্তিবিশেষ যে বা যারা অনুগামীদের সামাজিক- রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মের মাধ্যমে সমাজের সামনে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজের পরিচিতি তথা ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সাররা বিচারব্যবস্থার প্রায় সমান্তরালে হয়ে উঠছেন। তাঁরা জনগণের সামনে আদালতের মতো বিচার করেছেন এবং তাঁদের বিচারে স্বপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিজেই সিদ্ধান্ত দেন। আর সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নেমে পড়ে অনুগত ফলোয়াররা।

ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রকারভেদ:

সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা সাধারণ মানুষের রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। যেহেতু, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের কাছে ওই ব্যক্তির মতামতের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তাই ব্র্যান্ডগুলো চায় ব্যক্তিটি যেন তাদের পরিচিতির প্রচারক হিসাবে কাজ করে, এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের পণ্য-পরিষেবা-ব্র্যান্ড তথা তাদের মত বা বিশ্বাসের ব্যাপারে ইতিবাচক কথা বলে।ইনফ্লুয়েন্সাররা ক্রমেই হয়ে ওঠেন কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড তথা নির্দিষ্ট মতবাদের প্রোমোটার বা প্রচারক। এইভাবেই এইসব ব্যক্তিরা সমাজের এক বৃহত্তর শ্রেণীর কাছে হয়ে ওঠেন জনমত প্রনেতা। এভাবে ক্রমেই এইধরণের মানুষরা হয়ে ওঠেন জনমত প্রনেতা।

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণ মানুষ। পাশাপাশি মানুষের রুচি-পছন্দ-চাহিদা অনুযায়ী সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারনা ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই ইনফ্লুয়েন্সারদের তালিকায়ও ব্যাপক বৈচিত্র্য আসতে শুরু করেছে। ইনফ্লুয়েন্সারদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা সম্ভব।

তারকা ইনফ্লুয়েন্সার: এই সব তারকারা তাদের নিজেদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পেজ কিংবা আইডির মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস, মতামত তথা পণ্য ও পরিষেবার ব্যাপারে প্রচারণা চালায়। এই প্রচারণা হতে পারে ওই ব্র্যান্ডের পণ্য,পরিষেবা সংক্রান্ত ছবি পোস্ট করে বা বিষয় সম্পর্কে যুক্তি ও মতামত সহ কথা বলে। তবুও তারকা ইনফ্লুয়েন্সাররা আজ সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব জনপ্রিয় এবং তারকাদের মতে ট্রেন্ডি হতে চাওয়া মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট: কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা রয়েছে এমন বিশেষজ্ঞদের ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট বলা হয়। ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট হলেন মূলত সমাজের এলিট সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ যেমন চিকিৎসক,সাংবাদিক, গবেষক,লেখক, সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ শিক্ষক, পেশাদার উপদেষ্টা প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্সারদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি কারণ মানুষ বিশ্বাস করে এই ধরনের বিশেষজ্ঞরা সাধারণত অর্থের বিনিময়ে কোনো বিশ্বাস, মত বা ব্র্যান্ডের হয়ে প্রচারণা চালায় না। জনমানসে এই সব মানুষের কার্যকারিতা খুব বেশি হয়। এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্সাররা প্রভাবিত করার সাথে সাথে জনমানুষকে সচেতন করে তোলে।

ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর: বর্তমানে সামাজিক সোশ্যাল মিডিয়া গুলোতে এক বিপুল সংখ্যক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বর্তমানে ব্লগার বা কনটেন্ট ক্রিয়েটর একটি গুরুত্বপূর্ন ও জনপ্রিয় পেশা হয়ে উঠছে। এসব ব্লগ বা কনটেন্টকেই তারা তাদের অভিমত প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এসব ব্লগার বা কনটেন্ট ক্রিয়েটরেরা নিজস্ব বিশ্বাস তথা মতামতের সপক্ষে ইতিবাচক বার্তা প্রচার করে।

মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সার: মাইক্রো বা ক্ষুদ্র ইনফ্লুয়েন্সাররা কেবলই নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের সৃষ্টিশীলতার উপস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা করে থাকে।

সাধারণ মানুষ তাদের ব্যক্তিজীবনে সেইসব মানুষদেরকেই অনুসরণ করে যাদের সাথে তারা নিজেদের মিল খুঁজে পায়। অধিকাংশ মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সাররা হলেন একদম সাধারণ মানুষ, যারা কোনো ব্র্যান্ডের সাথে জড়িত নয়, কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞও নয়। এরা একদম নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা, ধারণা থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে

নিজেদের ধারণা, বিশ্বাস, মতামতকে প্রকাশ করে। এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্সারদের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা সবচেয়ে বেশি এবং সমাজে এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্সারদের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

জনমত প্রনেতা হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার:

বর্তমানের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার নামটি ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয়। এ ধরনের ইনফ্লুয়েন্সার হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজে তার ব্যক্তিগত পছন্দ ও ভালোলাগা অনুযায়ী কোনো পণ্য ব্যবহার করতে শুরু করে ওই পণ্যের ট্রেন্ড সেট করে দেয়, এবং পরবর্তী সময়ে তাকে দেখে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী ওই একই পণ্যের ভোক্তা বনে যায়। বর্তমান সময়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক ট্রেন্ড বা চল হচ্ছে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবশালী তারকাদের কাজে লাগিয়ে ব্র্যান্ডিং বা প্রচার করা। কিন্তু এখন সে অবস্থা আর নেই। সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার মূলত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে তাঁদের পণ্য বা পরিষেবার প্রচার তার ফলোয়ার বা অনুগামীদের কাছে প্রচার করে থাকেন। এতে ব্র্যান্ডগুলো যেমন প্রচার পায়, তেমনি বিক্রিও বাড়ে। এর বিনিময়ে ব্র্যান্ডগুলো ওই তারকার জন্য অঢেল অর্থ খরচে পিছপা হয় না।

রাজনৈতিক প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার:

সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা তাদের নিজেদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পেজ কিংবা আইডির মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস, মতামতের প্রচার চালায়। অনেকক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের রাজনৈতিক প্রচারের জন্য যুক্ত হয়ে থাকে এবং ওই দল সম্পর্কে এমন সব তথ্য জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দেয়, যা তাদেরকে উৎসাহিত করে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াতে রাজনৈতিক ইনফ্লুয়েন্সার বিষয়টি ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে বিশেষ কয়েকটি কারণে,

সরাসরি ভোটারদের সাথে যোগাযোগ: রাজনৈতিক ইনফ্লুয়েন্সাররা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবের মতো মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ সমর্থকদের সাথে রাজনীতিবিদদের সরাসরি মতাদর্শের যোগাযোগ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রচারের প্রথাগত পদ্ধতিগুলো থেকে বের হয়ে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের সৌজন্যে নামমাত্র খরচে প্রায় প্রত্যেকের কাছে প্রার্থীরা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস, মতামত পৌঁছে দিতে পারছেন।

বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন: একসময় টেলিভিশন, রেডিও এবং প্রিন্ট মিডিয়াই ছিল অন্যতম নির্বাচনী প্রচারণা মাধ্যম। তবে প্রচারের জন্য এসব মাধ্যমগুলোর সময় কেনার জন্য খরচ করতে হতো অঢেল অর্থ। কিন্তু বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে খুব সহজেই ইউটিউব, ফেইসবুক, টুইটারের মাধ্যমে এসব প্রচারণা চালানো যায়। আর যেহেতু ইন্টারনেট ভিত্তিক মিডিয়াগুলোতে যেকোনো সময় প্রায় সবরকমের উপায়ে প্রচারণা চালানো সুযোগ রয়েছে ফলে নির্বাচনী প্রচার ব্যবস্থা দিন দিন পুরোপুরি সোশ্যাল মিডিয়ামুখী হয়ে যাচ্ছে।

ভাইরাল মার্কেটিং: রাজনৈতিক ইনফ্লুয়েন্সারদের রাজনৈতিক বিশ্বাস, মতামত প্রচারণা প্রভৃতি ফেসবুকের শেয়ার এবং টুইটারের রি-টুইট ফিচারগুলো বর্তমানে ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট কোনো দলের সম্ভাব্য ভোটাররা তাদের ইনফ্লুয়েন্সারদের বিভিন্ন মতামত, রাজনৈতিক বিশ্বাস ভিডিও সহ বিভিন্ন সংবাদ খুব সহজেই নিজেদের প্রোফাইলে শেয়ার এবং রি-টুইট করার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের দ্বারা খুব সহজেই নির্দিষ্ট কোনো দলের ইভেন্টগুলোকে সমমনস্ক লোকদের কাছে শেয়ার করে ছড়িয়ে দিতে পারে।

ফিল্টারিং: ফেসবুক, টুইটারের মতো কোম্পানিগুলো নিজেদের সাইটে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের উপস্থিতি গ্রাহকদের পছন্দ, অপছন্দ, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা যদি নির্দিষ্ট কোনো দলের রাজনৈতিক প্রচারের জন্য যুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে এমন সব তথ্য বিরোধী মনোভাবের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই অধিকাংশ সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করে।

ফান্ড রাইজিং: পশ্চিমা বিশ্বের রাজনীতিতে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে প্রচারণায় সরাসরি সাধারণ সমর্থকদের কাছ থেকে ফান্ড রাইজিংয়ের ধারণাটা বেশ পুরনো। ভারতবর্ষে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা সাধারণ ভোটারদের কাছে পুরো ব্যাপারটাকে সহজবোধ্য করে তুলে ধরছে। অনলাইন ভিত্তিক ক্রাউড-ফান্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে খুব সহজেই যে কেউ যেকোনো পরিমাণের অর্থ যেকোনো সংগঠন বা ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারে। আর এই

পদ্ধতিটি বর্তমানে নির্দিষ্ট দলের সমর্থকেরাও শেয়ার, রি-টুইট করে একই চিন্তা-চেতনার ব্যবহারকারীদের কাছে ফান্ড রাইজিং সংক্রান্ত ইভেন্টগুলোও পৌঁছে দিচ্ছে।

২০২৪ এর লোকসভা ভোট রাজনৈতিক দলের প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দের উজ্জ্বল উপস্থিতি:

ভারত ইনস্টাগ্রাম রিলের বৃহত্তম বাজার হয়ে উঠেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে ইউটিউবের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। ভারতে গড় মাসিক ভিউ ৫০০ বিলিয়নেরও বেশি (তথ্যসূত্র- সূত্র: স্ট্যাটিস্টা), ইনফ্লুয়েন্সার দ্বারা উপস্থাপিত রাজনৈতিক সংবাদ এবং ভিউ সারা দেশে জনমত গঠন করছে অথবা জনমতকে প্রভাবিত করছে। এই আঙ্গিকে ২০২৪ সালে ভারতবর্ষের লোকসভা ভোটে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের রাজনৈতিক ভূমিকা চোখে লাগার মতো। সোশ্যাল মিডিয়া তারকারা রাজনৈতিক দলগুলিকে ভারতের জনগনের সাথে যেখানে ১.৪ বিলিয়ন জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ৩৫ বছরের কম (তথ্য সূত্র -বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন) এবং যেখানে অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রামের গ্রাহক সংখ্যা বেশি মূলত তরুণদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান সুযোগ করে দিয়েছে।

২০২৪ এর লোকসভা ভোটে সোশ্যাল মিডিয়ার দখলের দৌড়ে বিজেপি, আপ, কংগ্রেস, তৃণমূলের আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ও ইনফ্লুয়েন্সার দের ব্যবহার ছিলো চোখে পড়ার মতো। লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণের কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রথাগত পদ্ধতি ছাড়াও মিম, রিল থেকে শুরু করে ইনফ্লুয়েন্সার দের মাধ্যমে প্রচারমূলক ভিডিও, লাইভ স্ট্রিম প্রভৃতিরও আশ্রয় নেয়। এইভাবে রাজনৈতিক প্রচার কার্যকে আরও আকর্ষনিয় করতে এবং রাজনৈতিক দলগুলি তাদের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিতে বিভিন্ন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার দের ব্যবহারের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ সক্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর সাথে, এই প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে জনমত গঠন এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রচারে বিজেপি, কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি (এএপি), তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় সব রাজনৈতিক দল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হয়েছিল।

সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার পরিচালিত এই প্রচারণার মাধ্যমে কীভাবে রাজনৈতিক দলগুলিকে লাভবান করছে তা বোঝার জন্য ইন্ডিয়া টুডে একটি গভীর অনুসন্ধান চালিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় উপস্থিতির দিক থেকে বিজেপি দল অন্যান্য রাজনৈতিক দল তথা কংগ্রেস, আপ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তুলনায় এগিয়ে ছিলো।

বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার:

ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউব ছিলো বিজেপির প্রচারের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ফেসবুক এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের তুলনায় ইনস্টাগ্রামের দর্শক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও, ইউটিউব এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা ১৮ বছর থেকে ৮০ বছর বয়সী যেকোনো গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়।

ইন্ডিয়া টুডের গবেষণা তথ্য অনুযায়ী-

- বিজেপির ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল: ৭.৫ মিলিয়ন ফলোয়ার
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইন্সটা অ্যাকাউন্ট: ৮৫ মিলিয়ন ফলোয়ার
- বিজেপির এক্স হ্যান্ডেল: ২১.৬ মিলিয়ন ফলোয়ার
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক্স হ্যান্ডেল: ৯৬.৯ মিলিয়ন ফলোয়ার
- হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সংখ্যা: ৫০ লক্ষ

বিজেপির সংগঠকরা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবশালীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে তারা সরকারের হয়ে প্রচার চালায়। গবেষণায় দেখা গেছে একাধিক বিশিষ্ট ইউটিউবার ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সাথে সাম্প্রতিক যে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, যার ৮০ ভাগই হল বিজেপি নেতৃত্ব, সদস্যদের সাথে।

কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার:

কংগ্রেসও তাদের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সসারদের সংগঠিত একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছে যেখানে প্রভাবশালীরা কংগ্রেসের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়বস্তু পোস্ট করে। এমনকি কংগ্রেস এবং বিজেপির প্রভাবশালীদের মধ্যে প্রায়শই অনলাইন যুদ্ধ দেখা যায়, বিশেষ করে X- হ্যান্ডেল এ।

কংগ্রেসের সূত্রগুলি ইন্ডিয়া টুডেকে জানিয়েছে যে তারা তাদের কন্টেন্ট প্রচারের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করে এবং কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া টিম দেশের যেকোনো স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিষয়বস্তু প্রকাশ করে।

ইন্ডিয়া টুডের গবেষণা তথ্য অনুযায়ী-

- কংগ্রেস (আইএনসি ইন্ডিয়া) X-এ: ১০.৩ মিলিয়ন ফলোয়ার
- ইনস্টাগ্রামে কংগ্রেস (আইএনসি ইন্ডিয়া): ৩.৭ মিলিয়ন ফলোয়ার
- ফেসবুকে কংগ্রেস (আইএনসি ইন্ডিয়া): ৬.৭ মিলিয়ন ফলোয়ার
- ইউটিউবে কংগ্রেস (আইএনসি ইন্ডিয়া): ৪.২৪ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার
- রাহুল গান্ধী অন এক্স: ২৫.২ মিলিয়ন ফলোয়ার
- ফেসবুকে রাহুল গান্ধীর অনুসারী সংখ্যা ৬৯ লক্ষ।
- ইনস্টাগ্রামে রাহুল গান্ধী: ৬.৩ মিলিয়ন ফলোয়ার
- ইউটিউবে রাহুল গান্ধী: ৪০ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার

তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার:

তৃণমূল কংগ্রেসের 'খেলা হবে' (খেলা চলছে) স্লোগানটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচারণার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (আই-প্যাক) দলের তথ্য অনুযায়ী প্রচারে ফেসবুক এবং ইউটিউবের উপর ব্যাপকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রচারণায়, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপও ব্যবহার করছে। ইনস্টাগ্রামে, সবকিছুই ছোট ছোট রিল ব্যবহার করে, এবং হোয়াটসঅ্যাপের ক্ষেত্রে, দলটি স্থানীয় মানুষদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় স্তরের ইনফ্লুয়েন্সসারদের উপর নির্ভর করে।

ইন্ডিয়া টুডের গবেষণা তথ্য অনুযায়ী-

- তৃণমূলের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল: ১,০৮,০০০ ফলোয়ার
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনস্টাগ্রাম: ৩.৮ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার
- তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেল: ৬.৮ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডেল: ৭.৪ মিলিয়ন

আম আদমি পার্টির নির্বাচনী প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার:

আম আদমি পার্টি (এএপি) তার ভোটারদের সাথে যোগাযোগের জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছে। দলটির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাদের ডিজিটাল উপস্থিতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন, তার এক্স হ্যান্ডেলের ২৭.৪ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে, যা রাহুল গান্ধীর চেয়ে বেশি। আম আদমি পার্টির কাছে মিম ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সসারদের মাধ্যমে প্রচার তাদের মূল লক্ষ্য। দলটি তরুণ প্রজন্মের ভাষা বোঝে এবং তারা প্রচারের ক্ষেত্রে তরুণ ইনফ্লুয়েন্সসারদের বেশি ব্যবহার করে।

ইন্ডিয়া টুডের গবেষণা তথ্য অনুযায়ী-

- অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এক্স হ্যান্ডেল: ২৭.৪ মিলিয়ন ফলোয়ার
- অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল: ২.১ মিলিয়ন ফলোয়ার
- AAP এর Instagram: 1.1 মিলিয়ন ফলোয়ার
- AAP-এর X হ্যান্ডেল: ৬.৫ মিলিয়ন ফলোয়ার

২০২৪ এর লোকসভা ভোট রাজনৈতিক দলের প্রচারে ১০ জন জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার:

ভারত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে ইউটিউবের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। ভারতে গড় মাসিক ভিউ ৫০০ বিলিয়নেরও বেশি, ইনফ্লুয়েন্সার দ্বারা উপস্থাপিত রাজনৈতিক সংবাদ এবং ভিউ সারা দেশে জনমত গঠন করছে অথবা জনমতকে প্রভাবিত করছে।

এই আঙ্গিকে ২০২৪ সালে ভারতবর্ষের ১০ জন জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ব্যক্তিদের একটা লিস্ট প্রস্তুত করেন মুম্বাই-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘গেটওয়ে পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিজ’। তাদের গবেষণা এবং বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত তালিকাটি নিম্নে প্রকাশিত হল।

১. রণবীর এলাহাবাদিয়া:

ভিউ: ৩ বিলিয়ন

গ্রাহক: ১০.৫ মিলিয়ন

অনুষ্ঠানের ধরণ- পডকাস্ট সিরিজ, ‘দ্য রণবীর শো’ (টিআরএস), উদ্যোক্তা, ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা, রাজনৈতিক নেতা এবং চিন্তাভাবনা প্রভাবিতকারীদের ২০ জন বৃহত্তম ইউটিউব রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি কারা? মুম্বাই-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গেটওয়ে পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিজের গবেষণা এবং বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আমাদের তালিকাটি এখানে দেওয়া হল। উল্লিখিত সমস্ত পরিসংখ্যান ২ক্ষাৎকার প্রদান করে, যা তাদের অভিজ্ঞতা এবং দর্শনের উপর ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

২. নীতীশ রাজপুত:

ভিউ: ৩০৭ মিলিয়ন

গ্রাহক: ৬.৪ মিলিয়ন

অনুষ্ঠানের ধরণ- তথ্য-সমর্থিত গল্প বলার মাধ্যমে সরকারি নীতি, গণতন্ত্র এবং সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে সহজলভ্য এবং আকর্ষণীয় করে তোলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। নীতিশ ডিজিটাল শাসন, সাংস্কৃতিক রূপান্তর এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

৩. দ্য লালানটপ শো:

ভিউ: ২.১৭ বিলিয়ন

গ্রাহক: ৩২.৩ মিলিয়ন

অনুষ্ঠানের ধরণ- রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা এবং সংস্কৃতির মতো জটিল বিষয়গুলিকে সহজ করে তোলে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার এবং সাম্প্রতিক বিষয়গুলির গভীর কভারেজ প্ল্যাটফর্মটিকে বিনোদনমূলক এবং শিক্ষামূলক উভয়ই করে তোলে।

৪. প্রিয়া জৈন:

ভিউ: ৫০০ বিলিয়ন

গ্রাহক- ৫০০ বিলিয়নেরও বেশি

অনুষ্ঠানের ধরণ- রাজনৈতিক সাক্ষাকার।

৫. গৌরব ঠাকুর:

ভিউ: ১৭৮ মিলিয়ন

গ্রাহক: ৬.৭ মিলিয়ন

অনুষ্ঠানের ধরণ- সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় আখ্যানের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলেন।

৬. অভি এবং নিয়ু:

ভিউ: ১৯৮ মিলিয়ন

গ্রাহক: ৬.৩৩ মিলিয়ন

অনুষ্ঠানের ধরণ- গল্প বলার মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগ এবং বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলির বাস্তব সমাধানের উপর আলোকপাত করে।

৭. মিস্টিকা ল্যান্ড:

ভিউ: ৯১.০৫ মিলিয়ন

গ্রাহক: ৯.৪৭ মিলিয়ন

অনুষ্ঠানের ধরণ- লুকানো সত্য, কম জানা তথ্য এবং রাজনীতি ও সংস্কৃতির আকর্ষণীয় দিকগুলি উন্মোচন করে।

৮. দেশভক্ত – আকাশ ব্যানার্জি:

ভিউ: ৩২৮ মিলিয়ন

গ্রাহক: ৫.২৯ মিলিয়ন

অনুষ্ঠানের ধরণ- ভারতের রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক মঞ্চ। চ্যানেলটি সরকারি নীতি, মিডিয়ার বর্ণনা এবং সামাজিক বিষয়গুলির সমালোচনা করার জন্য তীক্ষ্ণ হাস্যরস এবং সাহসী মন্তব্য ব্যবহার করে

৯. রবীশ কুমার:

ভিউ: ১.১৪ বিলিয়ন

গ্রাহক: ১.২৪ কোটি

অনুষ্ঠানের ধরণ- সমালোচনামূলক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলি প্রান্তিক কণ্ঠস্বর সহ তুলে ধরা এবং শাসন ও সমাজ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকে উৎসাহিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

১০. স্কুল ভাবুন:

ভিউ: ১৬৩ মিলিয়ন

গ্রাহক: ৪.৩৯ মিলিয়ন

অনুষ্ঠানের ধরণ- ব্যবসা, ভূ-রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে সাশ্রয়ী মূল্যের, উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করে।

সমাজে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের রাজনৈতিক প্রভাব:

বিশ্বের রাজনীতিতে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে প্রচার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন রাজনীতি গতিশীল হয়ে উঠছে, তেমনি আরও বেশি জটিল আকার ধারণ করছে। জনমতকে প্রভাবিত করা, প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা, জনগণের মনোভাব নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা সহ বিভিন্ন নেতিবাচক অবদানও যথেষ্ট বিদ্যমান। বিশেষত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মাধ্যমগুলোতে ইনফ্লুয়েন্সারদের উপস্থাপিত প্রচারমূলক রাজনৈতিক মতাদর্শের অপপ্রয়োগ হচ্ছে। তাছাড়া পুঁজিবাদী বিশ্বে সামাজিক মাধ্যমগুলোর ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তারা রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একদিকে যেমন বিশ্বের পরিসর ছোট করে দিয়েছে, তেমনি রাজনীতিকে আরও বেশি নেতিবাচক করে তুলছে, তেমনি কদর্য ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রচারের নিরপেক্ষতা তথা গুণগত মানের বিভিন্নতার কারণে নির্বাচনকেন্দ্রিক বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ না থেকে বৈশ্বিক জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে সত্য-মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের মতামতকে প্রভাবিত করা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা প্রতিদিন নানা বিষয়ে মন্তব্য ও বিশ্লেষণ হাজির করছেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক, খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, সরকারের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত এবং সংবাদমাধ্যমসহ সমকালীন নানা ইস্যুতে ইনফ্লুয়েন্সাররা অনেক বেশি তৎপর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রভাব বাড়ছে। কেবল দেশের ভেতর নয়, বাইরে থেকেও ইনফ্লুয়েন্সাররা জনমতকে প্রভাবিত করছেন। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন তবে এসব ইনফ্লুয়েন্সারদের ফলোয়াররা অনেক ক্ষেত্রেই প্রজাসদৃশ। তাই তারা অনেকটা হয়ে পড়েছেন সামাজিক যোগাযোগকেন্দ্রিক নতুন 'সামন্তপ্রভু'। জনমত তৈরিতে এঁদের (ইনফ্লুয়েন্সারদের) ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং তাঁরা জনপ্রিয়ও বটে। কিন্তু এ প্রভাব ও জনপ্রিয়তাই শেষকথা নয়। ইনফ্লুয়েন্সাররা যোগাযোগ সম্পর্কের ওপর নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। প্রযুক্তির এ যুগে মানুষ বড় একটা সময় ভার্চুয়াল জগতে কাটাচ্ছে। ভার্চুয়াল জগতে বসতি বেড়েছে, বেড়েছে সংযোগ; ভাবের আদান-প্রদানও। দর্শক-শ্রোতার ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রভাব খতিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে।

ইনফ্লুয়েন্সাররা এমন সব কনটেন্ট বানাচ্ছেন, যাতে দ্রুত মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। ভিউ হলো পপুলার কালচারের একটি বিশেষ অংশ, যার সারবত্তা বলে কিছু নেই। ভিউ-প্রবণতার বড় ধাক্কা এসে পড়েছে ব্যক্তির স্বাধীনতা, গোপনীয়তা ও মানবিক মর্যাদার ওপরে। খুব সহজ করে বললে মানুষ কী খাবে বা তাকে খাওয়ানো যাবে, তা-ই হয়ে উঠছে ইনফ্লুয়েন্সারদের তৎপরতার মূল লক্ষ্য। তাঁরা তৈরি করছেন বাধ্যতামূলক দর্শকশ্রেণি। অর্থাৎ যে ইনফ্লুয়েন্সারকে ভিউ করা হচ্ছে, তাঁর কাছে সমর্পিত হচ্ছে দর্শক। আপডেট, বিষয়বস্তু, নতুনত্ব নিয়ে অপেক্ষায়

থাকছে। অর্থাৎ একটি অপেক্ষমাণ, অস্থির শ্রেণিও তৈরি করছেন ইনফ্লুয়েন্সাররা। শুধু তা-ই নয়, ইনফ্লুয়েন্সাররা ট্যাগিং উৎসাহিত করছেন। যাঁরা এ বক্তব্যের বিপক্ষে যাবেন, তাঁরা 'গণশত্রু' হিসেবে বিবেচিত হবেন। ইনফ্লুয়েন্সাররা সবকিছু বদলে দিতে চান তাঁদের মতো করে। ইনফ্লুয়েন্সাররা তাঁদের মতো করে সমাজ গড়তে চান। ইনফ্লুয়েন্সাররা নিজেদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অনুগামীদের নিয়মিত আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন । দর্শক-শ্রোতারা এসব কনটেন্টে আসক্ত হয়ে পড়ছেন। তাঁদের পক্ষে মিথ্যা, ভুল তথ্য, গুজব বা অতিরঞ্জন চিহ্নিত করা সুযোগ থাকছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, গোপনীয়তা ও মানবিক মর্যাদা। এক্ষেত্রে পাঠক-দর্শকরা নিজস্ব যুক্তি-তর্ক, বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে সক্ষম না হলে ইনফ্লুয়েন্সারদের নিজস্ব মত প্রাধান্য পাবে বিঘ্নিত হবে সমাজ কল্যাণ মূলক জনমত প্রতিষ্ঠা।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Allen, S. & Thompson, R. J. (n.d.). Television in the United States - The Kennedy-Nixon debates. Encyclopedia Britannica.

২. Gwendelyn S. Nisbett and Christina Childs DeWalt. 2016. Exploring the influence of celebrities in politics: A focus group study of young voters. Atlantic Journal of Communication 24(3): 144-156.

৩. Arya, Arshia, De, Soham, Mishra, Dibyendu, Shekhawat, Gazal, Sharma, Ankur, Panda, Anmol, Lalani, Faisal. et al., "DISMISS: Database of Indian Social Media Influencers on Twitter", In Proceedings of the International AAAI Conference on Web and social media. vol. 16, 2022, pp. 1201-1207.

৪. Dubois, Elizabeth and Gaffney, Devin. 2014. The Multiple Facets of Influence: Identifying Political Influentials and Opinion. August 2014. American Behavioral Scientist 58, 10 (2014), 1260–1277.

৫. Influencer Nation: How Modi's BJP is Reshaping Indian politics. May 31, 2024. Global Security.

৬. Katz, Elihu and Paul, Lazarsfeld. (1955). Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. Transaction Publishers, Piscataway, NJ.

৭. Kemp, Simon. Digital 2024: India – Data Reportal – Global Digital Insights. Data Reportal, 20 February 2024,

৮. Lok Sabha 2024: The influencers driving India's big election (May 2024) - Cherylann Mollan Role, BBC News, Mumbai.

৯. Mollan, C. (2024). Lok Sabha 2024: The influencers driving India's big election. BBC News.

১০. Mukherjee, Jaideep. 2004. Celebrity, Media and Politics: An Indian Perspective. Parliamentary Affairs 57, 1 (2004), 80–92.

১১. David, Nolan and Brookes, Stephanie. 2013. Populism in theory and practice: Analysing celebrity politics. Media Asia 40, 4(2013), 373–383.

১২. Pal, J. (2019). Legitimacy, Support and Endorsement: Narendra Modi's Social Media Engagement with Celebrities. Economic and Political Weekly, 54(7), 1–12.

১৩. Study of young voters. Atlantic Journal of Communication 24, 3 (2016), Vol24, Issue 3 (2016).144–156.

১৪. Sharma, P. (2025). Influencer advertising on digital media: An Indian political economy of communications perspective. Economic and Political Weekly Engage

60(21), https://www.epw.in/engage/article/influencer-advertising-digital-media-indian.

১৫. Sircar, Neelanjan. &Aiyar, Yamini. Social media's impact on Indian politics May 16, 2024.

১৬. Social media influencers are India's new election campaigners. March 27, 2024, The Hindu.

১৭. International Journal of Politics. Culture and Society 27, 4 (2014), 409–425.

১৮. স্টিভ, অ্যালেন এবং থম্পসন, রবার্ট জে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশন-কেনেডি-নিক্সন বিতর্ক। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, www.britannica.com/art/television-in-the-United-States/The-Kennedy-Nixon debates

১৯. আলম, খান.মো.রবিউল। সমাজে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের যে রাজনৈতিক প্রভাব- https://www.prothomalo.com/opinion/column/05466t43su

নির্দেশনা:

প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য প্রথমে ওয়েবসাইটে (https://uttarsuri.com/uttarsuri) অথবা উপরে দেওয়া Submit your Article এ ক্লিক করলেও হবে) লেখক হিসেবে নিবন্ধন (Registration) করতে হবে। নিবন্ধন করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatic) আপনি লেখা জমা দেওয়ার জন্য পোর্টালে প্রবেশ (Login) করতে পারবেন, প্রবেশ করার পর লেখকের নিজস্ব ড্যাশবোর্ডের বামদিকে Articles এ চাপ দিলে Add New আসবে, তাতে ক্লিক করে প্রবন্ধ জমা করতে হবে। প্রবন্ধ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আপনি ইমেইল/পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করলে পেয়ে যাবেন এবং উত্তরসূরি থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেইলে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

গবেষণাপত্র রচনায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি:

১. শিরোনাম (Title): শিরোনাম যথাযথ এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. সারসংক্ষেপ (Abstract): ইংরেজিতে ৩০০ শব্দের মধ্যে।
৪. সূচক শব্দ (Keywords): ন্যূনতম ৫টি।
৫. মূল আলোচনা: গবেষণাপত্রে ন্যূনতম ২৫০০ শব্দ থাকতে হবে। শব্দ সংখ্যা ২৫০০ এর কম হলে তা রিভিউ করা হবে না।
৬. তথ্যসূত্র (Reference): লেখকের পদবি, লেখকের নাম। গ্রন্থের নাম। প্রকাশনীর নাম, প্রকাশকাল, প্রকাশস্থান, পৃষ্ঠাঙ্ক।
৭. গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি (Bibliography): পৃষ্ঠাঙ্ক ব্যতিরেকে উল্লেখিত পদ্ধতি।

গবেষণাপত্র প্রেরণের নিয়মাবলী:

১. প্রবন্ধ হতে হবে সুচিন্তিত, মৌলিক ও গবেষণাধর্মী। প্রবন্ধে Plagiarism-এর মত ঘটনা ঘটলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে লেখকের। পত্রিকা কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। প্রবন্ধ AI ব্যবহার করে লেখা হলে ছাপানোর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
২. অভ্র কীবোর্ডে, যে কোনো ফন্টে টাইপ করে লেখা পাঠাতে পারেন (জার্নালে বেনসেন ১৩ ফন্ট ব্যবহার করা হয়)। ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman 12 ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।
৩. বাক্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্নের (দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন ইত্যাদি) আগে কখনোই স্পেস দেওয়া যাবে না। পরে একটি স্পেস দিতে হবে।
৪. গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ ইত্যাদির নাম 'Single Quote' এর মধ্যে রাখতে হবে।
৫. গদ্য, পদ্য বা যে কোনো টেক্সটের উদ্ধৃতি "Double Quote" এর মধ্যে রাখতে হবে।
৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া বাধ্যতামূলক।
৭. আকাদেমি বানান অভিধান (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) অনুসরণ করে ভালোভাবে প্রুফ দেখে লেখা পাঠাতে হবে। আকাদেমি বানান অভিধান এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহারিক বাংলা বানান অভিধান, পবিত্র সরকার দ্রষ্টব্য।
৮. সম্পাদকগণ প্রয়োজনে সংশোধন বা সামান্য পরিবর্তন করতে পারেন, যদি তিনি তা প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে করেন।

তথ্যসূত্র যে ভাবে লিখতে হবে:

বই এর ক্ষেত্রে:

১. সেলিম, মুস্তাফা। বাহান্ন তাসের পর। সোনিক অর্কেস্ট্রা, ১৯৭৮, ধর্মনগর, পৃ. ৩।
২. একই গ্রন্থ পর পর হলে লিখতে হবে, তদেব, পৃ. ৫।
৩. দে, তমালশেখর। সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ: সাক্ষাৎকার এবং। নীহারিকা পাবলিশার্স, ২০২২, কথামুখ, পৃ. ৬।
৪. দাশ বিশ্বাস, পীযূষকান্তি, সম্পাদনা। ছবি, পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১২৫, মার্চ ২০২৪, পৃ. ৮।

সাহিত্যপত্র:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

৪. নাথ, ঋষিকেশ, সম্পাদনা। শব্দনীল, সংখ্যা ২৫, একুশে মার্চ ২০২৩, পয়েন্টস ইউনিট, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

পত্রিকা:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

২. ──, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১১৪, এপ্রিল ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। (একই পত্রিকার ক্ষেত্রে)

ওয়েবসাইট:

ভট্টাচার্য, ড. তমালশেখর। "নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম।" আত্মদীপ, www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html। প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

ফুটনোট:

১ ড. তমালশেখর ভট্টাচার্য, "নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম," আত্মদীপ www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html, প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

২ মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

Plagiarism:

Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

Review Process

- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.
- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

Publication Ethics

Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.

- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.
- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1000.00 and Rs. 1200.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is $25 for single authored paper and $30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 600.00 per copy. Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25$ (inclusive international shipping charge) per copy.

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

Volume-II, Issue-I, September, 2025

Website: https://www.atmadeep.in/

Email: editor@atmadeep.in

NOVEL INSIGHTS

A Peer-Reviewed Quarterly Multidisciplinary Research Journal

E-ISSN: 3048-6572 P-ISSN: 3049-1991

Website: https://www.novelinsights.in

Published by: **UTTARSURI**

Crossref OPEN ACCESS

ABOUT UTTARSURI

Uttarsuri is a registered society under the Societies Registration Act XXI of 1860, bearing registration number RS/KARIM/258/L/09 OF 2022-23 dated 30.04.2022, located in Karimganj, Assam, India. The society is also registered with NGO Darpan, bearing the unique ID VO/NGO AS/2022/0314757.

Uttarsuri Publication is a branch of the registered society Uttarsuri. It is registered with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under registration number UDYAM-AS-18-0012611.

UTTAR SURI

প্রকাশক:

উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, অসম, ভারত

ISSN24541508